বাংলা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2851

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2851

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনা ও সংকলনে

ড. মো. চেঙ্গীশ খান
মেহেরীন মুনজারীন রত্না
ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী
ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান
ড. চঞ্চল কুমার বোস
জাহিদ হাসান সরকার

সম্পাদক

ড. মো. চেঙ্গীশ খান
ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী

সমন্বয়কারী

ড. মো. চেঙ্গীশ খান
মেহেরীন মুনজারীন রত্না

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2851

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০১৭
পুনঃমুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৮
পুনঃমুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০২০
অনলাইন ভার্সন : জানুয়ারি, ২০২২

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স
আব্দুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম

ISBN 978-984-34-3142-4

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর–১৭০৫

মুদ্রণ
মাষ্টার সিমেক্স পেপার লিমিটেড
৬৫/২/১, প্যারামাউন্ট হাইট্স
৮ম তলা, বক্স কালভার্ট রোড
পুরনা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলা দ্বিতীয় পত্র **কোর্স কোড : (HSC-2851)**

এইচএসসি প্রোগ্রামের বাংলা দ্বিতীয় পত্র বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একই সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে এনসিটিবি'র নতুন কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইটি স্বশিখন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। এতে ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশ স্থান পেয়েছে। প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি-না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন, মানস গঠন, ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং সর্বোপরি সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এই পাঠ্যবইটি সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক ভাষাদক্ষতা অর্জনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা, মানবীয় গুণাবলি ও চিন্তাশক্তিকে বিকশিত, সুসংহত ও প্রাগ্রসর করার সুযোগ পাবে। এই পাঠ্যসূচিকে যথাসম্ভব ভারমুক্ত ও আনন্দদায়ক করে প্রস্তুত করা হয়েছে। ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা এই পর্যায়ের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কিনা তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ২০টি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি-না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	শব্দার্থ	সারসংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	অ্যাসাইনমেন্ট	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

কোর্স সমাপ্তির সময়	কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য বাংলা বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ, কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–

আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর

ড. মো. চেঙ্গীশ খান অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : chenggish@bou.ac.bd	**মেহেরীন মুনজারীন রত্না** সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল : munjarin81@gmail.com

সূচিপত্র

ইউনিট ৮ : নির্মিতি

এইচএসসি প্রোগ্রাম
বাংলা দ্বিতীয় পত্র : HSC-2851

মানবণ্টন
পূর্ণমান : ১০০

১. ব্যাকরণ	**৫×৬ = ৩০**
৬টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের ১টি করে বিকল্প থাকবে।	
২. পারিভাষিক শব্দ অথবা বঙ্গানুবাদ লিখন	**১×১০ = ১০**
৩. দিনলিপি/অভিজ্ঞতা বর্ণনা অথবা ভাষণ/প্রতিবেদন লিখন	**১×১০ = ১০**
৪. বৈদ্যুতিন চিঠি/ক্ষুদে বার্তা লিখন অথবা পত্র/আবেদনপত্র লিখন	**১×১০ = ১০**
৫. সারাংশ / সারমর্ম অথবা ভাবসম্প্রসারণ লিখন	**১×১০ = ১০**
৬. সংলাপ অথবা ক্ষুদে গল্প রচনা	**১×১০ = ১০**
৭. প্রবন্ধ রচনা	
৫টি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার উল্লেখ থাকবে।	
যে কোনো ১টি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে হবে।	**১×২০ = ২০**
	মোট = ১০০

নির্মিতি

ইউনিট ১
ব্যাকরণ ও ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব

পাঠ ১.১ : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : বিষয়বস্তু ও পরিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ব্যাকরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলা ব্যাকরণের উদ্ভব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ব্যাকরণের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ব্যাকরণ : সাধারণ পরিচয়

ভাষা মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের অন্যতম উপায়। ভাষার সাহায্যে যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে কথকের (speaker) যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন হয় শ্রোতার (listener)। এক্ষেত্রে কথককে যেমন বোঝাতে হবে তাঁর কী বক্তব্য, একইভাবে শ্রোতাকেও বুঝতে হবে কথক কী বলছেন। কেননা, এর সূত্র ধরেই উত্তর-প্রত্যুত্তরের ধারাবাহিকতা চলবে এবং এক ধরনের যোগাযোগ তথা সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ভাষার ব্যবহারের কথা বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, বিভিন্নভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে। তবে, সকল ক্ষেত্রেই ভাষার কিছু সাধারণ নিয়ম ভাষীদের জানা থাকতে হবে এবং সে-সব নিয়ম কথক এবং শ্রোতা দুজনকেই মেনে চলতে হবে। প্রতিটি মানব ভাষাতেই কমবেশি এরকম নিয়ম রয়েছে। এই নিয়মের সমষ্টিই হলো ব্যাকরণ। মুখের ভাষা কিংবা লেখার ভাষা— যা-ই হোক না কেন ব্যাকরণ মেনেই তা ব্যবহার করতে হয়। আর এর ব্যতিক্রম ঘটলে ভাষা বোধগম্যতা হারায়। তাই ভাষার যে কাজ তা ঠিকমতো করতে গেলে ব্যাকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান আয়ত্ত করা ও তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু যখন ভাষা আয়ত্ত করতে শুরু করে তখনই সে পরোক্ষভাবে ব্যাকরণিক বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। যেমন: একজন বাঙালি শিশু, যে সবেমাত্র দুই শব্দের বাক্য বলতে শিখছে, সে হয়ত বলল, "আমি খাবে"। সঙ্গে সঙ্গে যে তাকে দেখাশোনা করছে সে বুঝিয়ে দেবে, বাক্যটি 'আমি খাব' হবে। অর্থাৎ, শিশুটি পরোক্ষভাবে বাংলা ব্যাকরণের ব্যক্তিবাচক ক্রিয়া প্রয়োগ সম্পর্কে কিছুটা শিখে নিল। এভাবে, শিশুর ভাষা আয়ত্তীকরণ (acquisition) প্রক্রিয়াতে ব্যাকরণ বিশেষ গুরুত্ব পায়। তবে, আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাকরণ শেখার কাজটি শুরু হয় শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সূত্র ধরে। আর এই ব্যাকরণ যতটা না মুখের ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশি লেখার ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত। বর্তমান গ্রন্থেও লেখার ভাষার ব্যাকরণ নিয়েই আলোকপাত করা হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষায় কৃত্রিমতার হার যত বাড়ে তার ব্যবহারে ব্যাকরণগত অসংগতি ও ত্রুটির হারও তত বাড়ে। একজন ভাষী যখন তার মায়ের ভাষা (যা প্রায়শই নির্দিষ্ট একটি ভাষার অপ্রমিত কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক রূপ) ব্যবহার করে তখন সে সবচেয়ে সাবলীলভাবে ব্যাকরণ অনুসরণ করে থাকে। ওই ব্যক্তি যখন প্রমিত ভাষায় (যা তার নিজস্ব আঞ্চলিক রূপ থেকে ভিন্ন ও তথাকথিত পরিশীলিত মান রূপ) কথা বলে তখন তার বেশ কিছু নতুন ব্যাকরণিক সূত্র শিখে নিয়ে সেগুলোর প্রয়োগ ঘটাতে হয়। আর যখন সে লেখ্যভাষা ব্যবহার করে তখন তাকে আরও বেশি ব্যাকরণিক নিয়ম শিখতে হয়।

ব্যাকরণের সংজ্ঞার্থ: ব্যাকরণ হলো ভাষা ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত বিধির সমষ্টি যা ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থা, শব্দ তথা রূপের গঠন, বাক্যিক বিন্যাস এবং বাগর্থকে বর্ণনা করে। ব্যাকরণকে অনুশাসনমূলক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করার রীতি দীর্ঘদিন

ধরে প্রচলিত থাকলেও আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাকরণ মূলত বর্ণনামূলক। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো বিধি কেন প্রাসঙ্গিক তার বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করাই ওই ভাষার ব্যাকরণের লক্ষ্য। সুতরাং, বাংলা ভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : এই ভাষার ধ্বনিব্যবস্থা কীরূপ তা বর্ণনা করা, বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ শনাক্ত করা, বাংলা বাক্য বিন্যাসের কৌশল ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা এবং সর্বোপরি ধ্বনি রূপ ও বাক্যের বাগর্থ-সংগতি নির্ধারণ করা।

সুতরাং বলা চলে যে, ব্যাকরণের মূল কাজ হলো ভাষার সংগঠন বিশ্লেষণ। ব্যাকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করলেও এই উদ্দেশ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা, 'ব্যাকরণ' শব্দটির মূল অর্থ হলো 'বিশেষভাবে বিশ্লেষণ'। শব্দটির গঠন হলো : বি-আ+কৃ+অন। ব্যাকরণ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যে বিষয়সমূহ আয়ত্ত করা যায় তা হলো :

ক) ভাষার ধ্বনি, রূপ, বাক্য এবং বাগর্থের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে শেখা;
খ) উল্লিখিত সকল উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারা;
গ) ভাষার প্রমিত ব্যবহারের সামর্থ্য অর্জন করা।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বংশের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় শাখাভুক্ত নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা। প্রাচীন বৈদিক ভাষা তথা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে ভাষার যে প্রাকৃত স্তর সৃষ্টি হয়েছিল তা কালক্রমে অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষার জন্ম দেয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে গৌড়ী অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গ-কামরূপীর মধ্য দিয়ে বাংলা এসেছে। আর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা এসেছে মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধী অপভ্রংশ হয়ে। এভাবে জন্ম নেওয়া বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন *চর্যাপদ*; যা ছিল মূলত সহজিয়া বৌদ্ধমতের জীবনধারা এবং ধর্মসাধনার নির্দেশনা সংবলিত গ্রন্থ। অনার্য ও অব্রাহ্মণ্য এই মতাদর্শ যখন *চর্যাপদে* সংকলিত হচ্ছিল, সেই খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে (মতান্তরে খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতকে) সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাব ছিল। উল্লেখ্য যে, প্রাচীন বৈদিক ভাষার পরিবর্তন ঠেকানোর জন্যই এক সময় এর সংস্কারকৃত রূপ হিসেবে সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল— যার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সংরক্ষিত। ফলে, জ্ঞানচর্চায় এর ব্যাপক প্রভাব থাকলেও এর থেকে কোনো ভাষার সৃষ্টি হওয়ারও আর সুযোগ ছিল না। অপরদিকে, সময়ের ব্যবধানে মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত বৈদিক ভাষার অসংস্কারকৃত রূপ থেকে সৃষ্ট প্রাকৃত ভাষাসমূহ নানাভাবে পাল্টে গেলেও বিভিন্ন নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষা সৃষ্টির কাল পর্যন্ত লেখ্যভাষা হিসেবে প্রাকৃতের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কিন্তু চর্যাকারগণ সেসব ভাষার পরিবর্তে তখনকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবেচনায় অনেক বেশি অপরিশীলিত বাংলা ভাষাকেই বেছে নিয়েছিলেন। সেই কাল থেকেই বাংলা ভাষা এমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হতে শুরু করে যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ বিভিন্ন সময় প্রবেশ করলেও এ ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন, শব্দের গঠন, বাক্য বিন্যাস-সহ আরও বিভিন্ন ব্যাকরণিক বিষয় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম প্রায়শই না মেনে ব্যাপক স্বাধীনতা গ্রহণ করে। অথচ, মধ্যযুগের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের সূচনাপর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য লেখকদের সূত্র ধরে এবং সেই থেকে শুরু করে মোটাদাগে এখন পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে রচিত প্রায় সকল গ্রন্থেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচে বাংলা ব্যাকরণকে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে, এমন অনেক নিয়ম বাংলা ব্যাকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেগুলো সংস্কৃত ভাষায় প্রাসঙ্গিক থাকলেও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছিল না। তাছাড়া, আধুনিক কালে মানব ভাষার ব্যাকরণকে ব্যাখ্যা করে থাকে একটি বিশেষ জ্ঞানশাখা (epistom), যার নাম ভাষাবিজ্ঞান (linguistics)। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন এমন প্রায় সকলেই প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণকে ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত করতে সক্ষম হননি। তবে, এর ব্যতিক্রম ঘটেছে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র ক্ষেত্রে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করায় তাঁরা তাঁদের রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানকে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে আংশিকভাবে সমন্বিত করার প্রয়াস পান। এসব গ্রন্থের আলোকে বলা যায় যে, বাংলা ব্যাকরণের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলো : বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা রূপতত্ত্ব, বাংলা বাক্যতত্ত্ব ও বাংলা বাগর্থতত্ত্ব। ব্যাকরণ-নির্দেশিত বিভিন্ন বিধি ও সূত্র ভাষায় কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা-ও পরোক্ষভাবে ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়। এ কারণে ভাষার প্রয়োগরীতি এবং নির্মিতি অধ্যয়নও ব্যাকরণ আয়ত্তীকরণের অংশ। নিচে বাংলা ব্যাকরণের মুখ্য আলোচ্য বিষয়সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব : এর মূল কাজ হলো বাংলা ভাষার ধ্বনি ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা। বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণের মাপকাঠিসমূহ, ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণরীতি, অর্ধস্বর, যৌগিকস্বর, অক্ষর ও অক্ষরায়ণ, ধ্বনি-পরিবর্তনসূত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করাই বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের লক্ষ্য।

বাংলা রূপতত্ত্ব : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের উৎপত্তি, শব্দের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রূপমূলের গঠন ও বিন্যাস এবং শব্দের বিবিধ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করাই বাংলা রূপতত্ত্বের মূল কাজ। বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ রয়েছে তাদের উৎস ও ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা, এসব শব্দের অন্তর্গত রূপমূল বা রূপমূলসমূহ কীভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা এবং বাংলা শব্দের প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে বাংলা রূপতত্ত্বের আলোচনার পরিধি নির্দেশিত হয়।

বাংলা বাক্যতত্ত্ব : বাংলা বাক্যের গঠনবৈশিষ্ট্য, পদক্রম, বাক্যাংশ ও পদের গঠন, কারক-বিভক্তির প্রয়োগ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করে এ ভাষার বাক্যতত্ত্ব। একই সঙ্গে ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের কর্তা ও কর্মের সম্বন্ধ, উক্তি ও উক্তি পরিবর্তন এবং বাচ্য বিষয়েও আলোকপাত করে বাক্যতত্ত্ব।

বাংলা বাগর্থতত্ত্ব : বাংলা ধ্বনির অর্থদ্যোতকতা এবং বাংলা শব্দ ও বাক্যের অর্থবাচকতা নিয়ে আলোচনা করে বাংলা বাগর্থতত্ত্ব। এরই অংশ হিসেবে অভিন্ন অর্থের বিভিন্ন শব্দ এবং একই শব্দের বিভিন্ন প্রকার অর্থ নিয়েও আলোকপাত করে বাগর্থতত্ত্ব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ব্যাকরণ বলতে কী বোঝেন? বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন।
২. বাংলা ব্যাকরণের মুখ্য আলোচ্য বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করুন।

পাঠ ১.২ : ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

ভাষা শিখনে ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। একটি ভাষা যথাযথভাবে শিখতে হলে একজন ভাষীর চারটি দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলো হলো : কথন, পঠন, লেখন ও শ্রবণ। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের অধিকাংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা হওয়ায় কথন (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষার কথন) ও শ্রবণ দক্ষতা একজন শিশু তার চারপাশের পরিবেশ থেকেই অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু লেখন ও পঠন দক্ষতা এবং প্রমিত বাংলায় কথন দক্ষতা অর্জনের জন্য বাঙালি শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বাংলাদেশে এমন অনেক অধিবাসী আছে যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়; তাদের বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে উল্লিখিত চারটি দক্ষতাই আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রে অর্জন করতে হয়। এই প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ পাঠের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ব্যাকরণ যথাযথভাবে অধ্যয়ন করতে সক্ষম হলে শিক্ষার্থীরা প্রমিত বাংলা উচ্চারণে কথা বলতে শিখবে; ব্যাকরণের নিয়মসমূহ আয়ত্ত করার ফলে তাদের পঠন যথার্থ হবে; তারা নির্ভুলভাবে বাংলা ভাষা লিখতে পারবে এবং বাংলা ভাষা শুনে বুঝতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন ।

ইউনিট ২
বাংলা ভাষা

পাঠ ২.১ : বাংলা ভাষার পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা কীভাবে বিকাশ লাভ করল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষার পরিচয়

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের প্রাচ্য শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা হলো বাংলা। এই ভাষাবংশ খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইউরোপ, এশিয়ার ইরান ও ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে। এই ভাষাগোষ্ঠীর মূল আবাসভূমি ছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষ্ণসাগরের নিকটবর্তী উত্তরে দানিয়ুব নদীর মুখ থেকে কাস্পিয়ান সাগরের অঞ্চলবর্তী ভূখণ্ডে। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মূল অঞ্চল থেকে ভাষাব্যবহারকারীরা ইউরোপের পশ্চিম অঞ্চলে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে একটি দল প্রথমে ইরানে প্রবেশের পর সেখান থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। তারা ভারতের উত্তরাঞ্চলে বসবাসের পর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই ভারতবর্ষে আর্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এদের ব্যবহৃত ভাষার প্রভাবেই নব্যভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত একটি ভাষারূপে খ্রিস্টীয় ৭ম থেকে ৯ম শতকে বাংলা উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাব থাকলেও এর ব্যাকরণ এবং প্রয়োগবিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজস্ব পথ অনুসারী। আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কারণে এবং এদের বানানরীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার নির্দেশনা বাংলা ভাষায় অনুসৃত হলেও বাংলা ভাষার উদ্ভবে সংস্কৃত ভাষার প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা যেমন নেই তেমনি সরাসরি কোনো প্রভাবও নেই। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষা যেমন হিন্দি, মারাঠি কিংবা গুজরাটি যে মাত্রায় সংস্কৃত ভাষার রূপরীতি মেনে চলে তার তুলনায় বাংলা ভাষা অনেক বেশি স্বাধীনতা নিয়েই তার আদি-মধ্য স্তর অতিক্রম করে আধুনিক স্তরে উপনীত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ২.২ : বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপের পার্থক্য লিখতে পারবেন।

বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি

উদ্ভবের পর থেকে আধুনিক বাংলা ভাষায় সাধু, চলতি ও আঞ্চলিক – এই তিন রকম রীতি প্রচলিত। এই তিন রীতির মধ্যে পার্থক্য মূলত ক্রিয়া সর্বনাম এবং রূপমূল ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে আঞ্চলিক রীতি একান্তভাবেই অকৃত্রিম। অঞ্চল ভেদে সৃষ্টি হওয়া উপভাষার ক্রিয়া, সর্বনাম ও রূপমূলের আশ্রয়ে এই রীতি বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, চলতি তথা প্রমিতরীতিতে সাধুরীতির রূপমূল অপেক্ষাকৃত সংকুচিত (রৌদ্র>রোদ, মস্তক>মাথা, তাহার>তার) রূপে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নদীয়ার কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কথ্যরূপ অবলম্বনে গঠিত হলেও পরবর্তীকালে ঢাকা ও কলকাতার প্রমিতরূপের মধ্যে উচ্চারণভঙ্গির রূপমূলের ব্যবহারগত পার্থক্য লক্ষ করা যায় (ঢাকা 'যখন থেকে', কলকাতা 'যবে থেকে', ঢাকা 'তুই গিয়েছিলি', কলকাতা 'তুই গিয়েছিলিশ' প্রভৃতি)। প্রকাশের দিক থেকে বাংলা ভাষায় দুটি রূপ বা রীতি আছে কথ্য ও লেখ্য রীতি। লেখার ক্ষেত্রে আবার সাধু ও চলতি এরূপ দুই ভাগ রয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধুরীতি সংস্কৃত ভাষাঘনিষ্ঠ পণ্ডিত ও বোদ্ধা লেখকদের লেখার উপযোগী প্রায়-কৃত্রিম ভাষা। চলতি রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টির সূচনার আগ পর্যন্ত এ রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টি হতো। সাধু ভাষার রক্ষণশীল গণ্ডি ভেঙে সৃষ্টি হয় বাংলা ভাষার চলতি রীতি। স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন এবং প্রচলতি আদর্শ প্রমিত ভাষাকে চলতি ভাষা বলে। বর্তমানে সব ধরনের বই, পত্রিকা ইত্যাদি এই রীতি অনুসরণ করেই প্রকাশিত হচ্ছে।

সাধুরীতিতে তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি; এটি কঠিন ও গম্ভীর স্বভাবের, আঞ্চলিক প্রভাবমুক্ত এবং এসব বানান নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনশীল। অপরদিকে, চলতি রীতিতে তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য বেশি; এটি সহজ ও সাবলীল স্বভাবের, লেখা ও বলা দুইয়ের উপযোগী, আঞ্চলিক প্রভাবযুক্ত, তুলনামূলকভাবে কম কৃত্রিম এবং অধিকতর পরিবর্তনশীল।

সাধু ও চলতি রীতির বাক্য রূপান্তরের নমুনা

সাধু : কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতি ভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে– এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন।

চলতি : কয়েক পা গিয়ে শকুন্তলার গতি থেমে গেল। শকুন্তলা, আমার আঁচল ধরে কে টানছে– এই বলে মুখ ফেরালেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ ও রীতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৩ : সাধু ও চলতি ভাষারীতি

উদ্দেশ্য

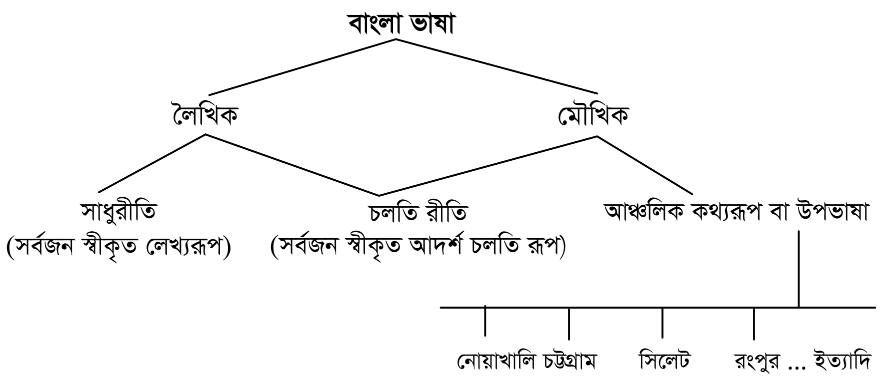
এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধু ও চলতি ভাষা কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে পদ্যের অনেক পরে; পদ্যেই রচিত হয়েছে প্রাচীনতম সাহিত্য। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আনুমানিক হিসাব করে বলা যায় যে, বাংলা কবিতার বয়স যদি হয় দেড় হাজার বছর তবে বাংলা গদ্যের বয়স মাত্র শ'দুয়েক বছর। সমগ্র মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০ পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্যে গদ্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা পরিমাণে খুবই সামান্য; তাও সীমাবদ্ধ ছিল দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র রচনার মধ্যে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূত্রপাত আধুনিক যুগে (১৮০১-বর্তমান কাল অবধি)। এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮০০ সাল)-কে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্য চর্চা বেগবান হয়। উল্লেখিত হয়েছে যে, এর আগে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল স্বল্প এবং সীমিত পরিসরে। এ থেকে মনে করার কোনো কারণ নেই, প্রাচীন বা মধ্যযুগের লোকেরা কথাবার্তা বলত পদ্যে; ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে। আসলে কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোনোদিনই কেউ কবিতা ব্যবহার করত না, বলত গদ্যেই, এখনও যেমন আমরা বলি। কিন্তু তারপরও সাহিত্য রচনার জন্য দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হয়েছে কবিতা বা কবিতার ভঙ্গি।

সাধারণ কথাবার্তা যখন মানুষেরা বলে তখন ভাষা ব্যাকরণের আঁটো-সাঁটো বন্ধনের অনেক বাইরে থাকে অর্থাৎ ব্যাকরণ তখন কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হয় না, ভাষীরা আরোপ করেন না– ভাব প্রকাশ করাই সেখানে মুখ্য। কিন্তু লৈখিক রূপ বা লেখ্য রূপ অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট বা সুনিয়ন্ত্রিত। বাংলা ভাষার মৌখিক রূপের যেমন চলতি ও আঞ্চলিক এই দুই ভাগ রয়েছে তেমনি। লৈখিক রূপ বা লেখ্যরূপেরও আদর্শ চলতি রীতি (Standard Colloquial Style) এবং সাধুরীতি (Standard Written Form) দুটো ভাগ বিদ্যমান। বাংলা গদ্যের উল্লিখিত বৈচিত্র্য নিচের চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :



সাধুরীতি

যতদূর জানা যায় 'সাধুভাষা' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ১৮১৫ সালে 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামে একটি রচনায় প্রথম ওই শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু সাধুভাষা বলতে তিনি বিশেষ কোন্ ধরনের ভাষারীতিকে বুঝিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে এ-টুকু বোঝা যায় যাঁরা 'সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন' তাঁদের ভাষাকে বোঝাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সাধুভাষা শব্দটি। অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁদের ভাষা ছিল 'সংস্কৃতমূলক' ও 'সংস্কৃতানুসারী'

তাঁদের ভাষাকেই রামমোহন চিহ্নিত করেছিলেন সাধুভাষা বলে। সাধুভাষার বিপরীতে এখন যে 'চলতি' বা 'চলতি' রীতির কথা আমরা বলছি, রামমোহনের বেশ পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে একটি প্রবন্ধে সে বিষয়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম অপরভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। ... সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ সকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ অভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না।" বঙ্কিমচন্দ্র ওই প্রবন্ধে তৎকালীন সাধুভাষাকে আক্রমণ করে বলেছিলেন 'সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা'র কারণেই বাংলা সাহিত্য 'অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল হয়ে উঠেছে'। তাই তাঁর পরামর্শ, 'অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে।' সাধুভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওই সব মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত সাধুভাষার যে সুনির্ধারিত রূপ গড়ে উঠেছিল তাতে তদ্ভব, অর্ধতৎসম প্রভৃতি শব্দের তুলনায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ ছিল বেশি। তবে বিদ্যাসাগর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের রচনার মধ্য দিয়ে সাধুভাষা ক্রমে সংস্কৃতের গণ্ডি বা সংস্কৃত ভাষারীতির অপ্রয়োজনীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে ভাষায় তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন তাকে আজ আমরা নিঃসন্দেহে সাধুভাষা বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু তিনি তাঁর শেষ দিককার উপন্যাসগুলোয়, আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৬)-এ যে সাধুভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ক্রিয়ার আদিম রূপ ছাড়া অনেকখানিই বর্তমানের চলতি বাংলার পূর্বসুরি হবার যোগ্য।

তবে সাধুরীতি বাংলাভাষীদের মুখের ভাষার অনেক কাছাকাছি চলে আসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধু গদ্যরীতির মাধ্যমে। তিনি ১৯১৪ সালের আগে চলতি ভাষা ব্যবহার করেননি একথা তথ্য হিসেবে সত্য হলেও চলতি বাংলা বা কথ্য বাংলার অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিল তাঁর গদ্যভঙ্গি। ক্রিয়া ও সর্বনামের আদিম রূপ হয়ত রবীন্দ্রনাথের ১৯১৪ সালের আগেকার গদ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশি চলতি বাংলার নিকটবর্তী। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের রীতি প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা সাহিত্যিক গদ্য অবলম্বন করেছিল সংস্কৃত ভাষার আদর্শ অর্থাৎ সংস্কৃত রীতির শব্দ চয়ন, সমাস-বাহুল্য, কথ্য ভাষার পদ বর্জন রীতি। ওই শতাব্দীর পণ্ডিতেরাই এ ধরনের ভাষা রীতির নাম দিয়েছিলেন সাধুভাষা। এখানে বলে রাখা দরকার যে সাধু রীতি কখনোই মানুষের অনানুষ্ঠানিক কথাবর্তার ভাষা ছিল না, এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল মুখ্যত সাহিত্য রচনার মধ্যেই।

চলতি ভাষা রীতি

চলতি বাংলা গদ্যরীতির প্রথম উদ্যোক্তা হিসেবে যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। বাংলা সাধু গদ্যরীতির আঁটোসাঁটো বন্ধন থেকে ভাষাকে সহজ স্বাভাবিক করে তোলার বাসনায় তিনি 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ওই প্রবন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে– ১. বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ রাখার প্রয়োজন নেই; ২. বহুবচনে- গণ প্রত্যয় বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়; ৩. বাংলায় অযথা সন্ধির ভার বাক্যের পক্ষে ক্ষতিকর; ৪. অবিকৃত সংস্কৃত (অর্থাৎ তৎসম) শব্দের তুলনায় রূপান্তরিত (অর্থাৎ তদ্ভব) এবং দেশজ শব্দের ব্যবহারই বাংলায় স্বাভাবিক। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এসব প্রস্তাবে, তাঁর কালের তুলনায়, অনেক বেশি আধুনিক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। কিন্তু বর্তমানে প্রচলতি চলতি বাংলার সঙ্গে সাধু বাংলার প্রধান যে পার্থক্য অর্থাৎ সর্বনাম ও ক্রিয়া, সে-সম্পর্কে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো প্রস্তাব নেই। তারপরও বলা যায়, শ্যামাচরণের ওই প্রস্তাবসমূহ চলতি বাংলা প্রবর্তনে বা ভাষাকে, সরল ও সাবলীল করে তোলার ক্ষেত্রে বেগবান করেছিল।
'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর লেখায় তৎকালীন কলকাতার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদের ওই ভাষাভঙ্গি অন্যদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে বিকাশ লাভ করেনি; এমনকি প্যারীচাঁদ মিত্র নিজেও ওই ভাষাভঙ্গি পরিত্যাগ করেছিলেন। হয়ত এর অন্যতম কারণ, সমকালের মানুষের সাহিত্য রুচির সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'- এর ভাষার খুব বেশি ঐক্য সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে 'আলালী ভাষা'র অকাল মৃত্যু ঘটে।

বর্তমানে যাকে আমরা চলতি বাংলা ভাষা বলে চিনি তার প্রবর্তনের ও প্রয়োগের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব পদক্ষেপের জন্য। ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' নামে একটি উঁচুমানের পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। ওই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই চলতি বাংলার প্রায়োগিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর এ প্রচেষ্টা খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'কথার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'আমার ইচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই লেখা হয়।' তার কারণ স্বাধীন হয়ে, স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টাতেও সুখ আছে। সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বা সংস্কৃতের 'অঞ্চল ধরে বেড়ানো'তে বাংলা ভাষার কোনো কল্যাণ নেই। তারপর তিনি প্রশ্ন করেছেন, কাকে বলে বাংলা ভাষা? উত্তর দিচ্ছেন এভাবে, 'যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় ভাবনা চিন্তা সুখ-দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরো বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলা ভাষা। তাই চলতি বাংলার প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত হচ্ছে, আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই। ভাষা দুয়েরই মূল এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে।' চলতি বাংলা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর এই মানসিকতা ও সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর কুশলতায় আধুনিক বাংলায় চলতি গদ্যরীতি বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর প্রতি সব সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। ফলে প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা গদ্যে চলতি রীতি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাভাবিক কারণে পিছিয়ে পড়েছে সাধুরীতি এবং সম্প্রতি তা প্রায় বর্জিত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সাধু ও চলতি ভাষা কাকে বলে?

২. সাধু ও চলতি ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২.৪ : সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধু ও চলতি ভাষার বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- সাধু থেকে চলতি বা চলতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর করতে পারবেন।

সাধু ও চলতি ভাষা

সাধু ও চলতি ভাষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের শুরুতে তার গ্রহণযোগ্য মীমাংসা আমরা লাভ করেছি। সাধু ও চলতি ভাষারীতির প্রধান পার্থক্য নির্ভর করে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ওপর। সাধুরীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়ার পূর্ণ ও দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে চলতি বাংলায় সর্বনাম ও ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বা হ্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিচে ওই সাধু ও চলতি রীতিতে এদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী পার্থক্য ঘটে তা দেখানো হলো :

সর্বনাম		ক্রিয়া	
সাধুভাষা	**চলতি ভাষা**	**সাধুভাষা**	**চলতিভাষা**
তাহারা, তাঁহারা	তারা, তাঁরা	যাইতেছে	যাচ্ছে
তাহাদের,	তাদের	যাইতেছি	যাচ্ছি
তাহাদিগের	তাদের	গিয়াছেন	গিয়েছেন
তাহাদিগকে	তাদের	যাইবেন	যাবেন
উহাদিগকে	ওদের	উপর	ওপর
কাহারা	কারা	বুঝ	বোঝ
সেইগুলির	সেগুলোর	লিখ	লেখ
যাহারা, যাহাদিগের	যারা, যাদের	লিখিবেন	লিখবেন
উহা	ওটা	দিয়াছিল	দিয়েছিল
ইহা	এটা ইত্যাদি	দিবেন	দেবেন
		উঠিতেছিস	উঠছিস
		উঠিবেন	উঠবেন
		শুইয়াছিলাম	শুয়েছিলাম ইত্যাদি

এ কথা সত্য যে সাধু ও চলতি রীতির সম্পর্ক যত সহজ ও সমান্তরাল মনে করা হয়, তা তেমন সহজ ও সমান্তরাল নয়। বাংলা বাক্যে অনেক ক্ষেত্রেই যেহেতু ক্রিয়া উহ্য বা অনুক্ত থাকে তাই বিচ্ছিন্নভাবে একটি বাক্য দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ঐ বাক্যটি সাধু না চলতি রীতির। নিচের বাক্যগুলো লক্ষ করুন :

ক. সায়মার এখন বাড়ি ফেরা উচিত।

খ. দূরের পথ, যত দ্রুত ফেরা যায় ততই ভাল।

গ. সায়মার বাড়ি ঢাকার এক প্রান্তে।

ওপরের তিনটি বাক্যকে তাদের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বলা প্রায় অসম্ভব যে বাক্যগুলো সাধু নাকি চলতি বাংলার অন্তর্গত। এর প্রধান কারণ বাক্যে যদি সমাপিকা ক্রিয়া উহ্য থাকে অর্থাৎ অনুক্ত থাকে তবে সাধু চলতির পার্থক্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব।

আবার কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়ার অনুক্ত না হলেও তার সাধু চলতির গোত্র নিরূপণ দুরূহ। যেমন নিত্য বর্তমান বা বর্তমান অনুজ্ঞায় কিছু কিছু ক্রিয়ার রূপ একবচন ও বহুবচনে এবং সাধু ও চলতি অভিন্ন। উদাহরণগুলো লক্ষ করুন :

আমি/আমরা	শুই
তুমি/তোমরা	শোও
সে/তারা	শোয়

কিন্তু নিত্য বর্তমান ও বর্তমান অনুজ্ঞা ছাড়া অন্যকালের ক্রিয়ারূপে সাধু ও চলতির পার্থক্য স্পষ্ট। যেমন—

সাধু রূপ	**চলতি রূপ**
আমি/আমরা শুইলাম	আমি/আমরা শুলাম
তুমি/তোমরা শুইলে	তুমি/তোমরা শুলে
সে/তারা শুইল	সে/তারা শুল .... ইত্যাদি।

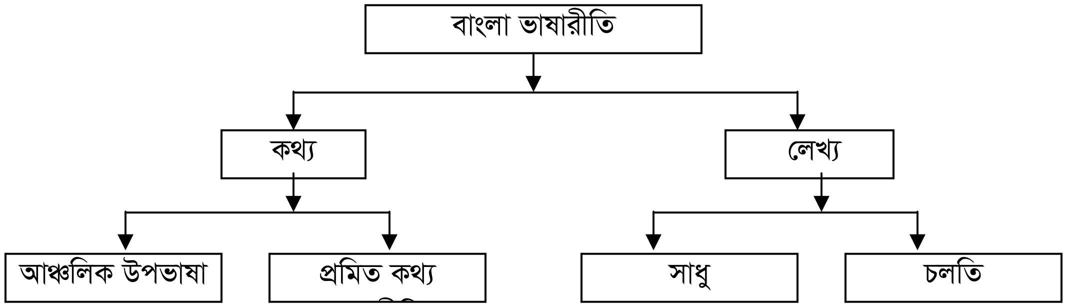
সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য নিয়ে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধু ভাষা' ও 'সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা' প্রবন্ধ দুটিতে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন। আমরা এখন সাধু ও চলতি ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামতের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করছি। তাঁর মতে, 'লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি মাত্র'। তাই মুখের ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার কোনো পার্থক্য থাকা অনুচিত। একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব, করে তুলতে পারব। তবে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য সব সময়ই লক্ষ করা যায় 'সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, স্টাইলগত'। সংস্কৃতের অনুসরণে উনিশ শতকে যে ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরী তাকে বলেছেন, 'কবিরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি'। ফলে সাধুভাষার গড়নটি হয়ে ওঠে 'চলৎশক্তি রহিত'। 'ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাংলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকদের গদ্য গদাই লশ্‌করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড় পদার্থের স্তূপমাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটি রক্ষা করা।' প্রমথ চৌধুরী মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গিটিকেই চলতি বাংলার আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন নদীয়া-শান্তিপুর এবং ভাগীরথীর উভয় তীরের ডায়ালেক্ট বা উপভাষাকে। তিনি পূর্ববাংলার কিংবা কলকাতার উচ্চারণকে প্রমিত বলে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, 'ঢাকাই কথা এবং খাস-কলকাত্তাই কথা, অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্যভাষা, দুয়েরই উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত। ....পূর্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কলকাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়।' এসব কারণেই নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলের ডায়ালেক্টকেই তিনি প্রমিত মনে করেছিলেন এবং বর্তমানে প্রচলতি চলতি ভাষা প্রমথ চৌধুরীর আদর্শ অনুসরণ করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এই দুটি রীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন– 'সাধু ভাষা মাজা ঘষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা। চলতি আটপৌরে সাজ, নিজের চরকায় কাটা সুতো দিয়ে বোনা।' ভাষার মৌখিক রূপের আবার দুটো রীতি। যথা:

১. আঞ্চলিক রীতি ও

২. প্রমিত রীতি।

বাংলা ভাষার এই রীতিভেদকে নিচের ছকে দেখানো হলো–



১. কথ্য ভাষা: 'কথ্য' কথাটি এসেছে 'কথা' থেকে। অর্থাৎ, যে ভাষায় আমরা সব সময় কথা বলি, তাকে বলা হয় কথ্য ভাষা। যেমন:

১. এক জনের দুই হুত আছিল।
২. এক মানষের দুই পোয়া আছিল।

ক. আঞ্চলিক উপভাষা : উপভাষা হলো ব্যাপক ভাষা অঞ্চলে ব্যবহৃত ভাষার বিচিত্র রূপ। বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপকে আঞ্চলিক উপভাষা বলে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র 'বাঙালা ব্যাকরণ" গ্রন্থের আলোকে-
ঢাকা : একন মানশের দুইডা পোলা আছিলো।
বগুড়া : য়্যাক ঝনের দুই ব্যাটা আছিল।
রংপুর : একজন ম্যানশের দুইক্না ব্যাটা আছিল্।
ময়মনসিংহ: য়্যাক জনের দুই পুৎ আছিল্।

খ. প্রমিত কথ্য ভাষারীতি : কথ্য ভাষারীতি মার্জিত হয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যে রূপ লাভ করেছে, সেই শিক্ষিত লোকের ভাষাকেই প্রমিত কথ্য ভাষারীতি বলা হয়।

২. লেখ্য ভাষা : "লেখ্য" কথাটি মূলত 'লেখা' থেকে এসেছে। যে ভাষায় আমরা বক্তব্য লিখি বা সাহিত্য রচনা করি, তাকে লেখ্য ভাষা বলা হয়।

ক. সাধু ভাষারীতি : যে ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি এবং ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়, তাকে সাধু ভাষারীতি বলা হয়। যেমন: করিয়াছি, তাহারা, তাহাদের ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "সাধারণ গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে।"

খ. চলিত ভাষারীতি : যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, তাকে চলিত ভাষারীতি বলে। যেমন; করেচি, তারা, তাদের ইত্যাদি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চলতি ভাষারীতি নিয়ে বলেছেন– "দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে। একে চলতি ভাষা বলা হয়।"

সাধুরীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. সাধু রীতি ব্যাকরণ নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে।
২. সাধু রীতি তৎসম শব্দবহুল ও গুরুগম্ভীর।
৩. সাধু রীতিতে ক্রিয়ার পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: পড়িতেছি, লেখিতেছি ইত্যাদি।
৪. সাধু রীতিতে সর্বনামের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তাহারা, উহারা ইত্যাদি।
৫. সাধু রীতিতে অব্যয়ের তৎসম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: তথাপি, যদ্যপি ইত্যাদি।
৬. সাধু রীতির রূপ সুনির্দিষ্ট।
৭. এই রীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার বেশি। যেমন: রসনেন্দ্রিয়, মহাবুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি।

৮. সাধু রীতি প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।
৯. সাধু রীতি নাটক, বক্তৃতা, সংলাপের উপযোগী নয়।
১০. সাধু রীতি শুধু লেখার উপযোগী।

চলতি রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ :

১. চলতি রীতি ব্যাকরণের সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলে না।
২. চলতি রীতিতে তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি।
৩. চলতি রীতিতে ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ পড়ছি, লিখছি ইত্যাদি।
৪. চলতি রীতিতে সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ ওরা, তারা ইত্যাদি।
৫. চলতি রীতিতে অব্যয়ের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ তবু, যদিও ইত্যাদি।
৬. চলতি রীতি পরিবর্তনশীল।
৭. চলতি রীতিতে সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।
৮. চলতি রীতি আধুনিক বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।
৯. চলতি রীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের উপযোগী।
১০. চলতি ভাষা কথ্য ও লেখ্য উভয়ই।

গুরুচণ্ডালী দোষ

একই গদ্য রচনায় সাধু ও চলতি উভয় রীতি অসংগতরূপে মিশ্রিত হলে বা লঘুগুরু শব্দের মিশ্রণে ভাষা শ্রুতিকটু হলে, তাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে।

বাংলা কবিতায় সাধু ও চলতি ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতি পদের মিশ্রণ প্রচলতি আছে। উভয় ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয় বলে গণ্য হয় না। কিন্তু বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সাধু বা চলতি রীতির যেকোনো একটিকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ রাখতে হয়, যেন উভয় রীতির মিশ্রণ না ঘটে।

যেমন– চলতি ভাষার আধারে একটি সুন্দর বাক্য: "গাড়ি চলতে লাগল, বেলি ঘুমোতে লাগল, বন-পাহাড়-পর্বত-ঝরনা-মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল।" যদি এ বাক্যে সাধু ও চলতি ক্রিয়া ও শব্দের এরকম অসংগত মিশ্রণ ঘটে, "গাড়ি চলতে লাগিল, বেলি ঘুমাইতে লাগল, বন-পাহাড়-পর্বত-ঝরনা-মেঘ এবং বহু খাঁদা নাসিকা এবং বক্র চোখ দেখা দান করিতে লাগল", তাহলে বাক্যটির ভাষা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হবে।

সাধু ও চলতি ভাষারীতির মধ্যকার পার্থক্য:

সাধু ভাষারীতি	চলতি ভাষারীতি
১. সাধু ভাষারীতি প্রাচীন ও পুরনো বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।	১. চলতি ভাষারীতি আধুনিক ও নতুন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী।
২. সাধু ভাষার রীতি ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	২. চলতি ভাষারীতি ব্যাকরণের সকল নিয়ম দ্বারা সমান নিয়ন্ত্রিত নয়।
৩. সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় সাধু ভাষারীতিতে। যেমন- তাহারা, করিয়া প্রভৃতি।	৩. চলতি ভাষারীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয় না। যেমনঃ তারা, করে প্রভৃতি।
৪. সাধু ভাষারীতিতে তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি।	৪. চলতি ভাষায় তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বেশি।
৫. সাধু ভাষারীতি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়।	৫. চলতি ভাষারীতি পরিবর্তনশীল।
৬. সাধু ভাষারীতি সংলাপ, বক্তৃতা ও নাটকের উপযোগী নয়।	৬. চলতি ভাষারীতি বক্তৃতা, নাটক ও সংলাপের জন্য উপযোগী।
৭. সাধু ভাষারীতিতে অভিশ্রুতি ও অপিনিহিতির ব্যবহার নেই।	৭. চলতি ভাষারীতিতে অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার রয়েছে।
৮. সাধু ভাষারীতিতে অব্যয় পদের তৎসম রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ তথাপি, বরঞ্চ ইত্যাদি।	৮. চলতি ভাষারীতিতে অব্যয় পদের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ যদি, তবু, বরং ইত্যাদি।

৯. সাধু ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাধান্য নেই।	৯. চলতি ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার ও প্রাধান্য রয়েছে। যেমনঃ টুকটুক, ভনভন, হনহন ইত্যাদি।
১০. সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ হইতে, নিকট, দিয়া ইত্যাদি।	১০. চলতি ভাষারীতিতে অনুসর্গের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয় না। যেমনঃ হতে, কাছে, দিয়ে ইত্যাদি।

সাধুরীতিকে চলতি রীতিতে রূপান্তর :

নিয়মের যথাযথ প্রয়োগ করে সাধুরীতিকে চলতি রীতিতে রূপান্তর করা যায়–

১. সর্বনাম পদে 'ই' ধ্বনি থাকলে উক্ত 'ই' ধ্বনি লোপ পায়। যেমনঃ তোমাদিগের > তোমাদের।

২. ক্রিয়ায় 'ই' ধ্বনি থাকলে উক্ত 'ই' ধ্বনি লোপ পায়। যেমনঃ যাইব >যাব, খাইব >খাব, হইবে >হবে ইত্যাদি।

৩. ক্রিয়াপদে 'উ' ধ্বনি থাকলে তা চলতি রীতিতে লোপ পায়। যেমনঃ হউক> হোক, যাউক> যাক, থাকুক> থাক ইত্যাদি।

৪. পদাশ্রিত 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমনঃ বিয়া> বিয়ে, দিলাম >দিলেম, বিলাত> বিলেত ইত্যাদি।

৫. পদাশ্রিত পূর্ববর্তী 'উ' বা 'ঊ' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী 'আ' ধ্বনি 'ও' বা 'উ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ কুলা >কুলো, পূজা >পুজো ইত্যাদি।

৬. পদের শেষে 'অ', 'আ' বা 'এ' থাকলে পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ বুনা >বোনা, শুনা >শোনা ইত্যাদি।

৭. পদের শেষে অ, আ, এ থাকলে পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনি 'এ' ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমনঃ ভিজা >ভেজা, লিখ >লেখ ইত্যাদি।

৮. বিশেষণঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমনঃ গ্রাম্য >গেঁয়ো।

চলতি রীতি হতে সাধু রীতিতে রূপান্তর :

নিম্নোক্ত নিয়মাবলির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে চলতি রীতি হতে সাধু রীতিতে রূপান্তর করা যায়ঃ

১. তদ্ভব শব্দকে তৎসম শব্দে রূপান্তর ঘটিয়ে ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ রক্ষা >পরিত্রাণ, মাথা >মস্তক ইত্যাদি।

২. ক্রিয়াকে দীর্ঘরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ করছি >করিতেছি।

৩. সর্বনামের দীর্ঘরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ তার >তাহার, তাদের >তাহাদের ইত্যাদি।

৪. সন্ধি বা সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ তুষারের ন্যায় শুভ্র >তুষারশুভ্র ইত্যাদি।

৫. বিশেষণ শব্দের পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ খুব >অতি, লাখ >লক্ষ ইত্যাদি।

৬. ধ্বন্যাত্মক কিছু শব্দের পরিবর্তন হয়। যেমনঃ মরমর >মর্মর ইত্যাদি।

৭. অভিশ্রুতিঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমনঃ ছুটো > ছুটিয়া, মেছো >মেছুয়া মাড়ুয়া ইত্যাদি।

৮. স্বরসংগতিঘটিত পরিবর্তন হয়। যেমনঃ ভিক্ষে >ভিক্ষা, ফিতে >ফিতা ইত্যাদি।

সাধু ও চলতি রীতির রূপভেদ

সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর ভাবপ্রকাশে ও কমগতির উচ্চারণে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে চলতিরীতিতে তা শ্রুতিমধুর, সহজ-সরল, সাবলীল ও সংক্ষিপ্ত রূপ হয়।

বর্তমান কালের রূপভেদ

কাল	সাধু	চলতি
ঘটমান বর্তমান	বলিতেছেন	বলছেন
	যাইতেছ	যাচ্ছ
	করিতেছি	করছি
	খেলিতেছে	খেলছে
পুরাঘটিত বর্তমান	বলিয়াছেন	বলেছেন
	গিয়াছ	গিয়েছ
	করিয়াছি	করেছি
	খেলিয়াছে	খেলেছে

সাধু	চলতি
হইতেছে	হচ্ছে
খাইতেছে	খাচ্ছে
শুনিতেছিস	শুনছিস
ঘুমাইতেছ	ঘুমাচ্ছ
হইয়াছে	হয়েছে
খাইয়াছে	খেয়েছে
শুনিয়াছিস	শুনেছিস
ঘুমাইয়াছ	ঘুমিয়েছ

অতীত কালের রূপভেদ

কাল	সাধু	চলতি
সাধারণ অতীত	বলিলেন	বললেন
	যাইলে	গেলে
	করিলাম	করলাম
	খেলিলাম	খেললাম
ঘটমান অতীত	বলিতেছিলেন	বলছিলেন
	যাইতেছিলে	যাচ্ছিলে
	করিতেছিলাম	করছিলাম
	খেলিতেছিলাম	খেলছিলাম

সাধু	চলতি
হইল	হলো
খাইল	খেল
শুনিলি	শুনলি
ঘুমাইলে	ঘুমালে
হইতেছিল	হচ্ছিল
খাইতেছিল	খাচ্ছিল
শুনিতেছিল	শুনছিল
ঘুমাইতেছিলে	ঘুমাচ্ছিল

কাল	সাধু	চলতি
পুরাঘটিত অতীত	বলিয়াছিলেন	বলেছিলেন
	গিয়াছিলে	গিয়েছিলে
	করিয়াছিলাম	করেছিলাম
	খেলিয়াছিলাম	খেলেছিলাম
নিত্যবৃত্ত অতীত	বলিতেন	বলতেন
	যাইতে	যেতে
	করিতাম	করতাম
	খেলিতাম	খেলতাম

সাধু	চলতি
হইয়াছিল	হয়েছিল
খাইয়াছিল	খেয়েছিল
শুনিয়াছিল	শুনেছিল
ঘুমাইয়াছিলে	ঘুমোচ্ছিলে
হইত	হতো
খাইত	খেত
শুনিত	শুনত
ঘুমাইতে	ঘুমাতে

ভবিষ্যৎ কালের রূপভেদ

কাল	সাধু	চলতি
সাধারণ ভবিষ্যৎ	বলিবেন	বলবেন
	যাইবে	যাবে
	করিব	করব
	খেলিব	খেলব
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা	বলিও	বোলো
	যাইও	যেয়ো
	করিও	কোরো
	খেলিও	খেলো

সাধু	চলতি
হইবে	হবে
খাইবে	খাবে
শুনিব	শুনব
ঘুমাইব	ঘুমাব
হইও	হোয়ো
খাইও	খেয়ো
শুনিও, শুনো	শোনো
ঘুমাইও	ঘুমিও

প্রযোজক ক্রিয়ার রূপভেদ

সাধু	চলতি
করাইয়াছি	করিয়েছি
করাইও	করিয়ো
করাইলাম	করালাম
যাওয়াইয়াছি	যাইয়েছি
খাওয়াইও	খাইয়ো

সাধু	চলতি
বলাইয়াছেন	বলিয়েছেন
শোনাইও	শুনিয়ো
শুনাইয়াছিস	শুনিয়েছিস
করাইবেন	করাবেন
শুনাইলি	শুনালি

সাধু	চলতি
খাওয়াইয়াছে	খাইয়েছে
খাওয়াইবে	খাওয়াবে
খাওয়াইল	খাওয়াল
হওয়াইয়াছে	হওয়াইয়েছে
বলাইবেন	বলাবেন

অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপভেদ

সাধু	চলতি
করিতে	করতে
করিয়া	করে
বলিতে	বলতে
বলিয়া	বলে
হইতে	হতে

সাধু	চলতি
যাইয়া	গিয়ে
যাইতে	যেতে
করিলে	করলে
করিবার	করবার
বলিলে	বললে

সাধু	চলতি
বলিবার	বলবার
হইলে	হলে
হইবার	হবার
যাইবার	যাবার
যাইলে	গেলে

যৌগিক ক্রিয়ার রূপভেদ :

সাধুভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি হয়, চলতি ভাষায় তুলনামূলকভাবে কম হয়। সাধু থেকে চলতি ভাষায় রূপান্তরকালে সাধুভাষার যৌগিক ক্রিয়া পরিবর্তন হয়ে চলতি মৌলিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলতি
আগমন করা	আসা
আহার করা	খাওয়া

সাধু	চলতি
লম্ফ প্রদান করা	লাফানো
শয়ন করা	শোওয়া

সাধু	চলতি
গ্রহণ করা	নেওয়া
গমন করা	যাওয়া

সাধু	চলতি
শ্রবণ করা	শোনা
নিদ্রা যাওয়া	ঘুমানো

সাধুভাষার যৌগিক ক্রিয়ার পরিবর্তে চলতি ভাষার যৌগিক ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত ও সরল হয়ে থাকে এবং বুঝতে সহজ হয়। যেমন– 'গাহিতে গাহিতে গমন করিতেছে' না বলে 'গাইতে গাইতে যাচ্ছে' বললে বাক্যটি সহজ-সরল, বোধগম্য ও শ্রুতিমধুর হয়।

লক্ষণীয়: ক্রিয়াপদে সাধুভাষায় হ থাকলে প্রায় কেবল চলতি ভাষায় হ লোপ পায়। যেমন–

সাধু	চলতি
কহে	কয়
কহিল	কইল
গাহিতাম	গাইতাম

সাধু	চলতি
চাহিল	চাইল
বহিতে	বইতে
কহিবে	কইবে

সাধু	চলতি
গাহিবে	গাইবে
চাহে	চায়
নাহিয়াছে	নেয়েছে

সর্বনামের রূপভেদ: সাধুভাষায় সর্বনামের রূপ পূর্ণ ও বিস্তৃত হয় এবং চলতি ভাষায় সংক্ষিপ্ত হয়। সাধুভাষায় সর্বনামে হ থাকলে চলতি ভাষায় সাধারণত হ বর্জিত হয়। যেমন–

সাধু	চলতি
যাহা	যা
যাঁহার	যাঁর
যাহারা	যারা
তাহা	তা
যাঁহারা	যাঁরা

সাধু	চলতি
তাহারা	তারা
তাঁহারা	তাঁরা
কাহারা	কারা
যাহার	যার
তাঁহাদের	তাঁদের

সাধু	চলতি
তাহার	তার
কাহার	কার
তাঁহার	তাঁর
কাহাদের	কাদের

অনেক সময় চলতি ভাষায় সাধুভাষার সর্বনামের হ কেবল বর্জিত হয় না, ধ্বনিতে অন্যান্য পরিবর্তনও হয়ে থাকে। যেমন–

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
ইহা	এটা, এটি	উহারা	ওরা	ইঁহারা	এঁরা
উহা	ওটা, ওটি	কেহ	কে	উহাদের	ওদের
ইহারা	এরা	ইহার	এর (এটার, এটির)	উঁহারা	ওঁরা
ইহাদের	এদের	উহার	ওর (ওটার, ওটির)		

পুনশ্চ: উঁহার সর্বনামের চলতি রূপ ওঁর; অনেকে এক্ষেত্রে 'ওনার' ব্যবহার করেন। এটি প্রমিত রূপ নয় বলে প্রমিত বাংলায় 'ওনার' সর্বনাম ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনুসর্গের রূপভেদ

১। সাধুভাষায় ব্যবহৃত পূর্ণ রূপের জায়গায় চলতি ভাষায় তার সংক্ষিপ্ত বা কোমল রূপ হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
ধরিয়া	ধরে	পার্শ্বে	পাশে	ভিতরে	ভেতরে
হইতে	হতে	থাকিয়া	থেকে	চাইতে	চেয়ে
করিয়া	করে	বাহিরে	বাইরে		

২। সাধুভাষায় ব্যবহৃত অনুসর্গের পরিবর্তে চলতি ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
অপেক্ষা	চেয়ে	পশ্চাতে	পেছনে	নিকটে	কাছে
কারণে	জন্যে	সহিত	সঙ্গে	দ্বারা	দিয়ে
ব্যতীত	ছাড়া	হইতে	থেকে	ন্যায়	মতো

৩। অনুসর্গযুক্ত পদগুচ্ছেরও রূপভেদ হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
ইহা অপেক্ষা	এর চেয়ে	ইহা দ্বারা	একে দিয়ে
সর্বাপেক্ষা	সবচেয়ে	তদপেক্ষা	তার চেয়ে

অব্যয়ের রূপভেদ

সাধুভাষায় সংস্কৃত বা তৎসম অব্যয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। চলতি ভাষায় তদ্ভব অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
অদ্যপি	আজও	প্রায়শ	প্রায়ই	তথায়	সেখানে
অনন্তর	তারপর	যদ্যপি	যদিও	নচেৎ	নইলে
কদাপি	কখনো	অকস্মাৎ	হঠাৎ	বরঞ্চ	বরং
তথাপি	তবুও	কদাচ	কখন	সহসা	হঠাৎ
নতুবা	নইলে	কুত্রাপি	কোথাও		

দ্রষ্টব্য: কিছু অব্যয় সাধু ও চলতি দুটি রীতিতেই ব্যবহৃত হয়। আবার কিছু অব্যয় কেবল চলতিরীতিতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন – তো, তা, তাহলে, তাইতো, তাই বলে, বলে, নইলে, নয়তো, হলে, পরে, মতো ইত্যাদি।

বিশেষ্যের রূপভেদ:

১। সাধুভাষায় বিশেষ্য পদের তৎসম বা সংস্কৃত রূপ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। চলতি ভাষায় বিশেষ করে তৎসম শব্দের তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি
অদ্য	আজ
অষ্টপ্রহরীয়	আটপৌরে
কর্ণ	কান
দ্বিপ্রহর	দুপুর
দুগ্ধ	দুধ

সাধু	চলতি
মস্তক	মাথা
চন্দ্র	চাঁদ
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান
কণ্টক	কাঁটা

সাধু	চলতি
গৃহিণী	গিন্নি
পত্র	পাতা
পক্ষী	পাখি
বৃক্ষ	গাছ
রাত্রি	রাত

২। অনেক ক্ষেত্রে তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দও ধ্বনি পরিবর্তনের (স্বরসংগতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি) মাধ্যমে কমবেশি পরিবর্তিত রূপে চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন –

সাধু	চলতি
উপর	ওপর
কুলা	কুলো
টুকরা	টুকরো
মুলা	মুলো
বিলাতি	বিলিতি
বিদ্যা	বিদ্যে
মিঠা	মিঠে
ভিক্ষা	ভিক্ষে
হিসাব	হিসেব

সাধু	চলতি
ভিতর	ভেতর
দেশি	দিশি
আজি	আজ
ফলাহার	ফলার
উঠান	উঠোন
তুলা	তুলো
জুতা	জুতো
পূজা	পুজো
উনান	উনুন

সাধু	চলতি
নাই	নেই
মিথ্যা	মিথ্যে
ফিতা	ফিতে
সিধা	সিধে
ধূলি	ধুলো
মহিষ	মোষ
গামোছা	গামছা
সিপাহি	সেপাই

৩। সাধু রীতিতে ব্যবহৃত কিছু কিছু তৎসম শব্দের পরিবর্তে চলতি ভাষায় সমার্থক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের পরিবর্তে বিদেশাগত শব্দ চলতি ভাষায় প্রাধান্য পায়। যেমন-

সাধু	চলতি
পত্র	চিঠি
বাতায়ন	জানালা

সাধু	চলতি
লেখনী	কলম
পুস্তক	বই

সাধু	চলতি
বিপণি	দোকান
শয্যা	বিছানা

বহুবচনের রূপভেদ : সাধুভাষায় বিশেষ্য পদের বিভিন্ন ধরনের বহুবচন দেখা যায়। যেমন– উদ্যানসমূহ, পর্বতমালা, পুস্তকাদি, বৃক্ষরাজি, লোকসকল, ভ্রাতৃগণ, সাংবাদিকমহল ইত্যাদি।

কিন্তু চলতি ভাষায় বহুবচনের রূপ সীমিত। চলতি ভাষায় বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রধানত রা/এরা, গুলি/গুলো ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। বহুবচনের কতকগুলো রূপ কেবল সাধুভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- নিকর (নক্ষত্রনিকর), নিচয় (তারকানিচয়) সমুচ্চয় (দ্রব্যসমুচ্চয়), গ্রাম (গুণগ্রাম), দাম (পুষ্পদাম)।

কারক-বিভক্তির রূপভেদ : সাধুভাষায় ব্যবহৃত কিছু কিছু কারক-বিভক্তি চলতি ভাষায় ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করে। যেমন-

সাধু	চলতি
দিগকে	দের

সাধু	চলতি
দিগে	দের

সাধু	চলতি
দিগের	দের

বিশেষণের রূপভেদ: সাধুভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে স্ত্রীবাচক শব্দে এবং স্ত্রীবাচক ভিন্ন অন্য শব্দেও স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১. সাধু রীতিতে নারীবাচক শব্দে নারীবাচক বিশেষণ:

অনাথা, বিধবা
ছলনাময়ী, প্রেমময়ী, মমতাময়ী, নারী
নবমালিকা, কুসুমকোমলা শকুন্তলা
রূপযৌবনসম্পন্না, নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাননা, মহামাননীয়া রাজকুমারী
ধর্মশীলা, নম্রস্বভাবা নারী
রণরঙ্গি, খড়্গধারিণী, রুদ্ররূপিণী চণ্ডী

২. সাধু রীতিতে নারীবাচক নয় এমন শব্দেও নারীবাচক বিশেষণ:

ওজস্বিনী ভাষা
জ্যোৎস্নাপুলকিতা রজনী
তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা তটিনী
মোহিনী মূর্তি
শস্যশালিনী ভূমি
সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী
সুজলা সুফলা শস্যা শ্যামলা মাতৃভূমি

লক্ষণীয় : কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ প্রীতিমূলক অর্থে পুরুষবাচক শব্দে নারীবাচক বিশেষণ এবং নারীবাচক শব্দে পুরুষবাচক বিশেষণের প্রয়োগ দেয়া যায়।

প্রিয় নার্গিস, ভালো থেকো। [নারীবাচক শব্দে পুরুষবাচক বিশেষণ]
বেশ লক্ষ্মী ছেলে। [পুরুষবাচক শব্দে নারীবাচক বিশেষণ]

বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু ও চলিতের রূপভেদ : সাধু ও চলতি রীতির বাক্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো কেবল সাধুভাষাতেই ব্যবহৃত হয়; অন্যদিকে কিছু শব্দ কেবল চলতি ভাষাতেই প্রত্যাশিত।

তৎসম-অতৎসম শব্দের প্রয়োগ

সাধু রীতিতে তৎসম শব্দের অধিক ব্যবহার দেখা যায়। পক্ষান্তরে, চলতি রীতিতে ওই সব তৎসম শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দের অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে।

সাধু	চলতি
অন্তঃকরণ	মন
উত্তমর্ণ	মহাজন
নিষ্ঠীবন	থুতু
সন্নিধানে	কাছে

সাধু	চলতি
অভিপ্রায়	ইচ্ছা
দর্পণ	আয়না
স্কন্ধ	কাঁধ
সম্যক	যথেষ্ট

সাধু	চলতি
অধ্যয়ন	পড়া
গলদেশ	গলা
তলদেশে	তলায়
বঙ্কিম	বাঁকা

সমাসবদ্ধ শব্দ প্রয়োগে পার্থক্য

সাধুভাষায় দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ বেশি। এ ধরনের প্রয়োগ ভাষাকে ওজস্বী করে। চলতি ভাষায় সমাসবদ্ধ শব্দ যতটা সম্ভব পরিহার করা হয়। ভাষা পরিবর্তনের সময়ে তাই সাধুভাষার সমাসবদ্ধ পদকে চলতি ভাষায় ভেঙে সহজ করে লেখা হয়। যেমন–

সাধু	চলতি
অভিবাদনপূর্বক	অভিবাদন করে
আপাদমস্তক	পা থেকে মাথা পর্যন্ত
আদ্যোপান্ত	আগাগোড়া
বাষ্পাকুললোচনে	অশ্রুসজল চোখে
বাষ্পবারি বিমোচন	চোখের জল ফেলা
নানাভরণভূষিত	নানা রকম গয়না পরা
মনুষ্য সমাজের	মানব সমাজের
দারুনির্মিত	কাঠের তৈরি
দীর্ঘোদর	বিশাল পেট

সাধু	চলতি
উল্লেখশ্রবণমাত্র	কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই
মনস্কামনা	মনের ইচ্ছা
বনস্পতিসঙ্কুল	বড় বড় গাছে ভরা
পূরণার্থ	পূরণের জন্যে
বহুদিনান্তরে	বহু দিন পরে
কিয়ৎক্ষণে	কয়েক মূহূর্তে
রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিক্রমে	রাজার আদেশ পাওয়ার পর
দামেস্কাধিপতি	দামেস্কের অধিপতি
স্বহস্তোৎপাদিত	নিজের হাতে জন্মানো

সন্ধিঘটিত শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য

সাধু রীতিতে সন্ধিঘটিত শব্দের ব্যবহার বেশি। বিষয়ের কারণে অপরিহার্য না হলে চলতি ভাষায় আড়ম্বরমুখী সন্ধিজাত শব্দ যতটা সম্ভব পরিহার করা হয়। প্রয়োজনে সন্ধিজাত শব্দ ভেঙে সহজ করে লেখা হয় কিংবা তদ্ভব রূপ দেওয়া হয়।

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
উৎসবার্থ	উৎসবের জন্যে	রসাভিষিক্ত	রসে অভিষিক্ত	প্রত্যুত্তরে	তার উত্তরে/
তদ্বিষয়ে	সেবিষয়ে	রাজাজ্ঞা	রাজার হুকুম	মনস্কামনা	মনের ইচ্ছা
তদ্বিপরীত	তার বিপরীত	গাত্রোত্থান	ওঠা, গা তোলা	মস্তকোপরি	মাথার ওপরে
তন্নিমিত্ত	তার জন্যে	তদুপরি	তার ওপরে		
প্রথানুসারে	প্রথা অনুসারে	তদ্দর্শনে	তা দেখে		

শব্দদ্বিত্বের প্রয়োগে পার্থক্য

সাধু রীতিতে শব্দদ্বিত্ব প্রয়োগের রীতি নেই। তা চলতি রীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন– আইঢাই, আধাআধি, কাছাকাছি, ফ্যালফ্যাল, উসখুস, ফিসফাস, হাইফাই ইত্যাদি চলতি ভাষার নিজস্ব সম্পদ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগে পার্থক্য

ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার সাধু রীতিতে নেই বললেই চলে। এ ধরনের শব্দ চলতি রীতিতেই প্রচুর ব্যবহৃত হয়। যেমন– ক্যাঁটকেটে (রং), কুচকুচে (কালো), খাঁ খাঁ (রোদ), ঝমঝম (বৃষ্টি), ঝিরঝির (বাতাস), টুকটুকে (লাল), গনগনে (আগুন), শোঁ-শোঁ (হাওয়া), ফুরফুরে (মেজাজ), ধবধবে (সাদা) ইত্যাদি।

বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে পার্থক্য

বাগধারা প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি চলতি ভাষার নিজস্ব সম্পদ। সাধুভাষায় এদের ব্যবহার নেই বললেই চলে। এদের প্রয়োগ অনেক সময় সাধুভাষাকে কৃত্রিম করে তোলে। যেমন- 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা', 'ধান ভানতে শিবের গীত' ইত্যাদি চলতি ভাষারই সম্পদ।

অলংকার প্রয়োগে পার্থক্য

প্রাচীন রীতির সমাসবদ্ধ উপমা প্রয়োগ সাধুভাষার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। প্রদত্ত উদাহরণগুলোর মতো আলংকারিক শব্দপ্রয়োগ চলতি ভাষায় দেখা যায় না। ঋণজাল, যাতনাযন্ত্রে পেষণ, লোভানলে আহুতি, লোভরিপু, শোকসিন্ধু, বিষাদ-বারিপ্রবাহ, নবনীরদ-নন্দিত। বাংলা ভাষার উচ্চারণের ক্ষেত্রে অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি, অপিনিহিতি ইত্যাদি নিয়ম প্রচলতি আছে। এসব উচ্চারণ রীতি সাধু ও চলতিরীতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তা কখনো বা এগুলোর মধ্যবর্তী স্বরধ্বনির যোগ ঘটায়, আবার কখনো তা ই-কার যোগে ভাষারীতির মধ্যে রূপভেদ সৃষ্টি করে। এগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শব্দের মাঝখানে ই-কারের লোপ

সাধু রীতি : যাহা, তাহা, ইহা, তাহাকে, যাহাকে, কাহাকে, কাহারও, ইহাদের, ইহারা, যাহারা, তাহারা ইত্যাদি।
চলতি রীতি: যা, তা, এ, তাকে, যাকে, কাকে, কারো, এদের, এরা, যারা, তারা ইত্যাদি।

সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে

সাধু রীতি : কহিল, গাহিল, চাহিল ইত্যাদি।
চলতি রীতি : কইল, গাইল, চাইল ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে

সাধু রীতি : সহিতে, কহিতে, রহিতে ইত্যাদি।
চলতি রীতি : সইতে, কইতে, রইতে ইত্যাদি।

শব্দের মধ্যবর্তী স্থলে ই-কার লোপের আরও দৃষ্টান্ত

সাধু	চলতি	সাধু	চলতি	সাধু	চলতি
সিপাহি	সেপাই	বেহাই	বেয়াই	রহিল	রইল
দধি	দহি > `B	ফলাহার	ফলার	সহিল	সইল

ক্রিয়াভেদের মধ্যবর্তী স্থলে ই বা উ ধ্বনি লোপের উদাহরণঃ
সাধু রীতি : যাউক, খাউক, লউক, খাওয়াইবি, নাওয়াইব, জানাইব ইত্যাদি।
চলতি রীতি : যাক, খাক, নিক, খাওয়াব, নাওয়াব, জানাব ইত্যাদি।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধু রীতির শব্দের আগে বা পরের স্বরধ্বনি পদের মধ্যবর্তী স্থলের স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। ব্যাকরণের ভাষায় একে বলে স্বরসংগতি। যেমন –

ক. শব্দের কোনো অক্ষরে অ, আ বা এ থাকলে এর পূর্ববর্তী ধ্বনি- এ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন সাধু ও চলতি ভাষারীতিকে প্রভাবিত করে। যেমন– সাধুভাষায় লেখা হয়– লিখ, শিখ, লিখা, লিখালিখি, শিখাশিখি, শিয়াল ইত্যাদি।

খ. পরবর্তী অক্ষরে অ, আ বা এ থাকলে পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হওয়ার উদাহরণঃ যেমন– সাধুভাষায়– শুন, শুনা, শুনে, বুঝে, বুঝানো, গুছানো, উঠ, উঠানো, বুঝা ইত্যাদি।

গ. পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অক্ষরের 'আ' ধ্বনির এ ধ্বনিতে পরিবর্তনের উদাহরণঃ
সাধু ভাষারীতিতে : মিছা, ফিতা, মিঠা, গিয়ে, দিয়ে ইত্যাদি।
চলতি ভাষারীতিতে : মিছে, ফিতে, মিঠে, গিয়ে, দিয়ে ইত্যাদি।

ঘ. আগে উ, ঊ থাকলে শেষে আ-হয়ে যাওয়ার উদাহরণঃ
সাধু ভাষারীতিতে : রূপা, ধূলা, কুলা, মূলা, চুলা ইত্যাদি।
চলতি ভাষারীতিতে : রুপো, ধুলো, কুলো, মুলো, চুলো ইত্যাদি।

স্বরসংগতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতির প্রভাবে সাধুভাষায় শব্দ পরিবর্তিত হয়ে চলতি রূপ লাভ করার আরও কিছু নমুনা প্রদত্ত হলো :

সাধু	চলতি
বলিয়া	বলে
আসিয়া	এসে
ভাসিয়া	ভেসে
হাসিয়া	হেসে
কালিয়া	কেলে

সাধু	চলতি
ছুটিয়া	ছুটে
লুটিয়া	লুটে
দেখিয়া	দেখে
যাইত	যেত
খাইত	খেত

সাধু	চলতি
হইত	হতো
বহিত	বইত
কহিত	কইত
লইত	নিত
সহিত	সইত

উল্লেখ্য যে, উভয়ের নিয়মকানুন ও পরিবর্তনের দৃষ্টান্তগুলো স্মরণ রাখলে সাধুরীতি থেকে চলতিরীতিতে ও চলতিরীতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সাধুরীতি থেকে চলতিরীতিতে পরিবর্তন

১. **সাধুরীতি :** ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড়ো লজ্জা পাইতাম; কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়। - অপরিচিতাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চলতিরীতি : ছেলেবেলায় আমার সুন্দর চেহারা নিয়ে পণ্ডিতমশায় আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সঙ্গে তুলনা করে, বিদ্রূপ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এতে তখন বড় লজ্জা পেতাম; কিন্তু বয়স হয়ে এ কথা ভেবেছি, যদি জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে স্বরূপ এবং পণ্ডিতশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমন করেই প্রকাশ পায়।

২. **সাধুরীতি :** এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিং দিব।

চলতিরীতি : এখন নিজের জায়গায় যাও, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দেবে বলেছে, জলযোগের সময় এসো, উভয়ে ভাগ করে খাব। আজ আর কারও হাঁড়ি খেয়ো না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীর হও, তবে আবার এসো, এক সরিষাভোর (সরিষা দানার পরিমাণ) আফিং দেব।

৩. **সাধুরীতি :** তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে।

চলতিরীতি : তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তারই যার শক্তি অপরিমেয়, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় দুপুরের সূর্যের মতো, বিপুল যার আশা, ক্লান্তিহীন যার উৎসাহ, বিরাট যার ঔদার্য, অফুরন্ত যার প্রাণ, অটল যার সাধনা, মৃত্যু যার মুঠিতলে।

৪. **সাধুরীতি :** বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষ্যে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, গ্রহণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।

চলতিরীতি : বাল্যকাল হতে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ নেই। শুধু যা কিছু নিতান্ত প্রয়োজন তাই কণ্ঠস্থ করছি। তেমন করে কোনো মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মনের বিকাশ লাভ হয় না। আনন্দের সঙ্গে পড়তে পড়তে পড়বার শক্তি অলক্ষ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে, গ্রহণশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজ ও স্বভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি পায়।

চলতিরীতি থেকে সাধুরীতিতে পরিবর্তন

১. **চলতিরীতি** : নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদের সার্থকতার গান গেয়ে শুনায়। অনুভূতির কান দিয়ে সে গান শুনতে হবে। তাহলে বুঝতে পারা যাবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাই।

সাধুরীতি : নীরব ভাষায় বৃক্ষ আমাদিগকে সার্থকতার গান গাহিয়া শুনায়। অনুভূতির কান দিয়া সেই গান শুনিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে জীবনের মানে বৃদ্ধি, ধর্মের মানেও তাহাই।

২. **চলতিরীতি** : বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুয়ে আছে একটা মাদুরের ওপর, মাথায় মলিন বালিশ। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ি চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

সাধুরীতি : বিকালের দিকে বেড়াইতে যাইবার পথে দেখিতে গেলাম বুড়িকে। বুড়ি শুইয়া আছে একটা মাদুরের উপর, মাথায় মিলন বালিশ। আমি গিয়া নিকটে দাঁড়াইতেই বুড়ি চোখ মেলিয়া আমার দিকে চাহিল।

৩. **চলতিরীতি** : তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকত, আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হত তবে কোন দুঃখ ছিল না। এরকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোথাও দেখিনি। জ্ঞানতৃষ্ণা তার প্রবল, কিন্তু বই কেনার বেলা সে অবলা। আবার কোনো কোনো বেশরম বলে, "বাঙালির-পয়সার অভাব।" বটে? কোথায় দাঁড়িয়ে বলছে লোকটা এ-কথা?

সাধুরীতি : তাহাও বুঝিতাম, যদি বাঙালির জ্ঞানতৃষ্ণা না থাকিত, আমার বেদনাটা সেইখানে। বাঙালি যদি হটেনটট হইত তাহা হইলে কোন দুঃখ ছিল না। এই রকম অদ্ভুত সংমিশ্রণ আমি ভূ-ভারতের কোন জায়গায় দেখি নাই। জ্ঞানতৃষ্ণা তাহার প্রবল, কিন্তু বই কিনার বেলায় সে অবলা। আবার কোন কোন বেশরম বলে, "বাঙালির পয়সার অভাব" বটে? কোন জায়গায় দাঁড়াইয়া বলিতেছে মানুষটা এই কথা?

৪. **চলতিরীতি :** সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসে। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।

সাধুরীতি : সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কাহারও মনোরঞ্জন করা নয়। এই দুইয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে সেইটি ভুলিয়া গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করিয়া অপরের জন্য খেলনা তৈয়ার করিতে বসে। সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়ে তাহার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নহে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সাধুরীতি ও চলতিরীতির বৈশিষ্ট্য লিখুন।

২. সাধুরীতি ও চলতিরীতির পার্থক্য লিখুন।

৩. সাধুরীতি থেকে চলতিরীতিতে রূপান্তর করুন।

ক. মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন। বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন, "আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো, এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা, তাই ঢাক পিটিয়া বেড়াইতে হইবে? আমাদের এখানে এসব চলিবে না, বলিয়া রাখিতেছি।"

খ. স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের উপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই।

গ. **সাধুরীতি :** দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন-ধরা তীরে মাটি ধসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।

৪. চলতিরীতি থেকে সাধুরীতিতে রূপান্তর করুন।

ক. কাক-ডাকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠতাম আমরা। তপু উঠত সবার আগে। ও জাগাতো আমাদের দুজনকে। ওঠো, ভোর হয়ে গেছে দেখছ না? অমন মোষের মতো ঘুমোচ্ছ কেন, ওঠো। গায়ের ওপর থেকে লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে জোর করে আমদের ঘুম ভাঙাতো তপু। মাথার কাছের জানালা খুলে দিয়ে বলতো, দেখো বাইরে কেমন মিষ্টি রোদ উঠেছে। আর ঘুমিয়ো না, ওঠো।

খ. **চলতিরীতি :** কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস, কিন্তু স্কুল মাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুল মাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে থাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না।

গ. **চলতিরীতি :** আস্তে চুপি চুপি তারা কথা কয়, আহ্লাদির ঘুম না ভাঙে। অতি সন্তর্পণে তারা বিছানা ছেড়ে ওঠে। আহ্লাদির বাপের আমলের গোরটা নেই, গামলাটা আছে। ঘড়া থেকে জল ঢেলে মোটা কাঁথা আর পুরনো ছেঁড়া একটা কম্বল চুবিয়ে রাখে, চালায় আগুন ধরে উঠতে উঠতে গোড়ায় চাপা দিয়ে নেভানো যাতে সহজ হয়।

ইউনিট ৩
বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

পাঠ ৩.১ : ধ্বনির পরিচয়, ধ্বনির প্রকার ভেদ ও ধ্বনি-পরিবর্তন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ধ্বনির পরিচয় বলতে পারবেন।
- ধ্বনির প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধ্বনি-পরিবর্তন সূত্রের সংজ্ঞার্থ ও উদাহরণ দিতে পারবেন।

মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে অনেকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। ইংরেজি sound-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ধ্বনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, আওয়াজ করা। যে কোনো ভাষার উচ্চারিত যে কোনো আওয়াজকে সাধারণত ধ্বনি বলা হয়। অর্থ প্রকাশ করে এমন ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি। মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয়।

বর্ণ

ধ্বনি মুখে উচ্চারিত হয় আর বর্ণ তারই লিখিত প্রতীক। ধ্বনিকে লিখে বোঝাতে যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। যেমন – 'অ' ধ্বনির প্রতীক হলো অ–বর্ণ, 'আ' ধ্বনির প্রতীক আ–বর্ণ।

ধ্বনির প্রকার ভেদ

ধ্বনি দু-প্রকার – স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
স্বরধ্বনি : যেসব ধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবরে, জিহ্বায় বা ঠোঁটে কোনো প্রকার শ্রুতিগ্রাহ্য বাধা সৃষ্টি হয় না সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলা হয়। অর্থাৎ জিহ্বা বা ঠোঁটের সঙ্গে কোনোরূপ স্পর্শ ছাড়া ঘোষবৎ বা গম্ভীর হয়ে উচ্চারিত হয় এই স্বরধ্বনি।
ব্যঞ্জনধ্বনি : যেসব ধ্বনি স্বরধ্বনি নয় সেগুলোকে সাধারণভাবে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যেতে পারে। ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবরে বা ঠোঁটে জিহ্বার সাহায্যে বাধার সৃষ্টি হয়।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া

প্রতিদিন মানুষ যখন কথা বলে তখন আসলে সে কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণ করে। অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি হলো ভাষা। ভাষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভাষার পরিবর্তন বলতে ধ্বনির পরিবর্তনকে বোঝায়। ভাষার ধ্বনিগুলো নানাভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। একটি ধ্বনির প্রভাবে আরেকটি ধ্বনি পরিবর্তিত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দুই ধ্বনির মাঝামাঝি আরেকটি নতুন ধ্বনি এসে যায়। প্রত্যেকের উচ্চারণ অবিকল একই রকম হয় না এবং একই ব্যক্তি সবসময় একইভাবে উচ্চারণ করে না। আমরা অনেক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উচ্চারণ করে থাকি। বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের মূলে শরীরী কারণ থাকতে পারে, থাকতে পারে সামাজিক কারণ। শ্রান্ত-ক্লান্ত থাকলে কিংবা স্বরযন্ত্রের কারণেও অনেক সময় উচ্চারণ অন্য রকম হয়। পরিবেশগত কারণে মানুষের উচ্চারণভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে শিষ্ট ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার পার্থক্য তৈরি হয়ে থাকে। বাংলা একটি চলমান জীবন্তভাষা, ধ্বনিপরিবর্তনের কারণে এই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই ভাষার ধ্বনিপরিবর্তনের বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাক :

১) স্বরাগম

শব্দের প্রথমে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য ওই ব্যঞ্জনের আগে ই, উ বা আ স্বর যোগ করাকে স্বরাগম বলা হয়।

যেমন:

ইস্কুল [ই+স্কুল], স্টিশন [ই+ স্টেশন]

ইস্তিরি [ই+স্তিরি], ইস্টিমার [ই+স্টিমার]

২) স্বরসঙ্গতি

শব্দের ভিতরে বিদ্যমান স্বরধ্বনিগুলো যখন পরস্পরের প্রভাবে সমরূপ ধারণ করে কিংবা পরস্পর মিল বা সংগতি লাভ করতে চায় তখন তাকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়।

যেমন:

বিলাতি > বিলিতি, দেশি > দিশি

কুড়াল > কুড়ুল, মিছা >মিছে

সুবিধা >সুবিধে, পূজা > পুজো, তখনি >তখুনি, এখনি > এখুনি

চিরনি >চিরুনি, ধূলা > ধুলো, শুনা >শোনা, হিসাব >হিসেব, ভিক্ষা >ভিক্ষে

৩) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ

কঠিন শব্দে কোমলতা আনার জন্য এবং উচ্চারণকে সহজ করার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে তার মধ্যে স্বরধ্বনি অ, ই, এ, ও, উ ইত্যাদি যোগ করাকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন–

অ স্বরধ্বনি যোগে : যত্ন > যতন

একইভাবে রত্ন > রতন, বর্ষ > বরষ, জন্ম > জনম, কর্ম > করম, পূর্ব > পুরব, স্বপ্ন > স্বপন, ত্রাস >তরাস, প্রাণ > পরান, মর্দ >মরদ, ভক্তি >ভকতি,

ই স্বরধ্বনি যোগে: প্রীতি >পিরিতি,

শ্রী >ছিরি, ফিল্ম > ফিলিম; বর্ষা >বরিষা স্নান >সিনান, চিত্র > চিত্তির

এ স্বরধ্বনি যোগে : গ্রাম >গেরাম

এইভাবে ট্রাম > টেরাম, গ্লাস >গেলাস, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, সির্ফ >সেরেফ

উ স্বরধ্বনি যোগে : মুক্তা >মুকুতা

এইভাবে রাজপুত্র > রাজপুত্তুর, শূদ্র >শুদ্দুর, মুল্ক > মুলুক, শুক্রবার > শুক্কুরবার, > বুলু, ফ্লুট > ফুলুট, সূর্য >সুরুজ

ও স্বরধ্বনি যোগে : শ্লোক > শোলোক

একইভাবে মুর্গ >মোরগ

৪) ধ্বনি বিপর্যয়

উচ্চারণের সময় শব্দস্থিত বা শব্দের মধ্যবর্তী ধ্বনির স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলা হয়।

যেমন : রিক্শা >রিশ্কা, বাক্স >বাস্ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ >ফাল, মুকুট > মুটুক,হ্রদ >হদ>দহ

৫) অপিনিহিতি

শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ কে আগেই উচ্চারণ করে ফেলার রীতিকে অপিনিহিতি বলা হয়। যেমন

বসিয়া > বইসা

একইভাবে

করিয়া > কইর‍্যা	কালই > কাইল
আজি >আইজ	রাতি > রাইত
রাখিয়া > রাইখ্যা	করিয়া > কইর‍্যা
বাদিয়া > বাইদ্যা	করিয়াছি > কইর‍্যাছি

হাসিয়া > হাইস্যা	ধরিয়া >ধইর‍্যা
গাঁতি > গাঁইতি	কাঁচি > কাঁইচি
জলুয়া > জউলা	সাধু >সাউধ
মাছুয়া >মাউছুয়া	গাছুয়া > গাউছা

৬) অভিশ্রুতি

অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ' পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন তার রূপ পরিবর্তন করে দেয় তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন–

করিয়া > কইরা > করে
হাসিয়া > হাইস্যা >হেসে
মারিয়া > মাইর‍্যা > মেরে
জলুয়া > জউলুআ > জইলুআ > জলো > জোলো
আজি > আইজ > আজ
রাতি > রাইত > রাত
ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে

অভিশ্রুতি অপিনিহিতির নির্ভরশীল, অপিনিহিতি ছাড়া অভিশ্রুতি হয় না। বাংলা চলিত ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো অভিশ্রুতি।

৭) সমীভবন বা সমীকরণ

শব্দের মধ্যে ভিন্ন দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন ধ্বনি দুটি একই ধ্বনিতে পরিণত হয় তাকে সমীভবন বা সমীকরণ বলা হয়। যেমন–

পদ্ম > পদ্দ	ধর্ম্ম > ধম্ম
জন্ম > জম্ম	গল্প > গপ্প
কর্তা > কত্তা	তর্ক >তক্ক
মূর্খ > মুখ্খু	কাঁদ্না > কান্না

৮) বিষমীভবন

শব্দের মধ্যে দুটি একজাতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির একটির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বিষমীভবন বলে। সমীভবনের ঠিক বিপরীত বিষয় বিষমীভবন। যেমন: শরীর > শরীল, লাল > নাল, লাঙ্গল > নাঙ্গল

৯) ধ্বনিবিলোপ

উচ্চারণের সময় দুটি একজাতীয় ধ্বনির একটির লোপ হলে তাকে ধ্বনিবিলোপ বা বর্ণবিচ্যুতি বলে।
যেমন : বড়দাদা > বড়দা, ছোটদিদি > ছোড়দি, বউদিদি > বউদি, ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা, ছোটদাদা > ছোট্দা

১০) ধ্বনিদ্বিত্ব

কোনো শব্দের ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার জন্য সেই শব্দের কোনো ধ্বনি দু-বার উচ্চারণ করা হলে তাকে ধ্বনিদ্বিত্ব বলে।
যেমন : ছোট >ছোট্ট, বড় >বড্ড, সকাল >সক্কাল, পাকা > পাক্কা

১১) ধ্বনিবিকৃতি

শব্দের মধ্যকার কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করলে তাকে বলা হয় ধ্বনিবিকৃতি। যেমন: ধাইমা> দাইমা, ধোবা > ধোপা

১২) স্বরলোপ

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে স্বরলোপ বলা হয়।

যেমনঃ উধার > ধার (উ স্বরধ্বনির লোপ), বড় দাদা > বড়দা (ড়–এর সঙ্গে যুক্ত অ স্বরধ্বনির লোপ)

১৩) অন্তর্হতি

শব্দের মধ্যস্থ কোনো স্বরহীন বা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনের লোপ ঘটলে তাকে অন্তর্হতি বলা হয়। যেমনঃ
পূর্ব > পুব (র্ এর বিলোপ); ফাল্গুন > ফাগুন (ল্ এর বিলোপ)

একইভাবে নারিকেল > নারকেল, ফলাহার > ফলার, নাতিনী >নাত্নি, অতসী > তিসি, অতিথি > অতিথ্

১৪) 'য়'–শ্রুতি ও 'ব'–শ্রুতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য সেই দুটি স্বরের মধ্যে 'য়' ধ্বনি অথবা অন্তস্থ ব-ধ্বনি অর্থাৎ 'ওয়', 'ও' ধ্বনির আগমন ঘটে, এদের য়–শ্রুতি ও অন্তস্থ ব–শ্রুতি বলা হয়।
য় –শ্রুতি

যেমনঃ বউএর > বউয়ের, দুইএর > দুইয়ের

ব– শ্রুতি [অন্তস্থ 'ব' এর উচ্চারণ 'ওয়া' দ্বারা নির্দেশ করা সম্ভব।]
খা+ আ> খাওয়া [খা+ও+আ]
যা+ আ > [যা+ও+আ]
তেমনভাবে
খোআ > খোওয়া, নাহা > নাআ> নাওয়া

১৫) হ্–কার লোপ

কথ্য বাংলায় 'হ' এরও লোপ হয়।
যেমন : কহে > কয়; চাহ > চাও; আলাহিদা > আলাদা ফলাহার > ফলার

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।
১। ধ্বনি কাকে বলে ? ধ্বনির প্রকারভেদ উল্লেখ করুন ? কী কী কারণে সাধারণত ধ্বনির পরিবর্তন হয় ?
২। স্বরাগম ও স্বরসঙ্গতি কাকে বলে ? চারটি করে উদাহরণ দিন।
৩। স্বরভক্তি কাকে বলে ? স্বরভক্তির পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৪। অপিনিহিতি বলতে কী বোঝায় ? অপিনিহিতির সঙ্গে অভিশ্রুতির সম্পর্ক নির্ণয় করুন এবং অপিনিহিতি থেকে অভিশ্রুতি হওয়ার পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৫। উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লিখুন :
বর্ণবিচ্যুতি, সমীভবন, বর্ণদ্বিত্ব, স্বরলোপ, বিষমীভবন, বর্ণবিকৃতি
৬। নিম্নলিখিত ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলোর নাম লিখুন :
ক) বিলাতি > বিলিতি
খ) যত্ন > যতন
গ) বাক্স >বাস্ক
ঘ) বসিয়া > বইসা
ঙ) করিয়া > কইরা > করে
চ) পদ্ম > পদ্দ
ছ) শরীর > শরীল
জ) বড়দাদা > বড়দা
ঝ) ধাইমা> দাইমা

পাঠ ৩.২ : ধ্বনি সংযোগ : সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্ধির সংজ্ঞার্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সন্ধির প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

'সন্ধি' শব্দের অর্থ মিলন বা সংযোগ। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলা হয়। খুব কাছাকাছি দুটি ধ্বনি দ্রুত উচ্চারণের ফলে কখনো একটি ধ্বনিতে পরিণত হয়, কখনো একটি ধ্বনির লোপ হয় বা একটির রূপান্তর হয় এবং কখনো বা দুটি ধ্বনিই রূপান্তরিত হয়ে নতুন ধ্বনি তৈরি করে। যেমন:

ধ্বনির মিলন বা রূপান্তর : রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র
ধ্বনি-লোপ : হিম+আলয় = হিমালয়
পূর্বধ্বনির বদল : চিৎ+ময় = চিন্ময়
পরধ্বনির বদল : রাজ্+নী = রাজ্ঞী
উভয় ধ্বনির বদল : উৎ+হত = উদ্ধত

ওপরের উদাহরণে পাশাপাশি দুটি শব্দ বসে সন্ধি হয়েছে। এতে উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর হয়েছে। রবি-ইন্দ্র, হিম-আলয়, চিৎ-ময়, উৎ-হত– এরকম উচ্চারণ কেবল অসুবিধাজনকই নয়, শুনতে শ্রতিমধুরও লাগে না। তার বদলে রবীন্দ্র, হিমালয়, চিন্ময়, উদ্ধত শব্দগুলো সহজ ও শ্রুতিমধুর। সন্ধি এভাবে শব্দকে সহজ মনোরম করে তোলার মাধ্যমে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

সন্ধির উদ্দেশ্য

ধ্বনি-পরিবর্তনই শুধু নয়, ভাষার মাধুর্য বাড়াতেও সন্ধির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ভাষার অন্যতম কাজ মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করা। এই মনের ভাব প্রকাশের কাজটি ধ্বনি উচ্চারণ করেই হয়ে থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো সবসময় একইভাবে উচ্চারিত হয় না। উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের ধ্বনিগুলোর কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবেই বদলে যায়, কিছু অংশ বাদ পড়ে যায়। কখনও আবার অতিরিক্ত ধ্বনিও এসে যায়। ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে শব্দের বানানেও প্রভাব পড়ে। বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে দেশি-বিদেশি শব্দ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সূত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই শব্দাবলির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলা সন্ধির ও সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের জন্য আলাদা সূত্র বেঁধে দেয়া হয়েছে। বাংলা সন্ধির নিয়ম গঠিত হয়েছে অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দ নিয়ে। আর সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় আগত তৎসম শব্দের সন্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষার নিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে। একটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে, উচ্চারণের সুবিধা হলেও যদি ধ্বনিগত মাধুর্য রক্ষিত না হয় সেক্ষেত্রে সন্ধি করার নিয়ম নেই। যেমন : কচু+আলু=কচ্চালু, কচু+আদা = কচ্চাদা।

সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

সন্ধির প্রয়োজন বহুবিধ। যেমন:
১। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সন্ধি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
২। নতুন শব্দ গঠনের জন্যে সন্ধির প্রয়োজন হয়।
৩। শব্দের আকার ছোট করতেও সন্ধির প্রয়োজন পড়ে।
৪। সন্ধির ফলে ভাষা সুন্দর ও সাবলীল হয়।
৫। উচ্চারণ সহজ করার জন্যে সন্ধির প্রয়োজন রয়েছে।

৬। উচ্চারণের সৌকর্য ও শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি, ভাষার প্রাঞ্জলতা সৃষ্টি ও ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করতে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠটি ভালোভাবে পড়ুন এবং উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার ভালোভাবে পড়ুন এবং নির্দেশ মত কাজ করুন।

১। সন্ধি শব্দের অর্থ কী ?

ক) সমঝোতা
খ) মিলন
গ) সংযোগ
ঘ) বন্ধুত্ব

২। বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী রকম ?

ক) স্বল্প
খ) গুরুত্বহীন
গ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ
ঘ) তেমন না

৩। সন্ধির উদ্দেশ্য কী ?

ক) উচ্চারণ সহজ করা
খ) উচ্চারণ ভিন্ন রকম করা
গ) নতুন শব্দ তৈরি করা
ঘ) উচ্চারণ সহজ ও মাধুর্যমণ্ডিত করা

উত্তর : ১. খ ২. গ ৩. ঘ

পাঠ ৩.৩ : সন্ধির প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সন্ধি কত প্রকার ও কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দসমূহের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও অতৎসম শব্দে এর ব্যবহার সীমিত। শব্দের উৎসের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় সন্ধিকে অতৎসম সন্ধি ও তৎসম সন্ধি- এই দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

অতৎসম সন্ধি

বাংলা ভাষার সন্ধি অতৎসম সন্ধি নামে পরিচিত। অনেকের মতে, সন্ধির নিয়ম শুধু সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কিছু কিছু সন্ধি দেখা যায় যা সংস্কৃত সন্ধির বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। বাংলা ভাষার সন্ধিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি। অতৎসম শব্দে বিসর্গ সন্ধি হয় না।

স্বরসন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনে, উভয় ধ্বনির একটির লোপে কিংবা উভয় ধ্বনির পারস্পরিক প্রভাবে ধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটে তার নাম স্বরসন্ধি। যেমন: ছেলেমি = ছেলে + আমি

এ + আ = এ যোগে অর্থাৎ এখানে ছেলে শব্দের শেষের এ-কার এবং আমি শব্দের আ-কার এই দুই স্বর মিলে একটি স্বরে পরিণত হয়ে ছেলেমি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বাংলা স্বরসন্ধির আরও কিছু উদাহরণ হলো:

আলা + ভোলা = আলাভোলা
ন্যাকা + আমো = ন্যাকামো

ব্যঞ্জন সন্ধি

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সহযোগে কিংবা তাদের একের লোপে অথবা ধ্বনি দুটির পারস্পরিক প্রভাবে ধ্বনির যে পরিবর্তন তার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি।

এক + এক = একেক

বদ্ + জাত = বজ্জাত

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমত কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১। খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি কত প্রকার ?

ক) চার প্রকার খ) পাঁচ প্রকার

গ) অনেক প্রকার ঘ) দুই প্রকার

২। স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনি মিলিত হলে তাকে কী সন্ধি বলে ?

ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি

গ) নিপাতনে সিদ্ধ ঘ) স্বর-ব্যঞ্জনসন্ধি

৩। অ এর পরে আ থাকলে উভয়ে মিলে কী হয় ?

ক) অ খ) আ

গ) এ ঘ) ই

উত্তরমালা

১. ঘ ২. খ ৩. খ

পাঠ ৩.৪ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের তৎসম সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ দিতে পারবেন।
- বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধির পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় যেগুলোর উৎস সংস্কৃত ভাষা। এসকল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জন সন্ধির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। স্বরসন্ধির মূল সংগঠন হলো:

স্বরসন্ধি = স্বরধ্বনি + স্বরধ্বনি

স্বরসন্ধি আবার দুই প্রকারের হয়ে থাকে।

বহিঃসন্ধি ও অন্তঃসন্ধি

বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সন্ধি হলে তাকে বহিঃসন্ধি বলা হয়। যেমন : মহা+আশয় = মহাশয়। এখানে মহা ও আশয় শব্দের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছে তাকে বহিঃসন্ধি বলা হয়।

একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তার নাম অন্তঃসন্ধি। যেমন : নৌ+ইক = নাবিক, ইতিহাস+ইক =ঐতিহাসিক।

১. অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ–কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ–কার হয় এবং এই আ–কার পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ + অ = আ

নব + অন্ন = নবান্ন

স্ব + অধীন = স্বাধীন

প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক

হত + আশ হতাশ

সূর্য + অস্ত = সূর্যাস্ত

অ + আ = আ

দশ + আনন = দশানন

গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার

প্রবাল + আদি = প্রবালাদি

রত্ন + আকর = রত্নাকর

জল + আশয় = জলাশয়

আ + অ = আ

আশা + অতীত = আশাতীত

মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ

ত্বরা + অন্বিত = ত্বরান্বিত

যথা + অযথ = যথাযথ

আ + আ = আ

ভাষা + আচার্য = ভাষাচার্য

ব্যথা +আতুর = ব্যথাতুর

কারা + আগার = কারাগার

মহা + আশয় = মহাশয়

২. অ–কার কিংবা আ–কারের পর ই-কার অথবা ঈ–কার থাকলে উভয়ে মিলে এ–কার হয় এবং এ–কারটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

অ + ই = এ

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র

স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা

শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা

আ + ই = এ

যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র

অ + ঈ = এ

নর + ঈশ = নরেশ

গণ + ঈশ = গণেশ

পরম + ঈশ = পরমেশ

আ + ঈ = এ

রমা + ঈশ = রমেশ

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী

৩. অ–কার অথবা আ–কারের পর উ–কার কিংবা ঊ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ও–কার হয়। ও–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়।

অ+উ = ও

নব+ উদয় = নবোদয়

নীল + উৎপল = নীলোৎপল

মূল + উচ্ছেদ = মূলোচ্ছেদ

আ+উ = ও

যথা+উচিত = যথোচিত

মহা+উৎসব = মহোৎসব

অ+ঊ = ও

চল + ঊর্মি = চলোর্মি

গৃহ+ ঊর্ধ্ব = গৃহোর্ধ্ব

আ+ ঊ = ও

গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি

৪. অ-কার অথবা আ–কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর’ হয় এবং ‘অর’ রেফ (ˊ) হিসেবে পরবর্তী বর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ঋ = অর্

উত্তম + ঋণ =উত্তমর্ণ

দেব + ঋষি = দেবর্ষি

সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি

আ + ঋ = অর্

মহা + ঋষি = মহর্ষি

রাজা + ঋষি = রাজর্ষি

৫. অ–কার কিংবা আ–কারের পর এ–কার কিংবা ঐ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ–কার হয় এবং ঐ–কার পূর্ববর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়।

অ + এ = ঐ
হিত + এষী = হিতৈষী
জন + এক = জনৈক
আ + এ = ঐ
তথা + এব = তথৈব
সদা + এব = সদৈব
অ + ঐ = ঐ
মত + ঐক্য = মতৈক্য
ধন + ঐশ্বর্য = ধনৈশ্বর্য
রূপ + ঐশ্বর্য = রূপৈশ্বর্য
আ + ঐ = ঐ
মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য

৬. অ–কার কিংবা আ–কারের পর ও–কার কিংবা ঔ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ–কার হয়। ঔ–কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ+ ও = ঔ
বন+ ওষধি = বনৌষধি
কণ্ঠ + ওষধি = কণ্ঠৌষধি
অ + ঔ= ঔ
পরম + ঔষধ = পরমৌষধ
চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য
আ + ঔ = ঔ
মহা + ঔষধ = মহৌষধ
মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

৭. ই–কার অথবা ঈ–কারের পর ই–কার কিংবা ঈ–কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ–কার হয়। দীর্ঘ ঈ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ই + ই = ঈ
গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র
অতি + ইত = অতীত
যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র
অতি + ইব = অতীব
ই + ঈ = ঈ
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ
অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর
পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
ঈ + ই = ঈ
মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র
সতী + ইন্দ্র = সতীন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ

পৃথ্বী + ঈশ = পৃথ্বীশ

৮. ই–কার কিংবা ঈ–কারের পর ই ও ঈ ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই বা ঈ–কার স্থানে ‘য’ হয়। য–ফলারূপে ‘য্’ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই+অ = য্ + অ

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত

অতি+অন্ত = অত্যন্ত

অতি + অধিক = অত্যধিক

প্রতি + অহ = প্রত্যহ

ই + আ = য্ + আ

ইতি + আদি = ইত্যাদি

অতি + আচার = অত্যাচার

প্রতি + আশা = প্রত্যাশা

ই + উ = য্ + উ

অতি + উচ্চ =অত্যুচ্চ

অতি + উক্তি = অত্যুক্তি

প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার

ই + ঊ = য্ + ঊ

প্রতি +ঊষ = প্রত্যূষ

ঈ + অ = য্ + আ

নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

ঈ + আ = য্ + আ

মসী + আধার = মস্যাধার

ই + এ = য্ + এ

প্রতি + এক = প্রত্যেক

৯. উ–কার অথবা ঊ–কারের পর ঊ–কার কিংবা উ–কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ–কার হয়। ঊ–কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ

সু + উক্ত = সূক্ত

অনু + উদিত = অনূদিত

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান

কটু + উক্তি = কটূক্তি

উ + ঊ = ঊ

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি

তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব

তরু + ঊর্ধ্ব = তরূর্ধ্ব

ঊ + উ = ঊ

বধূ + উক্তি = বধূক্তি

বধূ + উৎসব = বধূৎসব

ঊ + ঊ = ঊ

ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব
সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি

১০. উ-কার অথবা ঊ-কারের পর উ-কার। ঊ-কার ছাড়া অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয়। ব-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়।

উ + অ = ব্ + অ
অনু + অয় = অন্বয়
মনু + অন্তর = মন্বন্তর
সু + অল্প = স্বল্প
উ + আ = ব্ + আ
সু + আগত = স্বাগত
পশু + আচার = পশ্বাচার
উ + ই = ব + ই
অনু + ইত = অন্বিত
উ + ঈ = ব + ঈ
অনু + ঈক্ষা = অন্বীক্ষা
তনু + ঈ = তন্বী
উ + এ = ব + এ
অনু + এষণ = অন্বেষণ

১১. ঋ-কারের পর ঋ ছাড়া অন্য স্বর থাকলে ঋ-কার স্থানে র-ফলা হয়। র-ফলা পূর্ববর্তী ধ্বনিতে যুক্ত হয়।

ঋ + অ = র
পিতৃ + অর্থে = পিত্রর্থে
পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি
ঋ + আ = র
পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ

বিশেষ স্বরসন্ধি

অ-বর্ণের পর কাতর অর্থে ঋত শব্দের ঋ থাকলে ঋ স্থানে 'আর্' হয়ে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়।

শীত + ঋত = শীতার্ত
তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
দুঃখ + ঋত = দুঃখার্ত

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

কোন নিয়ম অনুসারে সন্ধি না হয়ে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির যখন পরিবর্তন ঘটে তখন সেইরূপ সন্ধিকে নিপাতন-সিদ্ধ সন্ধি বলে।

কুল + অটা = কুলটা
শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
স্ব + ঈর = স্বৈর
সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত
স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী

বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ
অক্ষ + উহিণী = অক্ষৌহিণী
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড

স্বরের অন্তঃসন্ধি

১. শব্দের মধ্যে এ–কারের পর স্বরধ্বনি থাকলে এ–কারের স্থানে 'অয়' হয়।
এ + অ = অয়
নে + অন = নয়ন
বে + অন = বয়ন
এ + আ = আ
শে + আন = শয়ান

২. ঐ–কারের পর স্বরধ্বনি থাকলে ঐ–কার স্থানে 'আয়' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।
ঐ + অ = আয়
নৈ + অক = নায়ক
গৈ + অক = গায়ক

৩. শব্দের মধ্যে ও–কারের পরে স্বরধ্বনি থাকলে ও–কারের স্থানে 'অব' হয় এবং পরের স্বর এতে যুক্ত হয়।
ও + অ = অব
পো + অন = পবন
ভো + অন = ভবন
লো + অন = লবণ

৪. শব্দের মধ্যে ঔ–কারের পর স্বরধ্বনি থাকলে ঔ–কার স্থানে 'আব' হয়।
ঔ + অ = আব
পৌ + অক = পাবক
নৌ + ইক = নাবিক
ভৌ + উক = ভাবুক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন। আপনার উত্তরের সঙ্গে না মিললে পাঠটি আবার পড়ুন এবং নির্দেশমতো কাজ করুন। একইভাবে অন্যান্য পাঠের উত্তরগুলো মিলিয়ে নেবেন।

১. একই শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয়, তাকে বলে–
ক) ব্যঞ্জনসন্ধি
খ) অন্তঃসন্ধি
গ) স্বরসন্ধি
ঘ) বহিঃসন্ধি

২. বাংলা সন্ধি কত প্রকার ?
ক) তিন প্রকার
খ) পাঁচ প্রকার
গ) দুই প্রকার
ঘ) চার প্রকার

৩. বিভিন্ন শব্দের মধ্যে যে সন্ধি নিষ্পন্ন হয় তাকে বলে ––
ক) বহিঃসন্ধি
খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
গ) অন্তঃসন্ধি
ঘ) স্বরসন্ধি

৪. ‘শীতার্ত ’ শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় –

ক) শীত + আর্ত
খ) শীত + ঋত
গ) শীত + আত
ঘ) শীত + রীত

৫. শব্দের মধ্যে ঔ–কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ–কার স্থানে হয় –

ক) আব
খ) অব
গ) অর
ঘ) আর

৬. বহিঃসন্ধি চিহ্নিত করুন :

ক) নে + অন
খ) বে + অন
গ) সূর্য + অস্ত
ঘ) পৌ + অক

৭. সন্ধি করুন :

ক) মনু + অন্তর
খ) প্র + ঊঢ়
গ) অনু + এষণ
ঘ) বধূ + উৎসব
ঙ) আদি + অন্ত
চ) অতি + অন্ত
ছ) মরু + উদ্যান
জ) পিতৃ + আলয়
ঝ) নৈ + অক
ঞ) শীত + ঋত

৮. সন্ধিবিচ্ছেদ করুন :

ক) দুঃখার্ত
খ) কটূক্তি
গ) লঘূর্মি
ঘ) গায়ক
ঙ) তৃষ্ণার্ত
চ) গবাক্ষ
ছ) সূক্ত
জ) অত্যধিক
ঝ) প্রত্যহ
ঞ) মাত্রাদেশ

উত্তর

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. গ

৭. মন্বন্তর, প্রৌঢ়, অন্বেষণ, বধূৎসব, আদ্যন্ত, অত্যন্ত, মরূদ্যান, পিত্রালয়, নায়ক, শীতার্ত

৮. দুঃখ + ঋত , কটু + উক্তি, লঘু + ঊর্মি, গৈ + অক, তৃষ্ণা + ঋত, গো + অক্ষ, সু + উক্ত , অতি + অধিক , প্রতি + অহ , মাতৃ + আদেশ

পাঠ ৩.৫ : ব্যঞ্জন সন্ধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ব্যঞ্জনসন্ধির সংজ্ঞার্থ ও নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনসন্ধি ও স্বরসন্ধির পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত শব্দগুলো সন্ধিবিচ্ছেদ ও সন্ধি করতে পারবেন।

স্বরধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে ব্যঞ্জনধ্বনির সহযোগে কিংবা তাদের একের লোপে অথবা ধ্বনি দুটির পারস্পরিক প্রভাবে ধ্বনির যে পরিবর্তন তার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরসন্ধির ক্ষেত্রে স্বরধ্বনির সঙ্গে যেমন স্বরধ্বনির সন্ধি হতে হয়, ব্যঞ্জনসন্ধির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সাধারণত তিন উপায়ে নিস্পন্ন হয়।

১. ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনির মিশ্রণে
২. ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে
৩. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মিশ্রণে

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের অথবা ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

১. স্বরবর্ণ , বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য, র, ল, ব, হ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

ক + ঈ = গ
বাক + ঈশ = বাগীশ
ক + এ = গ
ঋক + বেদ = ঋগ্বেদ
দিক + দর্শন = দিগ্দর্শন
ট + দ = ড়
ষট + দর্শন = ষড়ুদর্শন
ষট + আনন = ষড়ানন
ষট + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র

২. আনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

ত + ন = ন
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
ত + ম = ন
চিৎ + ময় = চিন্ময়
মৃৎ+ ময়ী = মৃন্ময়ী
ক + ম = ঙ
বাক্ +ময় = বাঙ্ময়
দিক + মণ্ডল = দিঙ্মণ্ডল
ট + ন = ণ
ষট্ + নবতি = ষণ্নবতি

৩. চ কিংবা ছ পরে থাকলে ত্ এবং দ স্থানে চ হয়।

উৎ + চারণ = উচ্চারণ
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

৪. জ কিংবা ঝ পরে থাকলে ত ও দ স্থানে জ হয় ।

ত্ + জ = জ
সৎ + জন = সজ্জন
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক
জগৎ + জ্যোতি = জগজ্জ্যোতি
ত্ + ঝ = জ
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা
দ + জ = জ
তদ + জাতীয় = তজ্জাতীয়

৫. ল পরে থাকলে ত ও দ স্থানে ল হয়।
ত্ + ল = ল
উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
উৎ + লাস = উল্লাস
উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন

৬. শ পরে থাকলে ত ও দ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয় । অর্থাৎ উভয়ে মিলে চ্ছ হয়।
ত্ + শ = চ
উৎ+ শ্বাস = উচ্ছ্বাস
উৎ+ শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল

৭. হ পরে থাকলে ত স্থানে দ এবং হ স্থানে ধ হয় এবং উভয়ে মিলে দ্ধ হয়।
ত্ + হ = দ
উৎ + হার= উদ্ধার
উৎ + হত = উদ্ধত
তৎ + হিত = তদ্ধিত

৮. ড, ঢ পরে থাকলে ত এবং দ স্থানে ড হয়।
ত্ + ড = ড
উৎ + ডীন = উড্ডীন
ত্ + ঢ = ড
বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহড্ঢক্কা

৯. স্বরবর্ণের পরে ছ থাকলে ছ স্থানে চ্ছ হয়।
ই + ছ = চ্ছ
পরি + ছদ = পরিচ্ছদ
উ + ছ = চ্ছ
তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া
আ + ছাদন = আচ্ছাদন

১০. পরে ক, প, স ধ্বনি থাকলে দ বা ধ স্থানে ৎ হয়।
দ্ + ক = ৎ
তদ + কাল = তৎকাল
হৃদ + কম্প = হৃৎকম্প
দ্ + প = ৎ
হৃদ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড
তদ + পর = তৎপর
দ্ + স = ৎ
তদ +সম = তৎসম
হৃদ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন
ধ্ + ক = ৎ
ক্ষুধ + কাতর = ক্ষুৎকাতর

ধ্ + প = ৎ
ক্ষুধ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা

১১. ন পরে থাকলে চ ও জ বর্ণের স্থানে ঞ হয়।

চ্ + ন = ঞ
যাচ্ + না = যাচ্ঞা
জ্ + ন = জ্ঞ
যজ্ + ন = যজ্ঞ
রাজ্ + নী = রাজ্ঞী

১২. ম আগে থাকলে এবং ক, খ, গ, ঘ পরে থাকলে ম স্থানে অনুস্বার (ং) বা উয়ো (ঙ) হয়।

ম্ + ক = ং
অহম্ + কার = অহংকার
সম্ +কীর্ণ = সংকীর্ণ
সম্ +খ্যা = সংখ্যা
ম্ +গ = ং
সম্ +গীত = সংগীত
সম্ + গত = সংগীত
ম্ + ঘ = ং
সম্ + ঘ = সংঘ
সম্ + ঘাত = সংঘাত

১৩. চ থেকে ম পর্যন্ত যে কোন ধ্বনি পরে থাকলে পূর্বপদের ম স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয়।

ম্ + চ = ঞ
সম্ + চয় = সঞ্চয়
ম্ + জ = ঞ
সম্ + জাত = সঞ্জাত
ম্ + ত = ন
গম্ +তব্য = গন্তব্য
ম্ + ধ = ন
সম্ + ধান = সন্ধান
ম্ + ন = ন্ন
কিম্ + নর = কিন্নর
ম্ + প = ম্প
সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ
ম্ + ব = ম্ব
সম্ + বোধন = সম্বোধন
ম্ + ম = ম্ম
সম্ + মান = সম্মান

১৪. পরে য/র/ল/ব থাকলে পূর্বের ম স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

সম্ + যত = সংযত
সম্ + রাগ = সংরাগ
সম্ + লাপ = সংলাপ
সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা

১৫. পরে শ/স/হ থাকলে পূর্বের ম স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।
সম্ +শোধন = সংশোধন
সম্ + সার = সংসার
সম্ + হার = সংহার

১৬. পরপদের প্রথমে যদি স্বরধ্বনি থাকে তবে পূর্বপদের অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির বিসর্গ (ঃ) র্ হয়ে যায়।
ইঃ + অ = র্
নিঃ + অন্ন = নিরন্ন
ইঃ + আ = রা
নিঃ + আকার = নিরাকার
ইঃ + ই = জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র
উঃ + অ = র
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা
উঃ + আ = রা
দুঃ +আত্মা = দুরাত্মা
দুঃ + আশা = দুরাশা

১৭. পরপদে র থাকলে পূর্বপদের বিসর্গযুক্ত ই উ দীর্ঘ–ঈ অথবা দীর্ঘ–ঊ-তে রূপান্তরিত হয়।
ইঃ + র = ঈ
নিঃ + রব = নীরব
নিঃ + রস = নীরস

১৮. ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম বর্ণ কিংবা য, র, ল, হ পরে থাকলে পূর্বপদের র–জাত বিসর্গ রেফ (́) – এ রূপান্তরিত হয়।
অন্তঃ + গত = অন্তর্গত
দুঃ + গত = দুর্গত
দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা
নিঃ + ঘাত = নির্ঘাত
দুঃ + জন = দুর্জন
নিঃ + মান = নির্মাণ
নিঃ + যাতন = নির্যাতন

১৯. চ, ছ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে শ্ হয়।
নিঃ + চয় = নিশ্চয়
শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

২০. ট, ঠ পরে থাকলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়।
চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

২১. ত থাকলে পূর্বপদের বিসর্গ স্থানে স হয়।
ইতঃ + তত = ইতস্তত
মনঃ +তাপ = মনস্তাপ

২২. ক, খ, প, ফ পরে থাকলে ই বা উ–জাত বিসর্গ স্থানে ষ হয়।
আবিঃ + কার = আবিষ্কার
দুঃ +কৃতি = দুষ্কৃতি
চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
তিরঃ + কার = তিরস্কার
নিঃ + পত্তি = নিষ্পত্তি

নিঃ + ফল = নিষ্ফল

২৩. ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম বর্ণ কিংবা য, র, ল অথবা হ পরে থাকলে বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে ও হয়। ও পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অধঃ + গতি = অধোগতি
সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
তিরঃ + ধান = তিরোধান
মনঃ + নয়ন = মনোনয়ন
অধঃ + বদন = অধোবদন
অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়
ইতঃ + মধ্যে = ইতোমধ্যে
মনঃ + যোগ = মনোযোগ
মনঃ + রম = মনোরম
যশঃ + লাভ = যশোলাভ
পুরঃ + হিত = পুরোহিত
ততঃ + অধিক = ততোধিক

নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ অর্থাৎ নিপাতনে সিদ্ধ :

গো + য = গব্য, নৌ + য = নাব্য, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি, তৎ + কর = তস্কর, গো + পদ = গোষ্পদ
পর + পর = পরাপর, পরি + কার = পরিষ্কার, এক + দশ = একাদশ, ষট + দশ = ষোড়শ

খাঁটি বাংলা শব্দে সন্ধি হয় না। তবে নিম্নলিখিত শব্দগুলো বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ –

কাঁদ্ + না = কান্না
রাঁধ + না = রান্না
পাট + কাটি = পাটকাটি
না + হই = নহি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।

১। ব্যঞ্জনসন্ধির সংজ্ঞা দিন।

২। বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি ও স্বরসন্ধির পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩। আনুনাসিক বর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে কোন বর্ণ হবে ?

ক) ৩য় খ) ১ম
গ) ২য় ঘ) ৫ম

৪। সন্ধি করুন:

সৎ + জন
বিপদ + জনক
উৎ + চারণ
বাক্ + ময়
দিক + মণ্ডল

পাঠ ৩.৬ : বাংলা উচ্চারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা ব্যাঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কতিপয় শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারবেন।

উচ্চারণ একটি বাচনিক প্রক্রিয়া। মান্য বা প্রমিত উচ্চারণ বলতে সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত আঞ্চলিকতামুক্ত উচ্চারণকে বুঝায়। মান্য উচ্চারণ সবসময় বানানকে অনুসরণ করে না। প্রায়ই তা অর্থকেও অনুসরণ করে না। মান্য উচ্চারণে ধ্বনিতাত্ত্বিক কারণটিই প্রধান। 'অনন্ত' শব্দের বানান অনুযায়ী উচ্চারণ হওয়া উচিত অনন্ত। কিন্তু আমরা মান্য উচ্চারণ করি –'অনোন্‌তো। এর কারণটি ধ্বনিতাত্ত্বিক। প্রথম সিলেবল বা অক্ষরে ঝোঁক পড়ার জন্য দ্বিতীয় অক্ষরের নিহিত অ ধ্বনি ও ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

আবৃত্তিতে, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ভাষণে কিংবা নাটকের সংলাপে এক ধরনের পরিশীলিত উচ্চারণ দেখা যায়। এই পরিশীলিত উচ্চারণকে বলা যায় ফরমাল বা আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ। এই আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ প্রমিত বা মান্য উচ্চারণ থেকে আলাদা।

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা

বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। ভাষার মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করা।
২। ভাষার অর্থ ও বোধগম্যতা রক্ষা করা।
৩। ভাষার যথার্থ মনোভাব প্রকাশ করা এবং অর্থের বিকৃতি থেকে রক্ষা করা।
৪। আঞ্চলিকতা থেকে ভাষাকে রক্ষা করা।
৫। শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে ভাষাকে মানসম্মত করা।

বাংলা উচ্চারণরীতি

স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিধি

'অ'-এর উচ্চারণ

অ কখনো 'অ' হিসেবে উচ্চারিত হয়, কখনো 'ও' হিসেবে উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় অ-ধ্বনির উচ্চারিত রূপ দুটি। যথা:

১। **আংশিক বিবৃত বা অর্ধ-বিবৃত অ-ধ্বনি :** আংশিক বিবৃত অ-ধ্বনির উচ্চারণ মূল বর্ণ 'অ'-এর উচ্চারণের অনুরূপ। যেমন : মত (মতো), যত (যতো), গত (গতো), কত (কতো) প্রভৃতি শব্দের প্রথম বর্ণ অবিকৃত–অ।

২। **'ও'-বিবৃত অ-স্বরধ্বনি :** এক্ষেত্রে 'অ' স্বরচিহ্নটি অনেকটা 'ও'-স্বরধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : সদ্য (সোদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), মধ্য (মোদ্‌ধো) দধি (দোধি), গদি (গোদি), করুণ (কোরুন) যদি (যোদি), নদী (নোদী), অতি (ওতি), প্রতি (প্রোতি) ইত্যাদি। এখানে অ-এর উচ্চারণ অনেকটা ও-এর মতো হয়েছে।

শব্দের আদ্যস্থ বা প্রথমের অ/অ-কার-এর উচ্চারণবিধি

১। শব্দের বানানে প্রথমে অ থাকলে কিংবা অন্য কোনো আদ্যবর্ণের সাথে অ-কার হিসেবে যুক্ত থাকলে এবং তারপরে ই/ঈ, উ/ঊ থাকলে অ কিংবা অ-কার এর উচ্চারণ সাধারণত ও কিংবা ও–কার এর মতো হয়। যেমন :

ক) অ + ই > ওই : উদাহরণ –অভিমান (ওভিমান), পথিক (পোথিক), অতীত (ওতিত), ক্ষতি (ক্ষোতি), অধিকার (ওধিকার), অতিরিক্ত (ওতিরিক্‌তো), পতি (পোতি), রশি (রোশি), ঘড়ি (ঘোড়ি), সতী (সোতি), বধির (বোধির), নতি (নোতি), মসি (মোসি), মন্দির (মোন্দির)

খ) অ + ঈ > ওই : উদাহরণ–অধীন (ওধিন্), গভীর (গোভির্), প্রবীণ (প্রোবিন্), নবীন (নোবিন), শশী (শোশি) রথী (রোথি), শরীর (শোরির্), ননী (নোনি), ধনী (ধোনি), অতীত (ওতিত্), নদী (নোদি), মনীষা (মোনিশা), প্রবীর (প্রোবির্)
গ) অ + উ > ওউ : উদাহরণ –অনু (ওনু), অনুদান (ওনুদান্), বউ (বোউ), সরু (সোরু), গরু (গোরু), তরু (তোরু), কদু (কোদু), যদু (যোদু), অনুকূল (ওনুকূল্), বকুল (বোকুল্), করুণ (কোরুন্), তোরুণ (তোরুন্), মধু (মোধু), মরু (মোরু)

ঘ) অ + ঊ > ওঊ : উদাহরণ––বধূ (বোধূ) অনূদিত (ওনুদিতো), ময়ূর (মোয়ুর্), মসুর (মোশুর্), কর্পূর (কোরপুর্), ময়ূখ (মোয়ুখ্)

২। বানানে অ কিংবা অ-কার যুক্ত বর্ণের পর য–ফলা (্য) থাকলে উচ্চারণ ও কিংবা ও–কারের মতো হয়।
অ + য ফলা > ও : অন্য (ওন্‌নো), অত্যধিক (ওত্‌তোধিক্), সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), কন্যা (কোন্‌না), বন্যা (বোন্‌না), বন্য (বোন্‌নো), অদ্য (ওদ্‌দো), কল্যাণ (কোল্‌লান্), কথ্য (কোত্‌থো), সত্য (সোত্‌তো), শয্যা (শোজ্‌জা), ধন্য (ধোন্‌নো), পণ্য (পোন্‌নো), মধ্য (মোদ্‌ধো), সদ্য (শোদ্‌দো), সখ্য (শোক্‌খো), তথ্য (তোত্‌থো)

৩। অ কিংবা অ-কারের পর ক্ষ কিংবা জ্ঞ থাকলে অ বা অ-কারের উচ্চারণ ও–এর মতো হবে।
ক) অ + ক্ষ> ও : সক্ষম (সক্‌খোম্), অক্ষম (অক্‌খোম), দক্ষ (দোক্‌খো), কক্ষ (কোক্‌খো), বক্ষ (বোক্‌খো), পক্ষ (পোক্‌খো), রক্ষা (রোক্‌খা), যক্ষ (যোক্‌খো)
খ) অ + জ্ঞ > ও : যজ্ঞ (জোগ্‌গো)

৪। অ –এর পর ঋ কিংবা ঋ–কার যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে অ–এর উচ্চারণ ও–এর মতো হয়।
মসৃণ (মোসসৃন্), মাতৃত্ব (মাতৃত্‌তো), বক্তৃতা (বোক্‌তৃতা), কর্তৃকারক (কোরতৃকারোক্)

৫। শব্দের প্রথমে অ–যুক্ত র–ফলা থাকলে অ–এর উচ্চারণ সাধারণত ও-এর মতো হয়।
প্রভাত (প্রোভাত্) গ্রহ (গ্রোহ), প্রখর (প্রোখর্), শ্রম (শ্রোম), ভ্রম (ভ্রোম্), প্রথম (প্রোথোম্), প্রকৃত (প্রোকৃত), গ্রন্থ (গ্রোন্‌থো), প্রকাশ (প্রোকাশ্), শ্রবণ (স্রোবোন্)

শব্দমধ্যস্থ অ/অ-কার –এর উচ্চারণবিধি

১। শব্দের মধ্যে অ কিংবা অ-কার ই/ঈ, উ/ঊ-কার এবং ক্ষ,জ্ঞ, য-ফলার পূর্বে থাকলে অ-এর উচ্চারণ ও-এর মতো হয়।
অবনতি (অবোনোতি), জননী (জনোনি), শতমূল (শতোমূল্), সমভূমি (শমোভূমি), সুমতি (শুমোতি), অদক্ষ (অদোক্‌খো), ধরণি (ধরোনি), অসত্য (অশোত্‌তো)

২। শব্দের মধ্যকার অ-এর পূর্বে অ, আ, এ কিংবা ও-কার থাকলে অ-এর উচ্চারণ ও হয়।
উদাহরণ : ছাগল (ছাগোল্), কাজল (কাজোল্), পাগল (পাগোল্), বলদ (বলোদ্), বেতন (বেতোন্), তখন (তখোন্), কাগজ (কাগোজ), দশক (দশোক), নাগর (নাগোর), সাগর (শাগোর), সমন (শমোন), জনম (জনোম), কোমল (কোমোল)

৩। বাংলা ভাষায় কিছু তৎসম শব্দ আছে যেগুলো পৃথক অবস্থায় হসন্ত উচ্চারণ হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য-অ ও–কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়। 'বন' যখন স্বতন্ত্র অবস্থায় উচ্চারিত হয় তখন উচ্চারণ বন কিন্তু 'বনবাসী' শব্দের উচ্চারণ বনোবাশি। আরও দৃষ্টান্ত : দীনবন্ধু (দীনোবোন্‌ধু), গীতগোবিন্দ (গিতোগোবিন্‌দো), মেঘমালা (মেঘোমালা), করতল (করোতল), মদমত্ত (মদোমত্‌তো), রসমালাই (রশোমালাই), ফুলবন (ফুলোবন)
তবে কিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দে উপর্যুক্ত নিয়ম মানা হচ্ছে না। শব্দের মধ্যস্থ অ–এর উচ্চারণে হসন্ত উচ্চারণ করা হচ্ছে।
যেমন : রাজপুত্র (উচ্চারণ–রাজোপুত্রো নয়, রাজপুত্‌ত্রো), লোকনাথ (উচ্চারণ–লোকোনাথ নয়, লোক্‌নাথ)
এরকম : সংবাদপত্র, রাজমহল, রাজনীতি, লোকসভা প্রভৃতি।

শব্দের অন্ত্য অ/অ-কার–এর উচ্চারণবিধি

১।। বাংলা ভাষায় শব্দান্তের অ–ধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে মিশে যায় বলে সাধারণত হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়।
উদাহরণঃ আম্, জাম্, হাত্, ধান, বান, পাঠ, পাট, ইট, মাছ্, দিবস্, পাত্, সাত্, রাত্, ঘাট্, মাঠ, ঋণ্, দিন্, খড়্, চর্,

২। আন –(আনো) –প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে অবস্থিত অ-এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়।
উদাহরণ : বলান (বলানো), করান (করানো), দেখান (দেখানো), শেখান (শেখানো), চালান (চালানো)।
তবে অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে উচ্চারণ হসন্তবাচক হবে। যেমনঃ আমাকে ছবিটি দেখান্। রাস্তা থেকে গাছটি সরান্।

৩। ত অথবা ইত প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য অ-উচ্চারণে ও–কারান্ত হয়ে থাকে।
যেমনঃ গত (গতো), নত (নতো), পালিত (পালিতো), বঞ্চিত (বোন্‌চিতো), মৃত (মৃতো), গঠিত (গোঠিতো), জ্ঞাত (গ্যাঁতো), পঠিত (পোঠিতো), গীত (গিতো)
কিন্তু এরূপ শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলে অন্ত্য অ-কারের লোপ পায়। যেমনঃ গীত (গিত্), সংগীত (শোংগিত্), পণ্ডিত (পোন্‌ডিত্)

৪। কিছু দ্বিরুক্ত শব্দের অন্তিম-অ সাধারণত ও-কারান্তরূপে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণঃ বড়বড় (বড়োবড়ো), ঘনঘন (ঘনো-ঘনো)

৫। শব্দের হ এবং ঢ় বর্ণের অন্ত্য–অ সাধারণত ও-কারান্তরূপে উচ্চারিত হয়।
যেমনঃ বিরহ (বিরহো), কলহ (কলোহো), বিবাহ (বিবাহো), গাঢ় (গাঢ়ো), দৃঢ় (দৃঢ়ো), দ্রোহ (দ্রোহো), মূঢ় (মুঢ়ো)

৬। ই-কার এবং এ-কারের পর য় থাকলে তা ও–কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমনঃ বিধেয় (বিধেয়ো), অজেয় (অজেয়ো), অনুমেয় (ওনুমেয়ো), তুলনীয় (তুলোনিয়ো), পালনীয় (পালোনিয়ো), বায়বীয় (বায়োবিয়ো), শারদীয় (শারোদিয়ো)

৭। শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে অ–ধ্বনির উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। উদাহরণ : রক্ত (রক্‌তো), পদ্য (পোদ্‌দো), ধর্ম (ধর্‌মো), কর্ম (কর্‌মো), অনুরক্ত (অনুরক্‌তো), চিহ্ন (চিন্‌হো), অনন্ত (অনোন্‌তো), প্রাজ্ঞ (প্রাগ্‌গোঁ), শান্ত (শান্‌তো)

৮। তর (তরো), তম (তমো) প্রত্যয়যুক্ত পদের শেষে অ–এর উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়। উদাহরণঃ উচ্চতম (উচ্‌চোতমো), ভিন্নতর (ভিন্‌নোতরো), অধিকতম (ওধিকোতমো), গুরুতর (গুরুতরো), অন্যতর (ওন্‌নোতরো)

৯। শব্দের অন্ত্য অ–এর আগে ঐ, ঔ, ং, ঃ, ঋ-কার থাকলে অন্ত্য অ-কার ও-কার রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণঃ হংস (হংশো), বৈধ (বোইধো), সৌর (শোউরো), ধৌত (ধোউতো), তৃণ (ত্রিনো), দৈব (দোইবো), মৃগ (মৃগো) বিংশ (বিংশো)

আ, ই, ঈ, উ, ঊ স্বরচিহ্নের উচ্চারণবিধি

১। একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের আ/ আ-কারের উচ্চারণ কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমনঃ আম (আ-ম), দাম (দা-ম), সাধ (সা–ধ), জাম (জা–ম), কাল (কা-ল), বান (বা–ন), মান (মা–ন), থান (থা–ন), পান (পা–ন), বাগ (বা–গ)

২। সাধারণত একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দের স্বরবর্ণ কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। উদাহরণঃ দিন, বীণ, ফুল, ধূপ। কিন্তু দিনে, বীণা, ফুলে, ধূপে ইত্যাদি শব্দের ই, ঈ, উ, ঊ-কারের উচ্চারণ হ্রস্ব।

৩। বাংলা বানানের হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্যের জন্য উচ্চারণে হ্রস্বতা-দীর্ঘতার পার্থক্য অনুসরণ করা হয় না। উদাহরণ মধু/ বধূ, নদী/ যদি

এ-এর উচ্চারণ

১। শব্দের আদিতে স্থিত এ-র পরে ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, য়, র, ল, শ, হ থাকলে ‘এ’ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণঃ একি, একীভূত, একুশ, একূল, মেয়ে, ভেতো, জেলা, এশা, কেহ। ব্যতিক্রম–দেওর (দ্যাওর), শেওড়া (শ্যাওড়া)
২। শব্দের আদ্য এ–কারের পরে যদি ং, ঙ, ঙ্গ থাকে এবং তারপরে ই, ঈ, উ, ঊ না থাকে তবে এ-কার এ্যা–কার রূপে উচ্চারিত হয়। উদাহরণঃ নেংটা (ন্যাংটা), বেঙ (ব্যাঙ)
৩। বাংলায় তৎসম শব্দের আদ্য এ-কার অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। উদাহরণঃ প্রেম (প্রেম), কেন্দ্র (কেন্দ্র)

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

উচ্চারণের দিক থেকে ঙ এবং ং-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। যেমন –রঙ/রং, ব্যাঙ/ব্যাং

ঞ, ঞ্জ, জ্ঞ–এর উচ্চারণ

১। ঞ-বর্ণটি চ বর্গের চারটি বর্ণ চ, ছ, জ, ঝ–এর পূর্বে যুক্তাবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং বাংলায় দন্ত্য ন-এর মতো উচ্চারিত হয়। উদাহরণ – মঞ্চ (মন্‌চো), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন), বাঞ্ছিত (বান্‌ছিতো), লাঞ্ছিত (লান্‌ছিতো), পঞ্চ (পন্‌চো), খঞ্জনা (খন্‌জোনা), সঞ্চয় (শন্‌চয়), রঞ্জন (রন্‌জোন)

২। জ্ঞ–এই যুক্ত ব্যঞ্জনে জ এবং ঞ বর্ণ দুটির কোনটিরই উচ্চারণ নেই, তবে বাংলায় জ্ঞ–এর উচ্চারণ শব্দের আদিতে গঁ, গ্যঁ এবং শব্দের মধ্যে এবং অন্তে গগঁ –এর মতো। যেমনঃ জ্ঞান (গ্যাঁন্‌), অজ্ঞ (অগ্‌গোঁ), বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন্‌), বিজ্ঞপ্তি (বিগ্‌গোঁপ্‌তি)

ণ, ন–এর উচ্চারণ

লিখিত রূপ ভিন্ন হলেও বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য–ণ উচ্চারণ দন্ত্য–ন হতে অভিন্ন। তবে উচ্চারণ একই হলেও দন্ত্য–ন এবং মূর্ধন্য–ণ -এর ব্যবহারে পদের অর্থের পরিবর্তন হয়। যেমনঃ পানি (জল), পাণি (হাত)। সেরকম–মন/মণ, গন/গণ

ড়, ঢ়–এর উচ্চারণ

উচ্চারণের দিক থেকে ড়, ঢ়–এর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুচাপের স্বল্পতা ও আধিক্যের দিক থেকে। এতে করে 'ঢ়' এর উদাহরণের অন্তে মহাপ্রাণ 'হ'-এর রেশ থাকে। তবে উচ্চারণভেদে অর্থেরও পার্থক্য ঘটে। যেমন– গাঢ়-গাড়, পড়া-পরা, ভাড়া-ভারা।

য, জ-এর উচ্চারণ

উচ্চারণের দিক থেকে য ও জ-এর মধ্যে কেবল 'জ'-এর উচ্চারণ সংরক্ষিত হবে। উদাহরণঃ যতন (জতোন), জনতা (জনোতা), যম (জম), জগৎ (জগোত্‌)

বর্গীয়-ব, অন্তঃস্থ-ব

উচ্চারণের দিক থেকে বাংলায় বর্গীয়-ব এবং অন্তস্থ-ব অভিন্ন। সংযুক্ত বর্ণে ব্যঞ্জনের পরে ব–ফলা রূপে সাধারণত অন্তস্থ–ব আসে, যা কেবল পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব–ভাব ঘটায়। উদাহরণ –বিশ্ব (বিশ্‌শো), বিদ্বান (বিদ্‌দান), স্বামী (শামি), স্বত্ব (শত্‌তো)

শ, ষ, স–এর উচ্চারণ

শ, ষ, স– এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ তালব্য শ–এর মতো। যেমন বৈশাখ (বোইশাখ), সুখ (শুখ), বিষ (বিশ)।
ত, থ, ন, র, ল–এর পূর্বে শ ধ্বনিমূল থাকলে তা দন্ত্য স-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন– শ্লাঘা (স্লাঘা)

ঃ ঁ-এর উচ্চারণ

১। শব্দের অন্তে বিসর্গ থাকলে তা উচ্চারিত না হলেও শেষের অ-কারের উচ্চারণ ও-কারের মতো হয়।
উদাহরণ ––প্রায়শ (প্রায়শো), মূলত (মূলতো)

২। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে ঐ বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে দেয়। উদাহরণ–– দুঃখ (দুক্‌খো), দুঃসময় (দুশ্‌শময়)

৩। যে কোনো স্বরধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনায় অনুরণিত করার জন্য চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়।

গাঁদা (গাঁদা), চাঁদ্‌ (চাঁদ)

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

ব-ফলা

১। শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন– ধ্বনি (ধোনি), ত্বক (তক্‌)

২। শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। উদাহরণ– অশ্ব (অশ্‌শো), বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ)

৩। শব্দের মাঝে বা শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে ব–ফলা যুক্ত থাকলে ওই ব–ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন –উজ্জ্বল (উজ্‌জল), তত্ত্ব (তত্‌তো)

৪। ম-এর সাথে ব–ফলা যুক্ত হলে ‘ব’ উচ্চারিত হয়। যেমন–গম্বুজ (গোম্‌বুজ), শম্বুজ (শোম্‌বুজ)

ম-ফলা

১। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনে-যুক্ত ম–ফলা থাকলে তা উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক উচ্চারিত হয়।)যেমন– শ্মশান (শঁশান্‌), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মারক (শাঁরোক্‌), স্মরণ (শঁরোন্‌), শ্মশ্রু (শোঁসস্রু)

২। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম–ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ‘ম’ উচ্চারিত হয় না। ব্যঞ্জনটির উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন – পদ্মা (পদ্‌দাঁ), ছদ্ম (ছদ্‌দোঁ), আত্ম (আত্‌তোঁ), আকস্মিক (আকোশ্‌শিঁক্‌), ভস্ম (ভশ্‌শোঁ), বিস্ময় (বিশ্‌শঁয়), অকস্মাৎ (অকোশ্‌শাত)

৩। গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল বর্ণের সঙ্গে ম–ফলা যুক্ত থাকলে ‘ম’-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।
যেমন– যুগ্ম (জুগ্‌মো), বাগ্মিতা (বাগ্‌মিতা), বাঙ্ময়ী (বাঙ্‌মোয়ি), মৃন্ময় (মৃন্‌ময়), হিরণ্ময় (হিরন্‌ময়)

৪। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত ম–ফলা উচ্চারিত হয় না, তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন– লক্ষ্মী (লোক্‌খি), সূক্ষ্ম (শুক্‌খো), যক্ষ্মা (জক্‌খা), ব্রাহ্মণ (ব্রামমোঁন)

৫। বাংলায় কতিপয় ম–ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে, যাদের ম–ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন– কুষ্মাণ্ড (কুশ্‌মানডো), আয়ুষ্মতী (আয়ুশ্‌মোতি)

য–ফলা

১। শব্দের আদিতে য–ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে এবং ঐ যুক্ত ব্যঞ্জনের পরে অ–কার বা আ-কার থাকলে তা এ্যা-যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন– ব্যথা (ব্যাথা), ব্যবস্থা (ব্যাবোস্‌থা), ব্যর্থ (ব্যার্‌থো), ব্যগ্র (ব্যাগ্‌গ্রো), ন্যস্ত (ন্যাস্‌তো), ব্যক্ত (ব্যাক্‌তো), ব্যাধ (ব্যাধ্‌), ব্যবসা (ব্যাব্‌শা), ব্যাখ্যা (ব্যাক্‌খা), শ্যামল (শ্যামল্‌)

২। শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য–ফলার পরে যদি ই–কার বা ঈ–কার থাকে, তবে য–ফলাযুক্ত বর্ণটি এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন– ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিব্যস্ত (বেতি্‌ব্যাস্‌তো)

৩। শব্দের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য–ফলা থাকলে তা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। উদাহরণঃ বন্ধ্যা (বন্‌ধা), সন্ধ্যা (শোন্‌ধা), সন্ন্যাসী (শোন্‌নাশি), মর্ত্য (মর্‌তো)

৪। শব্দের মধ্য বা অন্ত্য ব্যঞ্জনে য–ফলা যুক্ত হলে সে ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত এবং ও-কারান্ত হয়। যেমন– সদ্য (শোদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), পদ্য (পোদ্‌দো), অদ্য (ওদ্‌দো), সত্য (শোত্‌তো), নব্য (নোব্‌বো), কথ্য (কোত্‌থো), তথ্য (তোত্‌থো), শস্য (শোশ্‌শো), বধ্য (বোদ্‌ধো), শূন্য (শুন্‌নো)

র–ফলা

১। শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র–ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয় কিন্তু উচ্চারণে দ্বিত্ব হয় না।
যেমন–প্রভাব (প্রোভাব্‌), প্রকাশ (প্রোকাশ্‌), প্রথম (প্রোথোম্‌), প্রচণ্ড (প্রোচন্‌ডো), শ্রমিক (শ্রোমিক্‌), ভ্রম (ভ্রোম্‌), প্রচার (প্রোচার্‌), প্রধান (প্রোধান্‌), প্রমত্ত (প্রোমত্‌তো), প্রজন্ম (প্রোজন্‌মো), প্রবীণ (প্রোবিন্‌), প্রতিদান (প্রোতিদান্‌), প্রযুক্তি (প্রোযুক্‌তি)

২। শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে ব–ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়।

যেমন –বিক্রম (বিক্‌ক্রম্), রাত্রি (রাত্‌ত্রি), বিদ্রোহ (বিদ্‌দ্রোহ), নম্র (নম্‌ম্রো), মাত্র (মাত্‌ত্রো), যাত্রী (যাত্‌ত্রি), তীব্র (তিব্‌ব্রো), শূদ্র (শুদ্‌দ্রো), ধাত্রী (ধাত্‌ত্রি)

৩। শব্দের মধ্যে বা অন্তে র–ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণের নিয়ম থাকলেও ঋ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ ঠিক নয়। উদাহরণ–বিকৃত (বিকৃতো)

৪। কিছু কিছু শব্দে ঋ-কারের ক্ষেত্রে দ্বিত্ব ঘটে। যেমন – মসৃণ (মোস্‌সৃন্), অপসৃত (অপোস্‌সৃত), আদৃত (আদ্‌দৃতো), নিকৃষ্ট (নিক্‌কৃষ্ট), অদৃষ্ট (অদদৃশ্‌টো)

৫। সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে র–ফলা থাকলে উচ্চারণ দ্বিত্ব না হলেও 'র-ফলা' চিহ্নের উচ্চারণ লোপ পায় না।
উদাহরণ – অস্ত্র (অস্‌ত্রো), শাস্ত্র (শাস্‌ত্রো), বস্ত্র (বস্‌ত্রো), যন্ত্র (জন্‌ত্রো), কেন্দ্র (কেন্‌দ্রো), রাষ্ট্র (রাশ্‌ট্রো), তান্ত্রিক (তান্‌ত্রিক্), যান্ত্রিক (যান্‌ত্রিক্), রবীন্দ্র (রবিন্‌দ্রো), অন্ধ্র (অন্‌ধ্রো)

ল–ফলা

১। শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন– গ্লানি (গ্লানি), ম্লান (ম্লান), ক্লেশ (ক্লেশ), প্লাবন (প্লাবোন), প্লাস (প্লাস্), ক্লাব (ক্লাব্), প্লুত (প্লুত), প্লীহা (প্লিহা)

২। শব্দের মধ্যে ও শেষে ল-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিতব হয়। যেমন– বিপ্লব (বিপ্‌প্লব) অক্লান্ত (অক্‌ক্লান্‌তো), আপ্লুত (আপপ্লুত), শুক্লা (শুক্‌ক্লা), অম্লান (অম্‌ম্লান্)

ন–ফলা

গ ঘ ণ ত ধ ন প ম শ স হ-এর সঙ্গে দন্ত্য–ন যুক্ত হয়ে যথাক্রমে গ্ন, ঘ্ন ণ্ন ত্ন ন্ন প্ন ম্ন শ্ন হ্ন গঠন করে। হ্ন (হ + ন) যুক্তব্যঞ্জনে দন্ত্য-ন পরে বসলেও হ্ন -এর সঙ্গে দন্ত্য-ন হ-এর পূর্বে উচ্চারিত হয় (চিহ্ন–চিন্‌হোঁ)। অন্যান্য ক্ষেত্রে দন্ত্য-ন-এর উচ্চারণ পরে হয়। যেমন–ভগ্ন (ভগ্‌নো), বিঘ্ন (বিঘ্‌নো), ক্ষুণ্ন (খুন্‌নো), অন্ন (অন্‌নো), স্বপ্ন (স্বপ্‌নো), নিম্ন (নিম্‌নো)

হ-যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ

১। হ ধ্বনির সাথে ঋ–কার, র–ফলা কিংবা রেফ (ˊ) যুক্ত হলে হ-এর উচ্চারণ আগে হয়।
যেমন –হৃদয় (হ্রিদয়), হৃদ্য (হ্রি দদো), হৃৎপিণ্ড (হ্রিত্‌পিনডো), হৃদি (হ্রিদি)

২। হ-এর সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে র আগে উচ্চারিত হয়। যেমন –হ্রাস (হ্রাশ্), হ্রদ (হ্রদ্), হ্রেষা (হ্রেশা), হ্রস্ব (হ্রশ্‌শো)

৩। দন্ত্য–ন এবং মূর্ধন্য–ণ–এর সাথে হ যুক্ত হলে দন্ত্য-ন এবং মূর্ধন্য–ণ আগে উচ্চারিত হয়।
উদাহরণ –চিহ্ন (চিন্‌হো), বহ্নি (বোন্‌হি), পূর্বাহ্ণ (পুরবানহোহো), মধ্যাহ্ন (মোদ্‌ধানহো)

৪। হ-ব্যঞ্জনের সাথে ম-যুক্ত হলে 'মহ' উচ্চারিত হয়। যেমন –ব্রহ্মাণ্ড (ব্রোম্‌হাণ্ড), ব্রাহ্মণ (ব্রাহম্‌হন্)

৫। হ-বর্ণের সঙ্গে য–ফলা যুক্ত হলে হ-ব্যঞ্জনের নিজস্ব উচ্চারণ লোপ পায় এবং য–ফলার উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়।
যেমন– বাহ্য (বাজ্‌ঝো), সহ্য (সজ্‌ঝো), দাহ্য (দাজ্‌ঝো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্‌ঝো), ঊহ্য (ঊজ্‌ঝো)

৬। শব্দের প্রথমে হ-বর্ণের সঙ্গে ল যুক্ত থাকলে ল–এর উচ্চারণ হয়। উদাহরণ –হ্লাদ (লাদ্), হ্লাদিনী (লাদিনি)

৭। শব্দের মধ্যে কিংবা অন্ত্যে হ্ল থাকলে ল-এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন– আহ্লাদ (আল্‌লাদ), আহ্লাদিনী (আল্‌লাদিনি), প্রহ্লাদ (প্রোল্‌লাদ্)

৮। বাংলায় কতিপয় শব্দে হ-এর সাথে 'ব' যুক্ত হওয়ায় ব–এর পরে মহাপ্রাণ 'ভ' আসে।
যেমন–গহ্বর, জিহ্বা, আহ্বান।
তবে 'ব' ধ্বনি 'ও' বা 'উ'-তে পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারিত হয়। যথাক্রমে– গও্‌ভর্, জিউ্‌ভা, আও্‌ভান্

ক্ক, ক্ব

'ক-য়ে ক' যুক্ত হয়ে (ক + ক) = ক্ক এবং 'ক-য়ে ব' যুক্ত হয়ে (ক + ব) = ক্ব হয়। উভয় যুক্তব্যঞ্জনে ক-এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়।

যেমন– বৃক্ক (বৃক্কো), চিক্কণ (চিক্কন), ধাক্কা (ধাক্কা), কুক্কুট (কুক্কুট্)
পরিপক্ব – (পোরিপক্কো)

ক্ষ

'ক-য়ে মূর্ধন্য-ষ' যুক্ত হয়ে (ক + ষ) = ক্ষ। এটিকে বলা হয় 'খিয়ো'। শব্দের মাঝখানে থাকলে খিয়ো (ক + ষ) = কখ–এর মতো উচ্চারিত হয়।

যেমন –রক্ষা (রোক্খা), দক্ষ (দোক্খ), বক্ষ (বোক্খো), কক্ষ (কক্খো) , যক্ষ্মা (যক্খা)
শব্দের শুরুতে থাকলে ক্ষ–এর উচ্চারণ খ–এর মতো হয়। যেমন ––ক্ষমা (খমা), ক্ষতি (খোতি), ক্ষত (খতো)

ষ্ণ

এখানে ষ–এর সাথে ঞ-যুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ষ–এর সঙ্গে ণ –যুক্ত হয়ে (ষ + ণ) = ষ্ণ গঠিত হয়। ণ–এর উচ্চারণ স্বরান্ত হয়।

কৃষ্ণ –(কৃশ্নো), তৃষ্ণা (তৃশ্না), উষ্ণ (উশ্নো)

কতিপয় শব্দের উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অধিক	ওধিক্	অংশ	অঙ্শো
অধিকার	ওধিকার্	অনুকরণ	ওনুকরোন্
অন্যতর	ওন্নোতরো	অদক্ষ	অদোক্খো
অন্যতম	ওন্নোতরো	অনন্য	অনোন্নো
অস্বাভাবিক	অশশাভাবিক্	অভিজাত	ওভিজাতো
অকল্যাণ	অকোল্লান্	অভিনব	ওভিনবো
অভ্যুদয়	ওব্ভুদয়্	অকাট্য	অকাট্টো
অকথ্য	অকোত্থো	অরুণ	ওরুন্
অধিকাংশ	ওধিকাংশো	অধ্যয়ন	ওদ্ধোয়োন্
অভিজ্ঞ	ওভিগ্গোঁ	অত্যাচার	ওত্তাচার্
অভীষ্ট	ওভিষ্টো	অরণ্য	অরোন্নো
আহ্বান	আওভান্	আত্মীয়	আত্তিঁয়ো
আগত	আগতো	আত্তীকরণ	আত্তিকরোন্
আসর	আশোর্	আষাঢ়	আশাঢ়
আশ্বিন	আশ্শিন	আবৃত্তি	আবৃত্তি
আক্কেল	আক্কেল্	আদর্শ	আদোর্শো
ইত্যাদি	ইত্তাদি	ইতিহাস	ইতিহাশ্
ইন্দ্র	ইন্দ্রো	ইহলোক	ইহোলোক্
ঈপ্সিত	ইপ্শিতো	ঈর্ষা	ইর্শা
উক্ত	উক্তো	উচ্চ	উচ্চো
উদ্বিগ্ন	উদ্বিগ্নো	উৎসব	উত্শব্
উদ্যান	উদ্দান্	উদ্যম	উদ্দম্
উদ্যোগ	উদ্দোগ্	উদ্বেগ	উদ্বেগ

উপাত্ত	উপাত্‌তো	উষ্ম	উশ্‌মো
ঊর্মি	উর্‌মি	ঊর্ধ্ব	উর্‌ধো
ঋতু	রিতু	ঋষি	রিশি
একক	একক্‌	এমন	এ্যামোন্‌
ঐক্য	ওইক্‌কো	ঐচ্ছিক	ওইচ্‌ছিক্‌
ঐতিহ্য	ওইতিজ্‌ঝো	ঐতিহাসিক	ওইতিহাশিক্‌
ওজন	ওজোন্‌	ওষ্ঠ	ওশ্‌ঠো
ওজস্বী	ওজোশ্‌শি	ঔদার্য	ওউদার্‌জো
কবি	কোবি	কক্ষ	কোক্‌খো
কথন	কথোন্‌	কমল	কমোল্‌
কন্যা	কোন্‌না	কর্ম	করমো
কপট	কপোট্‌	কথ্য	কোত্‌থো
কাম্য	কাম্‌মো	কার্তিক	কার্‌তিক
কেমন	ক্যামোন্‌	কুঞ্জ	কুন্‌জো
ক্ষণকাল	খনোকাল্‌	ক্ষণিক	খোনিক্‌
ক্ষমতা	খমোতা	খবর	খবোর্‌
খরিদ	খোরিদ্‌	খচিত	খোচিতো
খালাস	খালাশ্‌	খেলা	খ্যালা
গগন	গগোন্‌	গণিত	গোণিত্‌
গরিমা	গোরিমা	গোপন	গোপোন
গ্রহণ	গ্রোহোন্‌	গ্রাহ্য	গ্রাজ্‌ঝো
ঘুষ	ঘুশ্‌	ঘুমন্ত	ঘুমন্‌তো
ঘোষণা	ঘোশোনা	ঘোরতর	ঘোরোতরো
চঞ্চল	চন্‌চল্‌	চক্র	চক্‌ক্রো
চরিত্র	চোরিত্‌ত্রো	চর্মকার	চর্‌মোকার্‌
চলন্ত	চলোন্‌তো	চিত্ত	চিত্‌তো
চিন্তিত	চিন্‌তিতো	চিকিৎসা	চিকিত্‌শা
ছলনা	ছলোনা	ছাত্র	ছাত্‌ত্রো
ছিয়াত্তর	ছিয়াত্‌তোর্‌	ছেষট্টি	ছেশোট্‌টি
জগৎ	জগোত্‌	জটিল	জোটিল
জনক	জনোক্‌	জলধি	জলোধি
জন্তু	জোন্‌তু	জনপ্রিয়	জনোপ্‌প্রিয়ো
ঝলক	ঝলোক্‌	ঝালর	ঝালোর্‌
টহল	টহোল্‌	টগর	টগোর্‌
টোপর	টোপোর্‌	ঠেলা	ঠ্যালা
ডজন	ডজোন্‌	ডাগর	ডাগোর্‌
ডুবন্ত	ডুবন্‌তো	ডেরা	ড্যারা
ঢোলক	ঢোলোক	তখন	তখোন্‌
তটস্থ	তটোস্‌থো	তড়িৎ	তোড়িত্‌
তথ্য	তোত্‌থো	তটিনী	তোটিনি

তনু	তোনু	তর্ক	তর্‌কো
তীব্র	তিবরো	তৈল	তোইলো
থতমত	থতোমতো	থলি	থোলি
দক্ষ	দোক্‌খো	দণ্ড	দন্‌ডো
দশক	দশোক্	দর্শন	দরশোন্
দন্ত	দন্‌তো	দ্বৈত	দোইতো
ধনী	ধোনি	ধর্ম	ধরমো
ধাত্রী	ধাত্‌ত্রি	ধাতব	ধাতোব্
নগণ্য	নগোন্‌নো	নগ্ন	নগ্‌নো
নতুন	নোতুন	নদী	নোদি
নতজানু	নতোজানু	নারীত্ব	নারিত্‌তো
পক্ষ	পোক্‌খো	পদ্য	পোদ্‌পদো
পদ্ম	পদদোঁ	পবন	পবোন্
পশ্চিম	পোশ্‌চিম্	পঞ্জিকা	পোন্‌জিকা
পরিসীমা	পোরিশিমা	পদ্ধতি	পোদ্‌ধোতি
প্রশ্ন	প্রোশ্‌নো	প্রহার	প্রোহার্
প্রাঞ্জল	প্রান্‌জল্	প্রামাণ্য	প্রামান্‌নো
ফটক	ফটোক	ফরিয়াদ	ফোরিয়াদ্
বণিক	বোনিক	বক্র	বক্‌ক্রো
বজ্র	বজ্‌জ্রো	বর্ণ	বরনো
বক্ষ	বোক্‌খো	বন্ধু	বোন্‌ধু
বদল	বদোল্	বসতি	বশোতি
বিজ্ঞাপন	বিগ্‌গাঁপোন	বিন্যাস	বিন্‌ন্যাশ
বিশ্ব	বিশ্‌শো	বৈশাখ	বোইশাখ্
ব্যতীত	বেতিতো	ব্যথিত	বেথিতো
ভক্তি	ভোক্‌তি	ভদ্র	ভাদ্‌দ্রো
ভাবান্তর	ভাবান্‌তর্	ভোগ্য	ভোগ্‌গো
মজুদ	মোজুদ	মধুকর	মোধুকর্
মমতা	মমোতা	মরণ	মরোন্
মঙ্গল	মোঙগোল	মতি	মোতি
মগ্ন	মগ্‌নো	মিশ্র	মিস্‌স্রো
মেলা	ম্যালা	মৌ	মোউ
মৃত্যু	মৃত্‌তু	মুখবন্ধ	মুখোবন্‌ধো
যখন	জখোন্	যজ্ঞ	জোগ্‌গো
যবনিকা	জবোনিকা	যুগান্তর	জুগান্‌তর্
রক্ত	রক্‌তো	রঙিন	রোঙিন
রচিত	রোচিত	রজনী	রজোনি
লালিত্য	লালিত্‌তো	লাভবান	লাভোবান
লাঙল	লাঙোল্	লাবণ্য	লাবোন্‌নো
লেহ্য	লেজ্‌ঝো	লোকারণ্য	লোকারোন্‌নো

লোভনীয়	লোভোনিয়ো	লৌহ	লোউহো
শকট	শকোট্	শর্ত	শর্তো
শস্য	শোশ্শো	শক্ত	শক্তো
শয্যা	শোজ্জা	শিক্ষক	শিক্খক্
শূন্য	শুন্নো	শ্মশান	শঁশান্
ষষ্ঠ	শশ্ঠো	ষোড়শ	শোড়শ্
সদ্য	শোঁদদো	সতী	শোতি
সদৃশ	শদৃশো	সমিতি	শোমিতি
সতত	সতোতো	সম্মান	সম্মান্
সমস্যা	শমোশ্শা	সঠিক	শঠিক্
সহজাত	শহোজাতো	সমাদর	শমাদোর্
সুদক্ষ	সুদোক্খো	সৌধ	শোউধো
সৌরভ	শোউরভ্	স্নেহ	স্নেহো
হঠকারী	হঠোকারি	হস্ত	হস্তো
হস্তী	হোস্তি	হীনবল	হিনোবল্
হেমন্ত	হেমোন্তো	হৈম	হোইমো

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। প্রমিত উচ্চারণ বলতে কী বোঝায় ?

২। আনুষ্ঠানিক বা ফরমাল উচ্চারণ কাকে বলে ?

৩। বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। ম-ফলা (ম) উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন।

৫। 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন।

৬। বাংলা উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন।

৭। নিচের শব্দগুলোর উচ্চারণ লিখুন–

গত, সদ্য, অভিমান, মসৃণ, অধিকতর।

পাঠ ৩.৭ : আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পৃথিবীর যে কোনো ভাষার ধ্বনি ও বর্ণকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় প্রকাশ করতে পারবেন।
- আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি ও বর্ণকে একটি লিখিত লিপির মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সমিতি গঠিত হয়। বিশ্বের যে কোনো ভাষার একটি মূলধ্বনির জন্য একটিমাত্র বর্ণ ব্যবহারের নীতিতে রচিত ৬২টি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ২৮টি স্বরবর্ণের সাহায্যে বিশ্বের ভাষাগুলোর যাবতীয় ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণই ছিল এই আন্তর্জাতিক বর্ণমালার লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা আই.পি.এ প্রকৃত অর্থে এক ধরনের বর্ণ ব্যবস্থা। লাতিন, রোমান ও ইংরেজি বর্ণমালাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে বর্ণমালা সংস্কারের মাধ্যমে আইপিএ প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দের সর্বশেষ সংস্কার অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বর্ণমালায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জন পর্যায়ে ১০৭টি বর্ণ ছিল। ২৮টি স্বরবর্ণ, ৬২টি ব্যঞ্জনবর্ণ, আইপিএ-বহির্ভূত স্বরধ্বনি ১৩টি।

বাংলা স্বরধ্বনি:

i (ই) e (এ) æ (অ্যা) a (আ) ɔ (অ) o (ও) u (উ)

বাংলা ব্যাঞ্জনধ্বনি :

k (ক)	kʰ (খ)	gʰ (গ)	gʰ (ঘ)
c (চ)	cʰ (ছ)	jʰ (জ)	jʰ (ঝ)
t (ট)	tʰ (ঠ)	dʰ (ড)	dʰ (ঢ)
t (ত)	tʰ (থ)	dʰ (দ)	dʰ (ধ)
p (প)	Pʰ (ফ)	bʰ (ব)	bʰ (ভ)
m (ম)	n (ন)	ŋ (ঙ)	r (র)
l (ল)	s (স)	ʃ (শ)	ɽ (ড়)
ɽʰ (ঢ়)	h (হ)		

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বলতে কী বোঝেন ?

ইউনিট ৪
রূপতত্ত্ব

পাঠ ৪.১ : বাংলা শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–
- বাংলা শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবেন।
- শব্দের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শব্দের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ভাষা হিসেবে বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এর শব্দ-ভান্ডার। বিভিন্ন ভাষার শব্দ গ্রহণে এবং আত্মীকরণে বাংলা ভাষা অত্যন্ত উদার। তবে, এই ঔদার্য মূলত শব্দ-ভাণ্ডার পর্যায়েই সীমিত। ভাষার সবচেয়ে ব্যবহারিক যে স্তর বাক্য, তাতে বাংলা ভাষা সবসময় নিজস্ব বিন্যাসরীতিই অনুসরণের পক্ষপাতী। অপরদিকে, ধ্বনির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অন্য ভাষার অনেক ধ্বনি উচ্চারণের সামর্থ্য বাংলা ভাষীদের থাকলেও নিজস্ব ধ্বনি-ব্যবস্থার প্রতিই তারা আস্থাশীল। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে বিষয়টি মোটেই এরূপ নয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে বিবিধ ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এ কারণে বাংলা ভাষার শব্দকে উৎপত্তিগত দিক দিয়ে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ। এদের মধ্যে অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশি বলতে যেসব শব্দকে বোঝায় সেসব শব্দকে 'খাঁটি বাংলা' শব্দ নামেও অভিহিত করা হয়। বস্তুত, এগুলোকে বলা যেতে পারে বাংলা শব্দের উৎস অনুসারে শ্রেণিবিভাগ। আবার শব্দের গঠনকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলা ভাষার শব্দকে মৌলিক ও সাধিত — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাগর্থমূলক বিবেচনায় বাংলা শব্দকে যৌগিক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ — এই তিন ভাগে ভাগ করার রীতি চালু রয়েছে। তাহলে বলা যায় যে, বাংলা ভাষার শব্দকে মূলত তিনটি বিবেচনা অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো :

ক. উৎস অনুসারে শ্রেণিবিভাগ;
খ. গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ;
গ. বাগর্থ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ।

নিচে এদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ক. উৎস অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ

১. তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ রয়েছে যেগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের বৈয়াকরণগণ 'তৎসম' বা তার (সংস্কৃতের) সমান হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রায় সকল বৈয়াকরণই সংস্কৃতের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল ছিলেন। তাই হিন্দি কিংবা গুজরাটি থেকে আসা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃতকে একই কাতারে রাখা যায়নি, যদিও এই তিনটি ভাষাই ইন্দো-ইরানীয় ভাষা-শাখারই অন্তর্গত। দীর্ঘদিন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার 'কন্যা'সমান। আর সেই কারণেই সংস্কৃতের এমন প্রাধান্য বৈয়াকরণদের মাঝে রয়ে গেছে। তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো : চন্দ্র, নক্ষত্র, ভবন, প্রত্যাশা, পরীক্ষা, মনুষ্য প্রভৃতি।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ: সংস্কৃতকে মানদণ্ড ধরে নিয়েই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত যেসব শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলো অর্ধ-তৎসম শব্দ। এই শব্দগুলো মানুষের মুখে মুখেই পাল্টেছে এবং এর থেকে এমন ধারণা করাও অসংগত হবে না যে, সাধারণ বাংলা ভাষী জনগণের আসলে সংস্কৃতকে অতিরিক্ত

গুরুত্ব প্রদানের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই তারা তাদের মতো করে সংস্কৃত অনেক শব্দকে সহজ করে নিয়েছে। অর্ধ তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো : জ্যোৎস্না> জোছনা, শ্রাদ্ধ> ছেরাদ্দ, গৃহিণী> গিন্নী, বৈষ্ণব> বোষ্টম, কুৎসিত> কুচ্ছিত প্রভৃতি।

৩. তদ্ভব শব্দ: প্রাকৃত তথা অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম করে যেসব সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তিতরূপে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। অর্থাৎ, তদ্ভব শব্দের মূল অবশ্যই সংস্কৃত কিন্তু বাংলা ভাষায় তাদের পরিবর্তিত রূপ ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, এসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত এবং তৎ-পরবর্তী স্তর অপভ্রংশে ব্যবহৃত হতো, পরে আবার সেগুলো আরও পরিবর্তিত হয়ে তদ্ভব শব্দ হিসেবে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তদ্ভব শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো: মস্তক > মত্থ > মাথা, চর্মকার> চম্মআর> চামার, হস্ত> হত্থ > হাত ইত্যাদি।

৪. দেশি শব্দ: বাংলা অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকে বাঙালিদের পাশাপাশি অন্যভাষী নৃগোষ্ঠীর বাস ছিল। এদের কেউ কেউ আবার বাঙালি জাতির উদ্ভবের আগে থেকেই এই ভূখণ্ডে বাস করত বলে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। এসব নৃগোষ্ঠীর ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সে সব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। বিশেষ করে কোল, মুণ্ডা, ভীলসহ প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর ভাষার শব্দ দেশি শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কুড়ি (বিশ), পেট (উদর), চুলা (উনুন) প্রভৃতি।

৫. বিদেশি শব্দ: সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সূত্র ধরে বিভিন্ন সময়ে বাংলাভাষীরা অন্য ভাষা এবং সেই ভাষার মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। সেই সূত্রে, সেসব ভাষার অনেক শব্দ কখনও অবিকৃতভাবে, কখনও পরিবর্তিত রূপে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এ ধরনের শব্দের কিছু উদাহরণ হলো:

আরবি শব্দ : আল্লাহ, ইমান, কোরবানি, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, হাদিস, হালাল, আদালত, ইদ, উকিল, ওজর, কানুন, কলম, কেচ্ছা, খারিজ, নগদ, বাকি, মহকুমা, মোক্তার, রায় প্রভৃতি।

ফারসি শব্দ: গুনাহ, দোজখ, নামাজ, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা, কারখানা, চশমা, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, মেথর, রসদ, আমদানি, জানোয়ার, নমুনা, রফতানি, প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ: চেয়ার, টেবিল, ইস্কুল (school), বাক্স (box), হাসপাতাল (hospital), বোতল (bottle) প্রভৃতি।

পর্তুগিজ শব্দ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, বালতি প্রভৃতি।

ফরাসি শব্দ : কুপন , ডিপো, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি।

ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ প্রভৃতি।

গুজরাটি শব্দ : খদ্দর, হরতাল প্রভৃতি।

পাঞ্জাবি শব্দ : চাহিদা, শিখ প্রভৃতি।

তুর্কি শব্দ : চাকর, চাকু, দারোগা প্রভৃতি।

চিনা শব্দ : চা, চিনি, লিচু প্রভৃতি।

মায়ানমার/ বর্মি শব্দ : ফুঙ্গি, লুঙ্গি প্রভৃতি।

জাপানি শব্দ : রিকশা, হারিকিরি প্রভৃতি।

খ. গঠন অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বাংলা শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো:

১. মৌলিক শব্দ : যে সব শব্দকে অর্থসঙ্গতিপূর্ণভাবে বিভাজন করা সম্ভব নয় তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন : গোলাপ, নাক, লাল, তিন, ইত্যাদি। এই শব্দগুলোকে আরও ছোট অংশে বিভাজনের চেষ্টা করা হলে দেখা যায় যে, কোনো অর্থদ্যোতক কিংবা অর্থবাচক অংশ পাওয়া যায় না। উদাহরণের অন্তর্গত 'গোলাপ' শব্দটি হয়ত 'গো' এবং 'লাপ' এই দুটি অংশে ভাগ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, 'গো' অংশটি অর্থপূর্ণ হলেও এর সঙ্গে গোলাপের কোনো

সম্পর্ক নেই, আর লাপ বাংলা ভাষার কোনো শব্দই নয়। ফলে, গোলাপ শব্দটিকে আর কোনো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না। এই শব্দগুলোই মৌলিক শব্দ।

২. সাধিত শব্দ : যে সব শব্দকে বিভাজন করলে এক বা একাধিক অর্থদ্যোতক কিংবা অর্থবাচক অংশ পাওয়া যায় সেসব শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। মূলত, মৌলিক শব্দ থেকেই ব্যাকরণিক বিধি অনুসরণ করে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সাহায্যে, উপসর্গ যোগে কিংবা সমাসের মাধ্যমে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ : চাঁদমুখ, মশারি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

গ. বাগর্থ অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ

১. যৌগিক শব্দ: প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যেমন থাকে তেমনি এর ব্যবহারিক অর্থও থাকে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, একটি শব্দের উৎপত্তি যখন ঘটেছিল তখন তার যে অর্থ ছিল তা-ই হলো ওই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ; আর শব্দটি বর্তমানে কোন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে তা-ই তার ব্যবহারিক অর্থ। যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে এই দুটি অর্থই অভিন্ন থাকবে। অর্থাৎ, শব্দগঠনের প্রক্রিয়ায় যেসব শব্দের ব্যবহারিক অর্থ তাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকেই অনুসরণ করে তাদের যৌগিক শব্দ বলে। যেমন, 'জীবনী' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'জীব+ অন+ ঈ' অর্থাৎ 'জীব' শব্দ হতে। তাই 'জীবনী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হওয়া উচিত জীব সংশ্লিষ্ট কোনো অর্থ। আর 'জীবনী' শব্দের অর্থ 'জীবের বেঁচে থাকার বিবরণ'। অর্থাৎ, 'জীবন' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বজায় থেকেছে। কয়েকটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ হলো : -

মূল শব্দ	শব্দ গঠন (অর্থ)	অর্থ
গায়ক	গৈ+অক	যে গান করে
কর্তব্য	কৃ+তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু+আনা	বাবুর ভাব
মধুর	মধু+র	মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত

২. রূঢ়ি শব্দ: ব্যুৎপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এমন প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দকে রূঢ়ি শব্দ বলে। রূঢ়ি শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো :

মূল শব্দ	শব্দ গঠন	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
হস্তী	হস্ত+ইন	হাত আছে যার	একটি বিশেষ প্রাণী, হাতি
গবেষণা	গো+এষণা	গরু খোঁজা	ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা
বাঁশি	বাঁশ+ইন	বাঁশি দিয়ে তৈরি	বাঁশের তৈরি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র
প্রভাত	প্র+ভাত	প্রকৃষ্টভাবে আলোকিত	সকাল বেলা

লক্ষণীয় যে, ওপরের উদাহরণের প্রতিটি শব্দই হয় প্রত্যয়নিষ্পন্ন অথবা উপসর্গ যোগে গঠিত। এবং প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ পৃথক। তাই এরা রূঢ়ি শব্দ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে।

৩. যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন শব্দ যদি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন কোনো ব্যবহারিক অর্থ ধারণ করে তবে তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। নিচের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করা যেতে পারে :

মূল শব্দ	শব্দ গঠন	ব্যবহারিক অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	পদ্মফুল
রাজপুত	রাজার পুত্র	একটি জাতি বিশেষ, ভারতের একটি জাতি
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু

শব্দ ও রূপমূল

শব্দকে বিভাজন করলে আরো ক্ষুদ্রতর বাগর্থদ্যোতক অংশ পাওয়া যায়। ভাষার এই সব বাগর্থদ্যোতক ক্ষুদ্রতম একককে বলা হয় রূপমূল। অর্থাৎ, রূপমূল হলো ভাষার এমন ক্ষুদ্রতম উপাদান যাদের হয় সুস্পষ্ট বাগর্থ থাকবে কিংবা অন্ততপক্ষে বাগর্থের কোনো যৌক্তিক ইঙ্গিত থাকবে। আমরা জানি ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপাদান হচ্ছে ধ্বনিমূল। কিন্তু ধ্বনিমূলগুলো কোনো অর্থদ্যোতকতাকে ধারণ করে না। অপরদিকে, রূপমূল মাত্রই কোনো না কোনোভাবে অর্থসংশ্লিষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'অবোধ' শব্দটিকে দুটি ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় : 'অ' এবং 'বোধ'। এখানে 'অ'

একটি রূপমূল যা উপসর্গ হিসেবে এই শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'বোধ' আরেকটি রূপমূল। লক্ষণীয় যে, 'অ' রূপমূলটির স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশের সুযোগ না থাকলেও এর সাহায্যে কোনো প্রকার অভাবকে বোঝানো হচ্ছে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অপরদিকে, 'বোধ' রূপমূলটি স্বাধীনভাবেই অর্থ প্রকাশ করতে পারছে। এর ওপর ভিত্তি করে রূপমূলকে দুটি ভাগে ভাগ ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

মুক্ত রূপমূল
বদ্ধ রূপমূল

মুক্তরূপমূলগুলো মুক্ত তথা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদেরকে আর বিভাজন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, মৌলিক শব্দ হিসেবে নির্দেশিত প্রত্যেকেই মুক্তরূপমূল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। অপরদিকে বদ্ধরূপমূলগুলোর কোনো স্বাধীন প্রকাশ সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি বদ্ধরূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি শব্দের রূপমূল বিভাজন দেখানো যেতে পারে :

প্রদত্ত শব্দ	গঠন	মুক্তরূপমূল	বদ্ধরূপমূল
সম্প্রীতি	সম্+ প্রীত্+ ই	প্রীত্	সম্, ই
পরিবর্তনশীলতা	পরি+ বর্তন (বৃত্+ অনট্)+ শীল+ তা	বর্তন	পরি, শীল, তা

শব্দ ও গঠনবৈচিত্র্য

বাংলা শব্দের গঠন বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মূলত তিনভাবে বাংলা শব্দ গঠিত হতে পারে। এগুলো হলো : উপসর্গ যোগে, প্রত্যয় যোগে এবং যৌগিকীকরণ তথা সমাসের মাধ্যমে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠনের প্রচলিত ধারণা যথাযথ নয়। সন্ধি মূলত একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যা শব্দস্তরে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ, একটি শব্দ গঠনের পর যদি দেখা যায় যে, ওই শব্দে এমন কতগুলো ধ্বনি পাশাপাশি বসেছে যাদের এক ধ্বনিতে পরিণত করা সম্ভব তাহলে সেখানে সন্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু এটি যে বাধ্যতামূলক কোনো বিষয়, তা কিন্তু নয়। দুটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমরা জানি, 'সিংহাসন' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সিংহ চিহ্নিত আসন' থেকে। অর্থাৎ, এই সমাসের পূর্বপদ সিংহ এবং পরপদ আসন পাশাপাশি বসেছে। এখন লক্ষ করা গেল যে, সিংহ-এর শেষে একটি স্বরধ্বনি রয়েছে এবং আসন-এর শুরুতে একটি স্বরধ্বনি রয়েছে। তাই এই দুটি স্বরধ্বনি এক ধ্বনিতে পরিণত হয়ে সিংহাসন শব্দটি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, শব্দ গঠনের মূল অংশে সন্ধির কোনো ভূমিকা ছিল না। আবার বাংলা ভাষায় প্রচলিত অভিন্নার্থক দুটি শব্দ — উপরিউক্ত এবং উপর্যুক্ত। দুটি শব্দই ব্যাকরণসম্মত এবং প্রথমটিতে সন্ধি ঘটেনি এবং দ্বিতীয়টিতে সন্ধি ঘটেছে। তাতে শব্দটির গঠনগত কোনো ত্রুটি তৈরি হয়নি। সুতরাং বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গ, প্রত্যয় এবং সমাসই ভূমিকা পালন করে।

উপসর্গ এবং উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন

উপসর্গ : বাংলা ভাষায় কিছু বদ্ধরূপমূল তথা শব্দাংশ রয়েছে যারা ধাতু বা প্রাতিপদিকের পূর্বে বসে এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংকোচন সাধন করতে পারে। এদের উপসর্গ বলা হয়। এদের অর্থবাচকতা না থাকলেও অর্থদ্যোতকতা রয়েছে। অর্থাৎ, এরা নিজেরা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম না হলেও অন্য কোনো ভাষিক উপাদানের সঙ্গে বসে এরা অর্থের নানাবিধ রূপান্তর ঘটাতে পারে। শব্দের শুরুতে যোগ হয়ে এটি নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে, অর্থের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে, অর্থের সংকোচন ঘটাতে পারে এবং কখনও কখনও পুরো অর্থটিই পাল্টে দিতে পারে। যেমন, 'অপ' একটি উপসর্গ, যা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত না হলেও সাধারণত কোনো ক্ষতিকারক কিছুর দ্যোতনা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এটি যখন 'কার'-এর আগে বসে তখন অর্থের সংকোচন ঘটিয়ে নতুন শব্দ 'অপকার' তৈরি করে। আবার এটি যখন 'রূপ' এর আগে বসছে তখন একদিকে 'অপ' অংশটির সাধারণ যে অর্থদ্যোতনা তা পাল্টে গিয়ে 'অপরূপ' শব্দ তৈরির মধ্য দিয়ে 'রূপ' শব্দটির অর্থের প্রসারণ ঘটাচ্ছে। অপর একটি উপসর্গ 'অ' বিভিন্ন শব্দ যেমন 'ভাব' এর আগে বসে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট 'অভাব' তৈরি করছে। অর্থাৎ, এখানে উপসর্গ শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ মূলত তিন প্রকার : বাংলা উপসর্গ, সংস্কৃত উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ।

বাংলা উপসর্গ : বাংলা ভাষায় বাংলা উপসর্গ মোট **২১** টি। এগুলো হলো :

অ	অঘা	অজ	অনা	
আ	আড়	আন	আব	
ইতি	উন (উনা)	কদ	কু	
নি	পাতি	বি	ভর	রাম
স	সা	সু	হা	

বাংলা উপসর্গগুলোর প্রয়োগ নিচে উপস্থাপিত হলো :

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ/ প্রয়োগ
অ	নিন্দিত	অকেজো (নিন্দিত কাজ করে যে), অপয়া
	অভাব	অচিন (চিন-পরিচয়ের অভাব), অজানা
	ক্রমাগত	অঝোর (ক্রমাগতভাবে ঝরতে থাকা), অঝোরে
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ	নিতান্ত/ মন্দ	অজপাড়াগাঁ (একেবারে নিতান্তই পাড়াগাঁ), অজমূর্খ
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি (বৃষ্টির অভাব)
	ছাড়া	অনাছিষ্টি (সৃষ্টিছাড়া)
	অশুভ	অনামুখো (অশুভ, মুখ যার অশুভ)
আ	অভাব	আলুনি (লবণের অভাব), আকাঁড়া
	বাজে, নিকৃষ্ট	আগাছা
আড়	বক্র/ বাঁকা	আড়চোখে (বাঁকা চোখে)
	আধা, প্রায়	আড়পাগলা (আধা পাগলা), আড়মোড়া
	বিশিষ্ট	আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি
আন	না	আনকোরা (যা এখনো কোরা হয়নি, একদম নতুন)
	বিক্ষিপ্ত	আনমনা (মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা)
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া (অস্পষ্ট ছায়া)
ইতি	পুরনো	ইতিকথা (বহু পুরনো কথা)
উন (উনা)	কম	উনিশ (বিশ হতে ১ উন)
কদ্	নিন্দিত	কদাকার (নিন্দিত/ কুৎসিত আকার), কদর্য
কু	কুৎসিত/ অপকর্ষ	কু-অভ্যাস (কুৎসিত/ খারাপ অভ্যাস), কুকথা
নি	নাই/ নেতি	নিখুঁত (খুঁত নেই যার), নিরেট
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস (ক্ষুদ্র প্রজাতির হাঁস), পাতকুয়ো
বি	ভিন্নতা	বিপথ (ভিন্ন পথ), বিভূঁই
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট (পেটের ভর্তিপূর্ণ অবস্থা), ভরদুপুর
রাম	বড়/ উৎকৃষ্ট	রামছাগল (বড় বা উৎকৃষ্ট প্রজাতির ছাগল), রামদা
স	সঙ্গে	সলাজ (লাজের সঙ্গে), সরব
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা (উৎকৃষ্ট মানের এক প্রকার জিরা)
সু	উত্তম	সুদিন (উত্তম দিন), সুখবর
হা	অভাব	হাভাতে (ভাতের অভাব)

সংস্কৃত উপসর্গ : সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত বিশটি উপসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এগুলো সাধারণত সংস্কৃত উৎসের শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো হলো :

প্র	পরা	অপ	সম
নি	অনু	অব	নির
দুর	বি	অধি	সু

উৎ	পরি	প্রতি	অতি
অপি	অভি	উপ	আ

নিচে সংস্কৃত উপসর্গগুলোর প্রয়োগ দেখানো হলো-

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ/ প্রয়োগ
প্র	প্রকৃষ্ট/ সম্যক	প্রচলন (প্রকৃষ্ট রূপ চলন/ চলিত যা) প্রভাব
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ
	আধিক্য	প্রবল (বলের আধিক্য)
	গতি	প্রবেশ
	ধারা-পরম্পরা	প্রপৌত্র
পরা	আতিশয্য	পরাক্রান্ত
	বিপরীত	পরাজয়
অপ	বিপরীত	অপমান, অপচয়
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি (নিকৃষ্ট সংস্কৃতি)
	স্থানান্তর	অপসারণ
	বিকৃত	অপমৃত্যু
	সুন্দর	অপরূপ
সম	সম্যক রূপে	সম্পূর্ণ
	সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ
নি	নিষেধ	নিবারণ
	নিশ্চয়	নির্ণয়
	আতিশয্য	নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ (কলুষতাহীন)
অনু	পশ্চাৎ	অনুগামী, অনুজ,
	সাদৃশ্য	অনুরূপ, অনুকার
	পৌনঃপুন্য	অনুশীলন (বারবার করা)
	সঙ্গে	অনুকূল
অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন
	নিম্নমুখী	অবতরণ
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবেলা
নির	অভাব	নিরক্ষর, নির্জীব
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ভর
	বাহির/ বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ
দুর	মন্দ	দুর্দশা, দুর্নাম
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুরতিক্রম্য
অধি	আধিপত্য	অধিপতি, অধিবাসী
	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	ব্যাপ্তি	অধিবাস, অধিগত
বি	বিশেষ রূপে	বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান
	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ
	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ

	অপ্রকৃতিস্থ	বিকার, বিপর্যয়
সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুপ্রিয়
	সহজ	সুগম, সুলভ
	আতিশয্য	সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উন্নতি, উত্তোলন
	আতিশয্য	উত্তপ্ত, উৎফুল্ল
	প্রস্তুতি	উৎপাদন, উচ্চারণ
	অপকর্ষ	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল
পরি	বিশেষ রূপ	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ
	শেষ	পরিশেষ
	সম্যক রূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা
	চতুর্দিক	পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
অপি	অপিচ	অপিনিহিতি
অভি	সম্যক	অভিজ্ঞ, অভিভূত
	গমন	অভিযান, অভিসার
	সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর
	বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	আদান, আগমন

বিদেশি উপসর্গ : বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে আগত উপসর্গসমূহ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। কেননা, প্রতিনয়তই নতুন নতুন শব্দ অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় আসার সুযোগ বিদ্যমান। আর সেই ভাষার শব্দের সূত্রে বিভিন্ন উপসর্গও বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের তালিকা উদাহরণসহ উপস্থাপিত হলো :

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
কার	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
দর	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান
না	না	নাচার, নারাজ, নাখোশ
নিম	আধা	নিমরাজি
ফি	প্রতি	ফি-রোজ, ফি-বছর
বদ	মন্দ	বদমেজাজ, বদহজম, বদনাম

বে	না	বেআদব, বেতার, বেকার
বর	বাইরে, মধ্যে	বরদাস্ত, বরখেলাপ
ব	সহিত	বকলম
কম	স্বল্প	কমজোর, কমবখত

আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
আম	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসকামরা
লা	না	লাজওয়াব, লাপাত্তা
গর	অভাব	গরমিল, গররাজি

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
ফুল	পূর্ণ	ফুলহাতা, ফুলবাবু
হাফ	আধা	হাফহাতা, হাফপ্যান্ট
হেড	প্রধান	হেডমাস্টার, হেডমৌলভি
সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-ইন্সপেক্টর

হিন্দি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
হর	প্রত্যেক	হরকিসিম, হরহামেশা, হরেক

প্রত্যয় ও প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকের পরে বিভিন্ন বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়। এই বদ্ধরূপমূলগুলোকে প্রত্যয় নামে অভিহিত করা হয়। গঠন অনুসারে দুই রকমের প্রত্যয় বাংলা ভাষায় রয়েছে। এগুলো হলো : কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় ধাতুর সঙ্গে এবং তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয় প্রাতিপদিকের সঙ্গে। উল্লেখ্য যে, ক্রিয়াশব্দের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়াপ্রকৃতি। অপরদিকে, বিভক্তিবিহীন নামশব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক বা নামপ্রকৃতি। অর্থাৎ, ক্রিয়া কিংবা নামশব্দের মূল অংশকে সাধারণভাবে প্রকৃতি বলা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল মূল অংশের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার শর্তেই এদের প্রকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য রয়েছে এমন প্রকৃতি তথা ধাতু এবং প্রাতিপদিক উভয়ই অবিভাজ্য রূপমূল হয় এবং এদের সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুক্তরূপমূল 'শোন' একটি ধাতু এবং এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বদ্ধরূপমূল তথা প্রত্যয় 'আ'। এর ফলে, নতুন শব্দ গঠিত হবে 'শোনা'। আবার মুক্তরূপমূল 'ঘর' একটি প্রাতিপদিক এবং এর সঙ্গে 'আমি' প্রত্যয় তথা বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে তৈরি হতে পারে নতুন শব্দ 'ঘরামি'। এভাবে প্রকৃতি এবং প্রত্যয় যোগে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়। বাংলা ব্যাকরণে ধাতু চিহ্নিত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক চিহ্ন ($\surd$) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ $\surd$বল্ মানে 'বল্' ধাতু।

অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় প্রকৃতি দুই প্রকার : নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতি। নামপ্রকৃতির কয়েকটি উদাহরণ হলো : লাজ, বড়, ঘর প্রভৃতি। অপরদিকে, ক্রিয়াপ্রকৃতির কয়েকটি উদাহরণ হলো– $\surd$পড়ু, $\surd$নাচ্, $\surd$জিত্ প্রভৃতি। একইভাবে, গঠন অনুসারে বাংলা ভাষায় প্রত্যয় দুই প্রকার : কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ হলো : -উক, -আই, -আমি এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ হলো : -উয়া, -উনে এবং -আ।

কৃদন্ত শব্দ: কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। অর্থাৎ ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। ওপরের উদাহরণে ব্যবহৃত ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত কৃদন্ত শব্দগুলো হলো যথাক্রমে : পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা।

তদ্ধিতান্ত শব্দ: তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় তদ্ধিতান্ত শব্দ। ওপরের উদাহরণে ব্যবহৃত নাম প্রকৃতি এবং তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত তদ্ধিতান্ত শব্দগুলো হলো: ওপরের লাজুক, বড়াই, ঘরামি।

প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের গুণ ও বৃদ্ধি : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের ধারণা রূপতত্ত্বের বিষয় হলেও কখনও কখনও তা শব্দ গঠনে ধ্বনিতত্ত্বকে সংশ্লিষ্ট করে। মূলত, সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দের ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায়। কখনও কখনও লক্ষ করা যায় যে, নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি অংশের আদিস্বরের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মদ্বয়কেই যথাক্রমে গুণ ও বৃদ্ধি নামে অভিহিত করা হয়। নিচে গুণ ও বৃদ্ধি ঘটার সূত্র উল্লেখ করা হলো :

গুণ

ই/ঈ-স্থলে এ	√চিন্+আ= চেনা, √নী+আ= নেওয়া
উ/ঊ-স্থলে ও	√ধু+আ= ধোয়া
ঋ-স্থলে অর	√কৃ+তা = কর্‌তা > কর্তা >ক্রেতা

বৃদ্ধি

অ-স্থলে আ	√পচ্+ণক(অক) = পাচক
ই/ঈ-স্থলে ঐ	√শিশু+ষ্ণ = শৈশব
উ/ঊ-স্থলে ঔ	√যুব্+অন= যৌবন
ঋ-স্থলে আর	√কৃ+ঘ্যণ(য-ফলা)= কার্য

এছাড়া, সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে কখনও কখনও প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কালে প্রত্যয়ের অংশবিশেষ লোপ পায়। এই লোপ পাওয়া অংশটিকে 'ইৎ' নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়া, প্রকৃতির অন্ত্যধ্বনির আগের ধ্বনিকে 'উপধা' বলা হয়ে থাকে এবং প্রকৃতির আদ্যধ্বনির পরবর্তী সকল ধ্বনিকে 'টি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ, 'ইৎ' প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং 'উপধা' ও 'টি' প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'পাঠক' শব্দটির গঠন হলো : √পঠ্ (প্+অ+ঠ্) + ণক (ণ্+অ+ক্)। এখানে প্রকৃতি অংশের উপধা হলো 'প্+অ', টি হলো 'অ+ক্' এবং চূড়ান্তভাবে শব্দ গঠনের কালে প্রকৃতি অংশে নির্দেশিত 'অ'-এর বৃদ্ধি ঘটে 'আ' হয়েছে। অপরদিকে, প্রত্যয় অংশে 'ণ্'-এর ইৎ ঘটেছে।

কৃৎ প্রত্যয়: উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

অ
√ধর্+অ= ধর
√মার্+অ = মার

অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√কাঁদ্+অন = কাঁদন
√নাচ্+অন = নাচন
√বাড়্+অন= বাড়ন
√ঝুল্+অন = ঝুলন
√দুল্+অন = দোলন   ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে 'ওন' হয়। যেমন-

√খা+অন = খাওন

অনা √খেল্+অনা = খেলনা

অনি/উনি √চির্+অনি = চিরনি > চিরুনি

√বাঁধ্+অনি = বাঁধুনি

√আঁট্+অনি = আঁটুনি

অন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√উড়্+অন্ত = উড়ন্ত

√ডুব্+অন্ত = ডুবন্ত

অক √মুড়্+অক = মোড়ক

√ঝল্+অক = ঝলক

আ √পড়্+আ = পড়া

√রাঁধ্+আ = রাঁধা

√কাচ্+আ = কাচা

আই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√চড়্+আই = চড়াই

√সিল্+আই = সিলাই

আও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√পাকড়্+আও = পাকড়াও

√চড়্+আও = চড়াও

আন (আনো) (প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)

√জানা+আন = জানানো

√শোনা+আন = শোনানো

√মান+আন = মানান/মানানো

আনি √শুন+আনি = শুনানি

√উড়্+আনি = উড়ানি

(√উড়্+উনি = উড়ুনি)

আরি/রি/উরি

√ডুব্+আরি/উরি = ডুবুরি

√ধুন্+আরি = ধুনারি

√পূজ্+আরি = পূজারি

আল

√মাত্+আল = মাতাল

√মিশ্+আল = মিশাল

ই

√ভাজ্+ই = ভাজি

√বেড়্+ই = বেড়ি

ইয়া/ইয়ে

√মর্+ইয়া = মরিয়া
√নাচ্+ইয়ে = নাচিয়ে
√গা+ইয়ে = গাইয়ে
√লিখ্+ইয়ে = লিখিয়ে

উ

√ডাক্+উ = ডাকু
√ঝাড়্+উ = ঝাড়ু   দ্বিত্বপ্রয়োগ : √উড়্+উ = উড়ুউড়ু

উয়া/ও

√পড়্+উয়া = পড়ুয়া
√উড়্+উয়া = উড়ুয়া > উড়ো
√উড়্+ও = উড়ো

তা (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√ফির্+তা = ফিরতা > ফেরতা
√পড়্+তা = পড়তা
√বহ্+তা = বহতা

তি (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√ঘাট্+তি = ঘাটতি
√বাড়্+তি = বাড়তি
√কাট্+তি = কাটতি
√উঠ্+তি = উঠতি

না (বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√কাঁদ্+না = কাঁদনা > কান্না
√রাঁধ্+না = রাঁধনা > রান্না

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

অন (ট্)

√নী+অনট্ > নে+অন = নয়ন
√স্থা+অনট্ = স্থান
√দৃশ+অন্ = দর্শন
√নন্দি+অনট্ = নন্দন

ক্ত

√জ্ঞা+ক্ত = জ্ঞাত
√খ্যা+ক্ত = খ্যাত
√পঠ্+ক্ত = পঠিত   কিছু কিছু ধাতুর শেষে ‘ই-কার’ যুক্ত হয়।
√লিখ্+ক্ত = লিখিত
√বেষ্ট্+ক্ত = বেষ্টিত

√চল্+ক্ত = চলিত
√লুণ্ঠ্+ক্ত = লুণ্ঠিত
√শিক্ষ্+ক্ত = শিক্ষিত
√মুচ্+ক্ত = মুক্ত — ধাতুর শেষে ‘চ/জ’ থাকলে তা ‘ক’ হয়। যেমন-
√ভুজ্+ক্ত = ভুক্ত
√গম্+ক্ত = গত — নিপাতনে সিদ্ধ
√গ্রন্থ্+ক্ত = গ্রথিত
√ছিদ্+ক্ত = ছিন্ন
√জন্+ক্ত = জাত
√হন্+ক্ত = হত
√মুহ্+ক্ত = মুগ্ধ
√যুধ্+ক্ত = যুদ্ধ
√লভ্+ক্ত = লব্ধ
√বচ্+ক্ত = উক্ত
√বপ্+ক্ত = উপ্ত
√স্বপ্+ক্ত = সুপ্ত
√সৃজ্+ক্ত = সৃষ্ট

ক্তি কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়।
√গম্+ক্তি = গতি
√মন্+ক্তি = মতি
কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ-কার যুক্ত হয়।
√শম্+ক্তি = শান্তি
√বচ্+ক্তি = উক্তি
√মুচ্+ক্তি = মুক্তি
√ভজ্+ক্তি = ভক্তি
নিপাতনে সিদ্ধ
√বচ্+ক্তি = উক্তি
√গৈ+ক্তি = গীতি
√বুধ্+ক্তি = বুদ্ধি

তব্য
√কৃ+তব্য = কর্তব্য
√দা+তব্য = দাতব্য
√পঠ্+তব্য = পঠিতব্য

অনীয়
√কৃ+অনীয় = করণীয়
√রক্ষ্+অনীয় = রক্ষণীয়
√দৃশ্+অনীয় = দর্শনীয়
√শ্রু+অনীয় = শ্রবণীয়

তৃচ
√দা+তৃচ্ = দাতা

√ক্রী+তৃচ্ = ক্রেতা
√যুধ+তৃচ্ = যোদ্ধা

ণক

√পঠ্+ণক = পাঠক
√নী+ণক > নৈ+অক = নায়ক
√গৈ+ণক = গায়ক
প্রযোজক ধাতুর শেষে 'ই-কার' থাকলে খ্ লোপ পায়।
√লিখ্+ণক = লেখক
√পূঁজি+ণক = পূজক
√স্তাবি+ণক = স্তাবক

ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে অতিরিক্ত 'য়' যুক্ত হয়।
বি+√ধা+ণক = বিধায়ক

ঘ্যণ

√কৃ+ঘ্যণ = কার্য্য > কার্য
√বাচ্+ঘ্যণ = বাচ্য
√ভোজ্+ঘ্যণ = ভোজ্য
√যোগ+ঘ্যণ = যোগ্য
পরি+√হার+ঘ্যণ = পরিহার্য

য

√দা+য >√দে+য = দেয়
√হা+য >√হে+য = হেয়
বি+√ধা+য = বিধেয়
অ+√জি+য = অজেয়

√গম্+য = গম্য শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা হয়।

ণিন

√গ্রহ্+ণিন = গ্রাহী
√পা+ণিন = পায়ী
√দ্রোহ্+ণিন = দ্রোহী
সত্য+√বদ+ণিন = সত্যবাদী
√স্থা+ণিন = স্থায়ী
'হন' ধাতুর ক্ষেত্রে
আত্ম+√হন্+ণিন = আত্মঘাতী

ইন

√শ্রম+ইন = শ্রমী

অল

√জি+অল = জয়
√ক্ষি+অল = ক্ষয়
√বিন্+অল = বিনয়

√হন্+অল = বধ

ইষ্ণু

√চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু

√ক্ষয়্+ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু

বর

√ঈশ্+বর = ঈশ্বর

√নশ্+বর = নশ্বর

র

√হিন্+স+র = হিংস্র

√নম্+র = নম্র

উক/ঊক

√ভু+উক > ভৌ+উক = ভাবুক

√জাগৃ+ঊক = জাগরূক

শানচ

√দীপ্+শানচ্ = দীপ্যমান

√চল্+শানচ্ = চলমান

√বৃধ্+শানচ্ = বর্ধমান

ঘঞ

√বস্+ঘঞ = বাস

√ক্রুধ্+ঘঞ = ক্রোধ

√ভিদ্+ঘঞ = ভেদ

√ত্যজ্+ঘঞ = ত্যাগ

√শুচ্+ঘঞ = শোক

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আ

চোর+আ = চোরা

কেষ্ট+আ = কেষ্টা

ডিঙি+আ = ডিঙা

বাঘ+আ = বাঘা

কাল+আ = কালা,

জল+আ = জলা

রোগ+আ = রোগা

লুন+আ = লুনা > লোনা

আই

বড়+আই = বড়াই

কানু+আই = কানাই

নিম+আই = নিমাই

বোন+আই = বোনাই

মিঠা+আই = মিঠাই

ঢাকা+আই = ঢাকাই

চোর+আই = চোরাই
মোগল+আই = মোগলাই

আমি/আম/
আমো/মি

ইতর+আমি = ইতরামি
পাগল+আমি = পাগলামি
বাঁদর+আমি = বাঁদরামি
ফাজিল+আমো = ফাজলামো
ঠক+আমো = ঠকামো
ঘর+আমি = ঘরামি
ছেলে+মি = ছেলেমি

ই

বাহাদুর+ই = বাহাদুরি
ডাক্তার+ই = ডাক্তারি
মোক্তার+ই = মোক্তারি
পোদ্দার+ই = পোদ্দারি
চাষ+ই = চাষি
জমিদার+ই = জমিদারি
দোকান+ই = দোকানি
রেশম+ই = রেশমি
সরকার+ই = সরকারি

ইয়া > এ

সেকাল+এ = সেকেলে
ভাদর+ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে
পাথর+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে
মাটি+ইয়া = মেটে
বালি+ইয়া = বেলে
জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে
খুন+ইয়া = খুনিয়া > খুনে
না+ইয়া = নাইয়া > নেয়ে
টনটন+এ = টনটনে
কনকন+এ = কনকনে
চকচক+এ = চকচকে

উয়া > ও

বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো
টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো
ধান+উয়া = ধেনো
মাঠ+উয়া = মেঠো
গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো
মাছ+উয়া = মাছুয়া > মেছো
তেল+উয়া = তেলো > তেলা

কুঁজ+উয়া = কুঁজো

উ

ঢাল+উ = ঢালু

কল+উ = কলু

উক

লাজ+উক = লাজুক

মিশ+উক = মিশুক

মিথ্যা+উক = মিথ্যুক

আরি/আরু

ভিখ+আরি = ভিখারি

শাঁখ+আরি = শাঁখারি

বোমা+আরু = বোমারু

আলি/আলো/আল>এল

দাঁত+আল = দাঁতাল

লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল

ধার+আল = ধারাল

শাঁস+আল = শাঁসাল

দুধ+আল = দুধাল > দুধেল

হিম+আল = হিমাল > হিমেল

চতুর+আলি = চতুরালি

ঘটক+আলি = ঘটকালি

সিঁদ+আল>এল = সিঁদেল

উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে

হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে

সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে

কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে

উড়

লেজ+উড় = লেজুড়

উয়া/ওয়া>ও

ঘর+ওয়া = ঘরোয়া

জল+উয়া = জলুয়া > জলো

আটিয়া/টে

তামা+আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে

ভাড়া+আটিয়া = ভাড়াটে

রোগা+আটিয়া = রোগাটে

অট>ট

ভরা+ট = ভরাট

জমা+ট = জমাট

লা

মেঘ+লা = মেঘলা

এক+লা = একলা

আধ+লা = আধলা

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ইত

কুসুম+ইত = কুসুমিত
তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত
কণ্টক+ইত = কণ্টকিত

ইমন/ইমা

নীল+ইমন = নীলিমা
মহৎ+ইমন = মহিমা

ইল

পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল
ফেনা+ইল = ফেনিল

ইষ্ঠ

গুরু+ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ
লঘু+ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ

ইন/ঈ/ইনী

জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন
সুখ+ইন = সুখিন
গুণ+ইন = গুণীন
মান+ইন = মানিন
জ্ঞান+ইন(ঈ)= জ্ঞানী

তা/ত্ব

শত্রু+তা = শত্রুতা
বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব
গুরু+ত্ব = গুরুত্ব
ঘন+ত্ব = ঘনত্ব
মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব

তর/তম

মধুর+তর = মধুরতর
প্রিয়+তর = প্রিয়তর
প্রিয়+তম = প্রিয়তম

নীন/ঈন(ন ইৎ)

সর্বজন+নীন = সর্বজনীন
কুল+নীন = কুলীন
নব+নীন = নবীন

নীয়/ঈয়(ন ইৎ)

জল+নীয় = জলীয়
বায়ু+নীয় = বায়বীয়
বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়
রাজা+নীয় = রাজকীয়

বতুপ/মতুপ

বান/মান

গুণ+বতুপ = গুণবান
দয়া+বতুপ = দয়াবান
শ্রী+মতুপ = শ্রীমান
বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান

বিন/বী

মেধা+বিন = মেধাবী
মায়া+বিন = মায়াবী
তেজঃ+বিন = তেজস্বী
যশঃ+বিন = যশস্বী

র

মধু+র = মধুর
মুখ+র = মুখর

ল

শীত+ল = শীতল
বৎস+ল = বৎসল

ষ্ণ(অ)

মনু+ষ্ণ = মানব
যদু+ষ্ণ = যাদব
শিব+ষ্ণ = শৈব
শক্তি+ষ্ণ = শাক্ত
বুদ্ধ+ষ্ণ = বৌদ্ধ
শিশু+ষ্ণ = শৈশব
গুরু+ষ্ণ = গৌরব
কিশোর+ষ্ণ = কৈশোর
পৃথিবী+ষ্ণ = পার্থিব
চিত্র+ষ্ণ = চৈত্র
সূর্য+ষ্ণ = সৌর — নিপাতনে সিদ্ধ। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সুর+ষ্ণ = সৌর।

ষ্ণ্য(য)

মনুঃ+ষ্ণ্য = মনুষ্য
সুন্দর+ষ্ণ্য = সৌন্দর্য
শূর+ষ্ণ্য = শৌর্য
ধীর+ষ্ণ্য = ধৈর্য
পর্বত+ষ্ণ্য = পার্বত্য

ষ্ণি(ই)

রাবণ+ষ্ণি = রাবণি
দশরথ+ষ্ণ্যি = দাশরথি

ষ্ণিক(ইক)

সাহিত্য+ষ্ণিক = সাহিত্যিক
বেদ+ষ্ণিক = বৈদিক
বিজ্ঞান+ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক
নগর+ষ্ণিক = নাগরিক

মাস+ষ্ণিক = মাসিক
ধর্ম+ষ্ণিক = ধার্মিক
সমাজ+ষ্ণিক = সামাজিক
অকস্মাৎ+ষ্ণিক = আকস্মিক

ষ্ণেয় (এয়)

ভগিনী+ষ্ণেয় = ভাগিনেয়
অগ্নি+ষ্ণেয় = আগ্নেয়
বিমাতৃ+ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

হিন্দি

ওয়ালা>আলা

বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা
মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা
দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা

ওয়ান>আন

গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান
দার+ওয়ান = দারোয়ান

আনা>আনি

মুনশি+আনা = মুনশিআনা/মুন্সিয়ানা
হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দয়ানি

পনা

ছেলে+পনা = ছেলেপনা
গিন্নি+পনা = গিন্নিপনা
বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা

সা>সে

পানি+সা = পানিসা > পানসে
কাল+সা = কালসা > কালসে

ফারসি

গর>কর

কারি+গর = কারিগর
বাজি+গর = বাজিগর > বাজিকর

দার

খবর+দার = খবরদার
তাঁবে+দার = তাঁবেদার
দেনা+দার = দেনাদার
চৌকি+দার = চৌকিদার
পাহারা+দার = পাহারাদার

বাজ

কলম+বাজ = কলমবাজ
ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ

গলা+বাজ = গলাবাজ

বন্দি/বন্দ

জবান+বন্দি = জবানবন্দি

নজর+বন্দি = নজরবন্দি

সই (মত অর্থে)

মানান+সই = মানানসই

চলন+সই = চলনসই

টেক+সই = টেকসই

সমাস ও সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় সমাস মূলত একধরনের যৌগিকীকরণ। অর্থাৎ, এর সাহায্যে একাধিক শব্দ মিলিত হয়ে যৌগিক শব্দ তৈরি হয়। বলা চলে যে, বাগর্থগত সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক শব্দে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো সমাস। এর সাহায্যে ভাষাকে সংহত ও সংক্ষেপিত করা সম্ভব হয়। ভাষার ব্যবহারিক মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। সমাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু পরিভাষা হলো ব্যাসবাক্য, সমস্তপদ, সমস্যমান পদ, পূর্বপদ এবং পরপদ। নিচে এগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ব্যাসবাক্য: সমাসবদ্ধ শব্দের বিস্তারিত রূপই হলো ব্যাসবাক্য। একে বিগ্রহবাক্যও বলা হয়। ব্যাসবাক্যেই মূলত সমাস নির্ণয়ের সূত্রসমূহ নির্দেশিত থাকে।

সমস্ত পদ: ব্যাসবাক্যের সাহায্যে যৌগিকীকরণের মাধ্যমে যে সংহত নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় সমস্ত পদ।

সমস্যমান পদ: যে উপাদানগুলোর আশ্রয়ে সমস্ত পদ গঠিত হয় তাদের সমস্যমান পদ বলে। এই সমস্যমান পদগুলোই সমাস প্রক্রিয়া সম্পাদন করে।

পূর্বপদ : সমস্ত পদের প্রথম পদকে পূর্বপদ বলে।

পরপদ: সমস্ত পদের শেষ অংশকে পরপদ বলা হয়। একে উত্তরপদ বলেও অভিহিত করা হয়।

নিচের একটি উদাহরণ এই পরিভাষাসমূহের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম। 'বিদ্যালয়' একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। অর্থাৎ, এই সমাসের সমস্তপদটি হলো 'বিদ্যালয়'; আর এর ব্যাসবাক্য হলো : 'বিদ্যার আলয়'। এখানে সমস্যমান পদগুলো হলো : বিদ্যা, আলয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তি 'র'। এই সমাসের পূর্বপদ হলো বিদ্যা এবং পরপদ হলো আলয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাস হলো শব্দগঠনের প্রক্রিয়া। আর তাই একই শব্দ কখনও কখনও একাধিক প্রক্রিয়ায় সমাসনিষ্পন্ন হতে পারে। এ কারণে ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাস নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। বাংলা ভাষায় প্রধাণত ছয় প্রকারের সমাস রয়েছে। এগুলো হলো : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব। এছাড়া কিছু অপ্রধান সমাসও রয়েছে। যেমন : প্রাদি, নিত্য, সুপসুপা প্রভৃতি। পূর্বপদ কিংবা পরপদের প্রাধান্যের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত সমাস নির্ণয় করা হয়ে থাকে। নিচে এর একটি তালিকা প্রদান করা যেতে পারে :

পূর্বপদের প্রাধান্য	পরপদের প্রাধান্য	সমাসের নাম	
আছে	আছে	দ্বন্দ্ব	(সমান প্রাধান্য)
নেই	আছে	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু	
আছে	নেই	অব্যয়ীভাব	
নেই	নেই	বহুব্রীহি	(ভিন্ন কোনোকিছুর প্রাধান্য)

নিচে বিভিন্ন প্রকার সমাসের বর্ণনা ও উদাহরণ উপস্থাপিত হলো।

দ্বন্দ্ব সমাস : এতে পূর্বপদ ও পরপদের সমান প্রাধান্য থাকে। ব্যাসবাক্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার ঘটে থাকে। যেমন- মা ও বাপ = মা-বাপ। এখানে পূর্বপদ 'মা' ও পরপদ 'বাপ'। ব্যাসবাক্যে 'মা' ও 'বাপ' দুইজনকেই সমান প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, এবং দুজনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বপদ ও পরপদ, উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে।

কর্মধারয় সমাস: কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। মূলত, এই সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদ পূর্বপদ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ব্যাসবাক্যটিতে ওই বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয়। অর্থাৎ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যেমন- নীল যে আকাশ = নীলাকাশ। এখানে, পূর্বপদ 'নীল' বিশেষণ ও পরপদ 'আকাশ' বিশেষ্য। ব্যাসবাক্যে 'আকাশ' সম্পর্কে বলা হয়েছে আকাশ 'নীল' রঙের। অর্থাৎ, 'আকাশ' বা পরপদের অর্থই এখানে প্রধান। কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নিচে উল্লেখিত হলো:

দুইটি বিশেষণ একই বিশেষ্য বোঝালে সেটি কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। এখানে পরবর্তী বিশেষ্যটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে এটি দ্বন্দ্ব সমাস হবে না।

দুইটি বিশেষ্য একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে সেটিও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব।

কার্যপরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা। এখানে 'মোছা' কাজটি অধিকতর গুরুত্বপ্রাপ্ত।

পূর্বপদে নারীবাচক বিশেষণ থাকলে তা পুরুষবাচক হয়ে যাবে। যেমন : সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা

বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে মহা হয়। যেমন: মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান

পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু', 'কৎ' হয়। যেমন : কু যে অর্থ = কদর্থ।

পরপদে 'রাজা' থাকলে 'রাজ' হয়। যেমন: মহান যে রাজা = মহারাজ।

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষ্য আগে এসে বিশেষণ পরে চলে যায়। যেমন: সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ।

কর্মধারয় সমাসকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলো লোপ পায়। যেমন : 'স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ'। এখানে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ 'রক্ষার্থে' লোপ পেয়েছে। উপমান এবং উপমিত কর্মধারয় সমাস নির্ধারণ করা হয় উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের তুলনামূলক বিশেষত্বের ওপর। উল্লেখ্য যে, যাকে তুলনা করা হয়, তাকে বলা হয় উপমেয়; আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান। অপরদিকে, উপমেয় এবং উপমানের যে গুণের ওপর ভিত্তি করে এই তুলনার কাজটি সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। যেমন, তুষারধবল শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো তুষারের ন্যায় ধবল। এখানে 'তুষার' হলো উপমান এবং যার সঙ্গে তুষারের তুলনা করা হয়েছে তা হলো উপমেয়। আর উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে 'ধবল' বিশেষণ, যা এই সমাসের সাধারণ ধর্ম। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, উপমান কর্মধারয় সমাসে সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমান পদের সমাস হয়। অর্থাৎ, এই সমাসে সাধারণ ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকবে। অপরদিকে, উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয় ও উপমান পদের মধ্যে সমাস হয়। এতে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না। যেমন: 'পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ'। এখানে উপমেয় 'পুরুষ'কে উপমান 'সিংহ'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু সিংহের কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুরুষের সাদৃশ্য রয়েছে তা-র উল্লেখ থাকে না। অপরদিকে, রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় এবং ব্যাসবাক্যে 'রূপ' শব্দটি থাকে। যেমন: 'ভব রূপ নদী = ভবনদী'। এখানে 'ভব' উপমেয় ও 'নদী' উপমান। কিন্তু এখানে সাদৃশ্য নয়, অভেদ কল্পনাকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, এখানে ভব তথা পৃথিবীকেই নদীর সঙ্গে একীভূত রূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পায় এই সমাসে এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। পূর্বপদের যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। পূর্বপদে কোনো বিভক্তি লোপ না পেলে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। তবে, সাধারণত তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তি লোপ পায়। যেমন, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত। এখানে পূর্বপদ 'দুঃখ'-এর সঙ্গে থাকা দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে। আবার পরপদ 'প্রাপ্ত'-এর অর্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বপদে বিভক্তি লোপ এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্য।

বহুব্রীহি সমাস: পূর্বপদ বা পরপদের পরিবর্তে এই সমাসে ভিন্ন অনুল্লিখিত কোনো কিছুকে এই সমাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেমন : 'গায়ে হলুদ' একটি বহুব্রীহি সমাস। এর ব্যাসবাক্য হলো : 'গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে'। লক্ষণীয় যে,

এতে কারও শরীরে হলুদ মাখানোকে বোঝানো হয়নি বরং এর বাইরে বিবাহের একটি অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বহুব্রীহি সমাস হয়ে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে : সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যাতিহার বহুব্রীহি প্রভৃতি।

দ্বিগু সমাস: এই সমাসেও পরপদের অর্থই প্রধান। এতে বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয়। তবে এখানে বিশেষণ পদটি সর্বদাই সংখ্যাবাচক হয়। যেমন : 'পঞ্চবটী'। এর ব্যাসবাক্য হলো : 'পঞ্চ বটের সমাহার'। এ ধরনের কাঠামোতেই অর্থাৎ পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদে 'সমাহার' শব্দবন্ধ রক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই সমাসের ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। একই সঙ্গে এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হিসেবে দেখা দেয়।

অব্যয়ীভাব সমাস : পূর্বপদে অব্যয় বাচক শব্দ এবং তার অর্থই প্রাধান্য পায় এই সমাসে। যেমন, 'মরণ পর্যন্ত = আমরণ'। এখানে পূর্বপদ হিসেবে পর্যন্ত অর্থে 'আ' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরপদ 'মরণ'। কিন্তু এখানে সমস্ত পদটিকে নতুন অর্থ দিয়েছে 'আ' উপসর্গটি। অর্থাৎ, এখানে 'আ' উপসর্গ বা অব্যয় বা পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাস।

প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু, পরি, ইত্যাদি অব্যয় বা উপসর্গের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সমাস হয়। যেমন : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এখানে 'বচন' সমস্যমান পদটি একটি বিশেষ্য, যার মূল বচ্ ধাতু। 'প্র' অব্যয়ের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য 'বচন'-এর সমাস হয়ে সমস্ত পদ 'প্রবচন' শব্দটি তৈরি হয়েছে।

নিত্য সমাস : এই সমাসের সমস্তপদই ব্যাসবাক্যের কাজ করে। অর্থাৎ, এরা নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে। যেমন : অন্যগ্রাম = গ্রামান্তর। এখানে 'অন্য গ্রাম' আর 'গ্রামান্তর', এই বাক্যাংশ ও শব্দটি উভয়েই প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ, সমস্তপদ এবং ব্যাসবাক্য প্রায় অভিন্ন। কেবল 'অন্য' শব্দের বদলে 'অন্তর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটি নিত্য সমাস।

দ্বিরুক্তি ও পরিভাষিক শব্দ

দ্বিরুক্তি

বাংলা ভাষায় কখনও কখনও একই শব্দের একাধিকবার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অর্থের সংকোচন, প্রসারণ, পরিবর্তন ঘটে থাকে। এগুলোকে সাধারণভাবে 'দ্বিরুক্তি' (অর্থাৎ দুইবার উক্ত হয়েছে এমন) নামে আখ্যা দেওয়া হয়। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ কিংবা বাক্যে ব্যবহৃত পদ, এমনকি অনুকার ধ্বনিও একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ বাগর্থ তাৎপর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন- 'তুমি মাঝে মাঝে বেড়াতে এসো।' বাক্যটি যে বক্তব্য প্রকাশ করছে, যদি একবার 'মাঝে' ব্যবহৃত হতো তাহলে তা প্রকাশিত হতো না। দ্বিরুক্তি তিন প্রকারের : শব্দের দ্বিরুক্তি, পদের দ্বিরুক্তি ও অনুকার দ্বিরুক্তি।

শব্দের দ্বিরুক্তি: একই শব্দ অভিন্নভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- ভাল ভাল বই, ফোঁটা ফোঁটা জল, বড় বড় বাড়ি, ইত্যাদি। ধ্বনিগত সাদৃশ্য ও সম্পর্ক আছে এমন শব্দ জোড় তৈরি করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন : কাপড়-চোপড়, লালন-পালন, খোঁজ-খবর প্রভৃতি। কখনও কখনও একই শব্দ অভিন্নভাবে দুইবার ব্যবহৃত না হয়ে এদের কোনো একটি সামান্য ধ্বনিগত পরিবর্তন সহযোগে উচ্চারিত হয়। যেমন : মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্প-সল্প, রকম-সকম প্রভৃতি। এছাড়া সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি হতে পারে। যেমন : ধন-দৌলত, বলা-কওয়া, টাকা-পয়সা। আবার বিপরীতার্থক শব্দযোগেও দ্বিরুক্তি ঘটতে পারে। যেমন- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া প্রভৃতি।

পদের দ্বিরুক্তি : বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদ কখনও কখনও দুইবার ব্যবহৃত হয়ে অর্থের পরিবর্ধন ঘটিয়ে থাকে। পদের দ্বিরুক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিভক্তি চিহ্ন থাকে এবং ওই বিভক্তি চিহ্নেরও দ্বিরুক্তি ঘটে। এক্ষেত্রে, একই পদ অভিন্নভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভাবছিলাম প্রভৃতি। দুটি পদ সম্পূর্ণ এক না থেকে কখনও দ্বিতীয় পদে সামান্য পরিবর্তন ঘটেও ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও সেক্ষেত্রে বিভক্তি চিহ্ন অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন : আমরা হাতে-নাতে চোরটাকে ধরেছি। এছাড়া, ধ্বনিগত সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ কিংবা সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দে একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে এবং পরপর ব্যবহৃত হয়ে পদের দ্বিরুক্তি ঘটতে পারে। যেমন : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। *দেশে বিদেশে* বইটি লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী, আর পথে-প্রবাসে লিখেছেন মুহম্মদ এনামুল হক। পদগত দ্বিরুক্তির কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

আধিক্য বোঝাতে	: রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান, ভাল ভাল আম, ছোট ছোট ডাল।
সামান্য বোঝাতে	: আমার জ্বর জ্বর লাগছে, কবি কবি ভাব, উড়ু উড়ু ভাব।
পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে	: তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।
ক্রিয়া বিশেষণ	: ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
অনুরূপ কিছু বোঝাতে	: তার সঙ্গী সাথি কেউ নেই।
আগ্রহ বোঝাতে	: ও দাদা দাদা বলে ডাকছে।
তীব্রতা বোঝাতে	: গরম গরম জিলাপি। নরম নরম হাত।
সর্বনামের বহুবচন বোঝাতে	: সে সে লোক কোথায় গেল? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।
ক্রিয়ার বিশেষণাত্মক ব্যবহার	: রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।
স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে	: দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এল।
ক্রিয়া বিশেষণ	: দেখে দেখে যাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে	: ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি।

অনুকার দ্বিরুক্তি : কখনও কখনও আপাত অর্থপূর্ণ নয় কিন্তু কোনো বিশেষ কিছুর বৈশিষ্ট্য কিংবা আচরণকে ধ্বনিগত সাদৃশ্যে প্রকাশ করে– এমন অব্যয় শব্দও পরপর ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্তি সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ অনুকার অব্যয়ের সাহায্যে সৃষ্ট কিছু দ্বিরুক্তির উদাহরণ নিম্নরূপ :

ভাবের গভীরতা বোঝাতে	: সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি এত খারাপ!
পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে	: বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে	: ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
বিশেষণ বোঝাতে	: পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
ধ্বনিব্যঞ্জনা	: ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

আরও কিছু অনুকার দ্বিরুক্তির উদাহরণ নিচে সন্নিবেশিত হলো :

বজ্রের ধ্বনি	: কড় কড়
তুমুল বৃষ্টির শব্দ	: ঝম ঝম
স্রোতের ধ্বনি	: কল কল
বাতাসের শব্দ	: শন শন
নূপুরের আওয়াজ	: রুম ঝুম
সিংহের গর্জন	: গর গর
ঘোড়ার ডাক	: চিঁহি চিঁহি
কোকিলের ডাক	: কুহু কুহু
চুড়ির শব্দ	: টুং টাং

পারিভাষিক শব্দ

জ্ঞানচর্চার অংশ হিসেবে বিভিন্ন জ্ঞানশাখাভিত্তিক যোগাযোগের প্রয়োজনে এবং বাংলা ভাষায় সেই সংশ্লিষ্ট কোনো যথোপযুক্ত শব্দ না থাকায় কখনও কখনও নতুন শব্দ তৈরি করে নিতে হয়। অন্য ভাষার শব্দের বাগর্থ, প্রয়োগ ও গঠনগত সাদৃশ্যে সৃষ্ট এ সকল শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলা হয়। এর কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

পারিভাষিক শব্দ	মূল বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	মূল বিদেশি শব্দ
অম্লজান	Oxygen	সচিব	Secretary
উদ্‌যান	Hudrogen	স্নাতক	Graduate
নথি	File	স্নাতকোত্তর	Post Graduate
প্রশিক্ষণ	Training	সমাপ্তি	Final
ব্যবস্থাপক	Manager	সাময়িকী	Periodical

বেতার	Radio	সমীকরণ	Equation
মহাব্যবস্থাপক	General Manager	পাঠক্রম	Curriculum

পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করার চেয়ে তার প্রচলন নিশ্চিত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের পরিভাষা তৈরির পরও ওই শব্দটিই কৃতঋণ হিসেবে বেশি প্রচলিত হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত পরিভাষাটিই ক্রমশ অপরিচিত হয়ে যায়। ওপরের উদাহরণে Oxygen-এর বাংলা পরিভাষা অম্লজান করা হলেও বর্তমানে অক্সিজেন হিসেবেই এটি বেশি পরিচিত। আবার কম্পিউটার, ল্যাপটপ প্রভৃতি শব্দের তো বাংলা পরিভাষা তৈরির কোনো উদ্যোগই গৃহীত হয়নি। সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোনের বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'মুঠোফোন' সৃষ্টির চেষ্টা গৃহীত হলেও তা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। তাই বলা যায় যে, পারিভাষিক শব্দ তৈরিতে ভাষীদের আগ্রহ এবং তাগিদ উভয়েরই বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

শব্দ প্রকরণ

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে প্রচলিত ব্যাকরণে পদ হিসেবে নির্দেশ করা হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো একটি শব্দ তখনই পদ হয়ে উঠতে পারে যদি তা বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং এই সূত্রে বিভক্তি যুক্ত হয়। বাক্যে যখন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয় যা বিভক্তি নামে পরিচিত। যেহেতু শূন্য বিভক্তি যোগের সুযোগ বিদ্যমান সেহেতু বলা যেতে পারে যে, বাক্যের সকল শব্দই বিভক্তিযুক্ত। কিন্তু শব্দ যখন বাক্যের কাঠামোর বাইরে স্বাধীনভাবে থাকে তখন তাকে পদ বলে অভিহিত করার কোনো সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, 'শিশুটি হাসে' বাক্যে 'শিশুটি' বিশেষ্য পদ কিন্তু বাক্যের কাঠামোর বাইরে 'শিশু' কেবল বিশেষ্য শব্দ। কখনও কখনও শব্দ ও পদের গঠন অভিন্ন হতে পারে; যেমন : 'ভালো' একটি বিশেষণ শব্দ, আবার 'সমাজে ভালো মানুষের একান্ত প্রয়োজন' বাক্যে 'ভালো' বিশেষণ পদ। এরা দেখতে অভিন্ন হলেও এদের ব্যাকরণিক অবস্থান এক নয়। এ কারণে শব্দ প্রকরণের অংশ হিসেবেই বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সূত্রে বলা চলে যে, বাংলা ভাষায় পাঁচ শ্রেণির শব্দ রয়েছে। এগুলো হলো : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়া।

বিশেষ্য : কোনো কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ প্রভৃতির নাম প্রকাশক শব্দই হলো বিশেষ্য। বিশেষ্য ছয় প্রকার। নিচে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ্যের উদাহরণ দেওয়া হলো :

নামবাচক বিশেষ্য

(ক) ব্যাক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল
(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা
(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর
(ঘ) গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশে বিদেশে, বিশ্বনবী

জাতিবাচক বিশেষ্য

(এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ

বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য

বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি)

সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল

ভাববাচক বিশেষ্য

(ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়) গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন. দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া

গুণবাচক বিশেষ্য

মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ

বিশেষণ :বিভিন্ন প্রকার শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে বিশেষণ। বিশেষণের মূল কাজ হলো বিশেষিত করা। বিশেষণ প্রধানত দুই প্রকার : নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ। নাম বিশেষণ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দকে এবং বাক্য-অন্তর্গত পদকে বিশেষিত করে; পক্ষান্তরে, ভাব বিশেষণ বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দ ছাড়া অন্য যে কোনো শব্দকে এবং বাক্য-অন্তর্গত পদকে বিশেষিত করে। নিচে বিভিন্ন ধরনের বিশেষণের উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

বিশেষ্যের বিশেষণ : নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট্ট পাখি উড়ে যাচ্ছে।

সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে একবার এসো।

বিশেষণের বিশেষণ (কোনো বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকেও বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।) : ও অতি ভালো ছেলে। গাঢ়/টকটকে লাল গোলাপ।

নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ : রকেটি অতি দ্রুত চলে।

অব্যয়ের বিশেষণ (অব্যয়ের অর্থকে বিশেষিত করে) : ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।

বাক্যের বিশেষণ (সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে) : দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন (degree): দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনামের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের অতিশায়ন ঘটে। বিভিন্নভাবে এই অতিশায়নরে বিষয়টি সম্পাদিত হয়। নিচে তা নির্দেশ করা হলো :

দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মধ্যে হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন : গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি; বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান, প্রভৃতি। তবে, কখনও কখনও প্রথম বিশেষ্যের শেষের ষষ্ঠী বিভক্তিই হতে, থেকে, চেয়ে-র কাজ করে। যেমন : এ মাটি সোনার বাড়া (সোনার চেয়েও বাড়া)। দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর প্রদানের জন্য মূল বিশেষণের পূর্বে 'অনেক', 'অধিক', 'বেশি', 'অল্প', 'কম', 'অধিকতর'প্রভৃতি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন : পদ্মফুল গোলাপের চেয়ে বেশি সুন্দর; ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী প্রভৃতি।

বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সবথেকে, সবচেয়ে,সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন:

তোমাদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান; পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান, প্রভৃতি।

সংস্কৃত থেকে আগত বিশেষণের অতিশায়নের ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তর' এবং বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তম' যোগ হয়। যেমন : গুরু- গুরুতর- গুরুতম; দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম প্রভৃতি। কখনও আবার দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ঈয়স' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : লঘু- লঘীয়ান- লঘিষ্ঠ; অল্প- কনীয়ান- কনিষ্ঠ; বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যেষ্ঠ; শ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ। উল্লেখ্য যে, দুয়ের তুলনায় এই নিয়মের ব্যবহার বাংলায় হয় না।

সর্বনাম : বিশেষ্য শব্দের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাই হলো সর্বনাম। বিভিন্ন ধরনের সর্বনাম রয়েছে। এগুলো হলো :

ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক	: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
আত্মবাচক	: স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি
সামীপ্যবাচক	: এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
দূরত্ববাচক	: ঐ, ঐসব, সব
সাকল্যবাচক	: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
প্রশ্নবাচক	: কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কীসে
অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	: কোন, কেহ, কেউ, কিছু
ব্যতিহারিক	: আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর
সংযোগজ্ঞাপক	: যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা
অন্যাদিবাচক	: অন্য, অপর, পর

সাপেক্ষবাচক : যত-তত, যেই-সেই, যেমন-তেমন

অব্যয় : কোনো প্রকার ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় এসব শব্দের কোনো পরিবর্তন ঘটে না বলে এদের অব্যয় বলা হয়। বাক্যে ব্যবহৃত হলেও, অব্যয় পদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এরা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বাক্যকে আরও শ্রুতিমধুর করে; কখনো-বা একাধিক পদ বা বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের অব্যয় রয়েছে। এগুলো হলো :

সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।

সংযোজক অব্যয় : ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি। উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। (উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়); তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (তাই অব্যয়টি 'তিনি সৎ' ও 'সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে' বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

বিয়োজক অব্যয় : কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি। আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। (আবুল, আব্দুল- এদের একজন করেছে, আরেকজন করেনি। সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ('মন্ত্রের সাধন' আর 'শরীর পাতন' বাক্যাংশ দুটির একটি সত্য হবে, অন্যটি মিথ্যা হবে।)

সংকোচক অব্যয় : কিন্তু, বরং, তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি। তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ। (এখানে 'শিক্ষিত' ও 'অসৎ' দুটোই সত্য, কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটেনি। কারণ, বৈশিষ্ট্য দুটো একরকম নয়, বরং বিপরীতধর্মী। ফলে তিনি অসৎবলে তিনি শিক্ষিত বাক্যাংশটির ভাবের সংকোচ ঘটেছে।)

অনন্বয়ী অব্যয় : এগুলো নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। এরা বাক্যের অন্য কোনো পদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

উচ্ছ্বাস প্রকাশে	: মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!
স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে	: হ্যা, আমি যাব। না, তুমি যাবে না।
সম্মতি প্রকাশে	: আমি আজ নিশ্চয়ই যাব।
অনুমোদন প্রকাশে	: এতো করে যখন বললে, বেশ তো আমি আসবো।
সমর্থন প্রকাশে	: আপনি তো ঠিকই বলছেন।
যন্ত্রণা প্রকাশে	: উঃ! বড্ড লেগেছে।
ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	: ছি ছি, তুমি এতো খারাপ!
সম্বোধন প্রকাশে	: ওগো, তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।
সম্ভাবনা প্রকাশে	: সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/ পাছে লোকে কিছু বলে।
বাক্যালংকার হিসেবে	: কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজ মনে।

অনুসর্গ অব্যয় : বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের কারকবাচকতা প্রকাশ করার কাজ করে অনুসর্গ অব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (এখানে 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তির মতো কাজ করেছে, এবং 'ওকে' যে কর্ম কারক, তা নির্দেশ করেছে। এই 'দিয়ে' হলো অনুসর্গ অব্যয়)।

ক্রিয়াঃ

ভাষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ক্রিয়া। এটি কোনো কাজ করা বোঝায়। বাংলা ভাষায় ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কাল অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটায়। ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি বাক্যে অপরিহার্য। বিভিন্নভাবে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ সম্ভব। নিচে এগুলো আলোচিত হলো :

সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়া : সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটায়। একটি বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতেই হয়। অপরদিকে, অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যে বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটায় না। প্রসঙ্গত দুটি উদাহরণ লক্ষণীয় : ছেলেরা খেলছে। মেয়েরা খেলে বাড়িতে ফিরল। প্রথম বাক্যে 'খেলছে' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'ফিরল' সমাপিকা ক্রিয়া। অপরদিকে, দ্বিতীয় বাক্যে 'খেলে' ক্রিয়াটি ভাবের বা বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটাচ্ছে না বলে তা অসমাপিকা ক্রিয়া। একটি বাক্যে যতোগুলো প্রয়োজন অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা যায়। সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে ইয়া, ইলে, ইতে, এ, লে, তে বিভক্তিগুলো যুক্ত থাকে।

সকর্মক-অকর্মক-দ্বিকর্মক ক্রিয়া : বাক্যে ব্যবহৃত কর্মপদের ওপর নির্ভর করে ক্রিয়াকে অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক– এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাক্যে যে সকল পদকে আশ্রয় করে ক্রিয়া তার কাজ সম্পাদন বা সংঘটন করে, তাকে বা তাদের কর্মপদ বলে।

ক্রিয়াপদকে 'কী/ কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই কর্মপদ। যেমন- মেয়েটি তার বন্ধুকে কলমটি দিল। এই বাক্যে 'কে', 'কী' এবং 'কাকে' এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য যে, 'কে' প্রশ্ন দিয়ে বাক্যের কর্তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সাধারণত বাক্যে কর্তা উহ্য বা প্রত্যক্ষ হিসেবে থাকে। এর বাইরে এই বাক্যে 'কী' এবং 'কাকে'-র উত্তর মেলে; অর্থাৎ এই বাক্যে দুটি কর্ম রয়েছে। তাই একে বলা হয় দ্বিকর্মক ক্রিয়া। আবার, 'মেয়েটি ছবি আঁকে' বাক্যে একটি কর্ম রয়েছে। তাই এটি সকর্মক ক্রিয়ার বাক্যের উদাহরণ। অপরদিকে, বাক্যে যদি কেবল কর্তা ও ক্রিয়া থাকে কিন্তু কোনো কর্ম না থাকে তবে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন : মেয়েটি হাসে।

প্রযোজক ক্রিয়া: এই ক্রিয়া একজনের প্রযোজনায় আরেকজনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রযোজক ক্রিয়ার দুজন কর্তা থাকে। এরমধ্যে একজন কর্তা কাজটি আরেকজন কর্তাকে দিয়ে করান। প্রযোজক ক্রিয়ার দুইজন কর্তার মধ্যে যিনি কাজটি করান, তাকে বলে প্রযোজক কর্তা। আর যিনি কাজটি করেন, তাকে বলে প্রযোজ্য কর্তা। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাচ্ছেন। এখানে 'ব্যাকরণ শেখার' কাজটি করছে 'ছাত্রেরা', কিন্তু শেখাচ্ছেন 'শিক্ষক'। অর্থাৎ, 'শিক্ষক' কাজটি প্রযোজনা করছেন। তাই 'শিক্ষক' এখানে প্রযোজক কর্তা। আর 'ব্যাকরণ শেখার' কাজটি আসলে 'ছাত্ররা' করছে, তাই 'ছাত্রেরা' এখানে প্রযোজ্য কর্তা।

নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে সব ধাতু গঠিত হয়, তাদেরকে নামধাতু বলে। নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে নামধাতুর ক্রিয়ার গঠিত হয়। যেমন : বিশেষ্য বেত+আ = বেতা, ক্রিয়া = বেতানো, বেতাচ্ছেন; বিশেষণ = বাঁকা+আ = বাঁকা, ক্রিয়াপদ = বাঁকানো, বাঁকাচ্ছেন প্রভৃতি।

যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি বসে যদি কোনো বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। সাধারণত যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, একাধিক ক্রিয়া যুক্ত হয়ে তাদের সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। কয়েকটি উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

ঘটনাটা শুনে রাখ। (শোনার বদলে তাগিদ দেয়া অর্থ বুঝিয়েছে)
তিনি বলতে লাগলেন। (ক্রিয়ার ঘটমানতা বোঝাচ্ছে)
ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল। (শোওয়ার পাশাপাশি কার্যসমাপ্তিও বোঝাচ্ছে)
সাইরেন বেজে উঠল। (আকস্মিকতা বোঝাতে)
শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে। (অভ্যস্ততা অর্থে)
এখন যেতে পার। (যাওয়ার অনুমোদন অর্থে)

মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়ু, ধর্ মার্ প্রভৃতি ধাতু যোগ হয়ে মিশ্র ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ : মানা কর্, ভাত দে ইত্যাদি।

ব্যাকরণিক উপাদান

পুরুষ

উত্তম পুরুষ : বাক্যের বক্তার ভূমিকা যে পালন করে তাকেই উত্তম পুরুষ হিসেবে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করছে, সেই উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো : আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ : যাকে উদ্দেশ করে বক্তা বাক্য উচ্চারণ করে তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের ইত্যাদি।

নামপুরুষ : বাক্যে অনুপস্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর উল্লেখ বক্তা করেন, তাদের নামপুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন যা কিছুর কথা বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নামপুরুষ। নাম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।

বচন

বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের সংখ্যাবাচকতা বোঝাতে বচন ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার : একবচন ও বহুবচন। একজন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝাতে সংখ্যাবাচক শব্দের এক বচনের রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : ছেলেটা, একটি মেয়ে, প্রভৃতি। অপরদিকে, বহুবচন নির্দেশক শব্দ দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝান হয়। যেমন : ছেলেগুলো, কয়েকটি কলম, সারি সারি গাছ প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনামের বচনভেদ হয়। কখনোই বিশেষণের বচনভেদ হয় না। কেবল উন্নত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা/এরা' ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে, বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে 'গুলা/গুলি/গুলো' যুক্ত হয়।

বহুবচন বাচক শব্দের ব্যবহার

গণ- দেবগণ, নরগণ, জনগণ
বৃন্দ- সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ,
মণ্ডলী- শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী
বর্গ- পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ
কুল- পক্ষিকুল, বৃক্ষকুল
সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল
সব- ভাইসব, পাখিসব
সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ
পাল- গরুর পাল
যূথ- হস্তিযূথ
আবলি- পুস্তকাবলি
গুচ্ছ- কবিতাগুচ্ছ
দাম- কুসুমদাম
নিকর- কমলনিকর
পুঞ্জ- মেঘপুঞ্জ
মালা- পর্বতমালা
রাজি- তারকারাজি
রাশি- বালিরাশি
নিচয়- কুসুমনিচয়

কখনও কখনও একবচন নির্দেশক বিশেষ্য ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন : সিংহ বনে থাকে (সব সিংহ বনে থাকে বোঝাচ্ছে)। পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। বাজারে লোক জমেছে।

একবচন নির্দেশক বিশেষ্যের আগে বহুত্ব জ্ঞাপক শব্দ, যেমন : অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন : অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা প্রভৃতি। বিশেষ্য পদ বা তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে, অর্থাৎ পদটি পরপর দুইবার ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, লাল লাল ফুল, বড় বড় মাঠ প্রভৃতি। এছাড়াও বিশেষ কিছু নিয়মে বাংলা ভাষায় বহুবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন : এটাই করিমদের বাড়ি ('করিমদের' বলতে এখানে করিমের পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে)। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মান না ('রবীন্দ্রনাথরা' বলতে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকদের বোঝানো হচ্ছে)। উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় একই সঙ্গে একাধিক/ একটির বেশি বহুবচন নির্দেশক শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহার করা যায় না। যেমন : 'সকল ছেলেরা' বললে তা ভুল হবে। বলতে হবে 'সকল ছেলে' বা 'ছেলেরা'।

নারী ও পুরুষবাচক শব্দ

বিশ্বের অনেক ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও নারী ও পুরুষ ভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। তবে, বাংলা ভাষায় নারী-পুরুষের এই ভেদ ব্যাকরণিক নয়। অর্থাৎ, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মতো জড়বস্তু কিংবা বিশেষণে নারী কিংবা পুরুষবাচক চিহ্ন যুক্ত হয় না। বাংলা ভাষায় নারীবাচক শব্দ যেমন রয়েছে তেমনি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে। পুরুষবাচক

শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো : বাপ, ভাই, ছেলে প্রভৃতি। নারীবাচক কয়েকটি শব্দ হলো : মা, বোন, মেয়ে প্রভৃতি। নারী প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ঈ-প্রত্যয় : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, বেঙ্গম-বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে- ভাগনী

নী-প্রত্যয় : কামার-কামারনি, জেলে-জেলেনি, কুমার-কুমারনি, ধোপা-ধোপানি, মজুর-মজুরনি পুরুবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে নী-প্রত্যয় যোগ হলে আগের 'ঈ', 'ই' হয়। যেমনঃ ভিখারী- ভিখারিনী

আনী-প্রত্যয় : আচার্য-আচার্যানী

ইনি-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনি, গোয়ালা- গোয়ালিনি, বাঘ-বাঘিনি

উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকরুন

আইন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরাইন

আ-প্রত্যয় : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা, অজ-অজা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া

ইকা-প্রত্যয় : শব্দের শেষে অক থাকলে ইকা-প্রত্যয় যোগ হয় এবং অক'-এর স্থলে ইকা হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা।

পুরুবাচক শব্দ গঠনের জন্য কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা প্রভৃতি ও নারীবাচক শব্দ গঠনের জন্য স্ত্রী, মাদি, মাদা, ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যেমনঃ মর/ মদ্দা/ হুলো বিড়াল- মেনি বিড়াল, পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে- মেয়েছেলে, পুরুষ কয়েদি- নারী কয়েদি, বলদ গরু- গাই গরু প্রভৃতি।

শব্দের শেষে পুরুষ বা নারীবাচক শব্দ যোগ করেও এ ধরনের শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন : বোন-পো- বোন-ঝি, ঠাকুর-পো- ঠাকুর-ঝি, গয়লা- গয়লা-বউ, জেলে- জেলে-বউ। যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' আছে, সেগুলোর শেষে 'ত্রী' হয়। যেমন- নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী প্রভৃতি। পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে নারীবাচক শব্দে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন : সৎ-সতী, গুণবান-গুণবতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরিয়সী। এছাড়া, বিশেষ নিয়মে গঠিত নারীবাচক শব্দ : সম্রাট- সম্রাজ্ঞী, যুবক-যুবতি, শ্বশুর-শ্বশ্রূ, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর- জা, শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

২. শব্দ বলতে কী বোঝেন? উৎস অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৩. গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।
৪. বাগর্থ অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
৫. শব্দের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ইউনিট ৫
বাক্যতত্ত্ব

পাঠ ৫.১ : বাক্যের ধারণা ও সংজ্ঞার্থ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাক্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাক্যের সংজ্ঞার্থ বলতে পারবেন।
- বাক্য রচনার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভূমিকা:

বাক্য ভাষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। একাধিক শব্দকে পাশাপাশি ব্যবহার করলেই বাক্য হয় না। বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেই তা বাক্যের পর্যায়ে পড়ে।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে বাক্যের সংজ্ঞার্থ প্রদান করেছেন এভাবে: "একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।"

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, "যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাকে বাক্য বলে।"

তাহলে বাক্যের সংজ্ঞার্থ এভাবে দেওয়া যায় যে, অর্থবোধক একাধিক পদের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে বাক্য বলে।

সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন বাক্যে কর্তা ও ক্রিয়া থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তা উহ্য থাকতে পারে। যেমন: যাও। খাও। শব্দগুলো গঠনের দিক থেকে একটিমাত্র শব্দের বাক্য হলেও এগুলোতে একাধিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

যাও। বাক্যের অন্তর্নিহিত রূপ– তুমি যাও।

খাও। বাক্যের অন্তর্নিহিত রূপ– তুমি খাও।

বাক্যের অংশ

প্রতিটি বাক্যের প্রধান অংশ থাকে দুটি। একটি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়।

উদ্দেশ্য: বাক্যে যাকে লক্ষ্য করে বা যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলা হয়। যেমন- মেয়েটি পড়ছে। প্রদত্ত বাক্যে মেয়েটি উদ্দেশ্য। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে একাধিক পদও থাকতে পারে। যেমন-

'সালমা, আরিফ, রিতা স্কুলে যায়।'

এখানে 'সালাম', 'আরিফ' ও 'রিতা' এই তিনটি পদ বাক্যের উদ্দেশ্য।

বিধেয়: বাক্যের যে অংশে উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন– ছেলেরা খেলছে। প্রদত্ত বাক্যে ‘খেলছে’ বিধেয়। বাক্যের বিধেয় অংশের মূল হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া। তবে অনেক সময় একাধিক ক্রিয়াও বিধেয় অংশে থাকতে পারে। যেমন- রহিম যেতে পারবে না।

প্রদত্ত বাক্যে ‘যেতে পারবে না’ বিধেয়।

বাক্য দীর্ঘ হলে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারিত হয়। যেমন-

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ কৌশল	সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
বিশেষণ যোগে	কুখ্যাত	জঙ্গি বাহিনী	ধরা পড়েছে।
সম্বন্ধ পদ যোগে	রহমানের	ভাই	এসেছে।
সমার্থক বাক্যাংশ যোগে	যারা সাধক	তারাই	সফল হবে।
অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে	চাটুকার পরিবৃত হয়েই	করিম সাহেব	থাকেন।
বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে	যার কথা তোমরা প্রায়ই বলে থাক	তিনি	এসেছেন।

বিধেয় সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ কৌশল	উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
ক্রিয়া বিশেষণ যোগে	কচ্ছপ	ধীর গতিতে	চলে।
ক্রিয়া বিশেষণ যোগে	জেট বিমান	অতিশয় দ্রুত	চলে।
কারক সহযোগে	আমি	ভুবনের ঘাটে ঘাটে	ভাসছি।
ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে	তারা	যেভাবেই হোক	যাবেন।
বিধেয় বিশেষণ যোগে	তারিন	অতি সুন্দর	গান গায়।

সার্থক বাক্যের গুণ বা বৈশিষ্ট্য:

একটি বাক্যকে সার্থক ও শুদ্ধ হতে হলে কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এগুলো হচ্ছে–

১. আকাঙ্ক্ষা

২. আসত্তি এবং

৩. যোগ্যতা

১. আকাঙ্ক্ষা: ‘আকাঙ্ক্ষা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ– ইচ্ছা, বাসনা। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য একপদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা-ই আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ বলা যায়– শ্রোতার ইচ্ছা বা বাসনার নিবৃত্তি ঘটলেই সার্থক বাক্য গঠিত হয়। যেমন-

আমরা গতকাল বই মেলায়, বাক্যটিতে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে না এবং শ্রোতার শোনার আকাঙ্ক্ষাও মেটে না। তাই বাক্যটি সার্থক নয়। কিন্তু ‘আমরা গতকাল বইমেলায় গিয়েছিলাম’ বাক্যটিতে বক্তার মনোভাব ও শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটেছে। তাই বাক্যটি সার্থক।

২. আসত্তি : আসত্তি শব্দের অর্থ নৈকট্য। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলি এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে যাতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক থাকে এবং ভাষার নিয়ম অনুযায়ী নৈকট্য থাকে। যেমন- যাব আমি ভাত কলেজে খেয়ে। এখানে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া অনুযায়ী বাক্যগুলো সাজানো নেই। তাই এটি সার্থক বাক্য নয়। বরং একটি সার্থক বাক্য হতে হলে তা হবে- "আমি ভাত খেয়ে কলেজে যাব।" এই বাক্যটিতে সঠিক পদবিন্যাস থাকায় এটি সার্থক বাক্য।

৩. যোগ্যতা : বাক্যের পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মেলবন্ধনের নামই যোগ্যতা। যেমন- বর্ষাকালে জলপথে নৌকা চলে। এটি একটি যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য। কারণ বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মিল রয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়- "বর্ষাকালে আকাশ পথে নৌকা চলে" তবে বাক্যটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ নৌকা আকাশ পথে চলে না। সার্থক বাক্যের জন্য অর্থ সংগতি বা যোগ্যতা থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাক্য কাকে বলে? বাক্যের কয়টি অংশ ও কী কী?

২. সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

৩. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫.২ : বাক্যের প্রকারভেদ ও বাক্য পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- অর্থ অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- বাক্য রূপান্তরের নিয়ম বলতে পারবেন।
- বাক্য রূপান্তর করতে পারবেন।

বাক্যের শ্রেণিবিভাগ

সার্থক বাক্যকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। যেমন: ক. গঠন অনুসারে বাক্য খ. অর্থ অনুসারে বাক্য।

ক. গঠন অনুসারে বাক্য :

গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে আমরা তিন প্রকার বাক্য পাই।

১. সরল বাক্য

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য

৩. যৌগিক বাক্য

১. সরল বাক্য : যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- 'রহিম প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যায়।'

প্রতিদিন বাক্যটিতে 'রহিম' উদ্দেশ্য ও 'প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়' বিধেয়। সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারিত হতে পারে।

২. মিশ্র বা জটিল বাক্য : কোনো কোনো বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্য থাকতে পারে। এই অপ্রধান খণ্ডাংশ মূল বাক্যেরই অংশ। এ ধরনের বাক্যকে মিশ্র বাক্য বলে। যেমন- 'সে যদি আসে তবে আমি খাব।'

বাক্যটিতে 'সে যদি আসে' অপ্রধান খণ্ডবাক্য আর 'তবে আমি খাব' প্রধান খণ্ডবাক্য।

খণ্ডবাক্য : একাধিক বাক্য মিলে একটি জটিল বাক্য তৈরি হলে বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্য যদি স্বাধীন বাক্য না হয়ে অন্য কোনো বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে তাকে খণ্ডবাক্য বলে। যেমন- 'যদি তুমি আস তাহলে আমি যাব', এখানে 'তুমি আস' এবং 'আমি যাব' বাক্যাংশ দুটি খণ্ডবাক্য।

খণ্ডবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. প্রধান খণ্ডবাক্য

খ. অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্য

ক. প্রধান খণ্ডবাক্য : বাক্যে ব্যবহৃত যে খণ্ডবাক্য অর্থ– প্রকাশের জন্য বাক্যের অন্য অংশের ওপর নির্ভরশীল নয়, তাকে প্রধান খণ্ডবাক্য বলে। যেমন- 'আমি জানি যে সে কাজটি করেছে।'

এখানে 'সে কাজটি করেছে' বাক্যটি প্রধান খণ্ডবাক্য। বাক্যটি এককভাবে উপস্থাপন করা হলেও এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়।

খ. অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্য : বাক্যে ব্যবহৃত যে খণ্ডবাক্য তার পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশের জন্য প্রধান খণ্ডবাক্যের ওপর নির্ভরশীল হয়, তাকে অধীন বা আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলে। যেমন- 'আমি অবাক হলাম তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে।'

এখানে 'তোমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে' আশ্রিত খণ্ডবাক্য। বাক্যটি নিজেই নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। অর্থ প্রকাশের জন্য প্রধান খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

জটিল বাক্য প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

ক. আশ্রয়-আশ্রিত জটিল বাক্য

খ. সাপেক্ষ-পদযুক্ত জটিল বাক্য ও

গ. প্রতি-নির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য।

ক. আশ্রয়-আশ্রিত জটিল বাক্য: যে জটিল বাক্যের আশ্রিত খণ্ডবাক্যটি প্রধান খণ্ডবাক্যের আশ্রয়ে থাকে এবং প্রধান খণ্ডবাক্যের সম্পূরক রূপে কাজ করে তাকে আশ্রয়-আশ্রিত জটিল বাক্য বলে। যেমন- 'নিপা যে আসবে, তা বলা যায় না।

খ. সাপেক্ষ-পদযুক্ত জটিল বাক্য : যে জটিল বাক্যের আশ্রিত খণ্ডবাক্য প্রধান খণ্ডবাক্যের বিধেয় ক্রিয়া সংগঠনের উপর নির্ভর করে, তাকে সাপেক্ষ-পদযুক্ত জটিল বাক্য বলে। যেমন- 'কাল যদি বৃষ্টি হয়, তবে স্কুল বন্ধ থাকবে।'

এ ধরনের জটিল বাক্যের প্রধান খণ্ডবাক্যে সাধারণত সাপেক্ষ অব্যয় 'যদি' এবং আশ্রিত খণ্ডবাক্যে 'তাহলে / তবে / না হয়' ইত্যাদি যুক্ত থাকে।

গ. প্রতি-নির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য : যখন-তখন, যা-তা, যাহা-তাহা, যার-তার, যেখানে-সেখানে, যথা-তথা ইত্যাদি প্রতিনির্দেশক সর্বনাম ব্যবহার করে জটিল বাক্য গঠন করলে। তাকে প্রতিনির্দেশক সর্বনাম যুক্ত জটিল বাক্য বলে। যেমন- 'যখন রোদ উঠল, তখন আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি।'

৩. যৌগিক বাক্য : দুই বা তার বেশি সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি দীর্ঘবাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু অথবা, কিংবা, বরং তথাপি ইত্যাদি অব্যয়যোগে সংযুক্ত থাকে। সরল বাক্যের সাথে সরল বাক্য বা জটিল বাক্যের সঙ্গে জটিল বাক্য বা সরল

বাক্যের সঙ্গে জটিল বাক্য বা জটিল বাক্যের সাথে সরল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠিত হয়। যেমন- 'তুমি বুদ্ধিমান কিন্তু তোমার সাথে যে এসেছিল সে বোকা।'

খ. অর্থ অনুসারে বাক্যঃ

অর্থ অনুসারে বাংলা বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১. বিবৃতিমূলক বা বর্ণনামূলক বাক্য;

২. প্রশ্নসূচক বাক্য;

৩. আদেশসূচক বাক্য;

৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য;

৫. বিস্ময়সূচক বাক্য;

তবে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অর্থ অনুযায়ী বাক্যকে সাত শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমনঃ

১. নির্দেশসূচক বাক্য;

২. প্রশ্নবাচক বাক্য;

৩. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য;

৪. আজ্ঞাসূচক বাক্য;

৫. কার্যকারণাত্মক বাক্য;

৬. সংশয়সূচক বা সন্দেহদ্যোতক বাক্য;

৭. আবেগসূচক বাক্য।

নিচে এগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. বিবৃতিমূলক বাক্য :

যে বাক্যে কোনো বক্তব্য সাধারণভাবে বিবৃত বা বর্ণনা নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণনামূলক বা বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। যেমন- 'ওসমান ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে। বিবৃতিমূলক বাক্য দুই প্রকারের। যথা-

ক. অস্তিবাচক বাক্য

খ. নেতিবাচক বাক্য

ক. অস্তিবাচক বাক্যঃ যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব হ্যাঁ-বোধক অর্থ প্রকাশ করে, তাকে অস্তিবাচক বাক্য বা হ্যাঁ-বাচক বাক্য বলে। যেমন- 'ভাল জিনিসের কদর বেশি।'

খ. নেতিবাচক বাক্য : যে বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা বক্তব্যের অস্তিত্ব না-বোধক অর্থে প্রকাশ করে, তাকে নেতিবাচক বাক্য বলে। যেমনঃ 'ফরিদা আজ স্কুলে যাবে না।'

২. প্রশ্নবোধক বাক্য :

যে বাক্যে কোনো ঘটনা, কাহিনি বা বক্তব্য বর্ণনায় প্রশ্নসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। যেমনঃ 'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?'

৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য :

যে বাক্য দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, অনুমতি, নিষেধ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন- 'দয়া করে বইটি দিন।'

৪. ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য :

যে বাক্যে বক্তার ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য বলে। যেমন- 'তুমি সাধনায় সফল হও।'

৫. আবেগসূচক বাক্যঃ

যে বাক্যে বক্তার মনের আনন্দ, বেদনা, শোক-বিষাদ ইত্যাদি আবেগ প্রকাশ পায়, তাকে আবেগসূচক বাক্য বলে। যেমন- 'হুররে! আমরা খেলায় জিতেছি।'

৬. সংশয়সূচক বাক্যঃ

যে ধরনের নির্দেশক বাক্যে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে সংশয়, সন্দেহ, সম্ভাবনা, অনুমান, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে সংশয়সূচক বাক্য বলে। যেমন- 'মনে হয়, রহমান পাস করবে না।'

৭. কার্যকারণাত্মক বাক্যঃ

যে সব বাক্যে কোনো নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত প্রকাশ পায়, তাকে কার্যকরাণাত্মক বাক্য বলে। যেমন- 'যদি আমি আসতে না পারি, তাহলে তুমি চলে যেও।'

বাক্যের পরিবর্তন

বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না করে এক প্রকারের বাক্যকে অন্য প্রকারের বাক্যে পরিবর্তন বা রূপান্তর করার নামই বাক্য পরিবর্তন বা বাক্য রূপান্তর। তবে বাক্য রূপান্তরের সময় মূল বাক্যের সাধু ও চলতিভাষারীতি অপরিবর্তিত রাখা দরকার। যেমন-

পরিশ্রমী লোক সফলতা লাভ করে।

এর রূপান্তর হয় এভাবে- যে পরিশ্রম করে সেই সফলতা লাভ করে।

বাক্য পরিবর্তনের প্রকারভেদঃ

বাক্যের পরিবর্তনকে তিনভাবে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা-

১. গঠনগত পরিবর্তন।
২. ভাবগত পরিবর্তন।
৩. উক্তির পরিবর্তন।

নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা হলোঃ

	বাক্য পরিবর্তন	
১. গঠনগত পরিবর্তন	২. ভাবগত পরিবর্তন	৩. উক্তির পরিবর্তনগত পবিরর্তন
সরল থেকে জটিল বাক্য	অস্তিবাচক থেকে নেতিবাচক	প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ
জটিল থেকে সরল বাক্য	নেতিবাচক থেকে অস্তিবাচক	পরোক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ
সরল থেকে যৌগিক বাক্য	নির্দেশাত্মক থেকে প্রশ্নবাচক	
যৌগিক থেকে সরল বাক্য	প্রশ্নবাচক থেকে নির্দেশাত্মক	
জটিল থেকে যৌগিক বাক্য	নির্দেশাত্মক থেকে অনুজ্ঞাসূচক	
যৌগিক থেকে জটিল বাক্য	অনুজ্ঞাসূচক থেকে নির্দেশাত্মক	
	নির্দেশাত্মক থেকে প্রার্থনাসূচক	
	প্রার্থনাসূচক থেকে নির্দেশাত্মক	
	নির্দেশাত্মক থেকে বিস্ময়সূচক	
	বিস্ময়সূচক থেকে নির্দেশাত্মক।	

নিচে বিভিন্ন প্রকার বাক্য পরিবর্তনের সূত্র ও উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

১। গঠনগত পরিবর্তন:

ক. সরল বাক্য থেকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র।

১. সরল বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

২. বাক্য দুটির প্রথমে সম্বন্ধসূচক অব্যয় (যদি-তবে, যে-সে, যখন-তখন ইত্যাদি) ব্যবহার করতে হবে।

৩. আশ্রিত খণ্ডবাক্য ও প্রধান খণ্ডবাক্যকে পরস্পর সাপেক্ষ করতে হবে।

৪. বাক্য পরিবর্তিত হলেও মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

যেমন: সরল: সত্যবাদীকে সবাই ভালোবাসে।

জটিল: যে সত্যবাদী, তাকেই সবাই ভালোবাসে।

সরল: বিদ্বান ব্যক্তিরা সম্মান পায়।

জটিল: যারা বিদ্বান, তারা সম্মান পায়।

সরল: ধনীরা প্রায় কৃপণ হয়।

জটিল: যারা ধনী, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

সরল: আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

জটিল: তুমি সেই, যাকে আমি নিতে এসেছি।

খ. জটিল বাক্য থেকে সরল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. জটিল বাক্যকে একটি অংশে রূপান্তর করতে হয়।

২. প্রধান খণ্ডবাক্যকে পরিবর্তন না করে অপ্রধান বা আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিবর্তন করতে হয়।

৩. অপ্রধান খণ্ডবাক্যকে সংকোচন করতে হয়।

৪. সম্বন্ধসূচক অব্যয় বা সাপেক্ষ সর্বনাম পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হয়।

৫. একটি বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়।

৬. বাক্য পরিবর্তন হলেও মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকবে।

যেমন: জটিল: যখন মেঘগর্জন করে, তখন ময়ূর নৃত্য করে।

সরল: মেঘগর্জন করলে ময়ূর নৃত্য করে।

জটিল: সে যদি কাল আসে, তবে আমি যাব।

সরল: সে কাল এলে আমি যাব।

জটিল: যে সকল পশু মাংস ভোজন করে, তারা অত্যন্ত বলবান।

সরল: মাংসভোজী পশুরা অত্যন্ত বলবান হয়।

জটিল: যে রক্ষক, সেই ভক্ষক।

সরল: রক্ষকই ভক্ষক।

গ. সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র:

১. সরল বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হয়।

২. আশ্রিত বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়ায় রূপান্তর করতে হয়।

৩. খণ্ডবাক্যগুলোকে সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা যুক্ত করতে হয়।

৪. বাক্যের পরিবর্তন হলেও বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।

যেমন: সরল: আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি।

যৌগিক : আমি বহু কষ্ট করেছি, তাই শিক্ষা লাভ করেছি।

সরল: দয়া করে সব খুলে বলুন।

যৌগিক : দয়া করুন এবং সব খুলে বলুন।

সরল: তার বয়স হলেও বুদ্ধি হয়নি।

যৌগিক : তার বয়স হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি।

সরল: বিদ্বান হলেও তার অহংকার নেই।

যৌগিক: তিনি বিদ্বান তথাপি তার অহংকার নেই।

ঘ. যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. বাক্য পরিবর্তন হলেও বাক্যের মূল অর্থের পরিবর্তন হয় না।

২. বাক্যটিকে একটি অংশে পরিণত করতে হয়।

৩. প্রধান খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

৪. আশ্রিত খণ্ডবাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

৫. সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক ইত্যাদি অব্যয় পদ থাকলে তা বর্জন করতে হয়।

যেমন: যৌগিক বাক্য: সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল: সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য: তুমি আসবে এবং আমি যাবো।

সরল বাক্য: তুমি এলে আমি যাব।

যৌগিক: ছেলেটি গরিব কিন্তু মেধাবী।

সরল: ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।

যৌগিক: আকাশে মেঘ ছিল না, কিন্তু বজ্রপাত হলো।

সরল: আকাশে মেঘ না থাকা সত্ত্বেও বজ্রপাত হলো।

ঙ. জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র:

১. জটিল বাক্যকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হয়।

২. সম্বন্ধসূচক অব্যয় পদ বিলুপ্ত হয়।

৩. খণ্ডবাক্যগুলোকে স্বাধীন বা নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যে পরিণত করতে হয়।

৪. সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাধীন বাক্যগুলো যুক্ত করতে হয়।

যেমন: জটিল: তুমি যদি না খাও তবে আমিও খাব না।

যৌগিক : তুমি খাও, নইলে আমিও খাব না।

জটিল: যদিও রামলালের বয়স কম ছিল তথাপি তার দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

যৌগিক : রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

জটিল: যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।

যৌগিক: বিপদ ও দুঃখ একসাথে আসে।

জটিল: যেহেতু দোষ করেছো সেহেতু শাস্তি পাবে।

যৌগিক: দোষ করেছো অতএব শাস্তি পাবে।

চ. যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. বাক্যটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

২. সংযোজক, বিয়োজক ও ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় পদের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে।

৩. নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্যগুলোর মধ্যে একটিকে প্রধান রেখে অন্যান্য খণ্ডবাক্যগুলোকে অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যে পরিণত করতে হবে।

৪. নিরপেক্ষ বাক্য দুটির পূর্বে সম্বন্ধসূচক অব্যয় পদ ব্যবহার করতে হয়।

যেমন: যৌগিক : মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, তবে পাস করতে পারবে।

জটিল : যদি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা কর, তবে পাস করতে পারবে।

যৌগিক : তুমি ধনী কিন্তু উদার নও।

জটিল : যদিও তুমি ধনী তবু উদার নও।

যৌগিক : ধনীদের নিজেদের গরজ আছে তাই তারা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

জটিল : যেহেতু ধনীদের নিজেদের গরজ আছে, সেহেতু তারা দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।

২। ভাবগত পরিবর্তন

ক. অস্তিবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয়যোগে অস্তিবাচক বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে (সমাপিকা ক্রিয়া) নেতিবাচক করতে হবে।

২. হ্যাঁ-সূচক বাক্যকে না করতে হলে মুল অর্থ পরিবর্তন না করে বাক্য পরিবর্তন করতে হবে।

৩. বাক্যের বিশেষণ পদটিকে বিপরীত শব্দে রূপান্তর করতে হবে।

৪. প্রয়োজন মত বাক্যের অন্য শব্দকে 'না' সূচক বাক্যের প্রয়োগের আওতাভুক্ত করতে হবে।

৫. 'না' বাচক ক্রিয়া ও 'না' বাচক শব্দ বা 'না' বাচক অব্যয় মিলে বাক্যের অস্তিবাচক বা হ্যাঁ-সূচক ভাবটি বজায় রাখতে হয়।

যেমন: অস্তিবাচক : হৈমন্তী চুপ করিয়া রহিল।

নেতিবাচক : হৈমন্তী চুপ না থাকিয়া পারিল না।

অস্তিবাচক : পাখিটা মরল।

নেতিবাচক : পাখিটা বাঁচল না।

অস্তিবাচক : এভাবে সমাজ অচল হয়ে পড়ে।

নেতিবাচক : এভাবে সমাজ চলে না।

অস্তিবাচক : অনুপমার উচিত কাজ হয়েছে।

নেতিবাচক : অনুপমার অনুচিত কাজ হয়নি।

অস্তিবাচক : বাড়িটা তারা দখল করেছে।

নেতিবাচক : বাড়িটা তারা দখল না করে ছাড়েনি।

খ. নেতিবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. বাক্যে না, নয়, নহে, নি, নেই, নাহি, নাই ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয় তুলে দিতে হয়।

২. শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাক্যে হ্যাঁ-সূচক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হয়।

৩. বাক্যের বিশেষণ পদটিকে বিপরীত শব্দে রূপান্তর করতে হয়।

৪. প্রয়োজন মত নেতিবাচক শব্দের বাক্যাংশকে অস্তিবাচক শব্দ দ্বারা অস্তিবাচকে রূপান্তর করতে হয়।

যেমন: নেতিবাচক : তারা যাবে না কোথাও।

অস্তিবাচক : তারা এখানেই থাকবে।

নেতিবাচক : আমি অন্য ঘরে যাব না।

অস্তিবাচক : আমি এ ঘরে থাকব।

নেতিবাচক : দেশের প্রচলিত ধর্মে কর্মে তাহার আস্থা ছিল না।

অস্তিবাচক : দেশের প্রচলিত ধর্মে কর্মে তাহার অনাস্থা ছিল।

নেতিবাচক : হৈম তাহার অর্থ বুঝিল না।

অস্তিবাচক : হৈম তাহার অর্থ বুঝিতে ব্যর্থ হইল।

গ. নেতিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. নেতিবাচক বাক্যের না-সূচক শব্দ তুলে দিতে হয়।

২. মূল বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।

৩. নির্দেশক বাক্য হলে 'কি' এবং নঞর্থক বাক্য হলে 'নাকি', 'নয়-কি'-সহ জিজ্ঞাসার চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।

৪. না-সূচক অব্যয় তুলে দিয়ে হ্যাঁ-সূচক অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

৫. সাধারণত বর্তমান কালের 'ল', 'ইল'-ক্রিয়া বিভক্তি থাকলে তার সঙ্গে আগে 'হয়' ক্রিয়া-বিভক্তি ব্যবহার করতে হয়।

যেমন:

নেতিবাচক : এতে দোষ নেই।

প্রশ্নবাচক : এতে দোষ কী?

নেতিবাচক : টাকায় সব হয় না।

প্রশ্নবাচক : টাকায় কি সব হয়?

নেতিবাচক : আর পথ নেই।

প্রশ্নবাচক : আর কি পথ আছে?

নেতিবাচক : পুলিশের লোক জানিবে না।

প্রশ্নবাচক : পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?

ঘ. প্রশ্নবাচক বাক্যকে নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. মূল অর্থ বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।

২. প্রশ্নবোধক অব্যয় 'কি' তুলে দিতে হয়।

৩. নেতিবাচক বা নঞর্থক না, নাই, নেই, নি, জানি না, বুঝি না ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

৪. বাক্যটিকে নেতিবাচক ভাব ধারায় গঠন করতে হয়।

যেমন: প্রশ্নবাচক : তারা কি পাষাণ?

নেতিবাচক : তারা পাষাণ কি না জানি না।

প্রশ্নবাচক : এ কেমন কথা?

নেতিবাচক : এ কেমন কথা জানি না।

প্রশ্নবাচক : তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে কি?

নেতিবাচক : তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

প্রশ্নবাচক : সরস্বতী বর দেবেন কি?

নেতিবাচক : সরস্বতী বর দেবেন না।

ঙ. অস্তিবাচক বাক্যকে প্রশ্নবাচক বাক্যে রূপান্তরের সূত্র :

১. মৌলিক বা মূল অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।

২. কর্তার পরে প্রশ্নবাচক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়।

৩. ক্রিয়ার পরে নঞর্থক অব্যয় ব্যবহার করতে হয়।

৪. বাক্য শেষে প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) ব্যবহার করতে হয়।

যেমন: অস্তিবাচক : ফুলকে সকলেই ভালোবাসে।

প্রশ্নবাচক : ফুলকে কি সকলেই ভালোবাসে না?

অস্তিবাচক : এরা অন্য জাতের মানুষ।

প্রশ্নবাচক : এরা কি অন্য জাতের মানুষ নয়?

অস্তিবাচক : শৈশবে তার বাবা মারা যান।

প্রশ্নবাচক : শৈশবে কি তার বাবা মারা যাননি?

অস্তিবাচক : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

প্রশ্নবাচক : বাংলাদেশ কি একটি উন্নয়নশীল দেশ নয়?

চ. প্রশ্নবাচক বাক্যকে অস্তিবাচক বাক্যে পরিবর্তনের সূত্র :

১. মূল বা মৌলিক অর্থ অপরিবর্তিত রেখে বাক্য পরিবর্তন করতে হয়।

২. প্রশ্নবাচক 'কি' অব্যয় বিলুপ্ত হবে।

৩. নঞর্থক অব্যয় পদও বিলুপ্ত হবে।

৪. জিজ্ঞাসা (?) চিহ্ন স্থানে দাঁড়ি (।) বসাতে হবে।

যেমন: প্রশ্নবাচক : ভুল কি সকলেই করে না?

অস্তিবাচক : ভুল সকলেই করে।

প্রশ্নবাচক : একলা যেতে ভয় করবে না তো?

অস্তিবাচক : একলা যেতে ভয় করবে কি না জানতে চাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩. সরল বাক্য ও যৌগিক বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪. খণ্ডবাক্য ও আশ্রিত খণ্ডবাক্য বলতে কী বোঝেন? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. বাক্যের রূপান্তর বা পরিবর্তন বলতে কী বোঝেন? কী কী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই পরিবর্তন হয়ে থাকে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭. বাক্য পরিবর্তন করুন:

ক. শিক্ষিত লোককে সবাই শ্রদ্ধা করে। (জটিল বাক্য)

খ. যদি দোষ স্বীকার কর তাহলে শাস্তি পাবে না। (সরল বাক্য)

গ. তুমি দীর্ঘজীবী হও। (বিবৃতিমূলক বাক্য)

ঘ. তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক বাক্য)

ঙ. বেশির ভাগ লোকই বেদের অর্থ বুঝত না। (অস্তিবাচক বাক্য)

চ. দেশের সেবা করা কর্তব্য। (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)

ছ. কথাটায় তার অবিশ্বাস হয়। (নেতিবাচক বাক্য)

জ. এতে দোষ কী? (নির্দেশাত্মক বাক্য)

পাঠ ৫.৩ : ক্রিয়ার কাল

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ক্রিয়ার কাল কী তা বলতে পারবেন।
- ক্রিয়ার কালের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ক্রিয়া অর্থ কাজ। 'কাল' কথাটির অর্থ সময়। ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন–

মায়া ছবি আঁকে– ক্রিয়াটি বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।

মায়া ছবি এঁকেছিল– ক্রিয়াটি অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

মায়া ছবি আঁকবে– ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

তাই বলা যায়, কোনো ক্রিয়া বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল। ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার। যথা- ১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল।

ক্রিয়াপদ: ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সাথে কাল (সময়) ও পুরুষবাচক ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। **'সে খেলে'**- এখানে **'সে'** এই নাম পুরুষের জন্য **'খেলে'** ধাতুর সাথে **'এ'** ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে **'খেলে'** ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে।

ক্রিয়াপদ গঠনের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় লক্ষণীয়–

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। তবে, বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন–

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	আমি যাই	আমরা যাই
মধ্যম	তুমি যাও	তোমরা যাও
নাম	সে যায়	তারা যায়

দেখা যায় যে, খাওয়া ক্রিয়া উত্তম পুরুষে যাই, মধ্যম পুরুষে যাও, নাম পুরুষে যায় অর্থাৎ ক্রিয়ার রূপান্তর হয়েছে; কিন্তু বচনভেদে কোনো রূপান্তর ঘটেনি। একবচনে যাই, বহুবচনেও যাই।

খ. সাধু ও চলিত রীতিভেদে ক্রিয়া বিভক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। যেমন-

	বর্তমান	অতীত	ভবিষ্যৎ
সাধু–	পড়ি	পড়িয়াছিলাম	পড়িব
চলিত-	পড়ি	পড়েছিলাম	পড়ব

গ. সাধারণ ভবিষ্যৎকালে মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ একই। যেমন–

মধ্যম পুরুষ : তুমি খেলবে। নাম পুরুষ: সে খেলবে।

ঘ. উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও নাম পুরুষ সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক ও তুচ্ছার্থ- এই তিনটি ক্রিয়ারূপ রয়েছে।

	সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক
মধ্যম পুরুষ	তুমি খাও তোমরা খাও	আপনি খান আপনারা খান	তুই খা তোরা খা
নাম পুরুষ–	সে খায় তারা খায়	তিনি খান তারা খান	এটা খায় এগুলো খায়

ক্রিয়ার কালের প্রকারভেদঃ

ক্রিয়া সংগঠনের প্রধান তিনটি কালকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা:

১. বর্তমান কাল–

ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল।

গ. পুরাঘটিত বর্তমান কাল।

ঘ. বর্তমান কালের অনুজ্ঞা।

২. অতীত কাল-

ক. সাধারণ অতীত কাল।

খ. ঘটমান অতীত কাল।

গ. পুরাঘটিত অতীত কাল।

ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

৩. ভবিষ্যৎ কাল-

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল।

গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল।

ঘ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা।

বর্তমান কাল

যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে ঘটেছে বা স্বভাবত ঘটে তাকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান ক্রিয়ার কাল চার প্রকার। এক্ষেত্রে সাথে ই, অ, এ, এন বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন– আমি বই পড়ি।

ক. সাধারণ বর্তমান কাল: যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন– আমি পড়ি।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল: স্বাভাবিক বা অভ্যাস বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন- সকালে সূর্য ওঠে।- স্বাভাবিকতা, আমি রোজ সকালে চা খাই।– অভ্যাস।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. ঐতিহাসিক বর্তমান কাল: অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় যদি নিত্য বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন–

১৯৭১ সালে আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

২. স্থায়ী সত্য বা চিরসত্য প্রকাশে: দুই আর তিন পাঁচ হয়।

৩. অনিশ্চয়তা প্রকাশে: কে জানে আজ ফেরি পার হতে পারব কিনা।

৪. কাব্যের ভণিতায়: 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান।'

৫. যদি, যখন, যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে: অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন– বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে : চণ্ডীদাস বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

২. অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে): আজ তাহলে উঠি। এখন তবে আসি।

৩. নেই, নাই, নি, শব্দ যোগে অতীত কালের ক্রিয়ায়:

আমি কখনো এরূপ দৃশ্য দেখি নাই।

তিনি গতকাল কলেজে যাননি।

৪. অতীতের কোনো ঘটনাকে বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে:

আমি দেখতে পেলাম, কে যেন কাঁদে।

খ. ঘটমান বর্তমান কাল: যে ক্রিয়ার কাজ বর্তমানে চলছে, এখন শেষ হয়নি, তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে ছি, ছেন, বা ইতেছি, এতেছে, ইতেছো, এতেছেন যুক্ত হয়। যেমন–

পাখিরা আকাশে উড়ছে।

বৃষ্টি পড়িতেছে।

ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ:

১. বর্ণনার বিবৃতি প্রকাশ করার জন্যে: দুটো অতীত কালের ক্রিয়ার বর্ণনায় সঙ্গতি রক্ষার জন্য শেষেরটিতে ঘটমান বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন– আমি দেখলাম চোর পালাচ্ছে।

২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে: ভয় পেয়ো না, কালই আসছি।

৩. অতীত ক্রিয়া বর্ণনার সঙ্গতি রক্ষার্থে: বক্তার বিবৃতির বর্ণনীয় বিষয়কে প্রকাশ করার জন্য কালের ক্রিয়ায় ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন– তিনি বললেন, "পাকিস্তানি শোষকদের অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।"

গ. পুরাঘটিত বর্তমান: যে ক্রিয়ার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজের ফল এখনও বর্তমান, তার কালকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে এছি, এছে, এছো, এছেন বা ইয়াছে, ইয়াছো, ইয়াছেন যুক্ত হয়। যেমন– তিনি বইটি পড়িয়াছেন।

ঘ. বর্তমান অনুজ্ঞা : আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা ইত্যাদির ভাব বোঝাতে ক্রিয়াপদের যে রূপ হয় তাকে বলে অনুজ্ঞা। আর যে ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের অনুজ্ঞা প্রকাশ পায় তাকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে অ, ও, উন, এন যুক্ত হয়। যেমন-

আদেশ– তোমরা এখনি চলে যাও।

অনুমতি– আপনি ভেতরে আসুন।

অনুরোধ– আমাকে এক গ্লাস পানি দেবেন।

উপদেশ– কখনও মিথ্যা বলবে না।

প্রার্থনা– বেঁচে থাক বাবা।

অতীত কাল

যে সমস্ত সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা পূর্বে শেষ হয়েছে এমন কোনো কাজকে বোঝায়, তাকে অতীত কাল বলে। যেমন- রহমান কাল এসেছিলেন। অতীত কাল ৪ প্রকার। যথা–

ক. সাধারণ অতীত কাল: বর্তমান কালের আগে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালকেই বলে সাধারণ অতীত কাল। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে লাম, ল, লে, লেন ইত্যাদি যুক্ত হয়। যেমন- আমি ছবিটি দেখলাম।

খ. ঘটমান অতীত কাল: যে কাজ অতীতে চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময়ও কাজটি শেষ হয়নি– ক্রিয়া সম্পাদিত হবার এরূপ ভাব বোঝালে তার কালকে ঘটমান অতীত কাল বলে। এক্ষেত্রে ল, লে, লাম, লেন যুক্ত হয়। যেমন– সেদিন বিরামহীন বৃষ্টি হচ্ছিল।

গ. পুরাঘটিত অতীত কাল: যে ক্রিয়ার কাজ অতীতে বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে এবং যার পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে ইয়াছিলাম, ইয়াছিলেন, ইয়াছিল ইত্যাদি যুক্ত হয় যেমন– গত বছর আমি কলকাতা গিয়েছিলাম।

ঘ. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল: অতীতে প্রায়ই ঘটতো এরূপ অর্থে ক্রিয়ার যে, কাল হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে ইতাম, ইত, ইতেন, ইতে যুক্ত হয়। যেমন– প্রতিদিন সকালে সে গান গাইত।

নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার:

১. কামনা প্রকাশে: আজ যদি মারিয়া আসতো, কেমন মজা হতো।

২. সম্ভাবনা প্রকাশে: তুমি যদি আসতে, তবে ভালোই হতো।

৩. অসম্ভব কল্পনায়: এই বাড়ি হতো যদি রাজার বাড়ি।

ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়ার কাজটি এখনো ঘটেনি অর্থাৎ অনাগতকালে সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন–মা আগামীকাল আসবেন।

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল: যে ক্রিয়ার কাজ এখনও ঘটেনি, পরে কিংবা অনাগত কালে ঘটবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। এক্ষেত্রে ক্রিয়ার শেষে ইব, ইবে, ইবেন হয়। যেমন– শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল: ভবিষ্যতে ঘটতে থাকবে- এরকম বোঝাতে ক্রিয়ার যে কাল হয়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন– যতক্ষণ সে পড়তে থাকবে, ততক্ষণ আমি তাকে বিরক্ত করব না।

নামপুরুষ সাধারণ: -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/ করতে থাকবে)।

নামপুরুষ ও মধ্যম পুরুষ: -ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন) (সম্ভ্রমাত্মক)

মধ্যম পুরুষ সাধারণ: -ইতে থাকিবে/তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক: -ইতে থাকিবে/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

উত্তম পুরুষ: -ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। এখানে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়ার– ইতে/-তে বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে থাক্ ধাতুর, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়।

জ্ঞাতব্য: মূল ধাতুর সঙ্গে- ইতে- তে বিভক্তি যোগে যে অসমাপিকা ক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা অপরিবর্তনীয় এবং কোনো কালবাচক নয়। মূল ধাতুর সঙ্গে ভবিষ্যৎ কালের কোনোরূপ ক্রিয়া বিভক্তিই যুক্ত হয় না। অর্থের দিক থেকে ঘটমান

ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ সৃষ্টি হয়েছে মনে করা যেতে পারে। রূপের দিক থেকে এগুলো সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপ মাত্র। তাই অনেকে ঘটমান ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদের রূপ আছে বলে স্বীকার করেন না।

গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল: কোনো ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যতে সম্পন্ন হয়ে থাকবে, এরকম বোঝালে– সেই ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন– আমার কথা হয়তো মনে পড়ে থাকবে। যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি-ইয়া/এ যোগ করে এবং যাক ও গম ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যথা– গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

ঘ. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, প্রার্থনা প্রভৃতি বোঝালে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের যে রূপ হয়, তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে। যেমন–

আদেশ– এই লেখাটি তুমিই লিখবে।

অনুরোধ– আমার জন্য একটি বই আনবেন।

উপদেশ– মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে।

প্রার্থনা– 'রেখো মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।'

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

১. আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন- কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে?
২. অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন- ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন। তোমরা হয়তো 'বিশ্বনবী' পড়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ক্রিয়ার কাল কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লিখুন।
২. 'পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার প্রয়োগে ভিন্নতা দেখা যায়, কিন্তু বচনভেদে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না।'- উদাহরণের সাহায্যে উক্তিটির বিশ্লেষণ করুন।
৩. নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার দেখিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখুন।

পাঠ ৫.৪ : কারক ও বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কারকের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- বিভক্তির পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কারক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' (কৃ+নক = কারক) একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। কারক শব্দটির অর্থ– যা কোনো কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কী করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরণ, হেতু স্থান, কাল ইত্যাদি সবকিছুই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন– সে আগামী কাল সকালে পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরবে। এই বাক্যে ক্রিয়া 'ধরবে'। ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে সে', কী ধরবে? মাছ; কোথায় ধরবে? পুকুরে জাল দিয়ে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্রিয়ার সঙ্গে নানা কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কগুলিই কারক। ব্যাকরণের পরিভাষায় সম্পর্ককে 'অন্বয়'ও বলা হয়। লক্ষণীয়, বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় সর্বনাম পদের। এগুলোকে নাম পদও বলা হয়।

কারকের সংজ্ঞার্থ

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক বা অন্বয় তাকে বলা হয় কারক।

বিভক্তি

বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ করে দেয়। দেখা যায় বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শূন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন-

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে – সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর 'উঠেছে' হল ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থ গ্রাহ্যতার জন্য 'সন্ধ্যা শব্দের সঙ্গে 'য়' 'আকাশ' শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। 'য়, 'এ' হল বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোন বর্ণ যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণ মতে সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শূন্য (০)। শূন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির সজ্জা এই রকম,

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে
সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।

এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি।

অনেক সময় বাক্যে বিভক্তির বদলে বিভক্তি স্থানীয় শব্দও ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিভক্তিরই কাজ করে। যেমন–
আমি ছেলেগুলিকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম।
কিংবা, সে ঢাকা থেকে এসেছে।

উপরের দুটি বাক্যে ‘দিয়ে’ ও ‘থেকে’ বিভক্তি স্থানীয় শব্দ। এগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। তাহলে অনুসর্গের সংজ্ঞা হল,

বাংলা বাক্যে যে অব্যয়জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে বিভক্তির ন্যায় বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা

বাংলায় অনেক বাক্য রয়েছে যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন–

মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।

এই জাতীয় ক্রিয়াহীন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সেজন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। উপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। ‘মাঠ মাঠ অজস্র ফসল কিংবা’ ‘ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদী ভাসমান’ বাক্য হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম বাক্যে ‘এ’ বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে ‘তে’ বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। ‘গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে’– এই বাক্যে আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও ‘য়’ বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য করেছে। নতুবা গাছ পাতা রাত শিশির’ কোন বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সেজন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সে সব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো যেমন ‘দ্বারা’ ‘দিয়ে’ ‘কর্তৃক’, ‘হতে’, ‘থেকে, চেয়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

বাংলা বিভক্তি

বাংলা বিভক্তিগুলি নিম্নরূপ

১) শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি (২) এ-বিভক্তি
৩) ‘তে’ বিভক্তি ৪) ‘কে’ বিভক্তি
৫) ‘রে’ বিভক্তি

এই বিভক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম চারটি বাক্যের কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়; শেষেরটি অর্থাৎ ‘র’ বা ‘এর’ বিভক্তি সম্বন্ধ পদ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলায় প্রত্যেক কারকের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। বাংলা বিভক্তিগুলি কমবেশি প্রায় প্রত্যেক কারকে ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য বিভক্তি দিয়ে বাংলা কারক চেনা যায় না, বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদগুলোর অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামপদগুলোর সম্বন্ধ স্থির করে বাংলা কারক নির্ণয় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিভক্তিগুলোর এক বচন রূপ আছে, বহুবচন নেই। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে একই বিভক্তি দেখা যায়। বহুবচনের চিহ্ন জ্ঞাপক কিছু বর্ণ সমষ্টি দেখা যায়, সেগুলি বহুবচনের রূপ মাত্র, বিভক্তি নয়। যেমন–

মানুষ+গুলো+কে = মানুষগুলোকে; এখানে বিভক্তি ‘কে’, গুলো বিভক্তি নয়।

নদী+গুলো+তে = নদীগুলোতে; এখানে বিভক্তি ‘তে’।

প্রত্যেক কারকের জন্য বিভক্তিকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো

বিভক্তির নাম	বিভক্তির রূপ	বহুবচন
প্রথমা	শূন্য (০), অ	রা, এরা, গুলি, গণ
দ্বিতীয়া	কে, রে (এরে)	দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, [বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]	দিগের দ্বারা, দের দ্বারা
চতুর্থী	কে, রে (এরে) [দ্বিতীয়ার মতো]	দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে [বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]	দিগ হতে, দিগের চেয়ে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগেরে, দের, দিগে, দিগেতে, গণে
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কারক বলতে কী বোঝায়? কারকের সংজ্ঞার্থ দিন।

২. বিভক্তি কাকে বলে? বিভক্তি কেন ব্যবহৃত হয়?

৩. বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো কী? এগুলোর কী কাজ?

৪. বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখুন।

৫. বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান- কথাটি বুঝিয়ে দিন।

৬. বাংলা বিভক্তিগুলির পরিচয় দিন।

৭. বুঝিয়ে দিন– শূন্য (০) বিভক্তি, অনুসর্গ

পাঠ ৫.৫ : কারকের বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কারক কত প্রকার ও কী কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রত্যেক কারকের সংজ্ঞার্থ ও বিবরণ লিখতে পারবেন।
- বিভক্তিগুলোর প্রয়োগ করতে পারবেন।

কারকের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যের ক্রিয়া পদের সঙ্গে নাম পদের অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্পর্ক বা অন্বয়কে কারক বলে। বাংলা বাক্যগুলোতে দেখা যায় এই সম্পর্ক ছয় প্রকারের হতে পারে। সেজন্য কারক ছয় প্রকার। যেমন–

১. কর্তৃকারক
২. কর্মকারক
৩. করণ কারক
৪. সম্প্রদান কারক
৫. অপাদান কারক
৬. অধিকরণ কারক

নিচের ছোট ছোট প্রশ্ন ব্যবহার করে সহজেই কারক নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্নসমূহ	**কারকের নাম**
কে, কার?	কর্তৃকারক
কী করে?	কর্মকারক
কাকে? / কার জন্যে?	সম্প্রদান কারক
কোথা থেকে?	অপাদান কারক
কী দিয়ে?	করণ কারক
কোথায় করে? কখন?	অধিকরণ কারক

যেমন : বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।

প্রশ্নসমূহ	**কারকের নাম**
কে দেয়?	বেগম সাহেবা (কর্তৃকারক)
কী দেয়?	চাল (কর্মকারক)
কী দিয়ে দেয়?	হাত (করণকারক)
কোথা থেকে দেয়?	ভাঁড়ার (অপাদান কারক)
কাকে দেয়?	গরিবকে (সম্প্রদান কারক)
কখন দেয়?	প্রতিদিন (অধিকরণ কারক)

কর্তৃকারক

বাক্যে যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলা হয় কর্তা এবং এই কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় কর্তৃকারক।

'উপমা পড়ছে' এই বাক্যে উপমা হল কর্তা।

ক্রিয়াকে 'কে' বা 'কারা' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক। সাগর দৌড়াচ্ছে – কে দৌড়াচ্ছে? সাগর। সুতরাং 'সাগর' কর্তৃকারক। তারা হাঁটছে – কারা হাঁটছে? তারা। 'তারা' কর্তৃ কারক।

নানা রকম কর্তৃকারক

বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় বাক্যের কর্তা কয়েক রকম।

ক) মুখ্য কর্তা ঃ যে বা যারা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বা তাদের বলা হয় মুখ্য কর্তা। যেমন–

শৈলী রান্না করছে।

কৃষকেরা ফসল কাটছে।

এখানে 'শৈলী ও 'কৃষকেরা' মুখ্য কর্তা

খ) প্রযোজক কর্তা ঃ মুখ্য কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায় তখন মুখ্য কর্তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা। যেমন,

কৃষক গরু দিয়ে চাষ করায়।

এই বাক্যে 'কৃষক' প্রযোজক কর্তা।

গ) প্রযোজ্য কর্তা ঃ যাকে দিয়ে মুখ্য কর্তার কাজ সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা।

মিতা ছোট বাচ্চাটিকে হাঁটাচ্ছে।

এখানে 'বাচ্চাটি' হল প্রযোজ্য কর্তা।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে আরো কয়েক রকম কর্তার রূপ বোঝা যায়। যেমন-

কর্মবাচ্যের কর্তা –	আমাকে যেতে হবে।
ভাববাচ্যের কর্তা –	তার বোধ হয় খাওয়া হয়নি।
কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা–	ঝড় আসছে। বাড়িগুলো ভেঙে পড়বে।

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ কর্তৃকারকে সাধারণত শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য বিভক্তির ব্যবহারও রীতিসিদ্ধ। যেমন–

কর্তৃকারকে শূন্য (০)

বা অ-বিভক্তি	ঃ	<u>মিতা</u> খেলছে।
এ-বিভক্তি	ঃ	শাড়িটি <u>চোরে</u> নিয়ে গেছে।
য়-বিভক্তি	ঃ	<u>ঘোড়ায়</u> গাড়ি টানে।
তে-বিভক্তি	ঃ	<u>পাখিতে</u> ধান খেয়েছে।
কে-বিভক্তি	ঃ	<u>আমাকে</u> যেতেই হবে।
র-বিভক্তি	ঃ	শেষ পর্যন্ত <u>আমার</u> যাওয়া হল না।
দ্বারা (অনুসর্গ)	ঃ	<u>তোমা দ্বারা</u> এ কাজ হবে না।
কর্তৃক (অনুসর্গ)	ঃ	<u>নজরুল</u> কর্তৃক অগ্নি-বীণা রচিত হয়েছে।

কর্মকারক

কর্তা যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে।

ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্ম এবং ক্রিয়া পদের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধই কর্মকারক।

সে ফল কিনছে – সে কী কিনছে? ফল। সুতরাং ফল কর্মকারক।
সায়েমা অর্ককে মারছে – সায়েমা কাকে মারছে? অর্ককে। 'অর্ক', কর্মকারক।

কোনো কোনো ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এর একটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম অন্যটি গৌণ কর্ম। বোঝাই যায়, গৌণ কর্মের চেয়ে মুখ্য কর্মের গুরুত্ব বেশি। মুখ কর্ম দিয়েই ক্রিয়ার কাজ পূর্ণ হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম ব্যক্তিবাচক বা প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। যেমন–

শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।
এই বাক্যে 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম, ছাত্র গৌণ কর্ম।

কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ
সাধারণত কর্মকারকে কে, রে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে অন্য বিভক্তিগুলোরও প্রয়োগ হয়।

কর্মকারকে শূন্য (০) বা অ বিভক্তি– সে বই পড়ে।
কর্মকারকে কে-বিভক্তি – আমার ছেলেকে বকবে না।
কর্মকারকে রে-বিভক্তি – তারে ডেকে আন।
কর্মকারকে য়-বিভক্তি – তোমায় আমি চাই।
কর্মকারকে এ-বিভক্তি – বৃথা গঞ্জ দশাননে
কর্মকারকে র-বিভক্তি – আমার দেখা পাবে না।

করণ কারক
যার দ্বারা বা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে করণ কারক বলে।

'করণ' শব্দের অর্থ উপায় বা সহায়। বাক্যের ক্রিয়াপদকে 'কার দ্বারা' বা কী উপায়ে জিজ্ঞাসা করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই করণ কারক।
নীলু ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। – নীলু কী দিয়ে ঘর সাজায়? ফুল দিয়ে সুতরাং 'ফুল' করণ কারক।
কাঠুরে কুড়াল দ্বারা গাছ কাটে। – কাঠুরে কী দ্বারা গাছ কাটে? কুড়াল দ্বারা। 'কুড়াল' করণ কারক।
করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ – করণ কারকে সাধারণত দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তির (অনুসর্গের) ব্যবহার হয়। তবে অন্য বিভক্তিগুলোরও প্রয়োগ রয়েছে।
করণ কারকে 'দ্বারা বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হবে।
করণ কারকে 'দিয়া' বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমার লোক দিয়ে কাজটা করাবে।
করণ কারকে শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি – রফিক তাস খেলে।
করণ কারকে এ-বিভক্তি – গ্যাসে গাড়ি চলে।
করণ কারকে য়-বিভক্তি – টাকায় টাকা হয়।
করণ কারকে তে-বিভক্তি – তার কথা যেন মধুতে মাখা

সম্প্রদান কারক
যার জন্য বা যার উদ্দেশে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দেওয়া যায় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

গরীবের মেয়েটিকে ভাত দাও। – এই বাক্যে গরীবের মেয়েটিকে সম্প্রদান কারক।
আধুনিক ব্যাকরণবিদেরা সম্প্রদান কারক স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে এটি কর্মকারকের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। তবু প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক আছে।
সম্প্রদান কারকে কে, রে চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার হয়। অন্য দু'একটি বিভক্তিরও প্রয়োগ রয়েছে।
সম্প্রদান কারকে কে-বিভক্তি - তাঁকে আমার সালাম জানাবে।

সম্প্রদান কারকে রে-বিভক্তি - হে দেবতা, তোমারে করব না পূজা।
সম্প্রদান কারকে এ-বিভক্তি - ঘরহীনে ঘর দাও।
সম্প্রদান কারকে য়-বিভক্তি - তোমায় কেন দিইনি আমি, সকল শূন্য করে।
সম্প্রদান কারকে তে-বিভক্তি - সমিতিতে চাঁদা দিয়েছি।
সম্প্রদান কারকে র-বিভক্তি - আল্লাহর এবাদত কর।

অপাদান কারক

যা থেকে বা যা হতে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং ক্রিয়ার বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে তাকে অপাদান কারক বলে।

লাবলু সেদিন ঢাকা থেকে চাঁটগা গিয়েছিল। - এ বাক্যে 'যাওয়া' ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।
আখ হতে গুড় হয়। - এই বাক্যে গুড় হওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয় 'আখ' হতে।
সুতরাং 'ঢাকা' ও 'আখ' অপাদান কারক।
অপাদান কারকে ক্রিয়া সম্পাদনের আরও কিছু নমুনা

স্থান — বাসের ছাদ থেকে সে পড়ে গেল।
কাল — পরশু থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি, খুব জ্বর।
অবস্থা — কোথাও হতে আশ্বাস পাব বলে মনে হয় না।
দূরত্ব — ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব একশ কিলোমিটারের মতো।
তারতম্য — সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ

অপাদান কারকে সাধারণত 'হতে', থেকে, চেয়ে' ইত্যাদি বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের ব্যবহার হয়। অপরাপর বিভক্তিগুলোর প্রয়োগও অপাদান কারকে রয়েছে।
অপাদান কারকে 'হতে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - সরষে হতে তেল হয়।
অপাদান কারকে 'থেকে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - কোথা থেকে এসেছে
অপাদান কারকে 'চেয়ে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - ফরিদের চেয়ে মুরিদ বয়সে বড়
অপাদান কারকে শূন্য (০) বা অ-বিভক্তি - সে একজন জেল পলাতক আসামি।
অপাদান কারকে এ-বিভক্তি - বিপদে মোরে রক্ষা কর।
অপাদান কারকে য়-বিভক্তি - পড়ায় বিরত হয়ো না।
অপাদান কারকে তে-বিভক্তি - জমিতে বেশ ধান পেয়েছি।
অপাদান কারকে কে-বিভক্তি - ছোট মামাকে বড় ভয় পাই।
অপাদান কারকে র-বিভক্তি - জঙ্গলে সাপের ভয় আছে।
বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার
ক. স্থানবাচক : তিনি গাজীপুর থেকে এসেছেন।
খ. দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।
গ. নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

অধিকরণ কারক : যে 'সময়' বা 'স্থান' কে আশ্রয় করে কর্তা তার কর্ম সম্পাদন করে সেই সময় বা স্থানকে অধিকরণ কারক বলে।

অধিকরণ কারকে সর্বদা সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

যেমন: ১. দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেও তারে।
২. নদীতে নৌকা বাঁধা।
৩. বসন্তে কোকিল ডাকে।

এখানে যদি প্রশ্ন করা যায় প্রার্থী কোথায় দাঁড়িয়ে তাহলে উত্তর আসে–দুয়ারে। আর দুয়ারে একটি স্থান।

আবার যদি বলা যায় কোকিল কখন ডাকে তাহলে উত্তর পাওয়া যায় বসন্তে। আর 'বসন্ত' সময় নির্দেশ করে।

শ্রেণিবিভাগ : অধিকরণ কারক তিন প্রকার।

যেমন: ১. আধারাধিকরণ,

২. কালাধিকরণ ও

৩. ভাবাধিকরণ।

১. আধারাধিকরণ : 'আধার' অর্থ 'স্থান'। অর্থাৎ, কর্তা কর্ম সম্পাদনে যে স্থানটি ব্যবহার করে, তাকে আধারাধিকরণ বলে।

যেমন: ১. আকাশে চাঁদ আছে।

২. ছেলেরা মাঠে খেলা করে।

২. কালাধিকরণ : 'কাল' অর্থ সময়। বাক্যের কর্তা যে সময়ে কাজ করে, সেই সময়কে কালাধিকরণ বলে।

যেমন: ১. তারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে।

২. বৈশাখ মাসে নবান্ন উৎসব হয়।

৩. ভাবাধিকরণ : কোনো ক্রিয়া সম্পাদন যদি অন্য কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ওপর নির্ভর করে, তাকে ভাবাধিকরণ বলে। যেমন: ১. সূর্যোদয়ে চারদিক আলোকিত হয়।

২. আহারে পেট ভরে।

অধিকরণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার :

১. প্রথমা বিভক্তি - শফিক সিলেট থাকে।

২. দ্বিতীয় বিভক্তি - হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে।

৩. তৃতীয়া বিভক্তি - বড় রাস্তা দিয়ে যেও।

৪. পঞ্চমী বিভক্তি - এমন দিনে কি বলা যায় তারে।

কারক নির্ণয়ের সহজ নিয়মাবলি :

১. কর্তৃকারক : বাক্যের ক্রিয়াকে 'কে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তৃকারক পাওয়া যায়। যেমন: সবিতা গান গায়। কে গান গায়? উত্তর হবে 'সবিতা'। এখানে সবিতা কর্তৃকারকের উদাহরণ।

২. কর্মকারক : বাক্যে অবস্থিত ক্রিয়াপদকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে কর্মকারক পাওয়া যায়। যেমন:

১. সে ভাত খায়। এখানে 'ভাত' কর্মকারকের উদাহরণ। কারণ 'কী' দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর 'ভাত' পাওয়া যায়।

আবার,

২. বাবা আমাকে একটি কলম দিয়ে দিলো। এখানে, যদি প্রশ্ন করি, 'কাকে' দিলো। তাহলে উত্তরে 'আমাকে' পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে 'আমাকে' কর্মকারক।

৩. করণকারক : 'কীসের দ্বারা' কর্তা কাজ করে প্রশ্ন করলে করণকারক পাওয়া যায়। যেমন: টাকায় টাকা হয়। এখানে যদি প্রশ্ন করি কীসের দ্বারা টাকা হয়, তাহলে উত্তর হবে টাকার দ্বারা। সুতরাং, 'টাকা' এখানে করণকারকের উদাহরণ।

৪. সম্প্রদান কারক : স্বত্বত্যাগ করে কর্তা যদি কারোর জন্য কিছু করে তবে যার জন্য করে, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। অর্থাৎ, "কার জন্য করে" প্রশ্ন করলে সম্প্রদান কারক পাওয়া যায়। যেমন: ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। এখানে, ভিক্ষা দেওয়ার কাজটি করা হয়েছে ভিখারির জন্য। সুতরাং ভিখারি এখানে সম্প্রদান কারক।

৫. অপাদান কারক : "কোথা থেকে" কাজটি হচ্ছে প্রশ্ন করলে অপাদান কারক পাওয়া যায়। যেমন: ছাদ থেকে পানি পড়ে। যদি বলি "কোথা থেকে" পানি পড়ে, তাহলে 'ছাদ' উত্তর পাওয়া যায়। সুতরাং 'ছাদ' এখানে অপাদান কারক।

৬. অধিকরণ কারক : কোথায় বা কখন হচ্ছে" প্রশ্ন দ্বারা অধিকরণ কারক পাওয়া যায়। যেমন: বনে বাঘ আছে। যদি বলি বাঘ কোথায় আছে, তাহলে 'বনে' উত্তর পাওয়া যায়।

আবার, মাঘ মাসে প্রচণ্ড শীত হয়।

এখানে, যদি বলি কখন প্রচণ্ড শীত হয়, তাহলে "মাঘ মাস" উত্তর পাওয়া যায়। সুতরাং 'বনে' ও 'মাঘ মাস' এখানে অধিকরণ কারক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কারক কয় প্রকার ও কী কী?
২. কর্তৃকারকের সংজ্ঞা লিখুন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৩. কতো রকম কর্তৃকারক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিন।
৪. কর্মকারক কাকে বলে? কোনটি মুখ্য কর্ম আর কোনটি গৌণ কর্ম?
৫. করণ কারকের সংজ্ঞা দিন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৬. একই রকম মনে হলেও কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লিখুন।
৭. উদাহরণসহ অপাদান কারকের সংজ্ঞা দিন এবং অপাদান কারকের প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখান।
৮. অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা দিন। অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার অধিকরণের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৯. সকল কারকে শূন্য (০) বিভক্তির প্রয়োগ দেখান।
১০. সকল কারকে 'এ' বিভক্তির (৭মী বিভক্তির) প্রয়োগ দেখান-
১১. সকল কারকে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখান
১২. নিম্নরেখ শব্দগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন ঃ

নিজের সাধনায় বড় হও।
সে কানে শোনে না।
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কেন?
গরিবকে সাহায্য কর।
আমাকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে।
জোর হাওয়ায় বাড়িটি নড়ছে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক বেঁধেছে।
তুমি কখন এসেছ?
অনেকেই আমেরিকা যায়।
আল্লাহকে ডাক।
শুনেছি লোকটি বিলেত ফেরত।
ভোরে বাড়ি থেকে বের হলাম।
লোকে কী বলবে।
লেখাপাড়ায় মনোযোগী হও।
চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
ফাগুনের শুরুতে কোকিল ডাকে।
সারাটা দিন কলেজ পালিয়ে কোথায় ছিলে ?
লীলা রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছে।
সে বাগানে ফুল তুলছে।
বশির চমৎকার ফুটবল খেলে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
চোরকে বেত মারা হল।
চণ্ডীদাসে কয় শুন পরিচয়।
ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও।

তুমি বই পড়।
চোরের ভয়ে এ ব্যবস্থা নিয়েছি।
তোমার খাওয়া হল না ।
পাগলেতে কী না বলে।
ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
খোকা মাকে জিজ্ঞাসা করে।
এ কলমে ভাল লেখা হয় না।
গগনে গরজে মেঘ।
গাধায় পানি ঘোলা করে খায়।
বোঁটা খসা ফল গাছে থাকবে কী করে?
ছুরি দিয়ে ফল কাট।
পাঁচ দিন ঘুমাতে পারিনি।
যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়।
রাতভর বৃষ্টি হল।
সে জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছে।
একবার চোখের দেখা দেখতে চাই।
সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
তিমি মাছ সাগরে থাকে।
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা।
আজকাল অনেক গাড়ি গ্যাসে চলে।
তর্কে বিরত হও।
চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।
তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হজরত।
সাগরতীরে বসে আছি।
কাঁচের জিনিস সহজে ভাঙে।
পূজার ফুল কে তুলবে?
ছাগলেতে কী না খায়।
আমি জানি কত ধানে কত চাল হয়।

পাঠ ৫.৬ ঃ সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সম্বন্ধ পদ

বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না এমন কোন পদের সঙ্গে নামপদের যে অব্যবহিত সম্বন্ধ দেখা যায় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

আমি তোমার বাড়ি যাব। এই বাক্যে যাব ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'আমি' ও 'বাড়ি' এই দুটি নাম পদের কিন্তু তোমার পদের সঙ্গে 'যাব' পদের কোন সম্পর্ক নেই; 'তোমার' পদটি 'বাড়ি'র সম্বন্ধীয় এবং বিশেষণজ্ঞাপক। এ কারণে 'তোমার' সম্বন্ধ পদ।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোন সম্বন্ধ বা অন্বয় না থাকার কারণে সম্বন্ধ পদ কারক নয়।

সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-
আমি+র>আমার (মা)
তুমি+র > তোমার (ছোট বোন)
বাড়ি+র > বাড়ির (লোক)
মাথা+র > মাথার (চুল)
জাফর+এর > জাফরের (গাড়ি)
সাগর+এর > সাগরের (ঢেউ)
খেত+এর > খেতের (চাল)
ডিম+এর > ডিমের (খোসা)
ভোর+এর > ভোরের (কাগজ)
স্থান, কাল, দিক ইত্যাদি বাচক কিছু শব্দের সঙ্গে 'র' বা 'এর'-এর পরিবর্তে সম্বন্ধসূচক 'কার' >কের ব্যবহৃত হয়।

আজি+কার = আজিকার>আজকের (খবর)
কালি+কার = কালিকার > কালকার> কালকের (কথা)
আগে+কার = আগেকার (দিন)
কখন+কার = কার = কখনকার (ঘটনা)
ভিতর+কার = ভিতরকার (অবস্থা)
পূর্বদিক+কার = পূবদিককার (অংশ)

বাংলা ভাষায় সম্বন্ধ পদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো ব্যক্তির বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকে। নানা অর্থে সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ হয়। কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল –

১. অধিকার সম্বন্ধ : বাংলাদেশের জলভাগ, আমার বাড়ি, তোমার ঘড়ি।
২. সামীপ্য : পুকুরের পাড়, সাগরের তীর
৩. অঙ্গ : ঘরের ছাদ, শিশুর দাঁত

৪. কার্যকারণ : আগুনের তাপ, আঘাতের বেদনা

৫. নিমিত্ত : পরের দুঃখ, বিয়ের সাজ

৬. উৎপাদন : জমির ধান, ফার্মের মুরগি।

৭. গুণ সম্বন্ধ : পাকা আমের মিষ্টতা, রান্না গোসতের স্বাদ

৮. হেতু সম্বন্ধ : বিদ্যার বিনয়, রূপের অহংকার

৯. উপাদান সম্বন্ধ : সোনার হার, পিতলের বাটি

১০. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : ইদের ছুটি, দুই দিনের পথ।

১১. ক্রম সম্বন্ধ : সাতের পৃষ্ঠা, বারোর ঘর

১২. কৃতিত্ব সম্বন্ধ : রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', নজরুলের 'অগ্নিবীণা'

১৩. বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের কথা, ভিক্ষার চাল

১৪. অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ : হৃদয়ের আসন, শোকের ছায়া।

১৫. কারক সম্বন্ধ :

কর্তা - আমার পড়া

কর্ম - গরিবের সেবা

করণ - লাঠির আঘাত

অপাদান - বাঘের ভয়

অধিকরণ - গ্রামের মানুষ

সম্বোধন পদ

আহ্বান বা সম্ভাষণ করে কিছু বলা হলে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন পদ বলে।

এই যে করিম, তুমি কোথায় যাচ্ছ। এই বাক্যের বক্তা করিম নামক জনৈক মানুষকে সম্বোধন করছে। সেজন্য করিম সম্বোধন পদ। এই যে, অব্যয় জাতীয় শব্দ। এ জাতীয় বহু সম্বোধন সূচক অব্যয় শব্দ সম্বোধন পদের আগে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

ওহে বাপু, কী করছ?

হে মানুষ, নিজের কথা ভাবো!

ওগো বন্ধু, কেমন আছো?

ওরে দুষ্টু, তোর মনে এই ছিল?

কী রে ভাই, আমার কথা একেবারে ভুলে গেলে!

বাংলা ভাষায় একসময় সম্বোধন পদের আগে অয়ি, অরে, আলো, ওলো, গো, লো, হাঁগো, হ্যাঁগা, হ্যাদে ইত্যাদি প্রাচীন অব্যয়গুলো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় এগুলোর ব্যবহার বেশ কমে এসেছে। সম্বোধনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উহ্য রেখে শুধু অব্যয় ব্যবহার করেও সম্বোধন বাক্য তৈরি করা যায়। যেমন–

কী, তুমি যাবে?

কী রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

এই, তুই কিন্তু দেরি করবি না।

কই, আমার কথা শুনছ?

হ্যাঁরে, তোদের এখানে কি কোন ভালো মানুষ নেই?

সম্বোধন সূচক অব্যয় বাদ দিয়ে শুধু সম্বোধন পদ দিয়ে বাক্য রচনা আধুনিক বাংলা রীতি। যেমন–

আপা, আমাকে ছুটি দিন।

ভাই, কেমন আছো, তোমাকে বহুদিন দেখিনি

রশিদ, তুমি তো আমার কোনো কথা শোন না।
স্যার, একটা কথা শুনবেন।
খোদা, তার দিলে রহম দাও।

তৎসম শব্দে সম্বোধন পদে পরিবর্তন হয়; কিন্তু আধুনিক বাংলায় এ রকম ব্যবহার রীতিসিদ্ধ নয়। যেমন-
হে মাতা, সন্তানকে ভুলে গেলি।

সম্বোধন পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। সেজন্য সম্বোধন পদও কারক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সম্বন্ধ পদ কাকে বলে? সম্বন্ধ পদের সংজ্ঞা দিন।
২. সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন? বুঝিয়ে দিন।
৩. সম্বন্ধ পদ কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৪. সম্বোধন পদের সংজ্ঞা দিন।
৫. সম্বোধন পদ কেন কারক নয় তার কারণ লিখুন।
৬. কয়েকটি সম্বোধন সূচক অব্যয় পদ লিখুন।
৭. কোনটি সম্বন্ধ পদ এবং কোনটি সম্বোধন পদ নির্দেশ করুন।
    ক. তোমার ছোট ভাইটিকে বেশ মেধাবী মনে হল।
    খ. পাটের গুদামে আগুন লেগেছে।
    গ. ওরে আজ তোরা ঘরের বাইরে যাবি নে।
    ঘ. শাহাদাত, তোমার মনে এই ছিল।
    ঙ. সে তো ননীর পুতুল। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে।
    চ. একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে চাই।
    ছ. নদীর পানি একেবারেই কমে গিয়েছে।
    জ. বদমাশ। তোকে আজ আমি দেখে নেব।
    ঝ. সে আজ কতকালের কথা।
    ঞ. দেখছ না, লোকটা কেমন দৃষ্টিতে তাকাল!
৮. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তির ব্যবহার হয়? ঐ বিভক্তির প্রয়োগে দশটি সম্বন্ধ পদ তৈরি করুন।

পাঠ ৫.৭ : উক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- উক্তির সংজ্ঞার্থ এবং প্রকারভেদ জানতে পারবেন।
- উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তির পার্থক্য কী তা বলতে পারবেন।

কোনো কিছু বলার নাম উক্তি।

উক্তি দুই প্রকার : প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি

প্রত্যক্ষ উক্তি

যে বাক্যে বক্তার নিজের কথাই অবিকল উদ্ধৃত হয়, তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে।
যেমন :

১. বারেক বলল, "আজ সাত দিন যাবৎ আমি টাইফয়েড জ্বরে ভুগছি।"
২. তিনি বলিলেন "আজই আমার কোর্টে যাওয়া দরকার।"
৩. আয়েশা বলল, "এই বন্দি আমার প্রাণেশ্বর"।
৪. কপালকুণ্ডলা বলিল, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ, আইস পথ দেখাইয়া দিতেছি।"
৫. নবীন বলল, "আমি কলেজে যাব"

পরোক্ষ উক্তি

বক্তার নিজের কথার যথাযথ উল্লেখ না করে যদি অন্য ব্যক্তি নিজের কথায় তা প্রকাশ করে তবে তাকে বলে পরোক্ষ উক্তি।

যে বাক্যে বক্তার উক্তি অন্যের জবানিতে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে।

যেমন :

১. কালাম বলল যে, সে আজই সাভার যাবে।
২. তনু বলল যে, তার অসুখ করেছে।
৩. আনোয়ার বলল যে, তার বাবা-মা দুজনেই দেশের বাইরে আছেন।
৪. অভ্র বলল যে, সে ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে।
৫. শিলা বলল যে, সে ছবি আঁকবে।

উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম :

১ প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু (" ") উদ্ধার চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার চিহ্ন লোপ সাধন করতে হয় এবং উদ্ধার চিহ্ন স্থানে 'যে' এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য বক্তব্যের মধ্যে বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :

প্রত্যক্ষ উক্তি : আমেনা বলল, "আমার ভাই বাড়ি নেই।"
পরোক্ষ উক্তি : আমেনা বলল যে, তার ভাই বাড়ি ছিলেন না।

২. বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন :
প্রত্যক্ষ উক্তি : আলিম বলল, "আমার বাবা আজই ঢাকা যাচ্ছেন"।
পরোক্ষ উক্তি : আলিম বলল যে, তার বাবা সেদিনই ঢাকা যাচ্ছেন।

৩. প্রত্যক্ষ উক্তি কালবাচক পদকে পরোক্ষ উক্তিতে অর্থ অনুসারী করতে হয়। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : হেলাল স্যার বললেন "কাল তোমাদের ক্লাস ছুটি থাকবে।"
পরোক্ষ উক্তি : হেলাল স্যার বললেন, পরদিন আমাদের ছুটি থাকবে।

৪. প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যের সর্বনাম এবং কালসূচক শব্দের পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটে থাকে।

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই	আগামীকাল	পরদিন
ইহা	তাহা	গতকাল	আগেরদিন
এ	সে	গতকল্য	পূর্বদিন
এখানে	সেখানে	এখন	তখন
ওখানে	ঐখানে	আজ	সেদিন

৫. অর্থ-সংগতি রক্ষার জন্য পরোক্ষ উক্তিতে ক্রিয়াপদের পরিবর্তন হতে পারে। যেমন–
প্রত্যক্ষ উক্তি : আজাদ বলল, "আমি এক্ষুণি আসছি।"
পরোক্ষ উক্তি : আজাদ বলল যে, সে তক্ষুণি যাচ্ছে।

৬. আশ্রিত খণ্ড বাক্যের ক্রিয়ার কাল পরোক্ষ উক্তিতে সব সময় মূল বাক্যাংশের ক্রিয়ার কালের ওপর নির্ভর করে না। যেমন–
ক) প্রত্যক্ষ উক্তি : ফারুক লিখেছিল, "বগুড়ায় খুব শীত পড়েছে"।
পরোক্ষ উক্তি : ফারুক লিখেছিল যে, বগুড়ায় খুব শীত পড়েছিল।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** জামাল বলেছিল, "আমি বাজারে যাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : জামাল বলেছিল যে, সে বাজারে যাচ্ছে।
গ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** মইন বলল, "আমি সিলেট যাব।"
পরোক্ষ উক্তি : মইন বলল যে, সে সিলেট যাবে।

৭. প্রত্যক্ষ উক্তিতে কোনো চিরন্তন সত্যের উদ্ধৃতি থাকলে পরোক্ষ উক্তিতে কালের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন–
ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** শিক্ষক বললেন, 'পৃথিবী গোলাকার'।
পরোক্ষ উক্তি : শিক্ষক বললেন যে, পৃথিবী গোলাকার।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** বৈজ্ঞানিক বললেন, "চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।"
পরোক্ষ উক্তি : বৈজ্ঞানিক বললেন যে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে।

৮. প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাসূচক ও আবেগসূচক প্রত্যক্ষ উক্তি পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে হলে প্রধান খণ্ডবাক্যের ক্রিয়াকে ভাব অনুসারে পরিবর্তন করতে হয়। যেমন–

প্রশ্নবোধক উক্তি

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** শিক্ষক বলেন, "তোমরা ছুটি চাও?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ছুটি চাই কিনা শিক্ষক তা জিজ্ঞেস করলেন।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** মা বললেন, "কবে নাগাদ তোমাদের ফল বের হবে?"
পরোক্ষ উক্তি : আমাদের ফল কবে নাগাদ বের হবে মা তা জানতে চাইলেন।

অনুজ্ঞাসূচক উক্তি

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** জলি বলল, "তোমরা আগামীকাল এসো।"
পরোক্ষ উক্তি : জলি তাদের পরদিন আসতে (বা যেতে) বলল।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** তিনি বললেন, "দয়া করে বাইরে আসুন।"
পরোক্ষ উক্তি : তিনি (আমাকে) বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন।
পরোক্ষ উক্তি : বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল যে, শীতে তারা কতই না কষ্ট পাচ্ছে।

আবেগসূচক উক্তি

ক) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** ফরিদা বলল, "বা"! ফুলটি খুব সুন্দর।"
পরোক্ষ উক্তি : ফরিদা আনন্দের সঙ্গে বলল যে, ফুলটি খুব সুন্দর।
খ) **প্রত্যক্ষ উক্তি :** বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল, "শীতে আমরা কতই না কষ্ট পাচ্ছি।"
পরোক্ষ উক্তি : বস্তিবাসী মেয়েটি দুঃখের সঙ্গে বলল যে, শীতে তারা অনেক কষ্ট পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. উক্তি কাকে বলে? উক্তি কত প্রকার ও কী কী?
২. উক্তি পরিবর্তনের পাঁচটি নিয়ম লিখুন।
৩. প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করুন।
ক. শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই ফল মাটিতে পড়ে।"
খ. নাসিমা বলল, "আমি এখানে কিছুদিন থাকব।"
গ. মা বললেন, "আগামীকাল তোমাদের ছুটি থাকবে।"
ঘ. লোকটি বলল, "বাঃ! দৃশ্যটি খুব সুন্দর।"
৪. পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে রূপান্তর করুন−
ক. আমির বলল যে, তার ভাই একজন খেলোয়ার।
খ. ছেলেটি আনন্দের সাথে বলল যে, প্রজাপতিটি বড়ই সুন্দর।
গ. রহমান আমাকে পরদিন আসতে বলল।
ঘ. বক্তা বললেন যে, ঋতু পরিবর্তনশীল।

পাঠ ৫.৮ : বাচ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাচ্য কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাচ্য কত প্রকার ও কী কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম লিখতে পারবেন।

বাচ্য

'বাচ্য' শব্দের অর্থ বক্তব্য। বক্তব্য বিষয়টিতে যখন কর্তা প্রাধান্য লাভ করে, তখন বাক্যটি কর্তৃবাচ্যের, যখন কর্ম প্রাধান্য লাভ করে, তখন কর্মবাচ্যের এবং যখন ক্রিয়াপদ প্রাধান্য লাভ করে, তখন ভাববাচ্যের অন্তর্গত বলে ধরা হয়। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন–

১. **সেলিনা** স্কুলে যাচ্ছে।
২. পুলিশের গুলিতে **ডাকাত** আহত হয়েছে।
৩. আবুলের বাড়ি **যাওয়া** হলো না।

উপরিউক্ত প্রথম বাক্যে কর্তার, দ্বিতীয় বাক্যে কর্মের এবং তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায়, বাক্যের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ ভঙ্গিই বাচ্য।

বাক্যের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয় বাচ্য।

বাংলাভাষায় বাচ্য চার প্রকার। যথা-
ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য, গ. ভাববাচ্য, ঘ. কর্ম-কর্তৃবাচ্য

কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্তার প্রাধান্য থাকে এবং ক্রিয়াপদ কর্তার অনুসারী হয় তাকে কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন- অভি বই পড়ছে।

১. কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদ সবসময় কর্তার অনুসারী হয়। অর্থাৎ কর্তার যে পুরুষ ক্রিয়াও সেই পুরুষের হয়ে থাকে। যেমন– শিলা কাজ করছে, সোহাগ খেলা করছে।
২. কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি এবং কর্মে দ্বিতীয়, ষষ্ঠী বা শূন্য বিভক্তি হয়। যেমন–
   ক) তাকে খেতে বলেছি।
   খ) শিক্ষক ছাত্রদের পড়ান।
   গ) রোগী পথ্য সেবন করে।
   ঘ) চোর আমগুলো চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।
   ঙ) কাঠুরে বনে কাঠ সংগ্রহ করছে।

কর্মবাচ্য

যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী অর্থাৎ কর্ম যে পুরুষের, ক্রিয়াটিও যদি সেই পুরুষের হয়, তবে তাকে কর্মবাচ্য বলে। যেমন– পাহারাদার কর্তৃক চোর ধরা পড়েছে।

১. কর্মবাচ্যে, কর্মে প্রথমা, কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি ও দ্বারা, দিয়া (দিয়ে) কর্তৃক অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন–
   ক) আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য দেশ বিজিত হয়।

খ) চোরটা ধরা পড়েছে।
গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।
ঘ) আজ গান শোনা হবে।

২. কখনো কখনো কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হতে পারে। যেমন–
ক) আসামিকে জরিমানা করা হয়েছে।
খ) আলমকে ডাক।
গ) আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।

ভাববাচ্য

যে বাক্যে কর্ম থাকে না, ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে।

১. ভাববাচ্যের ক্রিয়া সর্বদাই নাম পুরুষের হয়। ভাববাচ্যের কর্তায় ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়ে থাকে। যেমন-
ক) আমার (কর্তায় ষষ্ঠী) বাড়ি যাওয়া হলো না (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
খ) আমাকে (কর্তায় দ্বিতীয়া) ঢাকা যেতে হবে। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।
গ) তোমার দ্বারা (কর্তায় তৃতীয়া) এ কাজ হবে না। (নাম পুরুষের ক্রিয়া)।

২. কখনো কখনো ভাববাচ্যে কর্তা উহ্য থাকে, কর্মের দ্বারাই ভাববাচ্য গঠিত হয়। যেমন–
ক) এ পথে চলা দুষ্কর।
খ) এবার ওঠা যাক।
গ) কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

৩. মূলক্রিয়ার সঙ্গে সহযোগী ক্রিয়ার সংযোগ ও বিভিন্ন অর্থে বাচ্যের ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন–
ক) এ ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা অনুচিত।
খ) এ পথ আমার চেনা নেই।
গ) মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।
ঘ) জিজ্ঞাসিলে কহিবারে পারি, জানো তো স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।

কর্ম-কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্মকারক কর্তার মতো প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম কর্তার মনোযোগ ব্যতীত সম্পাদিত হয়, তাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন–
ক) আম পেকেছে খুব।
খ) তাঁর বইটি বাজারে বেশ কাটছে।
গ) অব্যয় বাঁশি বাজায়।
ঘ) কাপড় ছেঁড়ে।
ঙ) তোমাকে রোগা দেখায়।

সাধারণত প্রাকৃতিক ঘটনামূলক ক্রিয়ায় এই বাচ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।

বাচ্য পরিবর্তন

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য :

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে কর্মবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–
ক) বাক্য পরিবর্তনের অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।
খ) কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হবে।
গ) কর্মে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামী হয়।

জ্ঞাতব্য : কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া অকর্মক হলে তার কর্মবাচ্য হয় না।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
ক) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।	ক) বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।
খ) ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন।	খ) বিশ্বজগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে।
গ) আনন্দময়ী পুস্তক পাঠ করছে।	গ) আনন্দময়ী কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

লক্ষণীয় : কর্তৃবাচ্য ব্যবহৃত তৎসম ক্রিয়াটি কর্মবাচ্যে যৌগিক ক্রিয়াজাত ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য :

নিয়ম : কর্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে

ক) কর্তার ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

খ) ক্রিয়া নামপুরুষ অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
ক) আমি কোথাও যাবো না।	ক) আমার যাওয়া হবে না কোথাও।
খ) তুমিই রাজশাহী যাবে।	খ) তোমাকেই রাজশাহী যেতে হবে।
গ) তোমরা কখন এলে।	গ) তোমাদের কখন আসা হল।

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য :

কর্মবাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করতে হলে–

ক) কর্তায় প্রথমা, কর্মে দ্বিতীয় বা শূন্য বিভক্তি হয়ে থাকে।

খ) ক্রিয়া কর্তা অনুযায়ী হয়। যেমন–

কর্মবাচ্য	কর্তবাচ্য
ক) দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।	ক) দস্যুদল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।
খ) শিক্ষক কর্তৃক সে জ্ঞানী হয়েছে।	খ) শিক্ষক তাকে জ্ঞানী করেছে।

ভাব বাচ্যের বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করার সময়–

ক) কর্তৃবাচ্যের কর্তায় প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি হবে।

খ) ক্রিয়াপদটি কর্তা অনুযায়ী হবে।

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
ক) তোমাকে পাশ করতে হবে।	ক) তুমি পাশ করবে।
খ) এবার একটি গান করা হোক।	খ) এবার (তুমি) একটি গান কর।
গ) তার যেন আসা হয়।	গ) সে যেন আসে।
ঘ) চা পান করা হোক।	ঘ) (তুমি) চা পান কর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ক. বাচ্য কাকে বলে? বাচ্য কত প্রকার ও কী কী?

খ. বাচ্যান্তর করুন

১. কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর করুন।

ক. আলেকজান্ডার পারস্য দেশ জয় করেন।

খ. মহাকবি ফেরদৌসি শাহনামা মহাকাব্য রচনা করেছেন।
গ. শিকারি বাঘ মেরেছে।
ঘ. আমি বইটি পড়েছি।

২. কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করুন।
ক. কাফেলা দুস্যদল দ্বারা আক্রান্ত
খ. স্থপতি ইসা বুমির তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মিত হয়েছে।
গ. মধুসূদন কর্তৃক **মেঘনাদবধকাব্য** রচিত হয়েছিল।

৩. কর্তৃবাচ্য থেকে ভাব বাচ্যে এবং ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করুন
ক. এবার একটি কবিতা আবৃত্তি হোক।
খ. আমি একাই খাব।
গ. আজ আর তোমার খাওয়া হবে না।
ঘ. ধর্মস্থানে বেয়াদবি করতে নেই।

৪. বাচ্যের ব্যবহারে ভুল থাকলে শুদ্ধ করুন :
ক. তোমার যাওয়া হউক আমি যাওয়া হবে না।
খ. ছাত্রগণ তোমাদিগকে কর্তৃক ব্যাকরণের পাঠ শোনা হউক।
গ. শাসন করা তাই সাজে, সোহাগ করে যে।
ঘ. আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজে।
ঙ. মাতা কর্তৃক একটি কলম দান করা হইয়াছি।

ইউনিট ৬
বাগর্থতত্ত্ব

পাঠ ৬.১ : বাগর্থ ও বাগর্থ পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাগর্থ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাগর্থ পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাক তথা কথার অর্থই বাগর্থ। একটি শব্দে আভিধানিক অর্থ থাকলেও সেই অর্থের বাইরেও বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পেতে পারে। যদি কেউ বলে, চলার সময় চোখ কান খোলা রেখো। এখানে শরীরের সাথে যে 'চোখ বা কান' থাকে তার কথা না বলে সজাগ বা সচেতন থাকার কথা বলা হয়েছে। শব্দ ও বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন দিক, তার পরিবর্তন, প্রসার ও সংকোচন ইত্যাদি বিচারই বাগর্থের কাজ। তবে এই অর্থ একইসঙ্গে, সাধারণ বা আক্ষরিক অর্থ এবং বিশেষ বা ব্যঞ্জনাময় অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। বাগর্থের একাধিক স্তর থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও কথার আক্ষরিক অর্থ প্রকাশের সূত্রেই এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অর্থ প্রকাশিত হয়। যদি কথার অর্থ গূঢ় হয় তাহলেও এর আক্ষরিক অর্থ অগ্রাহ্য করার উপায় থাকে না।

বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ স্থায়ী আসন নিয়েছে সেসব শব্দ কালক্রমে অর্থগত পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। সাধারণত অর্থকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ ধরনের তিনটি অর্থপরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো কোনো অর্থ নির্দিষ্ট, অভিধানে গৃহীত বা আভিধানিক। এসব শব্দকে মুখ্যার্থ আর অন্যদিকে মুখ্যার্থ থেকে জাত আলংকারিক বিশিষ্টার্থকে বলা হয় গৌণার্থ। বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এসব শব্দ বদলে যায়। তিনটি কারণে, 'অর্থপ্রসার, অর্থসংকোচন, অর্থবদল বা অর্থসংক্রম হয়'। এছাড়া অর্থালংকার অনুসারেও শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে। যেমন :

শব্দের অর্থপ্রসার বা উৎকর্ষ বা উন্নতি : যেসব শব্দের মূল বা পূর্বরূপ ও সম্প্রসারিত রূপ এক নয় সেসব শব্দে অর্থপ্রসার বা উৎকর্ষ বা উন্নতি ঘটেছে বলে বিবেচনা করা হয়। রূপক বা অতিশয়োক্তির ফলে কখনো কখনো অর্থের বিস্তৃতি ঘটে। এখানে ক্ষুদ্র অর্থ থেকে অর্থের বিস্তৃতি ঘটে। যেমন :

শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সম্প্রসারিত অর্থ	শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সম্প্রসারিত রূপ
গুন	গরুর নাড়িভুড়ি বা তাঁত	দড়ি	ইতিকথা	অর্থশূন্য বাক্য	ইতিহাস
অপরূপ	কদাকার	অপূর্ব সুন্দর	মন্দির	গৃহ	দেবতার আলয়
অদৃষ্ট	অদেখা	ভাগ্য/নিয়তি	ধ্যান	চিন্তা	পরমার্থ চিন্তা
অভিষেক	স্নান	উচ্চপদে আসীন	গাঙ	গঙ্গা	যে কোনো নদী
দরিয়া	নদী	সমুদ্র			

শব্দের অর্থসংকোচ বা অপকর্ষ বা অবনতি : যেসব শব্দের মূল বা পূর্বরূপ ও সংকোচিত রূপ এক নয় তাদের শব্দের অর্থসংকোচ বা অপকর্ষ বা অবনতি বলে। শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোনো একটি মুখ্য হয়ে উঠলে অন্যান্য অর্থের বিলুপ্তি ঘটে অর্থসংকোচ হয়। এখানে বিস্তৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্র অর্থ ঘটে। যেমন :

শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সংকোচিত অর্থ	শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সংকোচিত রূপ
বুয়া	দাদি, নানি	কাজের মহিলা	কীর্তিকলাপ	নানা সুখ্যাতি	অপকীর্তিসমূহ
মহাজন	মহৎজন	সুদখোর	মুর্গ	যে কোনো পাখি	মোরগ
ঝি	কন্যা/মেয়ে	কাজের মেয়ে/দাসী	অন্ন	যে কোনো খাদ্য	ভাত
মৃগ	যে কোনো পশু	হরিণ			
উজবুক	উজবেকের অধিবাসী	নির্বোধ/বোকা/মূর্খ			

শব্দের অর্থবদল বা অর্থসংক্রম : যেসব শব্দের মূল বা পূর্বরূপ ও সংক্রমিতরূপ এক নয় তাদের শব্দের অর্থবদল বা অর্থসংক্রম বলে। অর্থের প্রসার ও সংকোচনের ফলে কখনো কখনো কোনো কোনো শব্দের এমন অর্থ তৈরি হয়ে যায় যখন তাদের সঙ্গে মূল অর্থের সংযোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে তখন তাদের অর্থবদল বা অর্থসংক্রম বলা হয়।

শব্দ	মূল বা পূর্বরূপ	সংক্রমিত রূপ	শব্দ	মূল বা পূবরূপ	সংক্রমিত রূপ
ঘর্ম	গরম	ঘাম	পাষণ্ড	ধর্মসম্প্রদায়	নিষ্ঠুর
পাত্র	পানাধার	বর	অনটন	গতিহীন	অভাব
শুশ্রূষা	জানার ইচ্ছা	সেবা	অবকাশ	ফাঁক	অবসর
			অমূলক	মূলহীন	কাল্পনিক

এছাড়াও বিভিন্ন আলংকারিক প্রয়োগে বাগর্থ পরিবর্তন ঘটে থাকে। যখন বলা হয় 'সম্ভাবনার দুয়ার', তখন এর অর্থের সঙ্গে দুয়ারের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। এভাবে, উপমা ও রূপকসহ বিভিন্ন অলংকারের সাহায্যে অনেক সময় শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়। এই সূত্রে আরও উল্লেখ্য যে, শব্দ যখন গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে তখন সেই অর্থকে বলে ব্যঞ্জনার্থ। এখানে শব্দের অর্থ বা বাক্যের ব্যঞ্জনার্থের দ্যোতনা থাকতে পারে। আসলে ব্যঞ্জনার সংশ্লিষ্ট অভিব্যক্তিই ব্যঞ্জনার্থ। এখানে শব্দের অর্থ মুখ্যার্থ অথবা লক্ষ্যার্থ না ধরে তাকে অতিক্রম করে যে অর্থ তাই বিবেচনা করা হয়। অর্থপ্রকাশের দিক দিয়ে ব্যঞ্জনার্থ দুই প্রকার। এরা হলো :

অভিধা : যা সরলভাবে বলা হচ্ছে তাই হলো অভিধা বা সরল অর্থ। একটি শব্দের একাধিক অর্থ থেকে অধিক ব্যবহৃত একটি শব্দকে অভিধা বা প্রসিদ্ধ অর্থ বা সরল অর্থ বলে। যেমন: 'করী' অর্থ 'যার হাত আছে বুঝালেও' 'হাতি' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমটি হলো অভিধা, একে বাচ্যার্থও বলে। একে অভিধা শক্তিও বলে। কারণ এখানে যেসব শব্দের অর্থ সাধারণভাবে বোঝা যায় শুধু সেসব শব্দই এ পর্যায়ে পড়ে। যেমন: মানুষ, গরু, ছাগল, গাছ, বই, আকাশ ইত্যাদি।

তির্যক ব্যঞ্জনার্থ : সরলভাবে না বুঝিয়ে অন্য অর্থ প্রকাশক শব্দ বা বাক্যকে তির্যক ব্যঞ্জনার্থ বলে। একই বাক্যের মাধ্যমে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেতে পারে। অর্থপ্রকাশ বা বাগর্থ প্রকাশ যখন গভীর ও একাধিক মাত্রাকে অবলম্বন করে উপস্থাপিত হয় তখনই কথায় তির্যক ব্যঞ্জনার্থ যুক্ত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

৪. বাগর্থতত্ত্ব কী আলোচনা করুন।
৫. শব্দের অর্থ পরিবর্তনের কারণগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.২ : প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- কিছু শব্দ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

এমন অনেক শব্দগুচ্ছ বাংলা ভাষায় রয়েছে যাদের উচ্চারণ প্রায় একই হলেও এদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের কিছু শব্দজোড় পাওয়া যাবে যাদের বানান অভিন্ন। তবে, বাংলা ভাষায় পৃথিবীর অনেক ভাষার মতোই ধ্বনিবর্ণের মধ্যে বহুপ্রতিসম সম্পর্ক বিরাজ করে। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব শব্দজোড়ের বানানে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

এ ধরনের শব্দ একটি ভাষার সমৃদ্ধি ও সৌকর্যের প্রতিনিধিত্ব করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা ব্যবহারকারীরা যখন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার করার সক্ষমতা অর্জন করে, তখনই এসকল শব্দ ভাষার শব্দভাণ্ডারে স্থায়িত্ব পেয়ে থাকে। কেননা, দ্ব্যর্থবোধকতা এড়িয়ে যথাযথভাবে এসব শব্দ ব্যবহারে ভাষীর দক্ষতা বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া, আলংকারিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিচে এ ধরনের কিছু শব্দজোড়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো:

১
অন্ন (ভাত) দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্ব গতিতে মানুষের মুখে অন্ন ওঠা দায়।
অন্য (অপর) সংস্কার, সংস্কার বাদ দিয়ে দুটো অন্য কথা বল।

২
অনু (পশ্চাৎ) এই দেশে এক সময় স্ত্রীলোকদের মৃত স্বামীর চিতায় অনুগমন করতে হতো।
অণু (ক্ষুদ্রতম অংশ) এটুকু ভাতে আমার পেটের অণুটুকুও ভরবে না।

৩
অনিষ্ট (ক্ষতি) অন্যের অনিষ্টের চিন্তা কখনো মনে এনো না।
অনিষ্ঠ (নিষ্ঠাহীন) লেখা পড়ায় অনিষ্ঠ হলে পাস করতে পারবে না।

৪
অংশ (ভাগ) বাপের জমির অংশ মেয়েরাও ছাড়বে না।
অংস (কাঁধ) বিপদে দূরে সরে না থেকে অংস মেলাও।

৫
অর্ঘ (মূল্য) তোমার একাজের অর্ঘ দেওয়ার সাধ্য আমার নাই।
অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ) মানুষের জন্য কাজ করলে তারা তোমার পায়ের কাছে অর্ঘ্য সাজাবে।

৬
অশ্ব (ঘোড়া) শুয়ে পড়ো, অশ্বের মতো দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ো না।
অশ্ম (পাথর) অশ্মে মাথা ঠুকে লাভ নাই, চল বাড়ি যাই।

৭
অশক্ত (দুর্বল) বিপদে অশক্ত হতে নেই।
অসক্ত (আসক্তিহীন) বইয়ে অসক্ত হলে ছাত্রজীবন বৃথা হবে।

৮
অনিল (বাতাস) গুমোট গরমে অনিল এসে প্রাণ জুড়াল।
অনীল (যা নীল নয়) আকাশ কি কখনো অনীল হয়?

৯
অভ্যাস (বারবার চেষ্টা) পরীক্ষা কাছে, রাত জেগে, পড়ার অভ্যাস করো।

অভ্যাশ (নিকট) অংক অভ্যাস কর, পরীক্ষা অভ্যাশে।

১০

অবধ্য (বধের অযোগ্য) মানুষ মানুষের অবধ্য।

অবোধ্য (যা বোঝা যায় না) অবোধ্য তত্ত্বকথা সব জায়গায় বল না।

১১

অপরিণত (যা পরিণত হয়নি) অপরিণত বয়সে এ বই পড়ে কিছুই বুঝবে না।

অপরিণীত (অবিবাহিত) বিধবার ঘরে অপরিণীত দুটো মেয়ে আছে।

১২

অন্ত (শেষ) সংসারে কাজের অন্ত নাই।

অন্ত্য (যা অন্তে আছে) অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষেই শ্মশান বৈরাগীর শোক নিঃশেষ হয়ে যায়।

১৩

অন্যান্য (অপরাপর) অন্যান্যের সঙ্গেই তার ভাল সম্পর্ক আছে।

অন্যোন্য (পরস্পর) অন্যোন্যের প্রতি ভালোবাসায় মানুষের সুখ।

১৪

অন্নপুষ্ট (ভোজনপুষ্ট) এ আকালে অন্নপুষ্ট মানুষ নেই।

অন্যপুষ্ট (কোকিল) কাকের বাসায় কোকিলের ছা অন্যপুষ্ট হয়।

১৫

অবদান (সৎকর্ম) মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান অনস্বীকার্য।

অবধান (মনোযোগ) স্বাধীন দেশের মান বাড়াতে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তিতে অবধান দিতে হবে।

১৬

অবিরাম (অনবরত) অবিরাম চেষ্টা মানুষকে সফলতা এনে দেয়।

অভিরাম (সুন্দর) পোশাকে নয়নাভিরাম সেজো না, মনের দিকে অভিরাম হও।

১৭

অপচয় (ক্ষতি) সময়ের অপচয় করলে জীবন নষ্ট হয়।

অবচয় (চয়ন) সবকিছুতেই সৌন্দর্য অবচয়ন করতে হবে।

১৮

অবিনীত (উদ্ধত) অবিনীত সন্তান মা-বাবার মর্যাদা নষ্ট করে।

অভিনীত (অভিনয় করা হয়েছে এখন) অনেক সময় নাট্যদলের অভিনীত মঞ্চনাটক দর্শকের মনে আশা জাগায়।

১৯

অজগর (সাপ) অজগর অলস প্রকৃতির।

অজাগর (নিদ্রা)মা অজাগর ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

২০

অপগত (দূরীভূত) অপরের দুঃখ অপগত করতে জীবন বিলিয়ে দাও।

অবগত (জানা) দেশসেবা করতে চাইলে দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া চাই।

২১

আদি (মূল) চর্যাপদ বাংলার আদি কবিতা।

আধি (মনঃকষ্ট) আধি গোপন না করে খোলা মেলা আলোচনা করা ভালো।

২২

আশা (ভরসা) ছাত্রদের ওপর দেশের মানুষের অনেক আশা।

আসা (আগমন) আজ তার বাড়িতে আসা হবে না।

২৩

আবাস (বাসস্থান) ঢাকা শহরে অনেক মানুষের আবাস গৃহ নেই, তারা ফুটপথে থাকে।

আভাস (ইঙ্গিত) পুলিশের আভাসেই চোরটা পালিয়ে গেল।

২৪

আবরণ (আচ্ছাদন) ছাতার আবরণে রোদবৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আভরণ (অলংকার) আভরণের লোভ দেখিয়ে মেয়েদের ঘরে আটকে রাখা যাবে না।

২৫
আপন (নিজ) আপন কাজে কেউ ফাঁকি দেয় না।
আপণ (দোকান) আপন থেকে লবণ কিনে এনো।
২৬
আষাঢ় (মাস বিশেষ) বাংলাদেশে আষাঢ়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়।
আসার (প্রবল বৃষ্টিপাত) আসার বন্যার অন্যতম কারণ।
২৭
উপাদান (উপকরণ) আমাদের দেশে কৃষি উপাদান সহজলভ্য।
উপাধান (বালিশ) উপাধানে মাথা রেখে ঘুমাও।
২৮
কূল (তট) নদীকূলে বসে সূর্যাস্ত দেখতে ভালো লাগে।
কুল (বংশ) উঁচুকুলে জন্মালেই ভালো মানুষ হওয়া যায় না।
২৯
কাক (পাখি বিশেষ) কাক কালো হয়।
কাঁখ (কোমর) কলসি কাখে মেয়েরা ঘাটে যায়।
৩০
ক্রীত (কেনা হয়েছে যা) শ্রমিকেরা ক্রীতদাস নয়।
কৃত (করা হয়েছে যা) প্রত্যেক মানুষ নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।
৩১
কপাল (ললাট) কপাল ভালোমন্দ বলে কিছু নাই কাজ করলে ফল লাভ করা যায়।
কপোল (গণ্ডদেশ) কপোল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ল।
৩২
খাট (পালঙ্ক) খাটতো দূরের কথা আমাদের দেশে বহু মানুষের ঘরই নাই।
খাটো (বেঁটে) আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দৈর্ঘে খাটো।
৩৩
খুর (পশুর পায়ের তলদেশ) গরুর খুরের নিচে পা পড়লে মানুষের পা থেতলে যায়।
ক্ষুর (চুল দাড়ি কামাবার অস্ত্রবিশেষ ক্ষৌরকর্মে) এখন ক্ষুরের চেয়ে ব্লেড-এর ব্যবহার বেড়েছে।
৩৪
গা (শরীর) কৃষকের গা রোদে পুড়ে তামাটে হয়।
গা (গ্রাম) গায়ের মানুষ সহজসরল হয়।
৩৫
ঘোড়া (অশ্ব) ঘোড়ার গায়ে শক্তি বেশি।
ঘোরা (বিচরণ) রোদে বেশি ঘোরাঘুরি করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।
৩৬
চাখড়ি (খড়িমাটি) চাখড়ি দিয়ে কাপড়ে দাগকাটা যায়।
চাকরি (বেতনের বিনিময়ে কাজ) চাকরিতে স্বাধীনতা নেই।
৩৭
চাল (ঘরের চালা) গ্রামেও এখন আর খড়ের চালের প্রচলন নেই।
চাল (চাউল) বর্তমান চালের বাজারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
৩৮
চির (দীর্ঘকাল) চিরদিন কেউ বেঁচে থাকে না।
চীর (ছেঁড়া কাপড়) চীর হলেও পরিষ্কার করে পরতে হয়।
৩৯
ছার (অধম) সে আবার কোন ছার, তাকে কুর্নিশ করতে হবে!
ছাড় (অনুমতি) অশালীন সিনেমা প্রদর্শণীয় ছাড়পত্র বাতিল করতে হবে।
৪০

ছাদ (আচ্ছাদন) পায়ের নিচে মাটি আর মাথার ওপরে ছাদ– এই তো চাই।
ছাদ (আকৃতি, গঠন) পৃথিবীতে নানা ছাদের মানুষ দেখা যায়।
৪১
জল (পানি) জলের কোন রং নেই।
জ্বল (দীপ্তি) রাতে ঝোপে ঝোপে জোনাকির আলো জ্বলজ্বল করে।
৪২
জাম (ফলবিশেষ) পাকা জামের রস অম্লমধুর।
যাম (অংশ) দিবসের দ্বিতীয় যামে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
৪৩
জিব (জিহ্বা) কুকুরের জিব দিয়ে লালা পড়ে।
জীব (প্রাণী) বুদ্ধির জোরেই জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ।
৪৪
জ্যোতি (আলো) চাঁদের নিজের কোন জ্যোতি নাই।
যতি (ছেদ) কাজে যতি দেওয়া মানে কাজবন্ধ করা নয়।
৪৫
টিকা (রোগের প্রতিষেধক) টিকা দিলে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
টীকা (ব্যাখ্যা) অবোধ্য লেখায় টীকা টিপ্পনি জুড়ে স্পষ্ট করতে হয়।
৪৬
ডোল (ভাণ্ড) ডোলে ধান চাল রাখা হয়।
ঢোল (বাদ্যযন্ত্র) গায়কটি ঢাক ঢোল বাজিয়ে আসর জমিয়ে নিল।
৪৭
ডাল (শাখা) ঝড়ের সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে।
ডাল (খাদ্যবিশেষ) গরিবের ডালভাত খেয়ে দিন কাটে।
৪৮
ঢাল (আঘাত প্রতিরোধ করার অস্ত্র) ঢাল দিয়ে সে তীরের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করল।
ঢাল (ঢালু জমিবিশেষ) পাহাড়ের ঢালে ঢালে জুম চাষ হয়।
৪৯
দিন (দিবস) দিন যেয়ে রাত আসে।
দীন (দরিদ্র) দীনে দয়া করা মানুষের ধর্ম।
৫০
দেশ (ভূখণ্ড) ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে।
দ্বেষ (হিংসা) দ্বেষ মানুষকে ধবংস করে।
৫১
দীপ (আলো) মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে শুভ কামনা করা হয়।
দ্বীপ (জলবেষ্টিত স্থলভাগ) ভোলা বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ।
৫২
ধনী (বিত্তশালী) ধনী মানুষের ধনের লোভ অপরিসীম।
ধ্বনি (আওয়াজ) **১৯৭১** সালে 'জয়বাংলা' ধ্বনি রাজাকারদের আতঙ্কিত করে তুলত।
৫৩
ধরা (পৃথিবী) ধনধান্যভরা আমাদের এই ধরা।
ধড়া (কটি বস্ত্র) ধড়া পরে তাকে অসহায় মনে হচ্ছে।
৫৪
ধাতৃ (বিধাতা) মানুষের মাঝেই ধাতৃ নিজেকে লুকিয়ে রাখেন।
ধাত্রী (দাই) ধাত্রী মা শিশুটিকে লালনপালন করেন।
৫৫
নীর (পানি) বানের নীর মানুষের দুঃখের কারণ।

নীড় (পাখির বাসা) কোকিল নীড় বানাতে পারে না।
৫৬
নিতি (রোজ) ঘরে ভাত নেই, অথচ নীতি অতিথি আগমন!
নীতি (নিয়ম) দেশ পরিচালনার নীতিই রাজনীতি।
৫৭
নিত্য (প্রতিদিন) সে নিত্য এখানে আসা যাওয়া করে।
নৃত্য (নাচ) ছোট শিশুটির নৃত্য সবাইকে মুগ্ধ করেছে।
৫৮
নিরাশ (আশাহীন) কাজে সফল হতে হলে নিরাশ হলে চলবে না।
নিরাস (প্রত্যাখ্যান) দুর্নীতিকে মানুষ নিরাস করেছে।
৫৯
নিরস্ত্র (অস্ত্রহীন) ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্য।
নিরস্ত (ক্ষান্ত) জীবন দিয়েছে, তবু যুদ্ধে বাঙালি নিরস্ত হয়নি।
৬০
প্রদান (দেওয়া) বাংলাদেশ সরকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বিদেশীদের সম্মাননা প্রদান করেছে।
প্রধান (বড়, শ্রেষ্ঠ) ভাত বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য।
৬১
পরা (পরিধান) আদিম মানুষ কাপড় পরত না।
পড়া (পাঠ করা) বই পড়া মজার কাজ।
৬২
পান (পাতা বিশেষ) পাহাড়ে পানের চাষ ভালো হয়।
পান (পান করা) ধূমপান বদ অভ্যাস।
৬৩
প্রসাদ (অনুগ্রহ) প্রসাদ নয়, গরিবকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে।
প্রাসাদ (বড় দালান) ঢাকা শহরে প্রাসাদের অভাব নেই।
৬৪
পালক (পাখির ডানার অংশ) পালক পাখিকে শীত ও তাপ থেকে রক্ষা করে।
পলক (মুহূর্ত, অল্প সময়) পারমাণবিক বোমা এক পলকে আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে।
৬৫
পরভৃত (কোকিল) বসন্তে পরভৃত ডাকে।
পরভৃৎ (কাক) পরভৃৎ কা কা করে।
৬৬
ফি (প্রত্যেক) ফিবছর আমরা নববর্ষ উদযাপন করি।
ফি (বেতন) বেসরকারি বিদ্যায়তনে ভর্তি ফি বৃদ্ধি করে শিক্ষাকে পণ্য বানানো হচ্ছে।
৬৭
বর্ষা (ঋতুবিশেষ) বর্ষাকালে মাঠঘাট পানিতে ভরে যায়।
বর্শা (অস্ত্রবিশেষ) বর্শার আঘাতে মানুষের মৃত্যু হয়।
৬৮
বান (বন্যা) বানভাসী মানুষের পাশে দাঁড়াও।
বাণ (শর) বাণবিদ্ধ হরিণ শাবক ছটফট করতে করতে মারা গেল।
৬৯
বল (শক্তি) খাদ্য শরীরের বল বৃদ্ধি করে।
বল (খেলার বল) মাঠে বল হাতে সাকিব এক অনন্য খেলোয়াড়।
৭০
বিনা (ব্যতীত) বিনা কারণে কার্য হয় না।
বীণা (বাদ্যযন্ত্র) বীণার সুরে মানুষ আনন্দ পায়।

৭১
বিষ (গরল) আর্সেনিক এক প্রকার বিষ।
বিশ (কুড়ি) বিশ টাকায় এখন এক কেজি আলুও কিনতে পাওয়া যায় না।
৭২
ভাষণ (উক্তি, কথন, বক্তব্য) মিথ্যা ভাষণে মানুষকে আর বিভ্রান্ত করা যাবে না।
ভাসন (দীপ্তি) সূর্যের আলোয় সোনা ভাসন ছড়ায়।
৭৩
ভারা (স্তূপাকার) ধান কাটা শেষে চাষিরা ভারা করে রাখে।
ভাড়া (মাশুল) এখন বাসের ভাড়াও মানুষের অসহনীয়।
৭৪
মন (অন্তর, হৃদয়) মনই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
মণ (চল্লিশ সের) পরিমাপের জন্য এখন আর মণ ব্যবহার করা হয় না।
৭৫
মাস (ত্রিশ দিন) বারমাস সে এখানে থাকে।
মাষ (কলাই) মাষকলাই ডাল খেতে ভালো।
৭৬
মরা (মৃত) মরা মানুষ পানিতে ভেসে ওঠে।
মড়া (শবদেহ) মড়াকে তাড়াতাড়ি সৎকার করাই ভালো।
৭৭
মূর্খ (জ্ঞানহীন) মূর্খ মানুষের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।
মুখ্য (প্রধান) মেধা নয়, টাকাই শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।
৭৮
মোড়ক (আচ্ছাদন) বিজ্ঞাপনের মোড়কে পণ্যের গুণ বোঝা যায় না।
মড়ক (মহামারি) আগে মড়ক লেগে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত।
৭৯
যোগ্য (উপযুক্ত) চোরের ছেলে চোর যোগ্য বাপের যোগ্য পুত্র বটে।
যজ্ঞ (যাগ, উৎসব) বাংলা নববর্ষে ঢাকা মহানগর মানুষের মিলনযজ্ঞে পরিণত হয়।
৮০
রচক (রচয়িতা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীতের রচক।
রোচক (উপভোগ্য) মুখরোচক হলেই খাদ্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হয় না।
৮১
রাধা (রাধিকা) রাধা কৃষ্ণের লীলা বৈষ্ণব মতে ভগবত লীলা।
রাঁধা (রন্ধন করা) যে ভাত রাঁধে সে চুলও বাঁধে।
৮২
লক্ষ (সংখ্যা বিশেষ) লক্ষ লক্ষ মানুষ মাঠে নেমেছে।
লক্ষ্য (দৃষ্টি, উদ্দেশ্য, গন্তব্যস্থল) লক্ষ্যহীন জাতি গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।
৮৩
লব্ধ (লাভ করা) জ্ঞানলব্ধ মানুষ পথ চিনতে ভুল করে না।
লুব্ধ (আকৃষ্ট) বাহারি পোশাক দেখে অনেকেই লুব্ধ হয়।
৮৪
লক্ষণ (চিহ্ন) নিয়মিত লেখাপড়া করা ভালো ছাত্রের লক্ষণ।
লক্ষ্মণ (রামের ভাই) রাম ও লক্ষ্মণ সহোদর।
৮৫
শয্যা (বিছানা) শয্যা বিছিয়ে সে ঘুমিয়ে গেলো।
সজ্জা (সাজ) বর সজ্জায় তাকে বেশ মানিয়েছে।

৮৬
শব (মৃতদেহ) সব ধর্মেই শব সৎকারের কথা আছে।
সব (সকল) সব মানুষের মুখে ভাত জোগানোর দায়িত্ব সরকারের।
৮৭
শিকার (মৃগয়া) শিকার করা অনেক মানুষের শখ।
স্বীকার (মেনে নেওয়া) ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে।
৮৮
সর্গ (অধ্যায়) বইটির পাঠ সর্গে মহাকাব্যের অধ্যায়কে সর্গ বলা হয়।
স্বর্গ (বেহেশত) মাতৃভূমি মানুষের কাছে স্বর্গের সমান।
৮৯
সহিত (সঙ্গে) পণ্যের সহিত বিনা মূল্যে উপহার দেওয়া বিক্রয় কৌশল।
স্ব-হিত (নিজ কল্যাণ) পাগলেও স্ব-হিত বোঝে।
৯০
সাড়া (সংকেত) বিড়ালের সাড়া পেয়ে ইঁদুরটি পালিয়ে গেল।
সারা (সমাপ্ত) কাজ সারা হলেই ঘরে ফিরব।
৯১
সাক্ষর (অক্ষর জ্ঞান) গত কয়েক বছরে দেশে স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা বেড়েছে।
স্বাক্ষর (নামসই) আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বাক্ষর করতে জানে না।
৯২
হাড় (অস্থি) হাড়ই সম্বল, তার শরীরে মাংস নেই বললেই চলে।
হার (পরাজয়) প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কাউকে না কাউকে হার মানতেই হয়।
৯৩
হাঁস (হংস) হাঁস পানিতে সাঁতার কাটে।
হাস (হাসি) হাসতে পারলে মন ভালো থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ বলতে কী বোঝেন?
২. নিচের প্রায় সমোচ্চারিত শব্দজোড়ের অর্থসহ বাক্যরচনা করুন।

ক. অপচয় অবচয়	খ. অন্ত অন্ত্য	গ. আসা আশা
ঘ. অংশ অংস	ঙ. অনিল অনীল	

পাঠ ৬.৩ : প্রতিশব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রতিশব্দ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রতিশব্দের ব্যবহার করতে পারবেন।

এ ধরনের শব্দের গঠন ও উচ্চারণ ভিন্ন হলেও এরা অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ভাষার একঘেয়েমি দূর করে প্রাঞ্জলতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রতিশব্দের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তবে, প্রতিশব্দ অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলেও বাক্যকাঠামোতে একটি শব্দের কোন প্রতিশব্দটি যথোপযুক্ত তা নিরূপণের ক্ষেত্রে বাক্যস্থিত অন্যান্য উপাদানের ওপর নির্ভর করে। তাই একটি শব্দের সমার্থক কোনো শব্দ বসিয়ে দিলেই চলবে না, তা সংশ্লিষ্ট বাক্যিক পরিবেশে কতটা মানানসই সেটার প্রতিও লক্ষ রাখতে হবে।

অ বর্ণ

১. অবকাশ	অবসর, ছুটি, ফুরসত, সময়, সুযোগ
২. অপূর্ব	অদ্ভুত, আজব, আশ্চর্য, তাজ্জব, চমৎকার
৩. অকস্মাৎ	আচমকা, আকস্মিক, সহসা, হঠাৎ
৪. অকাল	অসময়, অবেলা, অদিন, কুদিন, দুঃসময়
৫. অক্লান্ত	অদম্য, ক্লান্তিহীন, নিরলস, পরিশ্রমী
৬. অক্ষম	অসমর্থ, অপটু, অদক্ষ, অযোগ্য, দুর্বল
৭. অঙ্গীকার	পণ, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, শপথ, সংকল্প
৮. অচেতন	অজ্ঞান, অসাড়, জ্ঞানশূন্য, জ্ঞানহীন, বেহুঁশ
৯. অজ্ঞ	অশিক্ষিত, অজ্ঞানী, মূর্খ, নির্বোধ, বেকুব
১০. অতিরিক্ত	অনেক, প্রচুর, পর্যাপ্ত, বেশি, মেলা
১১. অতীত	গতদিন, তৎকাল, পূর্ব, সেকাল, পূর্বকাল
১২. অত্যাচার	উপদ্রব, নিপীড়ন, নির্যাতন, জুলুম, লাঞ্ছনা
১৩. অদৃশ্য	অগোচর, অদেখা, অদৃষ্ট, অলক্ষ্য, না দেখা
১৪. অধিবেশন	সভা, সমিতি, সমাবেশ, মিটিং
১৫. অধ্যয়ন	পাঠ, পঠন, পড়া, পাঠাভ্যাস, লেখাপড়া
১৬. অনন্ত	অন্তহীন, অসীম, অশেষ, চিরস্থায়ী
১৭. অনুজ্জ্বল	নিস্তেজ, জ্যোতিহীন, ম্লান, বিবর্ণ
১৮. অনুরোধ	আবেদন, আবদার, আরজি, বায়না
১৯. অপরিচিত	অজানা, নাজানা, অজ্ঞাত, অচিন
২০. অভাব	অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, গরিবি, দুর্দশা
২১. অলস	কুড়ে, অকর্মণ্য, অকেজো, ঢিলে, আলসে
২২. অল্প	কম, সামান্য, অপ্রচুর, নগণ্য, কিয়ৎ, ঈষৎ
২৩. অগ্নি	আগুন, অনল, বহ্নি, পাবক
২৪. অশ্ব	ঘোড়া, বাজী, তুরগ, টাঙ্গন
২৫. অতিশয়	অতি, অতীব, অতিমাত্রা, অধিক, অত্যন্ত
২৬. অখ্যাতি	কুৎসা, বদনাম, দুর্নাম, অপবাদ
২৭. অন্ধকার	আঁধার, তিমির, তমসা, শবর

২৮. অচল	গতিহীন, অটল, স্থির, নিথর, অপ্রচলিত
২৯. অবস্থা	দশা, রকম, প্রকার, হাল, হালত
৩০. অনাদর	উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অবহেলা, হেলা, অযত্ন
৩১. অপচয়	অপব্যয়, বৃথাব্যয়, ক্ষতি, ক্ষয়,হ্রাস
৩২. অতিথি	মেহমান, কুটুম, আগন্তুক, আমন্ত্রিত

আ বর্ণ

১. আসল	খাঁটি, মূলধন, মৌলিক, মূল, মৌল
২. আইন	বিধান, কানুন, ধারা, নিয়ম, নিয়মাবলি
৩. আঁধার	অন্ধকার, তমসা, তিমির, শর্বরী, আলোহীন
৪. আকার	আকৃতি, চেহারা, আদল, গড়ন, গঠন
৫. আমন্ত্রণ	আহ্বান, নিমন্ত্রণ
৬. আরম্ভ	শুরু, সূচনা, ভূমিকা, সূত্রপাত, প্রারম্ভ
৭. আলো	রশ্মি, কিরণ, দীপ্তি, প্রভা, নুর, জ্যোতি, আভা
৮. আকাশ	অম্বর, নভ, গগন, আসমান, দ্যুলক
৯. আদেশ	আজ্ঞা, হুকুম, অনুমতি, অনুশাসন, অনুজ্ঞা
১০. আনন্দ	হর্ষ, আহ্লাদ, ফুর্তি, খুশি, আমোদ, মজা
১১. আফসোস	পরিতাপ, দুঃখ, খেদ, অনুতাপ, আক্ষেপ, মনস্তাপ
১২. আধুনিক	সাম্প্রতিক, নব্য, নবীন, বর্তমান, হালের
১৩. আকুল	ব্যাকুল, কাতর, উৎসুক, কৌতূহলী, অস্থির
১৪. আশ্চর্য	বিস্ময়, চমক, অবাক

ই /ঈ বর্ণ

১. ইচ্ছা	সাধ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, আশা, চাওয়া
২. ইতি	সমাপ্তি, শেষ, অবসান, সমাপন, ছেদ
৩. ইদানিং	সম্প্রতি, আজকাল, এখন, অধুনা, বর্তমান
৪. ঈর্ষা	দ্বেষ, বিদ্বেষ, হিংসা, রেষারেষি, বৈরিতা

উ/ঊ বর্ণ

১. নমুনা	দৃষ্টান্ত , নিদর্শন, নজির
২. উজ্জ্বল	আলোকিত, উদ্ভাসিত, ভাস্বর, ঝলমলে, দীপ্ত
৩. উত্তম	উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, সেরা, অতুলনীয়
৪. উচ্ছেদ	উৎপাটন, উৎখাত, নির্মূল, বিনাশ, স্থানচ্যুতি
৫. উচিত	যোগ্য, কর্তব্য, উপযুক্ত, ন্যায্য, সমীচীন
৬. উপযুক্ত	যোগ্য, উপযোগী, সমকক্ষ, সক্ষম
৭. উপকথা	উপাখ্যান, কাহিনি, গল্প, কেচ্ছা

এ/ঐ বর্ণ

১. একতা	ঐক্য, মিলন, একত্ব, অভেদ, অভিন্নতা
২. ঐশ্বর্য	ধন, সম্পত্তি, বিত্ত, প্রতিপত্তি
৩. ঐক্য	একতা, একত্ব, মিল, অভিন্ন, সমতা

ব্যঞ্জনবর্ণ

১.	কাঁদা	ক্রন্দন, কান্না, রোদন, কান্নাকাটি, অশ্রুত্যাগ
২.	কেনা	ক্রয়, খরিদ, কেনাকাটা, সওদা
৩.	কোন্দল	বিবাদ, বিরোধ, ঝগড়া, কলহ
৪.	কষ্ট	ক্লেশ, আয়াশ, পরিশ্রম, দুঃখ
৫.	কন্যা	মেয়ে, নন্দিনী, কুমারী, ঝি, বেটি
৬.	কথা	উক্তি, বচন, কথন, বাক্য, বাণী
৭.	কলহ	ঝগড়া, বিরোধ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, কাইজা
৮.	কপাল	ভাল্‌, অদৃষ্ট, ভাগ্য, নিয়তি
৯.	কেশ	অলক, চিকুর, কুন্তল, চুল
১০.	কুল	বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ
১১.	কঠিন	শক্ত, দৃঢ়, কঠোর, কড়া, জটিল
১২.	কল্যাণ	মঙ্গল, শুভ, সুখ, কল্যাণযুক্ত, সমৃদ্ধি
১৩.	কাটা	কর্তন করা, খণ্ডন করা, খনন করা
১৪.	কারণ	হেতু, নিমিত্ত, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য
১৫.	কৃষক	চাষি, কৃষিজীবী, কর্ষক
১৬.	কূল	তীর, তট, কিনারা, ধার, পার, পাড়
১৭.	খ্যাতি	যশ, সুনাম, নাম, নামযশ, প্রতিষ্ঠা
১৮.	খাদ্য	খাবার, ভোজ্য, অন্ন, রসদ, খানা
১৯.	খবর	সংবাদ, বার্তা, তত্ত্ব, তথ্য, সমাচার, নিউজ, সন্দেশ
২০.	খাঁটি	বিশুদ্ধ, আসল, প্রকৃত, যথার্থ, সাচ্চা
২১.	খারাপ	মন্দ, কু, বদ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র
২২.	খুব	ভীষণ, প্রচণ্ড, প্রচুর, অনেক, অত্যন্ত , অতিশয়
২৩.	খোঁজা	অন্বেষণ, সন্ধান, অন্বেষা, এষণা, তালাশ
২৪.	খেচর	পাখি, পক্ষি, বিহঙ্গ, খগ
২৫.	গভীর	অগাধ, প্রগাঢ়, নিবিড়, অতল, গহন
২৬.	গরু	ধেনু, গো, গাভী, পয়স্বিনী
২৭.	গৃহ	ভবন, আলয়, নিলয়, সদন, ঘর, বাড়ি
২৮.	ঘরনি	গৃহিণী, গিন্নী, বউ, স্ত্রী, পত্নী, জায়া, বিবি
২৯.	চন্দ্র	চাঁদ, শশী, শশাঙ্ক, ইন্দু, হিমাংশু
৩০.	চক্ষু	চোখ, লোচন, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, আঁখি
৩১.	চঞ্চল	অস্থির, চপল, ব্যাকুল, কম্পিত, বিচলিত
৩২.	চিত্র	ছবি, প্রতিমূর্তি, নকশা
৩৩.	চির	অনন্ত , নিরবধি, নিত্য, অটুট
৩৪.	চিন্তা	মনন, ভাবা, স্মরণ, ধ্যান, ভাবনা
৩৫.	ছেদ	যতি, ছেদন, বিরাম, দাঁড়ি
৩৬.	ছাত্র	বিদ্যার্থী, শিষ্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ
৩৭.	জন্ম	উৎপত্তি, উদ্ভব, সৃষ্টি, ভূমিষ্ঠ, জনম, আবির্ভাব
৩৮.	জলাশয়	পুকুর, সরোবর, দিঘি, জলাধার, জলাভূমি
৩৯.	জাত	জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র, বংশ, প্রকার, কুল
৪০.	জ্ঞান	বোধ, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, শিক্ষা, চেতনা
৪১.	ঝড়	সাইক্লোন, ঝটিকা, ঝঞ্ঝা, তুফান

৪২. ঝোঁক টান, আকর্ষণ, মমতা, মায়া, ভালবাসা
৪৩. ঠিক সত্য, যথার্থ, নির্ভুল, ন্যায্য, ভাল, উত্তম
৪৪. ঠাট্টা উপহাস, রসিকতা, বিদ্রূপ, মশকরা
৪৫. ডগা শীর্ষ, শিখর, অগ্রভাগ, আগা, মাথা
৪৬. ঢেউ ঊর্মি, তরঙ্গ, হিলল, জোয়ার
৪৭. ঢাকনা আবরণ, আচ্ছাদন, ঢাকা, ছাদ, সরা
৪৮. ঢের প্রচুর, অনেক, বেশি, রাশি, স্তূপ
৪৯. তপন সূর্য, রবি, ভানু, প্রভাকর, দিনপতি
৫০. তৃষ্ণা পিপাসা, তেষ্টা, পিয়াসা, ইচ্ছা
৫১. তুষার বরফ, হিম, হিমানী, তুহীন
৫২. তৈরি গঠন, নির্মাণ, গড়া, বানানো, প্রস্তুত
৫৩. দলিল নথি, নথিপত্র, কাগজপত্র, পাট্টা, দস্তাবেজ
৫৪. দক্ষ নিপুণ, পটু, পারদর্শী
৫৫. দরিদ্র নির্ধন, গরিব, বিত্তহীন, নির্বিত্ত
৫৬. দরদ মমতা, টান, আকর্ষণ
৫৭. দয়া অনুগ্রহ, করুণা, কৃপা, অনুকম্পা, মায়া
৫৮. দুঃখ কষ্ট, ক্লেশ, যন্ত্রণা, দুখ, ব্যথা, বেদনা
৫৯. দাস ভৃত্য, চাকর, ক্রীতদাস, অনুগত, অধীন
৬০. দান দেওয়া, অর্পণ, সম্প্রদান, বিতরণ, উৎসর্গ
৬১. দাহ দহন, জ্বালা, পোড়া, সৎকার
৬২. দীন দরিদ্র, কাতর, অসহায়, দুঃখ, করুণ
৬৩. ধন বিত্ত, অর্থ, সম্পদ, বিভব, টাকা-পয়সা
৬৪. ধর্ম রীতি, আচরণ, সৎকর্ম, পুণ্যকর্ম
৬৫. ধ্বংস নাশ, বিনাশ, বিলোপ, শেষ, ভস্ম, কেয়ামত
৬৬. ধবল সাদা/শাদা, শ্বেত, শুভ্র, শুল্ক, ধলা
৬৭. নবীন আনকোরা, নতুন, আধুনিক, অধুনা, নব, নয়া
৬৮. নাম খ্যাতি, সুনাম, অভিধা
৬৯. নিকট সন্নিহিত, কাছে, অদূর, অদূরবর্তী
৭০. নম্র ভদ্র, বিনয়ী, বিনয়াবনত, কোমল, নরম
৭১. নদী তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিণী, গাং
৭২. নর মানব, মানুষ, মনুষ্য, লোক, জন, পুরুষ
৭৩. নারী মহিলা, স্ত্রী, মেয়ে, ললনা, মানবী
৭৪. নিজ আপন, স্বীয়, স্বয়ং, নিজস্ব, ব্যক্তিগত
৭৫. নিত্য সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, নিয়মিত, রোজ
৭৬. নিদ্রা ঘুম, বিশ্রাম, অসাড়
৭৭. পরিবর্তন বদল, পাল্টানো, সংস্কার, সংশোধন
৭৮. পানি জল, বারি, সলিল, নীর, পয়ঃ
৭৯. পৃথিবী ভুবন, জগৎ, ধরণী, ধরা, বিশ্ব
৮০. পাপ পাতক, কলুষ, দুষ্কর্ম, দুষ্কৃতি
৮১. পদ্ম কমল, উৎপল, পঙ্কজ, কুমুদ, শতদল
৮২. পর্বত গিরি, পাহাড়, নগ, অচল, ক্ষিতিধর
৮৩. পিতা জনক, জন্মদাতা, বাবা, আব্বা, বাপ

৮৪.	পুত্র	আত্মজ, দুলাল, তনয়, ছেলে, কুমার, পোলা
৮৫.	পাথর	পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, কাঁকর, কঙ্কর
৮৬.	পুষ্প	কুসুম, ফুল, রঙ্গনা, প্রসূন
৮৭.	পণ্ডিত	বিদ্বান, বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, বিশারদ, মনীষী
৮৮.	পতন	পড়া, অধোগতি, অবনতি, ধ্বংস, স্খলন
৮৯.	পতাকা	কেতন, ঝাণ্ডা, ধ্বজা, নিশান
৯০.	পত্নী	বউ, জায়া, সহধর্মিণী, জীবনসাথি, স্ত্রী
৯১.	পথ	রাস্তা, সরণি, সড়ক, নির্গমন, রাহা
৯২.	পরম	শ্রেষ্ঠ, মহৎ, অত্যন্ত , প্রধান, চরম
৯৩.	পূর্ণ	পুরা, ভর্তি, সফল, সিদ্ধ, সম্পূর্ণ, সমাপ্ত
৯৪.	পেলব	কোমল, মৃদু, লঘু, সুন্দর, নিপুণ, নরম
৯৫.	পেষণ	দলন, মর্দন, বাঁটা, চূর্ণন, পেষা
৯৬.	প্রকৃতি	স্বভাব, চরিত্র, ধর্ম, নিসর্গ
৯৭.	প্রবৃত্তি	অভিরুচি, স্পৃহা, স্বভাব
৯৮.	প্রভু	মনিব, স্বামী, ঈশ্বর, কর্তা, অধিপতি
৯৯.	পত্র	পাতা, পল্লব, পত্তর, চিঠি
১০০.	ফাঁকি	অবহেলা, বঞ্চনা, প্রতারণা, ঠকামি
১০১.	বন্ধুত্ব	মৈত্রী, সৌহার্দ্য, সখ্য, মিতালি, দোস্তি
১০২.	বায়ু	হাওয়া, বাতাস, পবন, সমীর, সমীরণ
১০৩.	বিচিত্র	বিভিন্ন, রকমারি, রকমফের, বিবিধ, নানান
১০৪.	বিশৃঙ্খল	ব্যতয়, গোলমাল, গোলযোগ
১০৫.	বৃহৎ	বিশাল, প্রকাণ্ড, মস্ত , বিপুল, বড়
১০৬.	বন	অরণ্য, অটবি, জঙ্গল, কানন, বনানী, বনভূমি
১০৭.	বন্ধু	সখা, মিত্র, সুহৃদ, বান্ধব, স্বজন, প্রিয়জন
১০৮.	বৃক্ষ	তরু, মহীরুহ, উদ্ভিদ, গাছপালা
১০৯.	বস্ত্র	বসন, পরিধেয়, কাপড়, পোশাক
১১০.	বসন্ত	মধুকাল, রাগ, ঋতুরাজ, মধুমাস
১১১.	বিমান	উড়োজাহাজ, হাওয়াই জাহাজ, আকাশযান
১১২.	বদ	দুষ্ট, মন্দ, অসাধু, অসৎ, কর্কশ, খারাপ
১১৩.	বাদ	বাতিল, কথন, ভাষণ, উক্তি, বিয়োগ, ত্যাগ
১১৪.	বর	বরণীয়, পতি, স্বামী, জামাই
১১৫.	বহু	অধিক, অনেক, প্রচুর, বেশি
১১৬.	বড়	জ্যেষ্ঠ, ধনী, শ্রেষ্ঠ, শীর্ষ, উচ্চ
১১৭.	বদ্ধ	বাঁধা, আবদ্ধ, রুদ্ধ, যুক্ত, বিন্যস্ত
১১৮.	বন্যা	প্লাবন, বান, জলোচ্ছ্বাস, জোয়ার, কোটাল
১১৯.	বশ	অধীন, আয়ত্ত, অধীনতা, বশবর্তিতা
১২০.	বসা	উপবেশন, স্থাপন, সক্রিয় হওয়া
১২১.	বাস্তু	বাসস্থান, বাসগৃহ, বাসভূমি, আবাস
১২২.	বিদ্যুৎ	তড়িৎ, বিজলি, চপলা, চঞ্চলা
১২৩.	বিফল	ফলহীন, নিষ্ফল, অসমর্থ, ব্যর্থ
১২৪.	বিচক্ষণ	বহুদর্শী, দূরদর্শী, অভিজ্ঞ, কর্মদক্ষ
১২৫.	বিচার	বিবেচনা, যুক্তিপ্রয়োগ, তর্ক, মীমাংসা

১২৬. বিধি নিয়ম, বিধান, আইন, পদ্ধতি, উপায়
১২৭. বিয়োগ বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু, অভাব
১২৮. বিরক্ত বিমুখ, অপ্রসন্ন, বিদ্বিষ্ট, ক্ষুব্ধ
১২৯. বিবাহ বিয়ে, পরিণয়, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, শাদি
১৩০. ভয় শঙ্কা, ত্রাস, ভীতি, ডর
১৩১. ভাই ভ্রাতা, সহোদর, ভাইয়া, ভায়া
১৩২. ভাগ্য বিধি, কপাল, নসিব, তকদির, নিয়তি
১৩৩. ভুল ভ্রম, ভ্রান্তি , ত্রুটি, প্রমাদ, গলদ, দোষ
১৩৪. ভ্রমর ভোমরা, মৌমাছি, মধুকর, মধুপ, অলি
১৩৫. ভগ্ন ভাঙা, খণ্ডিত, চূর্ণিত, দুমড়ানো, কুঞ্চিত
১৩৬. ভজন স্তুতি, আরাধনা, সেবা, প্রশংসা
১৩৭. ভয়ানক ভয়ংকর, ভয়াবহ, খুব, ভীষণ
১৩৮. ভর অবলম্বন, নির্ভর, সহযোগিতা, ভার
১৩৯. মাতা জননী, মা, গর্ভধারিণী, জন্মধাত্রী
১৪০. মৃত্যু মরণ, নিধন, ইন্তেকাল, মহাপ্রস্থান

অন্যান্য বর্ণ

১৪১. রাজা রাজ্যপাল, নৃপতি, ভূপতি, মহীপাল, সম্রাট
১৪২. রানি রাজ্ঞী, মহিষী, সম্রাজ্ঞী, রাজমহিষী, বেগম
১৪৩. ঋষি তপস্বী, মুনি, যোগী, সাধুপুরুষ
১৪৪. ঋদ্ধ সমৃদ্ধ, উন্নত, পুষ্ট
১৪৫. ঋতু কাল, মৌসুম, মরশুম
১৪৬. শিক্ষক গুরু, ওস্তাদ, মাস্টার, টিচার
১৪৭. হস্তি হাতি, করী, গজ, দ্বিপ, মাতঙ্গ
১৪৮. হরিণ মৃগ, মৃনয়ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের শব্দগুলোর প্রতিশব্দ লিখুন।

অদৃশ্য, বৃক্ষ, বায়ু, পোষণ, ভ্রমর, কূল, চন্দ্র, জাত, ঝড়, ঢেউ, ঢের, ঋতু, হস্তি, মাতা, বৃহৎ।

পাঠ ৬.৪ : একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ করতে পারবেন।

বাংলাভাষায় কিছু শব্দ রয়েছে যাদের আভিধানিক অর্থ এক হলেও প্রতিবেশ ভেদে এরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ভাষায় কিছু বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াশব্দ রয়েছে যারা আভিধানিক অর্থ ছাড়াও ব্যবহারিক বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। এদের পরে অন্য অর্থবোধক শব্দ বসে বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায়। এদের একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ বলে বিবেচনা করা হয়।

বিশিষ্টার্থ শব্দের ব্যবহার

শব্দ আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ বিশেষ অর্থ বাক্যরচনা

অর্থ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মানে বা টাকা

বিশেষ অর্থ :

১. অর্থ বোঝা (উদ্দেশ্য)	তার কথার অর্থ বোঝা গেল না।
২. কথার অর্থ (মানে)	তোমার কথার অর্থ কী?
৩. হাতে অর্থ নেই (টাকা)	তার হাতে কোন অর্থ নেই।
৪. অর্থনীতি (শাস্ত্রবিশেষ)	অর্থনীতি বেশি কঠিন নয়।
৫. অর্থবান (সম্পদশালী)	অর্থবানের হাত সব সময় বড় হয়।

উঠা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উত্থিত হওয়া

বিশেষ অর্থ :

১. রব উঠা (গুজব উঠা)	কুকর্মটি মতি মিয়া করেছে বলে রব উঠেছে।
২. জাতে উঠা (সমাজে স্থান পাওয়া)	প্রায়শ্চিত্ত করে সে জাতে উঠেছে।
৩. জ্বলে উঠা (ক্রুদ্ধ হওয়া)	খুনি আসামির কথা শুনে হাকিম জ্বলে উঠলেন।
৪. কানে উঠা (শুনতে পাওয়া)	কথাটা শেষ পর্যন্ত বাবার কানে উঠেছে।
৫. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	এত অল্পে তার মন ওঠে না।
৬. খরচ উঠা (খরচ পোষানো)	সে ব্যবসাতে মোটা টাকা লোকসান দিয়েছে;খরচ পর্যন্ত ওঠেনি।
৭. রঙ উঠা (বিবর্ণ হওয়া)	কাপড়টার রঙ উঠে যাবে।
৮. চাঁদা উঠা (অর্থ সংগৃহীত হওয়া)	সমিতিতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছে।

কথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বাক, বচন, ভাষা, উক্তি

বিশেষ অর্থ :

১. কথা দেওয়া (প্রতিশ্রুতি দেওয়া)	তাকে আমি টাকা দেব বলে কথা দিয়েছি।
২. কথা চলা (প্রস্তাব হওয়া)	আমাদের গ্রামে একটি হাই স্কুল খোলার কথা চলছে।
৩. শেষ কথা (প্রস্তাব হওয়া)	তার মতো জুচ্চোর আমার কাছে কোন সাহায্য পাবে না; এই আমার শেষ কথা।

৪. কথা (তুলনা) বড় লোকের ছেলে তুমি, তোমার সঙ্গে কার কথা!

কান

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. কান পাতা (শুনার জন্য মনোযোগ দেওয়া) দুষ্ট ছেলেটি বুড়োদের আলাপে কান পেতে থাকে।
২. কান দেওয়া (শোনা) সে কারো কথায় কান দেয় না।
৩. কানে উঠা (কর্ণগোচর হওয়া) তোমার অপরাধের কথা তোমার বাবার কানে উঠেছে।
৪. কানে তোলা (কথা উত্থাপন করা) এসব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে তুলে লাভ নেই।
৫. কানে বাজা (রেশ থাকা) তার কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে।
৬. কান ভার করা (সন্দেহ সৃষ্টি করা) ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে স্বামীর কান ভার করল মীরা।

কাজ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কর্ম, কার্য

বিশেষ অর্থ :

১. কাজ দেওয়া (সহায়ক) ভাল গাড়ি পুরোনো হলেও কাজ দেয়।
২. কাজ (প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া) শিক্ষা ছাড়া জীবনে কেবল টাকাতে কাজ হয় না।
৩. কাজে লাগা (প্রয়োজনে আসা) পুরোনো চাদরটি রেখে দাও; কাজে লাগবে।
৪. কাজ পাওয়া (কর্মের সংস্থান হওয়া) অনেক ঘোরাঘুরির পর সে একটা ভাল কাজ পেয়েছে।
৫. কাজ হাসিল করা (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া) কেবল মধুর কথায় কাজ হাসিল করা যায় না।

কাঁচা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : অপক্ব

বিশেষ অর্থ :

১. কাঁচা ইট (অপোড়া ইট) কাঁচা ইটের দালান ঝড়ে পড়ে যাবে।
২. কাঁচা লোক (অনিপুণ লোক) মতিন সাহেব কাঁচা লোক নন।
৩. কাঁচা ঘুম (সদ্য ঘুম) ছেলেটাকে কাঁচা ঘুমে ডেকো না।
৪. কাঁচারঙ (অস্থায়ীরঙ) শাড়িখানির কাঁচারঙ সহজে উঠে গেল।
৫. কাঁচা হাত (অনিপুণ হাত) কাঁচা হাতের লেখা; কত আর ভাল হবে!
৬. কাঁচা সোনা (বিশুদ্ধ সোনা) কাঁচা সোনার গয়নার ঔজ্জ্বল্যই আলাদা।
৭. কাঁচা মাথা (অপক্ব) ছেলেটির অঙ্কে কাঁচা মাথা বলে প্রতি বছরই ফেল করে।
৮. কাঁচা কথা (হালকা কথা) তিনি তো আর কাঁচা কথার লোক নন।

কড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : তীব্র, অকোমল

বিশেষ অর্থ :

১. কড়া (কঠোর) কড়া কথায় কারো মনে আঘাত দিয় না।
২. কড়া (প্রখর) কড়া রোদে দৌড়ান ভালো নয়।
৩. কড়া (সতর্ক) বাড়িটা কড়া পাহারা দিতে হচ্ছে।
৪. কড়া (খুব বেশি) কড়া সুদে টাকা ধার করা ঠিক নয়।
৫. কড়া (পাকা) এটি কড়ারঙের কাপড়।
৬. কড়া (উগ্র) তার কড়া মেজাজ অসহনীয়।

গরম

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উষ্ণ, তাপ, উত্তাপ

বিশেষ অর্থ :

১. গরম (উগ্র)	আমাকে গরম মেজাজ দেখাবেন না।
২. গরম (অজীর্ণ)	পেট গরম বলে সে আজ ভাত খায়নি।
৩. গরম (মূল্য বৃদ্ধি)	এখন কাপড়ের বাজার গরম।
৪. গরম (অহংকার)	টাকার গরমে তার ঘুম হচ্ছে না।
৫. গরম (উত্তাপ)	জ্বরে ছেলেটির গা গরম হয়েছে।
৬. গরম (গ্রীষ্ম)	গরমকাল আমার মোটেই ভালো লাগে না।
৭. গরম (টাটকা)	এটা আজকের গরম খবর।

গা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : শরীর, গতর

বিশেষ অর্থ :

১. গায়ে মাখা (গ্রাহ্য করা)	ছেলেটি বড় বেহায়া, কোনো কথাই গায়ে মাখে না।
২. গা ঢাকা দেওয়া (আত্মগোপন করা)	অন্ধকারে লোকটা গা ঢাকা দিলো।
৩. গায়ে হাত তোলা (প্রহার করা)	গরিবের গায়ে হাত তোলা ভালো নয়।
৪. গায়ে কাঁটা দেওয়া (রোমাঞ্চিত হওয়া)	সেই রাত্রির কথা মনে পড়লে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে।
৫. গা করা (মন দেওয়া)	বসে থেকে কি হবে? গা করে কাজ করো।
৬. গা জুড়ানো (স্বস্থি পাওয়া)	তোমার ঐ দশটি টাকায় আমার গা জুড়াবে না।

চোখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চক্ষু, নয়ন

বিশেষ অর্থ :

১. চোখ দেখা (চোখ পরীক্ষা করা)	ডাক্তার সাহেব রুগির চোখ দেখে চশমা নিতে বললেন।
২. চোখ পাকানো বা রাঙানো (রাগ দেখানো)	তোমার চোখরাঙানিতে ঘাবড়াব, সে লোক আমি নই।
৩. চোখ উঠা (চক্ষূরোগ বিশেষ)	ছেলেটার চোখ উঠেছে।
৪. চোখঠারা (চোখ দিয়ে ইশারা করা)	কেনো তুমি চোখঠারাও প্রমিলার দিকে?
৫. চোখ ফোটা (প্রকৃত জ্ঞান হওয়া)	কবে যে তোমার চোখ ফুটবে কে জানে!
৬. চোখ রাখা (দৃষ্টিরাখা)	ছেলেটির প্রতি একটু চোখ রেখো।
৭. চোখ খোলা (বোধ হওয়া)	কিন্তু তার কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না।
৮. চোখে ধুলো দেওয়া (ঠকানো)	পরের চোখে ধুলো দিয়ে আর কতোদিন চলবে?
৯. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা)	পা মাড়িয়ে যাও কেনো চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?
১০. চোখের দেখা (দর্শন)	মাঝে মাঝে চোখের দেখা দিও, বন্ধু।
১১. চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো (ভালোভাবে বুঝানো)	তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কিছুই বুঝবে না।
১২. চোখ টাটানো (ঈর্ষা হওয়া)	পরের মঙ্গল দেখলে খারাপ লোকের চোখ টাটায়।

ছোট

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ

বিশেষ অর্থ :

১. ছোট (সংকীর্ণ)	লোকটার মন ছোট।

২. ছোট (নীচ) ছোট লোক কত ভদ্রতাই বা জানবে।
৩. ছোট (কনিষ্ঠ) ছোট ছেলেটি মা-বাবার আদুরে।
৪. ছোট (তুচ্ছ) অত ছোট কথায় কান দিও না।
৫. ছোট (ক্ষুদ্র) ছোট কাজটি করতে বেশি সময় লাগবে না।
৬. ছোট (অপমানিত) ছেলেটির দুর্ব্যবহারে সমাজের কাছে আমার আমার মুখ ছোট হয়েছে।
৭. ছোট (বিনয়ী) বড়যদি হতে চাও ছোট হও আগে।

ছাড়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বর্জন বা ত্যাগ করা

বিশেষ অর্থ :

১. আশা ছাড়া (ত্যাগ করা) ঐ চাকরির আশা ছেড়েছি।
২. হাল ছাড়া (নিরাশ হওয়া) এতো শিগগির হাল ছাড়লে চলবে কি করে!
৩. গলা ছাড়া (উদাত্ত কণ্ঠ) গলা ছেড়ে গান গাও।
৪. জ্বর ছাড়া (জ্বর থামা) ঘাম দিয়ে তার জ্বর ছেড়েছে।
৫. ছেড়ে দেওয়া (মুক্ত করা) পাখিটাকে ছেড়ে দাও।
৬. ঘর ছাড়া (গৃহত্যাগ করা) ঘর ছেড়ে ছেলেটি পথে পথে ঘুরছে।
৭. ছাড়া (ব্যতীত) তোমাকে ছাড়া বাঁচে কি পরান।
৯. ছাড়া (আশ্রয়) মা ছাড়া শিশু অসহায়।

তোলা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : উঠানো, উত্তোলন

বিশেষ অর্থ :

১. গুজব তোলা (রটনা করা) যে মিথ্যা গুজব তোলে, সে দেশের শত্রু।
২. ঘরে তোলা (গৃহজাত করা) সব ফসল ঘরে তোলা হয়েছে তো?
৩. সুর তোলা (সুর ভাঁজা) গায়ক গানের সুর তুলতে চেষ্টা করছে।
৪. পটল তোলা (মারা যাওয়া) সে অল্প বয়সে পটল তুলেছ।
৫. চাঁদা তোলা (চাঁদা সংগ্রহ করা) দুর্গত এলাকার জন্য স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলতে নেমেছে।
৬. হাত তোলা (প্রহার করা) গরিবের গায়ে হাত তোলা উচিত নয়।
৭. কথা তোলা (প্রসঙ্গ উত্থাপন করা) বড় সাহেবের কাছে আমার কথাটা তুলছে নাকি।
৮. জাতে তোলা (সমাজে স্থান দেওয়া) প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে তোলা হয়েছে।
৯. কারবার তোলা (লোপ করা) ক্ষতির ভয়ে কারবার তুলে খুব ভাল কাজ করিনি।
১০. ফুল তোলা (চয়ন করা) সেলিনা বাগানে ফুল তুলছে।
১১. ফসল তোলা (গোলাজাত করা) কৃষক তার মাঠের ফসল তুলেছে।

দেওয়া

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : প্রদান

বিশেষ অর্থ :

১. নাম দেওয়া (তালিকাভুক্ত হওয়া) তরুণ ছেলেটি সৈন্য বিভাগে নাম দিয়েছে।
২. সাড়া দেওয়া (আহ্বানে জবাব দান) দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।
৩. জাত দেওয়া (মান বিনষ্ট করা) অভাবে পড়ে ছেলেটি জাত দিয়েছে।
৪. হানা দেওয়া (আক্রমণ করা) দেশে শত্রু হানা দিয়েছে।
৫. কান দেওয়া (শুনা) গুজবে কান দিয়ো না।
৬. প্রাণ দেওয়া (আত্মত্যাগ করা) প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের জন্য হেসে হেসে প্রাণ দিতে পারেন।

৭. তা দেওয়া (উষ্ণতা দেওয়া) — মুরগি ডিমে তা দিচ্ছে।
৮. ছুটি দেওয়া (বন্ধ দেওয়া) — আজ থেকে কলেজ দুদিনের ছুটি দেওয়া হয়েছে।
৯. মুখ দেওয়া (খাওয়া) — বিড়াল দুধে মুখ দিয়েছে।
১০. চম্পট দেওয়া (পালাইয়া যাওয়া) — দুষ্ট ছেলেটা টাকা মেরে চম্পট দিয়েছে।

ধরা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : স্পর্শ, পাকড়ানো, পৃথিবী

বিশেষ অর্থ :

১. দোষ ধরা (দেখান) — পরের দোষ ধরার অভ্যাস ভালো নয়।
২. তাল ধরা (উৎসাহ দেওয়া) — প্রতি কাজেই তাল ধরলে হয় না।
৩. রোগ ধরা (রোগাক্রান্ত হওয়া) — লোকটাকে শক্ত রোগে ধরেছে।
৪. মনে ধরা (পছন্দ হওয়া) — কলমটি আমার মনে ধরেনি।
৫. ট্রেন ধরা (ঠিক সময় ট্রেন পাওয়া) — বড্ড দেরি হয়ে গেছে; ট্রেন ধরতে পারব কি?
৬. দাম ধরা (মূল্য নির্ধারণ) — ন্যায্য দাম ধরে গরুটি দিয়ে দাও।
৭. কলম ধরা (লিখা শুরু করা) — শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বিরুদ্ধে কলম ধরতে হলো।
৮. ধরা (অনুরোধ করা) — বড় কর্তাকে ধরলেই চাকরি হয়ে যাবে।
৯. গান ধরা (গান গাওয়া) — অনেক সাধাসাধির পর তিনি গান ধরলেন।

পা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পদ, চরণ

বিশেষ অর্থ :

১. পা বাড়ানো (অগ্রসর হওয়া) — পা বাড়িয়ে চলো; সাফল্য তোমার আসবেই।
২. পা চালান (দ্রুতবেগে চলন) — অফিসের সময় হওয়াতে সে পা চালিয়ে চলে গেল।
৩. পায়ে পড়া (ক্ষমা চাওয়া) — কৃত অপরাধের জন্য ছাত্রটি শিক্ষকের পায়ে পড়ল।
৪. পায়ে ঠেলা (তুচ্ছ করা) — হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।
৫. পায়ে ধরা (অনুরোধ করা) — ওর মতো কৃপণের পায়ে ধরলেও দুটি টাকা দেবে না।
৬. পা চাটা (হীন খোশামোদ করা) — দুমুঠো ভাতের জন্য কারো পা চাটতেও তার আপত্তি নাই।

পাকা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : পক্ব, পরিণত

বিশেষ অর্থ :

১. পাকা ইট (পোড়ানো) — পাকা ইটের বাড়ি খুব শক্ত মজবুত।
২. পাকা (অভিজ্ঞ) — রহমান সাহেব পাকা ডাক্তার।
৩. পাকা সোনা (খাঁটি) — পাকা সোনার অলংকার টিকে বেশি।
৪. পাকারং (স্থায়ী) — পাকা রঙের শাড়ি দামে সস্তা নয়।
৫. পাকা চুল (সাদা) — বুড়োর পাকা চুলের বাহার দেখো।
৬. পাকা খাতা(শেষ) — পাকা খাতায় হিসেব তোলা হয়েছে; আর কাটাকাটি সম্ভব নয়।
৭. পাকা (নিপুণ) — বুড়োর কাজে খুঁত থাকে না সে এতই পাকা।
৮. পাকা (সম্পূর্ণ) — এ কাজটি করতে যকির পাকা এক সপ্তাহ লেগেছে।
৯. পাকাকথা (অপরিবর্তনীয়) — তারা বিয়েতে পাকাকথা দিয়েছে।

বড়

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বৃহৎ, দীর্ঘ, মহৎ, খুব

বিশেষ অর্থ :

১. বড় (ধনী)	সে বেশ বড় লোক।
২. বড় (উচ্চপদস্থ)	অফিসের বড় বাবু বদমেজাজি লোক।
৩. বড় (অত্যন্ত)	বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছিলাম।
৪. বড় (উদার)	সম্রাট আকবর বড় মনের অধিকারী ছিলেন।
৫. বড় (জ্যেষ্ঠ)	মৈত্রী বাবা মায়ের বড় মেয়ে।
৬. বড় (উচ্চবংশ)	বড় ঘরের মেয়ে বলে তার এত দেমাক।
৭. বড় (কঠোর)	সে আমার মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারল!
৮. বড় (বিশেষ)	বড়দিনের ছুটিতে লিপি বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেল।
৯. বড় (নিকট)	লোকটি আমার বড় কুটুম।

বুক

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : বক্ষস্থল, অন্তর, ছাতি

বিশেষ অর্থ :

১. বুক বাঁধা (মন দৃঢ় করা)	পিতৃহীন ছেলেটি বুক বেঁধে জীবন সংগ্রামে নেমেছে।
২. বুক ফাটা (হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া)	কোন কোন মায়ের বুক ফাটলেও মুখ ফোটেনা।
৩. বুকের পাটা (সাহস)	বিড়াল দেখলে যে ভয় পায়, তার আবার বুকের পাটা!
৪. বুক পাতা (সাহায্য করা)	প্রকৃত মানুষ যাঁরা, তাঁরা পরের জন্য বুক পাততে পারেন।
৫. বুক ফুলা (গর্ব করা)	ছেলের পরীক্ষা পাশে বুড়োর বুক ফুলে গেছে।
৬. বুকে লাগা (আঘাত পাওয়া)	তোমার কঠোর বাক্য বন্ধুর বুকে লেগেছে।
৭. বুক লাগান (সাহায্য করা)	পরের বিপদে বুক লাগান মহত্ত্বের কাজ।

মন

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : চিত্ত, হৃদয়

বিশেষ অর্থ :

১. মন উঠা (সন্তুষ্ট হওয়া)	যতই দাও না কেন তার কিন্তু মন উঠবে না।
২. মন পড়া (পছন্দ হওয়া)	মেয়েটাতে তার মন পড়েছে।
৩. মন লাগা (মনোযোগী হওয়া)	কিছুতেই কাজে মন লাগছে না।
৪. মনে পড়ে (স্মরণে আসা)	কবিতার লাইনটা মনে পড়ছে না।
৫. মনে লাগা (পছন্দ হওয়া)	বাড়িটি আমার বেশ মনে লেগেছে।
৬. মন পাওয়া (ভালোবাসা পাওয়া)	এত করেও তোমার মন পাইনি।
৭. মনের মিল (সদ্ভাব)	ওদের দুজনের মধ্যে মনের মিল নেই।
৮. মন কষাকষি (মনোমালিন্য)	সম্পত্তি নিয়ে উভয়ের মধ্যে মন কষাকষি আছে।

মাথা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মস্তক, শির, আগা, আরম্ভ ,শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. মাথা দেওয়া (সাহায্য করা)	বিপদে যে মাথা দেয় সেই প্রকৃত বন্ধু।
২. মাথা ধরা (মাথায় যন্ত্রণা হওয়া)	ওষুধ খেয়ে রোগীর মাথা ধরেছে।
৩. মাথা পাতা (সম্মত হওয়া)	এ কাজে আমি মাথা পাততে পারি না।
৪. মাথা আসা (বোধগম্য হওয়া)	অঙ্কটি কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না।
৫. মাথা খাওয়া (নষ্ট করা)	অতি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ো না।
৬. মাথা ঠেকান (প্রণাম করা)	ও আমার দেশের মাটি, তোমার তরে ঠেকাই মাথা।

৭. মাথায় উঠা (প্রশ্রয় পাওয়া) আদর পেয়ে ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে।
৮. মাথা গরম করা (চটিয়া যাওয়া) এত অল্পে ছেলেটা মাথায় গরম করছে।
৯. চোখের মাথা খাওয়া (অন্ধ হওয়া) চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?
১০. মাথার দিব্যি (শপথ) মাথার দিব্যি, তুমি সেখানে যাবে না।

মুখ

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : মুখমণ্ডল, সম্মুখ

বিশেষ অর্থ :

১. মুখ রাখা (মান রাখা) ছেলেটা তার বাবার মুখ রেখেছে।
২. মুখ উজ্জ্বল করা (গৌরব বাড়ানো) সুপুত্র বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।
৩. মুখ চাওয়া (নিভুর্র করা) আমি তার মুখ চেয়ে বসে আছি।
৪. মুখ তোলা (প্রসন্ন হওয়া) খোদা দরিদ্র লোকটির দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।
৫. মুখে খই ফোটা (বেশি কথা বলা) মনে হয়, বক্তার মুখে যেন খই ফুটছে।
৬. মুখ খোলা (নীরবতার পর কথা বলা) অনেকক্ষণ পর দেখি আপনি মুখ খুললেন।
৭. মুখ সামলানো (সংযত হওয়া) খবরদার মুখ সামলিয়ে কথা বলো।
৮. মুখ করা (তিরস্কার করা) আমি আপনার খাই, না পরি; আমাকে মুখ করছেন কেন?
৯. মুখ চুন হওয়া (লজ্জা পাওয়া) ছোট ভাইয়ের অভদ্র ব্যবহারে আমার মুখ চুন হয়েছে।
১০. মুখ ভার করা (অভিমান করা) মুখ ভার করে বসে থেকে কি লাভ?
১১. মুখ ফুটে বলা (সাহস করে বলা) এ সামান্য কথাটাও মুখ ফুটে তুমি বলতে পারলে না?
১২. মুখচোরা (লাজুক) তার মতো মুখচোরা ছেলে আবার আইন পড়ে।
১৩. মুখবন্ধ (ভূমিকা) মুখবন্ধে বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।
১৪. মুখ লাল হওয়া (রাগান্বিত হওয়া) তার কথা শুনে কবির সাহেবের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

মোটা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :

বিশেষ অর্থ :

১. মোটা (স্থূল) মোটা বুদ্ধিতে সব কাজ হয় না।
২. মোটা (অমসৃণ) মোটা কাপড় আমি পরি না।
৩. মোটা (মিহি নয়-এমন) মোটা ভাত ও মোটা কাপড়েই সে তুষ্ট।
৪. মোটা (বেশি) মোটা আয়ের লোক গরিবকে চোখে দেখে না।
৫. মোটা (বহু) আমার মোটা কাজ আছে।
৬. মোটা (প্রচুর) মোটা ধার নিলে শেষে শোধ করতে পারে না।

রাখা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :

বিশেষ অর্থ :

১. পায়ে রাখা (আশ্রয় দেওয়া) এ অধমকে পায়ে রেখ, হে খোদা!
২. মান রাখা (সম্মান রাখা) সন্তান বংশের মান রাখতে পারে।
৩. মন রাখা (সন্তুষ্ট করা) সকলের মনরেখে চলা কঠিন।
৪. কথা রাখা (অনুরোধ রক্ষা করা) আমার বিশ্বাস, সে আমার কথা রাখবে।
৫. চোখ রাখা (নজর রাখা) শিশুটির প্রতি চোখ রেখো।
৬. মনে রাখা (স্মরণ রাখা) সে বংশের মান রেখেছে।

৭. নাম রাখা (সম্মান রাখা) ছেলেটা বাপের নাম রেখেছে।
৮. কথা রাখা (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা) শেষ পর্যন্ত কথা রাখলেন বড় সাহেব।

লাগা

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ :

বিশেষ অর্থ :

১. পিছু লাগা (শত্রুতা করা)	সে আমার পিছু লেগেছে কেন বুঝতে পারছি না।
২. জোড়া লাগা (সংলগ্ন হওয়া)	ভাঙা মন জোড়া লাগে না।
৩. মন লাগা (মনোযোগ দেওয়া)	কাজে মন লাগাও।
৪. চমক লাগা (আশ্চর্যান্বিত হওয়া)	দৃশ্যটি দেখে আমার চমক লেগেছে।
৫. ভেল্কি লাগা (ধাঁধাঁ লাগা)	মন্ত্র আউড়িয়ে লোকের মনে ভেল্কি লাগানোর যুগ চলে গেছে।
৬. নজর লাগা (কু দৃষ্টি লাগা)	রমেশবাবুর বাড়ির প্রতি চোরের নজর লেগেছে।
৭. ভাল লাগা (পছন্দ হওয়া)	একই জায়গায় বেশিদিন ভাল লাগে না।
৮. ঘাটে লাগানো (ভিড়ান)	জাহাজ ঘাটে লেগেছে।
৯. কাজে লাগা (শুরু করা)	সম্প্রতি এক নতুন কাজে লেগেছি।
১০. হাতে লাগা (হাতে আঘাত পাওয়া)	সাবধানে কাজ করো নতুবা হাতে লাগবে।

শক্ত

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : কঠিন, নরম না

বিশেষ অর্থ :

১. শক্ত কথা (কড়া)	কাউকে শক্ত কথা বলো না।
২. শক্ত (কঠিন)	অঙ্কটি খুবই শক্ত।
৩. শক্ত (দুরারোগ্য)	বড় শক্ত পীড়ায় সে ভুগছে।
৪. শক্ত লোক (নির্দয়)	শক্ত লোক অনেকেরই পছন্দ নয়।
৫. শক্ত (মজবুত)	করিম সাহেবের হাতের কাজ খুবই শক্ত।

হাত

আভিধানিক বা সাধারণ অর্থ : হস্ত /শরীরের একটি অঙ্গ

বিশেষ অর্থ :

১. হাত আসা (অভ্যাস হওয়া/রপ্ত হওয়া)	কাজটিতে তার হাত এসেছে।
২. হাত করা (বশীভূত করা)	চাকরটাকে হাত করে চোর ঘরে ঢুকেছে।
৩. হাত থাকা (প্রস্তাব)	এ ব্যাপারে আমার হাত নেই।
৪. হাত পাতা (অনুগ্রহ চাওয়া/ভিক্ষা করা)	আমি তার কাছে হাত পাততে পারবো না।
৫. হাত দেওয়া (কাজ করতে চাওয়া)	এক সপ্তাহ ধরে কাজটিতে হাত দিতে পারি না।
৬. হাতটান (চুরির অভ্যাস)	হাতটানের জন্য চাকরটাকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।
৭. হাত তোলা (প্রহার করা)	গরিবের গায়ে হাত তোলা ভাল নয়।
৮. হাত দেখা (ভাগ্য গণনা করা)	জ্যোতিষী তার হাত দেখেছে।
৯. হাত যশ (সুখ্যাতি)	ডা. রফিকের হাত যশ আছে।

১০. হাত চলা (তাড়াতাড়ি করা) একটু হাত চালাও বাছারা, অনেক কাজ যে বাকি।

১১. হাতজোড় করা (ক্ষমা চাওয়া) থাক হয়েছে ভাই, আর বকোনা;
তোমার কাছে হাতজোড় করছি।

১২. হাত পাকা (দক্ষ হওয়া) চেষ্টা করলেই হাত পাকাতে পারবে।

১৩. হাত খরচ (ব্যক্তিগত খুচরা ব্যয়) প্রতি মাসে সে তার বাবার নিকট থেকে সামান্য হাত খরচ পায়।

১৪. হাত খালি (নিঃস্ব হওয়া) মাসের শেষে সবারই হাত খালি থাকে।

১৫. হাতেনাতে (প্রমাণসহ ধরা) চোরটিকে শেষে হাতেনাতে ধরা হয়েছে।

১৬. হাতে পাওয়া (আয়ত্তে পাওয়া) অনেক দিন পর তাকে হাতে পেয়েছি।

১৭. হাতেখড়ি (প্রাথমিক শিক্ষা) শিরিনের হাতে খড়ি হয়েছে।

১৮. হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল) বৃদ্ধা শেষে হাতের পাঁচকেও হারালো।

১৯. হাতের পুতুল (যাকে দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করানো যায়) সে তার হাতের পুতুল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের শব্দগুলোর একই শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগ দেখান।

কথা, চোখ, মাথা, পাকা, মুখ।

ইউনিট ৭
ভাষার প্রয়োগরীতি

পাঠ ৭.১ : প্রমিত বাংলা বানানরীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রমিত বাংলা বানান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে বাংলা বানানরীতিতে সংস্কৃত শব্দ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু, অতৎসম শব্দ অর্থাৎ, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, অর্ধ-তৎসম প্রভৃতি উৎস হতে প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। ফলে অতৎসম শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানান সংস্কারের জন্য ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। ফলে রাজশেখর বসুকে সভাপতি করে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি" গঠিত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগ ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে বাংলা বানান নিয়ে নানা সুপারিশ ও নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। এরপর ১৯৯২ সালের এপ্রিলে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিলো তা ১৯৯৪ সালে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বানানরীতি ও (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) প্রবর্তিত বানানরীতির সমন্বয়ে বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানরীতি সময়ের দাবি অনুযায়ী যথার্থ। ২০০০ সালে এ নিয়মের কিছু সূত্র সংশোধিত হয়। ২০১২ সালে পুনরায় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১

তৎসম শব্দ

১.১

এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২

যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন:

কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

১.৩

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন:

অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

১.৪

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন:

অহম্ + কার = অহংকার

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন:

অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫

সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন:

গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রিপরিষদ।

তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন:

গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও-তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন:

কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→ সহযোগিতা।

১.৬

বিসর্গ (ঃ)

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন:

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন:

দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

২

অতৎসম শব্দ

২.১

ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন:

আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি,

ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি।

চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বল? কী করছ? কী করে যাবে? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২

এ, অ্যা

বাংলা এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন:

কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন:

ব্যাঙ, ল্যাঠা।

এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন:

অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩

ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন:

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো;

এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো;

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;

কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;

করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো;

করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো;

কোনো, মতো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।

২.৪

ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন:

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫

ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬

জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন:

কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন:

আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্‌যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.৭

মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন:

অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন:

কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন:

গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

২.৮

শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন:

কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন;

আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব;

স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর।

ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম;

এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং –sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন:

পাসপোর্ট, বাস;

ক্যাশ;

টেলিভিশন;

মিশন, সেশন;

রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন:

তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯

বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়।

এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন:

স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন:

মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০

হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন:

কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন:

উহ্, বাহ্, যাহ্।

২.১১

ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন:

বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

৩

বিবিধ

৩.১

সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন:

অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন:

কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

৩.২

বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন:

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩.৩

না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ

করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমনঃ

নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ

না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৩.৪

অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্নরূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমনঃ

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.৫

নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্নরূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমনঃ

আজই, এখনই।

৪

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান

বা সংস্থার নাম

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

৫

ক্রিয়াপদের রূপ

৫.১

উঠ্ ধাতু

(আমি) উঠতাম, উঠেছিলাম, উঠছিলাম, উঠলাম, উঠেছি, উঠছি, উঠি, উঠব; ওঠাতাম, উঠিয়েছিলাম, ওঠাচ্ছিলাম, ওঠালাম, উঠিয়েছি, ওঠাচ্ছি, ওঠাই, ওঠাব

(তুমি) উঠতে, উঠেছিলে, উঠছিলে, উঠলে, উঠেছ, উঠছ, ওঠো, উঠবে, উঠো; ওঠাতে, উঠিয়েছিলে, ওঠাচ্ছিলে, ওঠালে, উঠিয়েছ, ওঠাচ্ছ, ওঠাও, ওঠাবে, উঠিয়ো

(তুই) উঠতি(স), উঠেছিলি, উঠছিলি, উঠলি, উঠেছিস, উঠছিস, উঠিস, উঠবি, ওঠ; ওঠাতি, উঠিয়েছিলি, ওঠাচ্ছিলি, ওঠালি, উঠিয়েছিস, ওঠাচ্ছিস, ওঠাস, ওঠাবি, ওঠা

(সে) উঠত, উঠেছিল, উঠছিল, উঠল, উঠেছে, উঠছে, ওঠে, উঠবে, উঠুক; ওঠাত, উঠিয়েছিল, ওঠাচ্ছিল, ওঠাল, উঠিয়েছে, ওঠাচ্ছে, ওঠায়, ওঠাবে, ওঠাক

(আপনি/তিনি) উঠতেন, উঠেছিলেন, উঠছিলেন, উঠলেন, উঠেছেন, উঠছেন, ওঠেন, উঠবেন, উঠুন; ওঠাতেন, উঠিয়েছিলেন, ওঠাচ্ছিলেন, ওঠালেন, উঠিয়েছেন, ওঠাচ্ছেন, ওঠাবেন, ওঠান

উঠে, উঠিয়ে

৫.২

কর্ ধাতু

(আমি) করতাম, করেছিলাম, করছিলাম, করলাম, করেছি, করছি, করি, করব; করাতাম, করিয়েছিলাম, করাচ্ছিলাম, করালাম, করিয়েছি, করাচ্ছি, করাই, করাব

(তুমি) করতে, করেছিলে, করছিলে, করলে, করেছ, করছ, করো, করবে, কোরো; করাতে, করিয়েছিলে, করাচ্ছিলে, করালে, করিয়েছ, করাচ্ছ, করাও, করাবে, কোরিয়ো

(তুই) করতি(স), করেছিলি, করছিলি, করলি, করেছিস, করছিস, করিস, করবি, কর; করাতি, করিয়েছিলি, করাচ্ছিলি, করালি, করিয়েছিস, করাচ্ছিস, করাস, করাবি, করা

(সে) করত, করেছিল, করছিল, করল, করেছে, করছে, করে, করবে, করুক; করাতো, করিয়েছিল, করাচ্ছিল, করালো, করিয়েছে, করাচ্ছে, করায়, করাবে, করাক

(আপনি) করতেন, করেছিলেন, করছিলেন, করলেন, করেছেন, করছেন, করেন, করবেন, করুন; করাতেন, করিয়েছিলেন, করাচ্ছিলেন, করালেন, করিয়েছেন, করাচ্ছেন, করাবেন, করান

করে [ক'রে], করিয়ে

৫.৩

কাট্ ধাতু

(আমি) কাটতাম, কেটেছিলাম, কাটছিলাম, কাটলাম, কেটেছি, কাটছি, কাটি, কাটব; কাটাতাম, কাটিয়েছিলাম, কাটাচ্ছিলাম, কাটালাম, কাটিয়েছি, কাটাচ্ছি, কাটাই, কাটাব

(তুমি) কাটাতে, কেটেছিলে, কাটছিলে, কাটলে, কেটেছ, কাটছ, কাটো, কাটবে, কেটো; কাটাতে, কাটিয়েছিলে, কাটাচ্ছিলে, কাটালে, কাটিয়েছ, কাটাচ্ছ, কাটাও, কাটাবে, কাটিয়ো

(তুই) কাটতি(স), কেটেছিলি, কাটছিলি, কাটলি, কেটেছিস, কাটছিস, কাটিস, কাট, কাটবি; কাটাতি, কাটিয়েছিলি, কাটাচ্ছিলি, কাটালি, কাটিয়েছিস, কাটাচ্ছিস, কাটাস, কাটা, কাটাবি

(সে) কাটত, কেটেছিল, কাটছিল, কাটল, কেটেছে, কাটছে, কাটে, কাটুক, কাটবে; কাটাত, কাটিয়েছিল, কাটাচ্ছিল, কাটাল, কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে, কাটায়, কাটাক, কাটাবে

(আপনি) কাটতেন, কেটেছিলেন, কাটছিলেন, কাটলেন, কেটেছেন, কাটছেন, কাটেন, কাটুন, কাটবেন; কাটাতেন, কাটিয়েছিলেন, কাটাচ্ছিলেন, কাটালেন, কাটিয়েছেন, কাটাচ্ছেন, কাটান, কাটাবেন, কেটে, কাটিয়ে

৫.৪

খা ধাতু

(আমি) খেতাম, খেয়েছিলাম, খাচ্ছিলাম, খেলাম, খেয়েছি, খাচ্ছি, খাই, খাব; খাওয়াতাম, খাইয়েছিলাম, খাওয়াচ্ছিলাম, খাওয়ালাম, খাইয়েছি, খাওয়াচ্ছি, খাওয়াই, খাওয়াব

(তুমি) খেতে, খেয়েছিল, খাচ্ছিলে, খেলে, খেয়েছ, খাচ্ছ, খাও, খেয়ো, খাবে; খাওয়াতে, খাইয়েছিলে, খাওয়াচ্ছিলে, খাওয়ালে, খাইয়েছ, খাওয়াচ্ছ, খাওয়াও, খাইয়ো, খাওয়াবে

(তুই) খেতি(স), খেয়েছিলি, খাচ্ছিলি, খেলি, খেয়েছিস, খাচ্ছিস, খাস, খাবি, খা; খাওয়াতি, খাইয়েছিলি, খাওয়াচ্ছিলি, খাওয়ালি, খাইয়েছিস, খাওয়াচ্ছিস, খাওয়াস, খাওয়াবি, খাওয়া

(সে) খেতো, খেয়েছিল, খাচ্ছিল, খেলো, খেয়েছে, খাচ্ছে, খায়, খাবে, খাক; খাওয়াত, খাইয়েছিল, খাওয়াচ্ছিল, খাওয়াল, খাইয়েছে, খাওয়াচ্ছে, খাওয়ায়, খাওয়াবে, খাওয়াক

(আপনি/তিনি) খেতেন, খেয়েছিলেন, খাচ্ছিলেন, খেলেন, খেয়েছেন, খাচ্ছেন, খান, খাবেন; খাওয়াতেন, খাইয়েছিলেন, খাওয়াচ্ছিলেন, খাওয়ালেন, খাইয়েছেন, খাওয়াচ্ছেন, খাওয়ান, খাওয়াবেন খেয়ে, খাইয়ে

৫.৫

দি ধাতু

(আমি) দিতাম, দিয়েছিলাম, দিচ্ছিলাম, দিলাম, দিয়েছি, দিচ্ছি, দিই, দেবো; দেওয়াতাম, দিইয়েছিলাম, দেওয়াচ্ছিলাম, দেওয়ালাম, দিইয়েছি, দেওয়াচ্ছি, দেওয়াই, দেওয়াব

(তুমি) দিতে, দিয়েছিলে, দিচ্ছিলে, দিলে, দিয়েছ, দিচ্ছ, দাও, দিয়ো, দেবে; দেওয়াতে, দিইয়েছিলে, দেওয়াচ্ছিলে, দেওয়ালে, দিইয়েছ, দেওয়াচ্ছে, দেওয়াও, দিইয়ো, দেওয়াবে

(তুই) দিতি(স), দিয়েছিলি, দিচ্ছিলি, দিলি, দিয়েছিস, দিচ্ছিস, দিস, দিবি, দে; দেওয়াতি, দিইয়েছিলি, দেওয়াচ্ছিলি, দেওয়ালি, দিইয়েছিস, দেওয়াচ্ছিস, দেওয়াস, দেওয়াবি, দেওয়া

(সে) দিত, দিয়েছিল, দিচ্ছিল, দিলো, দিয়েছে, দিচ্ছে, দেয়, দেবে, দিক; দেওয়াত, দিইয়েছিল, দেওয়াচ্ছিল, দেওয়ালো, দিইয়েছে, দেওয়াচ্ছে, দেওয়ায়, দেওয়াবে, দেওয়াক

(আপনি/তিনি) দিতেন, দিয়েছিলেন, দিচ্ছিলেন, দিলেন, দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেন, দেবেন, দিন; দেওয়াতেন, দিইয়েছিলেন, দেওয়াচ্ছিলেন, দেওয়ালেন, দিইয়েছেন, দেওয়াচ্ছেন, দেওয়াবেন, দেওয়ান, দিয়ে

৫.৬

দৌড়া ধাতু

(আমি) দৌড়াতাম, দৌড়েছিলাম, দৌড়াচ্ছিলাম, দৌড়ালাম, দৌড়েছি, দৌড়াচ্ছি, দৌড়াই, দৌড়াব

(তুমি) দৌড়াতে, দৌড়েছিলে, দৌড়াচ্ছিলে, দৌড়ালে, দৌড়েছ, দৌড়াচ্ছ, দৌড়াও, দৌড়াবে

(তুই) দৌড়াতি(স), দৌড়েছিলি, দৌড়াচ্ছিলি, দৌড়ালি, দৌড়েছিস, দৌড়াচ্ছিস, দৌড়াস, দৌড়াবি, দৌড়া

(সে) দৌড়াত, দৌড়েছিল, দৌড়াচ্ছিল, দৌড়াল, দৌড়েছে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়ায়, দৌড়াবে, দৌড়াক

(আপনি/তিনি) দৌড়াতেন, দৌড়েছিলেন, দৌড়াচ্ছিলেন, দৌড়ালেন, দৌড়েছেন, দৌড়াচ্ছেন, দৌড়ান, দৌড়াবেন

দৌড়ে

৫.৭

যা ধাতু

(আমি) যেতাম, গিয়েছিলাম, যাচ্ছিলাম, গেলাম, গিয়েছি, যাচ্ছি, যাই, যাব; যাওয়াতাম, যাইতেছিলাম, যাওয়াচ্ছিলাম, যাওয়ালাম, যাইয়েছি, যাওয়াচ্ছি, যাওয়াই, যাওয়াব

(তুমি) যেতে, গিয়েছিলে, যাচ্ছিলে, গেলে, গিয়েছ, যাচ্ছ, যাও, যেয়ো, যাবে; যাওয়াতে, যাওয়াচ্ছিলে, যাওয়ালে, যাওয়াচ্ছ, যাওয়াও, যাইয়ো, যাওয়াবে

(তুই) যেতি(স), গিয়েছিলি, যাচ্ছিলি, গেলি, গিয়েছিস, যাচ্ছিস, যাস, যাবি, যা; যাওয়াতি, যাইয়েছিলি, যাওয়াচ্ছিলি, যাওয়ালি, যাইয়েছিস, যাওয়াচ্ছিস, যাওয়াস, যাওয়াবি, যাওয়া

(সে) যেত, যাচ্ছিল, গেল, গিয়েছে, যাচ্ছে, যায়, যাবে, যাক; যাওয়াত, যাওয়াচ্ছিল, যাওয়াল, যাইয়েছে, যাওয়াচ্ছে, যাওয়ায়, যাওয়াবে, যাওয়াক

(আপনি/তিনি) যেতেন, গিয়েছিলেন, যাচ্ছিলেন, গেলেন, গিয়েছেন, যাচ্ছেন, যান, যাবেন; যাওয়াতেন, যাইয়েছিলেন, যাওয়াচ্ছিলেন, যাওয়ালেন, যাইয়েছেন, যাওয়াচ্ছেন, যাওয়ান, যাওয়াবেন

গিয়ে

৫.৮

শিখ্ ধাতু

(আমি) শিখতাম, শিখেছিলাম, শিখছিলাম, শিখলাম, শিখেছি, শিখছি, শিখি, শিখব; শেখাতাম, শিখিয়েছিলাম, শেখাচ্ছিলাম, শেখালাম, শিখিয়েছি, শেখাচ্ছি, শেখাই, শেখাব

(তুমি) শিখতে, শিখেছিলে, শিখছিলে, শিখলে, শিখেছ, শিখছ, শেখো, শিখো, শিখবে; শেখাতে, শিখিয়েছিলে, শেখাচ্ছিলে, শেখালে, শিখিয়েছ, শেখাচ্ছ, শেখাও, শিখিয়ো, শেখাবে

(তুই) শিখতি(স), শিখেছিলি, শিখছিলি, শিখলি, শিখেছিস, শিখছিস, শিখিস, শিখবি, শেখ; শেখাতি, শিখিয়েছিলি, শেখাচ্ছিলি, শেখালি, শিখিয়েছিস, শেখাচ্ছিস, শেখাস, শেখাবি, শেখা

(সে) শিখত, শিখেছিল, শিখছিল, শিখল, শিখেছে, শিখছে, শেখে, শিখবে, শিখুক; শেখাত, শিখিয়েছিল, শেখাচ্ছিল, শেখাল, শিখিয়েছে, শেখাচ্ছে, শেখায়, শেখাবে, শেখাক

(আপনি/তিনি) শিখতেন, শিখেছিলেন, শিখছিলেন, শিখলেন, শিখেছেন, শিখছেন, শেখেন, শিখবেন; শেখাতেন, শিখিয়েছিলেন, শেখাচ্ছিলেন, শেখালেন, শিখিয়েছেন, শেখাচ্ছেন, শেখান, শেখাবেন

শিখে, শিখিয়ে

৫.৯

শু ধাতু

(আমি) শুতাম, শুয়েছিলাম, শুচ্ছিলাম, শুলাম, শুয়েছি, শুচ্ছি, শুই, শোব; শোয়াতাম, শুইয়েছিলাম, শোয়াচ্ছিলাম, শোয়ালাম, শুইয়েছি, শোয়াচ্ছি, শোয়াই, শোয়াব

(তুমি) শুতে, শুয়েছিলে, শুচ্ছিলে, শুলে, শুয়েছ, শুচ্ছ, শোও, শুয়ো, শোবে; শোয়াতে, শুইয়েছিলে, শোয়াচ্ছিলে, শোয়ালে, শুইয়েছ, শোয়াচ্ছ, শোয়াও, শুইয়ো, শোয়াবে

(তুই) শুতি(স), শুয়েছিলি, শুচ্ছিলি, শুলি, শুয়েছিস, শুচ্ছিস, শুস, শুবি, শো; শোয়াতি, শুইয়েছিলি, শোয়াচ্ছিলি, শোয়ালি, শুইয়েছিস, শোয়াচ্ছিস, শোয়াস, শোয়াবি, শোয়া

(সে) শুতো, শুয়েছিল, শুচ্ছিল, শুলো, শুয়েছে, শুচ্ছে, শোয়, শোবে, শুক; শোয়াত, শুইয়েছিল, শোয়াচ্ছিল, শোয়াল, শুইয়েছে, শোয়াচ্ছে, শোয়ায়, শোয়াবে, শোয়াক

(আপনি/তিনি) শুতেন, শুয়েছিলেন, শুচ্ছিলেন, শুলেন, শুয়েছেন, শুচ্ছেন, শোন, শোবেন; শোয়াতেন, শুইয়েছিলেন, শোয়াচ্ছিলেন, শোয়ালেন, শুইয়েছেন, শোয়াচ্ছেন, শোয়ান, শোয়াবেন

শুয়ে, শুইয়ে

৫.১০

হ ধাতু

(আমি) হতাম, হয়েছিলাম, হচ্ছিলাম, হলাম, হয়েছি, হচ্ছি, হই, হব; হওয়াতাম, হইয়েছিলাম, হওয়াচ্ছিলাম, হওয়ালাম, হইয়েছি, হওয়াচ্ছি, হওয়াই, হওয়াব

(তুমি) হতে, হয়েছিলে, হচ্ছিলে, হলে, হয়েছ, হচ্ছ, হও, হোয়ো, হবে; হওয়াতে, হইয়েছিলে, হওয়াচ্ছিলে, হওয়ালে, হইয়েছ, হওয়াচ্ছ, হওয়াও, হওয়ায়ো, হওয়াবে

(তুই) হতি(স), হয়েছিলি, হচ্ছিলি, হলি, হয়েছিস, হচ্ছিস, হোস, হবি, হ; হওয়াতি, হইয়েছিলি, হওয়াচ্ছিলি, হওয়ালি, হইয়েছিস, হওয়াচ্ছিস, হওয়াস, হওয়াবি, হওয়া

(সে) হতো, হয়েছিল, হচ্ছিল, হলো, হয়েছে, হচ্ছে, হয়, হবে, হোক; হওয়াত, হইয়েছিল, হওয়াচ্ছিল, হওয়াল, হইয়েছে, হওয়াচ্ছে, হওয়ায়, হওয়াবে, হওয়াক

(আপনি/তিনি) হতেন, হয়েছিলেন, হচ্ছিলেন, হলেন, হয়েছেন, হচ্ছেন, হন, হোন, হবেন; হওয়াতেন, হইয়েছিলেন, হওয়াচ্ছিলেন, হওয়ালেন, হইয়েছেন, হওয়াচ্ছেন, হওয়ান, হওয়াবেন

হয়ে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা বানানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন।

২. বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম লিখুন।

পাঠ-৭.২ : বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- কী কী কারণে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ হয় তা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ করতে পারবেন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। অথচ লেখার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা প্রায়ই নানা ধরনের অশুদ্ধি ঘটিয়ে ফেলছি। যেমন বানান ভুল করি, তেমনি বাক্য নির্মাণেও অপপ্রয়োগ ঘটাই।

ভাষার শুদ্ধ প্রযোগ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন ব্যাকরণ-জ্ঞান, শব্দ ও বাক্যের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা এবং সেগুলো নিরসনে সতর্কতা ও সচেতন প্রয়াস। মুদ্রণ ও লেখায় ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ত্রুটির ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে–

ক. বানানের অশুদ্ধি;

খ. বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ;

গ. বাক্যে পদবিন্যাসের ত্রুটি;

ঘ. সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি।

ক. বানানোর অশুদ্ধি : শব্দের উচ্চারণ অসতর্ককতার কারণে বানানে ভুল হয়। উচ্চারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলে প্রায়ই বানানে ভুল হয়। একই ধ্বনির জন্যে একাধিক হরফ' এবং 'সমধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনের আধিক্য' বানান ভুলের জন্য মুল কারণগুলোর অন্যতম। বানানের সঠিক নিয়ম জানা না থাকলে বানান ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে বানানের যে পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য না জানা থাকলে বানানে ভুল হতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমি যথাক্রমে **১৯৩৭, ১৯৮৮, ১৯৯২** ও **২০১২** সালে বাংলা বানানের যে নিয়ম নির্ধারণ ও সুপারিশ করেছে; বানান সঠিকভাবে লেখার জন্য সেসব নির্ধারিত নিয়ম ও সুপারিশ সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার। এ ছাড়াও শুদ্ধ বানানের জন্য ব্যাকরণ-জ্ঞান অপরিহার্য। সন্ধি, সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে শব্দ ও পদের গঠনরীতি জানা না থাকায় যেসব বানানে ভুল হয় সেসব পরিহার করা যায়। ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান সরাসরি বানানের সঙ্গে যুক্ত বলে ব্যাকরণ-জ্ঞান দ্বারা ণত্ব বিধান বা ষত্ব বিধান ঘটিত বানানের ভুলগুলো সহজেই এড়ানো সম্ভব হয়। এসব ছাড়াও সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ ও বানান পার্থক্য সম্বন্ধে সতর্ক থেকে বানানোর ভুল এড়ানো যায়।

খ. বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ : একটি শব্দের অর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে বাক্যে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, বাক্যে পদবিন্যাসগত ত্রুটি ঘটে। বিশেষ করে বিশেষ্য-বিশেষণ যথাযথরূপে চিহ্নিত করে সেগুলোকে বাক্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা উচিত। উৎকর্ষ, সারল্য প্রভৃতি বিশেষণ-বিশেষ্য সম্পর্কে প্রয়োগকারীর ধারণার অভাবেই বাক্যে অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণ-সিদ্ধ জ্ঞানের আলোকেই বাক্যে প্রয়োগ করা উচিত।

গ. বাক্যে পদবিন্যাসের ত্রুটি : শুদ্ধ বাক্যের জন্য অবশ্যই বাক্যে অভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস থাকা দরকার। ইচ্ছেমতো এলোমেলো পদসংস্থান চলে না। পদশৃঙ্খলার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। এসব নিয়ম-কানুন মেনে বাক্যে পদসংস্থান করা উচিত। তবে বাক্যশৈলীর প্রয়োজনে বাংলা বাক্যের নিয়ম মেনে সম্মুখন ও পদবিপর্যয় ঘটানো চলে। বাক্যে পদসংস্থান সম্পর্কে প্রায়োগিক ধারণা না থাকলে পদবিন্যাস ও অর্থের দিক থেকে বাক্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি : সাধু ও চলিত ভাষার দুই রীতির যে কোনো একটিতে বেছে নিতে হয় বাক্য তৈরির সময়। এ দুই রীতির সংমিশ্রণ দূষণীয় বলে গণ্য হয় সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী' দোষ বলা হয়। 'গুরুচণ্ডালী' দোষে ভাষা দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে (কথাসাহিত্য ও নাটকের সংলাপ অবশ্য ব্যতিক্রম)। এসব কারণেই ভাষার এ দুই রীতির মিশ্রণ যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

*** স্ত্রীবাচক '-ইনী/-ইণী' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানানে সতর্কতা :** কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোর শেষে '-ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুরুষবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন: বিরহ থেকে বিরহী, অপরাধ থেকে অপরাধী। এরূপ শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিণত করতে হলে মূল শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক '-ইনী' প্রত্যয় যোগ করতে হয়। যেমন- বিরহ থেকে বিরহিনী।

*** স্ত্রীবাচক- 'ঈ' ও 'আ'-প্রত্যয়ের বাহুল্যজনিত ভুল:** '-কর' প্রত্যয়যোগে বাংলায় কয়েকটি বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন: হিতকর, কার্যকর ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক '–ঈ' প্রত্যয় ব্যবহার সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ। যেমন: হিতকারী, কার্যকরী ইত্যাদি। বাংলা '-ঈ' প্রত্যয়ের এ ধরনের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় এবং স্ত্রীবাচক '-ঈ' প্রত্যয় ছাড়াই এসব শব্দ ব্যবহার করা সংগত।

*** বানানে 'ই'-কার ও 'ঈ'-কার সম্পর্কে সতর্কতা :**

সংস্কৃত-ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মধ্যাংশে প্রত্যয়ের ই-কার : সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের (সহযোগিন্, প্রতিযোগিন্ ইত্যাদি) বাংলা পুরুষবাচক রূপ ঈ-কারান্ত হয়। যেমন: সহযোগী, প্রতিযোগী। কিন্তু 'ইন' প্রত্যয়ান্ত এসব শব্দে বিশেষ্যবাচক তা কিংবা, ত্ব প্রত্যয় যুক্ত হলে- ইন, এর ন্ লোপ পায় এবং মূলের ই-কার বজায় থাকে। ফলে শব্দের মধ্যাংশে 'ই'-কার আসে। যেমন: সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা।

-তা প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে ই-কার

মিতব্যয়ী – মিতব্যয়িতা	দেশদ্রোহী – দেশদ্রোহিতা
উপযোগী – উপযোগিতা	সত্যবাদী – সত্যবাদিত
অপকারী – অপকারিতা	পরিণামদর্শী – পরিণামদর্শিতা
বিলাসী – বিলাসিতা	সহমর্মী – সহমর্মিতা

*** বানানে অনুস্বার সম্পর্কে সতর্কতা :** বাংলায় অনুস্বার [ং]-এর উচ্চারণ ও ভূমিকা প্রায় 'ঙ'-র মতো। তবে এটি কখনও স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত কিংবা স্বরাশ্রিত হয় না। শব্দের শুরুতেও এটি বসে না। শুধু অন্য বর্ণের সঙ্গে শব্দের মধ্যাংশে ও শেষে এর প্রয়োগ হয়।

*** সম্ভাষণসূচক শব্দের বানান সতর্কতা :** পুরুষবাচক সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর 'ষ' হয়। যেমন:

শ্রদ্ধাভাজনেষু	কল্যাণবরেষু	সুজনেষু	সুচরিতেষু
সুহৃদ্‌বরেষু	বন্ধুবরেষু	কল্যাণীয়েষু	প্রীতিভাজনেষু
প্রিয়বরেষু	কল্যাণীবরেষু	স্নেহাস্পদেষু	
শ্রীচরণেষু	শ্রদ্ধাস্পদেষু	প্রিয়তমেধু	

লক্ষণীয় : আ-কারের পর স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে 'সু' হয়। যেমন: সচরিতাসু, পূজনীয়াসু, প্রিয়তমাসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু ইত্যাদি।

*** যুক্তব্যঞ্জনের বানান সতর্কতা**

ত্ব : ঘনত্ব, চত্বর, ত্বক, ত্বরণ, দায়িত্ব, দূরত্ব, নতুনত্ব, পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, শিষ্যত্ব, সত্বর, স্বত্ব, স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, ঋত্বিক, কর্তৃত্ব, কৃতিত্ব।

জ্ঝ : লজ্ঝন, উল্লজ্ঝন, জজ্ঝ।

চ্ছ্ব : জলোচ্ছ্বাস, তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ভাবোচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত।

ক্ব : ক্বচিৎ, নিক্বণ, পক্ব, পক্বাশয়

হ্ন : আহ্নিক, চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, জাহ্নবী

ঙ্গ : গঙ্গা, তরঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ, অঙ্গীকার, অন্তরঙ্গ, ইঙ্গিত, প্রসঙ্গ, প্রাঙ্গণ, ব্যঙ্গ, ভঙ্গ, শৃঙ্গ, ভঙ্গি, মঙ্গল, সুড়ঙ্গ।

চ্ছ : প্রচ্ছন্ন, বৃক্ষচ্ছায়া, মুখচ্ছবি, কথাচ্ছলে, তরুচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দ।

ক্ষ : অক্ষি, পক্ষ, পক্ষী, রক্ষী, লক্ষণ, লক্ষণীয়, লক্ষ।

ন্ন : নিষ্পন্ন, প্রচ্ছন্ন

ক্ষ্ম : পক্ষ্ম, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম

ঙ্ক : কঙ্কাল, কলঙ্ক, নিঃশঙ্ক, পঙ্ক, পঙ্কজ, শঙ্কিকল, পালঙ্ক, বঙ্কিম, অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কুর, আতঙ্ক, আশঙ্কা, শঙ্কা।

ঙ্ক্ষ : মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষা, শুভাকাঙ্ক্ষী।

ঙ্খ : অনুপুঙ্খ, উচ্চৃঙ্খল, পুঙ্খানুপুঙ্খ, শঙ্খ, শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা

জ্জ্ব : ঔজ্জ্বল্য, প্রোজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল, অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল

জ্ব : জ্বালা, জ্বালাতন, জ্বলুনি, জ্বলজ্বল, জাজ্বল্যমান, প্রজ্বলন

ণ্ন : ক্ষুণ্ন, বিষণ্ন, ক্ষুণ্নিবৃত্তি

ণ্য : পণ্য, পুণ্য, প্রামাণ্য, গণ্য, ঘৃণ্য, তারুণ্য, নগণ্য, বরেণ্য, লাবণ্য।

ধ্ব : ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধন্যাত্মক, বিধ্বস্ত, বিধ্বংস, সাধ্বী

ন্ব : অন্বয়, অন্বিত, তন্বী, মন্বন্তর, সমন্বয়।

ন্ন্য : সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।

ন্দ্ব : দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্দ্বীপ

ত্থ : অভ্যুত্থান, উত্থান, উত্থিত

থ্ব : পৃথ্বী

স্ক : তিরস্কার, তেজস্কর, পুরস্কার, বয়স্ক, ভাস্কর, মনস্ক, সংস্করণ, সংস্কার

স্ম : অকস্মাৎ, আকস্মিক, জাতিস্মর, বিস্ময়, বিস্মরণ, ভস্ম, ভস্মীভূত, স্মরণ, স্মরণিকা

ত্ম/ত্ম্য : দেশাত্মবোধ, দৌরাত্ম্য, মারাত্মক, অধ্যাত্ম, আত্ম, আত্মীকরণ, আত্মীয়, আধ্যাত্মিক, একাত্ম, হিংসাত্মক, মাহাত্ম্য।

ত্ত/ত্ত্ব : উত্ত্যক্ত, উত্তাপ, উত্তীর্ণ, উত্তেজনা, উদাত্ত, একাত্তর, কৃত্তিবাস, পত্তন, উদ্বৃত্ত, উন্মত্ত, উত্তোলন, মৃত্তিকা, প্রদত্ত, আত্তীকরণ, তাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ব, মহত্ত্ব, সত্ত্বেও

দ্ব : দ্বাদশ, দ্বার, দ্বিতীয়, অদ্বয়, অদ্বিতীয়, উপদ্বীপ, দ্বন্দ্ব, দ্বয়, দ্বীপ, দ্বেষ, দ্বৈত, বদ্বীপ, বিদ্বান, বিদ্বেষ, বিদ্বজ্জন, প্রতিদ্বন্দ্বী।

দ্ম : ছদ্ম, পদ্ম, পদ্মা

দ্ধ : ক্রুদ্ধ, তদ্ধিত, পদ্ধতি, উদ্ধার, উদ্ধৃত, ঋদ্ধ, বৃদ্ধ, যুদ্ধ, রুদ্ধ, শুদ্ধ, সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধি, সিদ্ধ

ণ্ম : ষাণ্মাসিক, হিরণ্ময়

স্য : আলস্য, বিশ্বাস্য, মৎস্য, শস্য, সদস্য, হিস্যা

শ্ম : অশ্ম, জীবাশ্ম, রশ্মি, শ্মশান, শ্মশ্রু

ষ্ম : উষ্ম, উষ্মা, গ্রীষ্ম, ভীষ্ম, শ্লেষ্মা, শৈষ্মিক

ষ্ক : আবিষ্কার, জ্যোতিষ্ক, দুষ্কর, নিষ্কণ্টক, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কর্মা, নিষ্কাসন, পরিষ্কার, পুষ্করিণী, বহিষ্কার, মস্তিষ্ক

ষ্ক্রি : নিষ্ক্রিয়

স্ক্রি : তেজস্ক্রিয়, সংস্ক্রিয়া

ষ্প : চতুষ্পদ, দুষ্প্রবৃত্তি, দুষ্প্রাপ্য, নিষ্পত্তি, নিষ্পন্ন, নিষ্পাপ, নিষ্প্রভ, পুষ্পিত, বাষ্প, বাষ্পীয়, ভ্রাতুষ্পুত্র

স্প : অস্পষ্ট, আস্পদ, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, পরস্পর, বনস্পতি, বৃহস্পতি, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদ, হাস্যাস্পদ

ষ্ফ : নিষ্ফল, নিষ্ফলতা

স্ত : অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, ত্রস্ত, প্রশস্ত, বিন্যস্ত, বিপর্যস্ত, বিশ্বস্ত, সন্ত্রস্ত

স্থ : অন্তঃস্থ, অভ্যন্তরস্থ, তটস্থ, দুস্থ, প্রস্থ, মধ্যস্থ, মুখস্থ

স্ম : সম্মত, সম্মান, সম্মুখ, সম্মেলন, সম্মুখীন

শ্ব : অশ্ব, আশ্বস্ত, আশ্বাস, ঈশ্বর, ঐশ্বর্য, নিশ্বাস, বিশ্ব, বিশ্বাস, শাশ্বত, শ্বশুর, শ্বাস, শ্বেত

স্ব : আস্বাদ, ওজস্বী, নিঃস্ব, বিস্বাদ, ভাস্বর, সরস্বতী, স্বরূপ, স্বর্ণ, স্বাক্ষর, স্বাগত, স্বাস্থ্য, স্বেদ

স্ফ : পরিস্ফুট, প্রস্ফুটিত, বিস্ফোরণ, স্ফটিক, স্ফীত, স্ফুটনাঙ্ক, স্ফুরণ, স্ফূর্তি, স্বতঃস্ফূর্ত

হ্রে : হ্রেষা

ন্ম : উন্মুখ, উন্মূল, উন্মেষ, উন্মোচন, চিন্ময়, তন্ময়, মৃন্ময়, উন্মত্ত, উন্মাদ, উন্মুক্ত

ষ্ট : অনিষ্ট, আড়ষ্ট, নিকৃষ্ট, বিশিষ্ট, রাষ্ট্র

ষ্ঠ : জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ

শ্য : দৃশ্য, অবশ্য, উদ্দেশ্য, সাদৃশ্য

ষ্য : ভাষ্য, মনুষ্য, শিষ্য

হ্রা : হ্রাস, ক্রমহ্রাসমান

*** বানানে 'ই/ঈ' সংক্রান্ত সতর্কতা**

কি/কী : একাকী-একাকিত্ব, কীর্তি, বিকীর্ণ-বিকিরণ

গি/গী : উদগীর্ণ-উদগিরণ, উপযোগী-উপযোগিতা, প্রতিযোগী-প্রতিযোগিতা, সহযোগী-সহযোগিতা, সর্বাঙ্গীণ-সর্বাঙ্গিক

চি/চী : উদীচী, দধীচি, প্রতীচী, প্রাচি, প্রাচীন

জি/জী : পুঞ্জীভূত-পুঞ্জিত, জীবী-জীবিকা

ণি/ণী : বর্ণিত-নির্ণীত

তি/তী : অতীন্দ্রিয়, অতীব, অতীত, কৃতী-কৃতিত্ব, স্ত্রীত্ব, প্রীতি, প্রতীতি, প্রীমতী-মতি

থি/থী : পৃথিবী, ভাগীরথী, রথী-সারথি

ধি/ধী : দধীচি, ধী-উপাধি, সুধী (সম্বোধনেও সুধী)

নি/নী : কনীনিকা, নির্নিমেষ, নিরবধি, নীরবতা, নীরস, নিশি, মনীষী

দী : প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্দী-বন্দিত্ব

পি/পী : পিপীলিকা, প্রীতি

বি/বী : কৃষিজীবী, বার্তাজীবী, মসীজীবী, জীবিকা, বীতশ্রদ্ধ, বীভৎস, বিরস (কিন্তু-নীরস)

ভি/ভী : বিভীষণ, বিভীষিকা

মি/মী : উন্মীলন, নিমীলিত, মীমাংসা, সম্মিলন, সম্মিলিত, বাল্মীকি, সমীচীন, সমীপ, সমীহ

য়ি/য়ী : দায়ী-দায়িত্ব, স্থায়ী-স্থায়িত্ব

রি/রী : অপকারী-অপকারিতা, উপকারী-উপকারিতা, কিরীটী, গরীয়সী, নারীত্ব, নিরীক্ষণ, পরীক্ষা-পরীক্ষিত, মরিচা-মরীচিকা, শরীরী-শারীরিক

শি/শী : অনুশীলন, আশীর্বাদ, নিশীথ, মাংসাশী, শশী, শিশি, সাঁড়াশি, সুশীল, শ্রী, আশিস

ষি/ষী : মনীষী, মহিষী

সি/সী : উদাসীন, গরীয়সী, সন্ন্যাসী, সমাসীন, সসীম

হি/হী : গ্রহীতা, গৃহীত, হীন, তুহিন, মহী, মহিষী, হিমেল

লি/লী : অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, গৃহস্থালি, পাকস্থলী

*** বানানে 'উ/ঊ' সংক্রান্ত সতর্কতা**

উ/ঊ : উর্বর, উরু, ঊর্ধ্ব, ঊর্মি, ঊষর, উহ্য, ঊনবিংশ

কু/কূ : অনুকূল, আকুল, কুলবধূ, কূপ-কুয়ো, প্রতিকূল

চু/চূ : চূড়া-চুড়ো, চূষ্য, চূষণীয়

টু/টূ : কটু-কটূক্তি

তু/তূ : কৌতুক, কৌতূহল, স্তূপ

থু/থূ : ধূলি-ধুলো, খেলাধুলা, ধূম, ধুমধাম, ধূপ, ধূসর, বধূ, বঁধু

দু/দূ : তদূর্ধ্ব, ন্যূন, নূতন (কিন্তু নতুন), নূপুর, অনুকম্পা, অনুকূল

পু/পূ : পূর্ব-পুব, পূজা-পুজো, পূজারি, পূরণ, পুরাণ, পুরানো

ফু/ফূ : স্ফুরণ, স্ফূর্তি, ফুর্তি

ভু/ভূ : অদ্ভুত, উদ্ভূত, পরাভূত, ত্রিভুজ, ভুবন, ভুল, ভূষণ, ভূলোক, ভূত

মু/মূ : মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, মূক, মুখ, মূর্ছা, মূর্খ, মূঢ়, মূলা-মুলো, সমূহ

শু/শূ : শূন্য, শূর, শুশ্রূষা, শুভ্র, শুঁড়, শূদ্র

রু/রূ : জাগরূক, তদ্রূপ, দুরূহ, মরূদ্যান-মরু, মহীরুহ, অরূপ, অরুণ

সু/সূ : মধুসূদন, সূক্ষ্ম, সুর (দেবতা, ধ্বনিসৌকর্য), সূর (বীর)

হু/হূ : মুহূর্ত, মুহুর্মুহু

*** 'র/ড়/ঢ়' সংক্রান্ত সতর্কতা**

র/ড়/ঢ় : নীর, নীড়, আড়ম্বর, ষড়যন্ত্র, ষড়ভুজ, আড়ষ্ট, আরূঢ়, রূঢ়, আষাঢ়, গূঢ়, দৃঢ়, প্রগাঢ়।

*** 'ত//' সংক্রান্ত সতর্কতা**

ত/ৎ : উপস্থিত, করিতকর্মা, কুৎসিত, কৈফিয়ত, অজিত, উচিত, উতরাই, তফাত, নিশ্চিত, পঞ্চায়েত, ফুরসত, মারফত, রঞ্জিত, অর্থাৎ, ঈষৎ, জগৎ, তাবৎ, বৃহৎ, মহৎ, শরৎ, অকস্মাৎ, বৈদাৎ, নস্যাৎ, পশ্চাৎ, সাক্ষাৎ, ক্বচিৎ, তড়িৎ, বিদ্যুৎ, ভবিষ্যৎ, তৎক্ষণাৎ, যকৃৎ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, রণজিৎ, সত্যজিৎ।

লক্ষণীয় : প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে ৎ-এর জায়গায় 'ত' হয়। যেমন : শরতে, পাশ্চাত্য, মহত্ত্ব।

*** 'য'-ফলাজলিত সকর্তকা**

ধ্য/ধ্যা : অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, অধ্যাদেশ, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, অধ্যায়

ত্য/ত্যা : ত্যক্ত, প্রত্যন্ত, প্রত্যহ, অত্যাচার, অত্যাবশ্যক, ইত্যাদি, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাগত, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাশা, অত্যধিক, অত্যন্ত, অত্যল্প, ইত্যবসর, গত্যন্তর, জাত্যভিমান, প্রত্যাহার, সত্যাসত্য

দ্য/দ্যা : আদ্যক্ষর, আদ্যন্ত, দ্ব্যর্থক, যদ্যপি, অদ্যাপি, অদ্যাবধি

ব্য/ব্যা : ব্যাপ্ত, ব্যায়াম, ব্যাসার্ধ, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যভিচার, ব্যয়, ব্যক্ত, ব্যক্তি, ব্যগ্র, ব্যঞ্জন, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যাকরণ, ব্যাকুল, ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাত, ব্যাধি, ব্যাপার, ব্যাহত

ভ্য/ভ্যা : অভ্যাগত, অভ্যস্ত, অভ্যন্তরীণ, অভ্যাস

না/ন্যা : অন্যায়, ন্যায়, ন্যস্ত, বিন্যস্ত, ন্যায্য, বিন্যাস

*** যুক্তব্যঞ্জনের রূপ সম্পর্কে ধারণার অভাবে বানান অশুদ্ধি**

ক্ষ্ণ (ক্+ষ্+ণ) : তীক্ষ্ণ

হ্ন (হ্+ন) : চিহ্ন, সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন, বহ্নি

ঞ্জ (ঞ্+জ) : অঞ্জলি, প্রাঞ্জল, রঞ্জিত

ত্রু (ত্+র্+উ) : শত্রু, ত্রুটি

ক্র (ক্+র) : শুক্র, ক্রুদ্ধ, বক্র, ক্রুর

জ্ঞ (জ্+ঞ) : বিজ্ঞ, বিজ্ঞান, অনুজ্ঞা, অজ্ঞান, জ্ঞান

ক্ষ (ক্+ষ) : বক্ষ, ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, কক্ষ, লক্ষ

ক্ষ্ম (ক্+ষ্+ম্) : লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী

হ্ম (হ্+ম) : ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম

* সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি সম্পর্কে সতর্কতা : সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির)-উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমনঃ নেই ধন যার= নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এ রকম :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্গুণী	নির্গুণ	নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরভিমানী	নিরভিমান	নীরোগী	নীরোগ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নির্দোষী	নির্দোষ
নির্ধনী	নির্ধন	নির্জ্ঞানী	নির্জ্ঞান

সমাস-ঘটিত অন্যান্য অশুদ্ধি

সলজ্জ (সরজ্জা নয়)	অহর্নিশ (অহনিশি নয়)	
যুবরাজ (যুবরাজা নয়)	দিবারাত্র (দিবারাত্রি নয়)	সশঙ্ক (সশঙ্কা নয়)
অর্ধরাত (অর্ধরাত্রি নয়)	মাতৃজাতি (মাতাজাতি নয়)	অহোরাত্র (অহোরাত্রি নয়)
রাজগণ (রাজাগণ নয়)	গরিমমণ্ডিত (গরিমামণ্ডিত নয়)	সক্ষম (সক্ষমিত নয়)
অতলস্পর্শ (অতলস্পর্শী নয়)	মহিমমণ্ডিত (মহিমামণ্ডিত নয়)	পিতৃহারা (পিতাহারা নয়)
সুবুদ্ধি (সুবুদ্ধিমান নয়)	ভ্রাতৃবৃন্দ (ভ্রাতাবৃন্দ নয়)	

*** প্রত্যয়-ঘটিত বিভিন্ন অশুদ্ধি সম্পর্কে সতর্কতা :**

দূষণীয় (দোষণীয় নয়)	লক্ষণীয় (লক্ষ্যণীয় নয়)	ঐকতান (ঐক্যতান নয়)
মথিত (মন্থিত নয়)	গন্য (গণ্যনীয় নয়)	মান্য (মান্যনীয় নয়)
গণনীয় (গণ্যনীয় নয়)	মোহ্যমান (মুহ্যমান নয়)	ঐকমত্য (ঐক্যমত নয়)
মধুরিমা (মাধুরিমা নয়)	আর্থনীতিক (অর্থনৈতিক নয়)	বন্দ্য (বন্দ্যনীয় নয়)
গ্রাহ্য (গ্রাহানীয় নয়)	রমণীয় (রমাণীয় নয়)	চূষণীয় (চোষণীয় নয়)
রম্য (রম্যণীয় নয়)	পূজনীয় (পূজ্যনীয় নয়)	সামসময়িক (সমসাময়িক নয়)
নির্দোষিতা (নির্দোষতা নয়)	সর্জন (সৃজন নয়)	পরিত্যাজ্য (পরিত্যজ্য নয়)
সহনীয় (সহ্যনীয় নয়)	নির্গুণতা (নির্গুণিতা নয়)	শ্রোতব্য (শ্রুতব্য নয়)
সহনীয় (সহ্যনীয় নয়)		

লক্ষণীয় : অর্থনৈতিক, মুহ্যমান, রাজনৈতিক, সমসাময়িক, সৃজন ইত্যাদি শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত ও গৃহীত।

শব্দ প্রয়োগের আরও কিছু জটিলতা

বাক্যে শব্দ প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই জটিলতায় পড়ি। শব্দটি কি এক সাথে হবে নাকি আলাদা হবে। 'নয়তো' হবে নাকি 'নয় তো হবে। 'গতকাল' হবে নাকি 'গত কাল' হবে এই নিয়ে ভাবনার শেষ থাকে না। এখানে এ ধরনের কিছু প্রচলিত শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ দেখানো হলো–

না হয়/নাহয়	:	না হয় না হবে। সে নাহয় থাকুক।
নয় তো/নয়তো	:	এখন নয় তো পরে যাবে। যাও, নয়তো কষ্ট পাবে।
না হলে/নাহলে	:	তার সঙ্গে দেখা না হলে চলে এসো। নাচ নাহলে গান শেখো।
কেন না/কেননা	:	তুমি কেন না বললে? যাব, কেননা আগে কখনো যাইনি।
ক্ষণ/কাল	:	যতক্ষণ ততক্ষণ, কিছুক্ষণ। নানামত, নানান ঝামেলা।
বহু	:	বহুকাল, বহুদিন, বহুভাষী। বহু ভাশা, বহু কষ্ট।
বহুল	:	বিলাসবহুল, জনবহুল। বহুল পরিচিত, বহুল প্রচলিত।
বিশেষ	:	অবস্থাবিশেষ, ফুলবিশেষ। বিশেষ গ্রন্থ, বিশেষ অবস্থা।
ভাবে	:	ভালোভাবে, খারাপভাবে। সে ভাবে আছে।
মাত্র	:	এইমাত্র, একটিমাত্র, বলামাত্র। মাত্র পাঁচ মিনিট।
সব/সারা	:	সব লোক, সব সময়। সারা অঙ্গ, সারা বাড়ি [ব্যতিক্রম; সবকিছু, সারাক্ষণ]
প্রতি	:	প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, প্রতিবছর। জনতার প্রতি, শিক্ষকের প্রতি।
প্রায়	:	প্রায় সকালে, প্রায় প্রতিদিন। বিস্মৃতপ্রায়, বিলুপ্তপ্রায়।
মূলক	:	ভ্রান্তিমূলক, বৃত্তিমূলক, বৈষম্যমূলক।
প্রধান	:	প্রধান ব্যক্তিত্ব, প্রধান শিক্ষক। শীতপ্রধান, কৃষিপ্রধান।
পরায়ণ	:	কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বপরায়ণ।
সম্মত	:	বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত, বিধিসম্মত।
ব্যাপী	:	জীবনব্যাপী, বছরব্যাপী, পৃথিবীব্যাপী।
নি, না	:	যাইনি, খাইনি, করিনি, ধরি না, যাই না।

নেই/নয় : ভালো নেই, আলো নেই, মন্দ নয়, এটা নয়।

টি, টা, খানা, খানি, গুলি, গুলো, রা, এরা, গণ, বৃন্দ : এই শব্দগুলো কখনোই আলাদা বসবে না। যেমন– বইটি, ছেলেটি, বাড়িখানা, মেয়েগুলো, ছাত্ররা, শ্রমিকেরা, শিক্ষকগণ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বোধ হয়/বোধ হয় : আমার বোধ হয় সে আসবে না। তুমি বোধহয় আজ কলেজে যাচ্ছো না।

তার পর/ তারপর : সেই ছোটবেলা থেকে পড়লেখা শুরু করেছি, তার পর থেকে এখন পর্যন্ত পড়ার মধ্যেই আছি। আমি বাসায় গিয়ে তারপর ফোন করবো।

বাক্যে পদবিন্যাসের ত্রুটি

বাক্যে শব্দের বিন্যাসের ওপর বাক্যের অর্থ নির্ভরশীল। অনেক সময় কোনো শব্দের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। সে জন্যে প্রয়োজনীয় শব্দ ঠিক যে জায়গায় বসা উচিত সেই জায়গায় বসাতে হয়। যেমন:

আয়েশা ঐ লোকটাকে শুধু দেখেছে। (অন্য কিছু করেনি)

আয়েশা শুধু ঐ লোকটাকে দেখেছে। (অন্য কাউকে দেখেনি)

শুধু আয়েশা ঐ লোকটাকে দেখেছে। (অন্য কেউ নয়)

১. বাক্যে বিশেষণ প্রয়োগে সংগতি : বিশেষণের অবস্থান হওয়া উচিত সম্পর্কিত শব্দের পাশে। তা না হলে অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। যেমন: বিশেষণের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে নিচের বাক্যে দুটিতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে গেছে:

আমার ছেলে প্রথম ছবি আঁকে স্কুলে।

আমার প্রথম ছেলে ছবি আঁকে স্কুলে।

বিশেষণের প্রয়োগ যথাস্থানে হওয়া উচিত। নিচের উদাহরণগুলোতে বাক্যের দুর্বলতার কারণ বিশেষণের অপপ্রয়োগ :

দুর্বল : সপ্তাহব্যাপী কলেজে বই মেলা শুরু হয়েছে।

উন্নত : কলেজে সপ্তাহব্যাপী বই মেলা শুরু হয়েছে।

লক্ষণীয় : গরম গরুর দুধ, টাটকা গরুর দুধ ইত্যাদি বাংলা বাক্যরীতির দিক থেকে ভুল নয়। কারণ, গরুর দুধ, অলুক সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ। স্বভাবতই এর আগে গরম, টাটকা ইত্যাদি বিশেষণ বসতে পারে। কিন্তু পড়ার সময় গরম গরু, টাটকা গরু ইত্যাদি বিদঘুটে অর্থবোধক হতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে গরুর গরম দুধ, গরুর টাটকা দুধ লেখাই শ্রেয়।

২. বাক্যে সর্বনাম প্রয়োগে সংগতি : বাক্যে সর্বনামের অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার, যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কারণ কখনও কখনও সর্বনামের অবস্থান বদলের ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে। যেমন:

সে গল্প ছিল গণপ্রথার বিরুদ্ধে। (সে- নির্দেশক সর্বনাম)
গল্পে সে ছিল গণপ্রথার বিরুদ্ধে। (সে- ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)
অশুদ্ধি : তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।
শুদ্ধ : তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

বাক্যে অনেক সময় সর্বনামের অপপ্রয়োগও হয়ে থাকে। যেমন:
অপপ্রয়োগে : দুষ্কৃতকারীরা তিনি ও তাঁকে দেখতে আসা ডাক্তারকে শাসিয়েছে।
উন্নত : দুষ্কৃতকারীরা তাঁকে এবং তাঁকে দেখতে আসা ডাক্তারকে শাসিয়েছে।

অনেক সময় বাক্যে অপ্রয়োজনে সর্বনামের ব্যবহার হতে পারে:
অপপ্রয়োগ : অধ্যক্ষকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

উন্নত : টেলিফোনে যোগাযোগ করেও অধ্যক্ষকে পাওয়া যায়নি।

৩. বাক্যে অব্যয় প্রয়োগে সংগতি : একই ধরনের অব্যয়ের পর পর পুনরুক্তি না থাকাই শ্রেয়। যেমন–

দুবল: সবাই একে একে চলে গেল, তাকেও সুতরাং চলে যেতে হলো।

উন্নত : সবাই একে একে চলে গেল, সুতরাং তাকেও চলে যেতে হলো।

বাক্যের উত্তরণে সংগতিপূর্ণ অব্যয়ের প্রয়োগ :

সংগতিহীন : ইভু ঢাকায় পড়তে চায় এবং বাবা-মা তাতে রাজি হচ্ছেন না।

সংগতিপূর্ণ : ইভু ঢাকায় পড়তে চায়; কিন্তু বাবা-মা তাতে রাজি হচ্ছেন না।

৪. ক্রিয়া পদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগে সংগতি : যথাযথ ক্রিয়াদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না। যেমন:

দুর্বল : তিনি শিক্ষার মানে উন্নয়নের জন্যে কিছু পরামর্শ রাখেন।

উন্নত : তিনি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে কিছু পরামর্শ দেন।

বাক্যে ক্রিয়ার কালগত সংগতি রক্ষিত না হলে বাক্য শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন:

দুর্বল : তিনি এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন এবং সঠিক তদন্তের দাবি জানান।

উন্নত : তিনি এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং সঠিক তদন্তের দাবি জানান।

ক্রিয়াপদের প্রয়োজনীয় অংশ উহ্য থাকলেও বাক্য অস্পষ্ট ও শিথিল হতে পারে। যেমন:

দুর্বল : এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

উন্নত : এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্য পদের পুরুষের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার সংগতি না থাকলে বাক্য শুদ্ধ হয় না। যেমন:

অশুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিল।

শুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৫. বিভক্তি প্রয়োগে সংগতি : বিভক্তি প্রয়োগে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি যেন না থাকে। যেমন:

দুর্বল : কর্তৃপক্ষ গোলযোগ সৃষ্টি করায় দশজন ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উন্নত : গোলযোগ সৃষ্টি করায় কর্তৃপক্ষ দশজন ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৬. বাক্যে বচন সংগতি : পূর্বগামী বিশেষ্যের বচন অনুসারে অনুগামী সর্বনামের বচনে সংগতি রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ পূর্বগামী বিশেষ্য একবচন বোঝালে অনুগামী সর্বনামও একবচন হবে। যেমন:

অশুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তার মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।

শুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।

৭. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি : ভাষা প্রয়োগে কখনও চলিত রীতির রূপের সঙ্গে সাধু রীতির রূপ মেশানো উচিত নয়। হয় সাধু রীতির প্রয়োগ হবে, না হয় চলিত রীতির। ভাষা ব্যবহারে সাধু ও চলিত রীতির মিশেল দূষণীয় বলে এ ধরনের মিশ্রণ সযত্নে পরিহার করতে হয়। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা গেলে যেকোনো একটি রীতিতে তা পরিবর্তন করে নিতে হয়।

মিশ্রিত : তাকে কলেজে যাইতে হইবে।

সাধু : তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে।

চলিত : তাকে কলেজে যেতে হবে।

কিছু বহুল ব্যবহৃত বানানের শুদ্ধরূপ উল্লেখ করা হল:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	অ
অপরাহ্ন	**অপরাহ্ণ**
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অতিথী	অতিথি
অহরাত্রি	অহোরাত্র
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অকালপক্ক	অকালপক্ব
অক্ষুণ্ন	অক্ষুণ্ণ
অকালমুস্মান্ড	অকালমুষ্মাণ্ড
অঙ্গিকার	অঙ্গীকার
অগ্নিমান্দ	অগ্নিমান্দ্য
অনুকুল	অনুকূল
অঙ্গাঙ্গী	অঙ্গাঙ্গি
অকুণ্ঠ	অকুণ্ঠ
অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
অনাস্তা	অনাস্থা
অনিন্দ	অনিন্দ্য
অনির্বান	অনির্বাণ
অধিনস্ত	অধীনস্থ
অস্পষ্ঠ	অস্পষ্ট
অনুজ্জল	অনুজ্জ্বল
অনুসংগ	অনুষঙ্গ
অন্তভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আইনজীবি	আইনজীবী
আদ্যান্ত	আদ্যন্ত
আত্বস্ত	আত্মস্থ
আশাঢ়	আষাঢ়
আশ্বীর্বাদ	আশীর্বাদ
আগমনি	আগমনী
আংগিনা	আঙিনা
আলচ্যমান	আলোচ্যমান
আমাবস্যা	অমাবস্যা
আবিস্কার	আবিষ্কার
আয়ত্ব	আয়ত্ত
আত্বসমর্পন	আত্মসমর্পণ
আগুন্তক	আগন্তুক
	আ
অনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
আত্মৎসর্গ	আত্মোৎসর্গ
আড়ষ্ঠ	আড়ষ্ট
আপত্বি	আপত্তি
আরোহন	আরোহণ
আশংকা	আশঙ্কা
	ই, ঈ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
ইংরেজী	ইংরেজি
ইদৃশ	ঈদৃশ
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা
ইহজগত	ইহজগৎ
ইষত	ঈষৎ
ঈর্ষাপরায়ন	ঈর্ষাপরায়ণ
	উ, ঋ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উজ্জল	উজ্জ্বল
উচীত	উচিত
উত্তির্ন	উত্তীর্ণ
উচ্ছৃংখল	উচ্ছৃঙ্খল
উচ্চঃস্বর	উচ্চৈঃস্বর
উদ্ধৃত্ত	উদ্ধৃত
উম্মোচিত	উন্মোচিত
উপযোগীতা	উপযোগিতা
উপরুক্ত	উপর্যুক্ত
উম্মুলিত	উন্মূলিত
উম্মুক্ত	উন্মুক্ত
উর্দ্ধশ্বাস	ঊর্ধ্বশ্বাস
ঋনী	ঋণী
	এ, ঐ, ও,
একত্রিত	একত্র
এ্যালুমিনিয়াম	অ্যালুমিনিয়াম

এতদ্বতীত	এতদ্ব্যতীত
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐতিয্য	ঐতিহ্য
ঐশর্য	ঐশ্বর্য
ওষ্ট	ওষ্ঠ/ওষ্ঠ্য
ঔজ্জল	ঔজ্জ্বল্য

ক, খ

কার্য্যালয়	কার্যালয়
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
কৃতিবাস	কৃত্তিবাস
কৌতুহল	কৌতূহল
কলংকিত	কলঙ্কিত
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
কণ্ঠস্ত	কণ্ঠস্থ
কনিষ্ট	কনিষ্ঠ
কলংক	কলঙ্ক
কর্মজীবি	কর্মজীবী
কল্যান	কল্যাণ
কর্মনিষ্টা	কর্মনিষ্ঠা
কোষ্টকাটিন্য	কোষ্ঠকাঠিন্য
কাংখিত	কাঙ্ক্ষিত
কৃপন	কৃপণ
কৌতূক	কৌতুক
কিনাংক	কিণাঙ্ক
খুজাখুজি	খোঁজাখুঁজি
খুঁরাখুঁরি	খোঁড়াখুঁড়ি

গ, ঘ

গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
গ্রামীন	গ্রামীণ
গঞ্ঞ্জনা	গঞ্জনা
গগণ	গগন
গরিষ্ট	গরিষ্ঠ
গহণা	গহনা
গৃহিণি	গৃহিণী
গর্ভধারনী	গর্ভধারিণী
গুনাগুন	গুণাগুণ
গোষ্টি	গোষ্ঠী
গৃহস্থলী	গৃহস্থালি
গার্হ্যস্থ	গার্হস্থ্য
ঘুরাঘুরি	ঘোরাঘুরি
ঘুর্নিঝড়	ঘূর্ণিঝড়
ঘুর্ণমান	ঘূর্ণমান
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ

চ, ছ

চতুস্পদি	চতুষ্পদী
চতুস্কোন	চতুষ্কোণ
চক্ষুস্মান	চক্ষুষ্মান
চুর্নবিচুর্ন	চূর্ণবিচূর্ণ
চাক্ষুস	চাক্ষুষ
ছাত্র-ছাত্রীগন	ছাত্র-ছাত্রীগণ
ছন্দপতন	ছন্দঃপতন
ছায়ামুর্তি	ছায়ামূর্তি

জ, ঝ

জগত	জগৎ
জ্যোৎস্না রাত	জ্যোৎস্না
জীবীকা	জীবিকা
জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস
জাজল্যমান	জাজ্বল্যমান
জোতিষ্ক	জ্যোতিষ্ক
ঝরণা	ঝরনা

ট, ঠ, ড, ঢ

টর্ণেডো	টর্নেডো
ঠোট	ঠোঁট
ঠান্ডা	ঠাণ্ডা
ঠোংগা	ঠোঙা
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
ডিংগি	ডিঙি
ঢেরস	ঢেঁড়স

ত

ততক্ষণাত	তৎক্ষণাৎ
তরান্বিত	ত্বরান্বিত
তত্তীয়	তত্ত্বীয়
তিরষ্কার	তিরস্কার
তরুনী	তরুণী

ত্যগ	ত্যাগ
ত্বরন	ত্বরণ
তাজ্য	ত্যাজ্য
ত্রিভূজ	ত্রিভুজ
তোরণ	তোরণ

দ

দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দূরাবস্থা	দুরবস্থা
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
দুষিত	দূষিত
দুষণীয়	দূষণীয়
দণ্ডবিদি	দণ্ডবিধি
দারিদ্র	দারিদ্র্য
দায়ীত্ব	দায়িত্ব
দীর্ঘজীবি	দীর্ঘজীবী
দূরন্ত	দুরন্ত
দূর্ঘটনা	দুর্ঘটনা
দাম্পত্ব	দাম্পত্য
দাসত্ত	দাসত্ব
দুস্কৃতি	দুষ্কৃতি
দুরত্ব	দূরত্ব
দুরুহ	দুরূহ
দুর্বৃত্ত	দুর্বৃত্ত
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
দৌহিত্য	দৌহিত্র
দধিচি	দধীচি
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
দুধর্ষ	দুর্ধর্ষ
দ্রবিভুত	দ্রবীভূত

ধ

ধরনী	ধরণি
ধুলিসাত	ধূলিসাৎ
ধৈর্যধারন	ধৈর্যধারণ
ধুমপান	ধূমপান
ধারনা	ধারণা
ধুলিধুসর	ধূলিধূসর

ন

নূন্যতম	ন্যূনতম
নুপুর	নূপুর
নিরব	নীরব
নিশিথিনি	নিশীথিনী
নবায়ণ	নবায়ন
নিষ্টুর	নিষ্ঠুর
ন্যয়পরায়ন	ন্যায়পরায়ণ
নিঃসরন	নিঃসরণ
নিগুঢ়	নিগূঢ়
নিপুন	নিপুণ
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ

প, ফ

প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
পরিস্কার	পরিষ্কার
পানিণি	পাণিনি
পরজীবি	পরজীবী
প্রনয়ন	প্রণয়ন
পুরষ্কার	পুরস্কার
প্রতিদ্বন্দ্বীনতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রনয়ন	প্রণয়ন
প্রজণ্ম	প্রজন্ম
পিরীত	পিরিতি
প্রাণী জগত	প্রাণিজগৎ
পৈত্রিক	পৈতৃক
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
প্রনয়িণী	প্রণয়িনী
পূণ্য	পুণ্য
পরিত্যাক্তা	পরিত্যক্তা
পন্ডিতমন্য	পণ্ডিতম্মন্য
পরিনিতা	পরিণীতা
পূনঃপূন	পুনঃপুন
পালাপার্বন	পালাপার্বণ
পূননির্মান	পুনর্নির্মাণ

পঁচা	পচা
প্রাতস্নান	প্রাতঃস্নান
পাষান	পাষাণ
পূন্যকীর্তি	পুণ্যকীর্তি
প্রত্যুতপন্নমতি	প্রত্যুৎপন্নমতি
প্রত্যার্পন	প্রত্যর্পণ
পাপীষ্ঠ	পাপিষ্ঠ
পুরান	পুরাণ
প্রোজ্জল	প্রোজ্জ্বল
প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রতিদ্বন্দ্বী
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট

ব

বিভিসিকা	বিভীষিকা
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
ব্যতিত	ব্যতীত
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
বহিঃস্কার	বহিস্কার
বানিজ্য	বাণিজ্য
ব্যাকরন	ব্যাকরণ
ব্যায়	ব্যয়
বিদুষি	বিদুষী
ব্যার্থ	ব্যর্থ
বাল্মিকি	বাল্মীকি
বাংগালী	বাঙালি
বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
বশিভুত	বশীভূত
বহিপ্রকাশ	বহিঃপ্রকাশ
বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
বহিশত্রু	বহিঃশত্রু
ব্যাথীত	ব্যথিত
ব্যাঞ্জনা	ব্যঞ্জনা
ব্যাবস্থাপক	ব্যবস্থাপক
বিনাপনি	বীণাপাণি
বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
ব্যরিষ্টার	ব্যারিস্টার
বাঞ্চিত	বাঞ্ছিত
বিষন্ন	বিষণ্ণ
বিথিকা	বীথিকা
বৈশিষ্ঠ্য	বৈশিষ্ট্য
ব্যকুলতা	ব্যাকুলতা
ব্যয়াম	ব্যায়াম

ভ

ভূবণ	ভুবন
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভশ্ম	ভস্ম
ভূবনভূলানো	ভুবনভুলানো
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ
ভণ্ডামী	ভণ্ডামি
ভবিষ্যৎদানী	ভবিষ্যদ্বাণী
ভাংগাগরা	ভাঙাগড়া
ভ্রুন	ভ্রূণ
ভৎসনা	ভর্ৎসনা
ভ্রূকূটি	ভ্রূকুটি
ভ্রাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র

ম

মুহূর্ত	মুহূর্ত
মূমর্ষু	মুমূর্ষু
মনমোহন	মনোমোহন
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট
মনিষি	মনীষী
মরীচীকা	মরীচিকা
মুখস্ত	মুখস্থ
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
মনোপুত	মনঃপূত
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব
মিমাংশা	মীমাংসা
মনযোগ	মনোযোগ
মুখমুখী	মুখোমুখি
মাধুর্য্য	মাধুর্য
মৎসজীবি	মৎস্যজীবী
মনিজাল	মণিজাল
মনুষ্যত্য	মনুষ্যত্ব

মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুণ্ন
ম্যনেজার	ম্যানেজার
ম্যাজিষ্ট্যাট	ম্যাজিস্ট্রেট
ম্যগাজিন	ম্যাগাজিন
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ

য, র

যক্ষা	যক্ষ্মা
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
যশশ্বিনী	যশস্বিনী
রামায়ন	রামায়ণ
রনতুর্য	রণতূর্য
রমনি	রমণী
রাজলক্ষী	রাজলক্ষ্মী
রেজিষ্টার	রেজিস্ট্রার
রৌদ্রজ্জল	রৌদ্রোজ্জ্বল

ল

লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
লাঙ্গল	লাঙল
লক্ষ্যনীয়	লক্ষণীয়
লগিষ্ট	লঘিষ্ঠ
লাঞ্চিত	লাঞ্ছিত
লাঞ্চনা	লাঞ্ছনা

শ

শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শান্তনা	সান্ত্বনা
শশ্রুষা	শুশ্রূষা
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শারীরীক	শারীরিক
শ্বাশুড়ি	শাশুড়ি
শষ্য	শস্য
শীকার	স্বীকার
শমিরণ	সমীরণ
শ্বাস-প্রসাদ	শ্বাস-প্রশ্বাস
শরনাথীনী	শরণার্থিনী
শুভাকাংখি	শুভাকাঙ্ক্ষী
শোনীতধারা	শোণিতধারা
শ্বশুড়বাড়ী	শ্বশুরবাড়ি
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
শ্রবন	শ্রবণ
শ্রাবন	শ্রাবণ
ষ্টেশন	স্টেশন

ষ

ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
ষ্টেশন	স্টেশন
ষ্টিমার	স্টিমার
ষান্মাসিক	ষাণ্মাষিক

স, হ

সমীচিন	সমীচীন
সন্যাসী	সন্ন্যাসী
সন্ধিহান	সন্দিহান
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
সহযোগীতা	সহযোগিতা
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
স্বরস্বতী	সরস্বতী
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ
সুপারিস	সুপারিশ
সাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
স্বার্থকতা	সার্থকতা
সহকারি	সহকারী
সম্বাদ	সংবাদ
সম্বলিত	সংবলিত
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সমিপবর্তিনী	সমীপবর্তিনী
স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস
সম্বলিত	সংবলিত
স্বক্ষরতা	সাক্ষরতা
সধর্ম্মচুত	স্বধর্মচ্যুত
সন্ধ্যাপ্রদ্বিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ
সংকীর্ন	সংকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ
সন্তুষ্ঠ	সন্তুষ্ট
সর্বাংগীন	সর্বাঙ্গীণ
সহপাটি	সহপাঠী
সতিসাধবী	সতীসাধ্বী
সহযোগীতা	সহযোগিতা

স্বাক্ষী	সাক্ষী	স্বত্ত্বাধিকার	স্বত্বাধিকার
স্বায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন	সার্থত্যাগ	স্বার্থত্যাগ
স্যাতস্যাতে	স্যাঁতসেঁতে	সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
সচ্ছন্দ্য	স্বচ্ছন্দ	হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা
সাচ্ছন্দ	স্বাচ্ছন্দ্য		

নিচের কিছু বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ উল্লেখ করা হলো:

বাক্য শুদ্ধিকরণ

অপ্রপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার বা অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।	অপচয় একটি মারাত্মক অভ্যাস।
অতিলোভে তাতী নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
অতিশয় দুঃখিত হলাম।	খুব দুঃখ পেলাম।
অভাবগ্রস্থ ছাত্রটি তার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করল।	অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তার দুরবস্থার কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করল।
অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না।	আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
আপনার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে।	আপনার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যক ব্যয়ে কৃপণতা (বা কার্পণ্য) অনুচিত।
আবশ্যকীয় কাগজপত্র নিয়ে আসবেন।	আবশ্যক কাগজপত্র নিয়ে আসবেন।
আমাদের উচিত নহে উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করা।	উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা আমাদের উচিত নহে।
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই।	আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।	আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।
আমার এ কাজে মনোযোগীতা নেই।	আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদ্যানও বটে।	আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদুষীও বটে।
আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ দিলাম।	আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ জানালাম।
আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা রইলাম।	আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রইলাম।
আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখলাম।	আমি আপনার অবগতির জন্যে (বা আপনাকে জ্ঞাপনার্থে) এই সংবাদ লিখলাম।
আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি। / আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
আমি ও আমার মামা ঢাকা গিয়েছিলাম।	আমার মামা ও আমি ঢাকা গিয়েছিলাম।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।
আমি সাক্ষী দিব না।	আমি সাক্ষ্য দেব না।
আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি।	আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।
আমি তার আগমন সংবাদে সন্তোষ হয়েছি।	আমি তার আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হয়েছি।
আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।	তিনি, তুমি ও আমি আজ বাগানে যাব।
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
একের লাঠি দশের বোঝা।	দশের লাঠি একের বোঝা।
এমন অসহ্যনীয় ব্যাথ্যা আমি আর কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য (বা অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।
এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।	এটা লজ্জাকর ব্যাপার।
এর আবশ্যক নেই।	এর আবশ্যকতা নেই।
এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাংগিন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।	এক সদ্যোজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।
একটা গোপন কথা বলি।	একটা গোপনীয় কথা বলি।
কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সুবুর করিতে চাহিলেন না।	কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করতে চাইলেন না।
কালীদাস বিখ্যাত কবি।	কালিদাস বিখ্যাত কবি।
কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।	কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?	কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে।	গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।
ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চর্য হয়ে গেল।	ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেল।
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
তোমার দ্বারা সে অপমান হয়েছে।	তোমার দ্বারা সে অপমানিত হয়েছে।
তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।	তোমার কাছ থেকে তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।
তা প্রমাণ হয়েছে।	তা প্রমাণিত হয়েছে।
তাকে স্বপরিবারে দাওয়াত করে।	তাকে সপরিবারে দাওয়াত করো।
তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।	তার সহোদর ডাক্তার। / তার বৈমাত্রেয় ডাক্তার।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
তার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।	তার অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।
তার চেষ্টা নিস্ফল হলো।	তার চেষ্টা নিষ্ফল হলো।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।	তার উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
তার সাঙঘাতিক আনন্দ হলো।	তার অপরিসীম আনন্দ হলো।
তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
তুমি কি বার্ষীক ক্রীরা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করবে না?	তুমি কি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে না?
তুমি, করিম ও আমি আজ পড়তে যাব।	করিম, তুমি ও আমি আজ পড়তে যাব।
তুমিই টাকাটা আত্মসাৎ করেছ।	তুমিই টাকা আত্মসাৎ করেছ।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
দিবারাত্রি পরিশ্রমে তার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে।	দিনরাত পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে।
নূতন নূতন ছেলেগুলো স্কুলে বড় উৎপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে।
নিপরাধী, নিস্পাপীকে শাস্তি দেবে কেন?	নিরপরাধ, নিষ্পাপকে শাস্তি দেবে কেন?
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
পরপকার মানুষত্বের পরিচায়ক।	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
পরবর্তীতে আপনি আসবেন।	আপনি পরে আসবেন।
পড়াশোনায় তোমার মনোযোগীতা দেখতেছি না।	পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ দেখছি না।
পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারকের নাম বলতে পারায় পুরষ্কার পাইল ও নমষ্কার করিয়া চলিয়া গেল।	পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারকের নাম বলিতে পারায় পুরস্কার পাইল ও নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।
ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম।	ব্যাকুল চিত্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
বাংলাদেশ উন্নতশীল দেশে।	বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ।
বিদ্যাণকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
বিপদ হতে সতর্কিত থাকিও।	বিপদ হতে সতর্ক থাকিও।
বিপদগ্রস্থ হয়ে তিনি আজ এসেছিলেন।	বিপদগ্রস্ত হয়ে তিনি আজ এসেছেন।
বিগত পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে সে চেষ্টা করতেছে।	বিগত পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল।
মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশা (বা সুকেশী) এবং সুহাসিনী।
মেয়েটি স্বয়স্বর।	মেয়েটি স্বয়ংবরা।
মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
মাদকাশক্তি ভালো নয়।	মাদকাসক্তি ভালো নয়।
মুমূর্ষ ব্যক্তিটির প্রতি সকলেরই সহানুভূতি ছিল।	মুমূর্ষু লোকটির জন্যে সকলেরই সহানুভুতি ছিল।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
যেই সব ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয় নাই, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।	যেসব ছাত্র পরীক্ষা দেয়নি, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
যশ লাভ করবার জন্যে তার আকাঙ্খা খুব বেশি।	যশোলাভের জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।
যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।	যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	সকল প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
রবীঠাকুরের গীতাঞ্জলী বিখ্যাত কাব্য।	রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিখ্যাত কাব্য।
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ (বা উৎকৃষ্টতা) অনস্বীকার্য।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
শওকত ওসমানের কৃতদাসের হাসি একটি আদমজি পুরস্কারে সম্মানিত উপন্যাস।	শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' আদমজি পুরস্কারে সম্মানিত একটি উপন্যাস।
অসুস্থ্যের জন্যে আমি কাল আসতে পারিনি।	অসুস্থতার জন্যে আমি কাল আসতে পারিনি।
শশীভূষণ কি আসেনি?	শশিভুষণ কি আসেনি?
শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হতে পারে।	শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (সমৃদ্ধিশালী) হতে পারে।
সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হইয়াছে।
সে সংকট অবস্থায় পড়েছে।	সে সংকটজনক অবস্থায় পড়েছে।
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল।	সে সব কথা বিস্তারিত বলল।
সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।	সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।
সব মাছগুলোর দাম কত?	সব মাছের দাম কত?
সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য (বা বহুলতা) বর্জন করবে।
সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী।	সকল ছাত্রই পড়াশোনায় অমনোযোগী।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিতি ছিল।	সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
সশঙ্কিত চিত্তে সে বলতে লাগল।	সশঙ্ক (শঙ্কিত) চিত্তে সে বলতে লাগল।
সবধান পূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।
সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র ঘোড়াগুলো বায়ূবেগে ধাবমান হইল।	সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র, অশ্বগুলো বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
হস্তীটি অপরিসীম স্থুল।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থুলকায়।
হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত।	হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত।
হে ত্রিনয়নী, আমাকে রক্ষা করো।	হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা করো।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
তাহার সৌজন্যেতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সভ্যগণ/সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
তারা একত্রে গমন করলো।	তারা গমন করল।
পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে।	পরবর্তী সময়ে আপনি এলে ভালো হবে।
আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
দারিদ্রতাকে জয় করতে হলে, পরিশ্রম কর।	দরিদ্রতাকে/দারিদ্র্যকে জয় করতে হলে পরিশ্রম করো।
শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।	শুধু তুমি গেলেই হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কী কী কারণে বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগ ঘটে– আলোচনা করুন।

২. নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লিখুন–

অপরাহ্ন, নিপুন, আরোহন, উচ্ছাস, কৌতুহল, কৃপন, গোষ্টী, ব্রাহ্মন, সাতন্ত্র, স্বাক্ষী।

৩. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধ প্রয়োগ দেখান:

অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য।

আমি সন্তোষ হলাম।

একটা গোপন কথা বলি।

তা প্রমাণ হয়েছে।

দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।

রোগের বৃদ্ধি হয়েছে।

সে অপমান হয়েছে।

সূর্য উদয় হয়েছে।

আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত।

শুধুমাত্র তুমি গেলই হবে।

পাঠ ৭.৩ : যতিচিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষায় যথাযথভাবে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবেন।
- যতি বা বিরাম চিহ্ন কী তা লিখতে পারবেন।
- বাক্যে যতি চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যতি চিহ্নের ব্যবহার ও বিরতিকাল নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। এই যে কথা, আমরা মুখে বলে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি তা কিন্তু লিখেও অন্যকে জানান যায়। দূরের আত্মীয় বা বন্ধুকে আমরা লিখে আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণ জানাতে পারি। আবার যে ভাবনা সরাসরি কাউকে জানাচ্ছি না অনাগত মানুষ ও কালের জন্যও লিখে যেতে পারি। লিখিত ভাষায়– আমরা চিহ্ন ব্যবহার করি। এ চিহ্নগুলো দুটো কারণে ব্যবহৃত হয় – (এক) বাক্যের অর্থকে সঠিকভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য, (দুই)– বাক্যটি উচ্চারণ করে পড়লে বাক যন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য।

আমরা একনাগাড়ে কথা বলে যেতে পারি না। মাঝে মাঝে আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া স্বরসঙ্গতিহীন অবস্থায় একের পর শব্দ উচ্চারণ করে গেলে তার অর্থ বোঝা যায় না। এসব কারণে– কথা অন্যের কাছে বোধগম্য ও আমাদের বাগযন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য মাঝে মাঝে কথা বলার মধ্যে বিরতি দেই। এই বিরতিগুলোই কথা লেখার সময় অর্থাৎ ভাষাকে যখন আমরা লিখিত রূপ দেই, তখন নানা রকম চিহ্ন দিয়ে বিরতির ইঙ্গিত দেই। কথা বলার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য আমরা থামি, তাকে বলে শ্বাস পর্ব বা breath pause, এবং অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যও আমরা বিরতি দেই – একে বলে সার্থপর্ব বা Sense Pause।

বিরাম চিহ্ন কথার অর্থ যে চিহ্নের সাহায্যে কথা বলার সময় জিহ্বার কাজের বিরাম বা বিরতি নির্দেশিত হয়। মনোভাব প্রকাশের সময় অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য উচ্চারিত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিতে হয়। লেখার সময়ও বাক্যের মধ্যে বিরতি বুঝিয়ে তা দেখানোর জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকেই বিরতি চিহ্ন, যতি চিহ্ন, ছেদ চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন বা ভাষা চিহ্ন বলে।

হাজার বছরের ঐতিহ্যে ভরপুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিন্তু বাংলা ভাষায় সুষ্ঠুভাবে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে দেড়শ দুইশ বছর আগে। মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রথম নৈপুর্ণ দেখান। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলেছেন। যতি চিহ্নের প্রয়োগ যথাযথ না হলে বাক্য অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হতে পারে। এমনকী কখনো কখনো প্রত্যাশিত অর্থ প্রকাশ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কাল নির্দেশ করা হলো:

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি কাল
কমা	,	১(এক) বলতে যে সময় লাগে
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়

দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময় চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
কোলন চিহ্ন	:	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধরণ চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে
ব্র্যাকেট	()	থামার প্রয়োজন নেই
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই
	[ ]	থামার প্রয়োজন নেই

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার :

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}সাধারণত একটি দীর্ঘ বাক্যের ভেতরে দম নেয়া ও অর্থের স্পষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতি নির্দেশ করে কমা। নিচে কমার প্রয়োগ ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

ক. বাক্যে সমজাতীয় একাধিক পদ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা: সালাম, বরকত, রফিক- নাম না জানা আরো অনেকে শহিদ হয়েছেন ভাষা আন্দোলনে।

খ. পরস্পর সম্বন্ধসূচক একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমনঃ সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ. সমজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা– বসতে দিলে শুতে চায়, শুতে দিলে ঘুমাতে চায়।

ঘ. বাক্যের প্রারম্ভে সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমনঃ শুভ, এদিকে এসো।

ঙ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসবে। যেমনঃ গতকাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পরিচিত।

চ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসাতে হয়। যেমনঃ সাহেব বললেন, “এখানে একবার এসো।”

ছ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমনঃ ১৮ পৌষ, বুধবার, ১৩১০ সাল।

জ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমনঃ ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০৮০।

ঝ. নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে। যেমনঃ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ, পি এইচ ডি।

ঞ. দুই বা ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পরপর ব্যবহৃত হলে কমা বসানো হয়। যেমনঃ খেতে খেতে, যেতে যেতে, দেখতে দেখতে কক্সবাজার পৌঁছলাম।

ট. সংযোজক এবং বিয়োজক অব্যয়ের আগে কমা বসে। যেমনঃ আমি তাকে পছন্দ করি। কিন্তু তা সে বুঝতে চায় না।

ঠ. বড় রাশিতে হাজার, লক্ষ, কোটি লেখতে কমা বসে। যেমনঃ ১, ৬, ১২, ৭৩, ৪৫৮।

ড. বাক্যের সূচনায় সুতরাং, বিশেষত, মুখ্যত ইত্যাদি পদের পরে কমা বসে। যথা: সুতরাং, তোমার কোনো কথা আমরা শুনবো না।

২. সেমিকোলন (;)

ক. কমা অপেক্ষা বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। শব্দ বা পদের পরে সেমিকেলন বসে না। সাধারণত বাক্যাংশের পরে বসে। যেমনঃ সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই টুটে।

খ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একবাক্যে লিখতে মাঝখানে সেমিকোলন হয়। যেমনঃ চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে; পৃথিবী সূর্যের চারদিকে।

গ. দুটি বা তিনটি বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন হয়। যেমনঃ আগে পড়া; তারপর খাওয়া; অতঃপর স্কুল।

ঘ. পরস্পর নির্ভরশীল বাক্য সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত হলেও কখনো কখনো প্রথম বাক্যের শেষেও সংযোজক অব্যয়ের আগে সেমিকোলন বসে। যথা– দুঃখ তো মানুষের জন্যই আসে; কিন্তু তা জয় করার জন্য চাই মনোবল।

ঙ. যেসব বাক্যে ভাব সাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমনঃ শরীরটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে হাঁচি ও কাশি আসছে।

চ. বাক্যের কোনো বক্তব্যকে পরবর্তী অংশে বিষদভাবে বর্ণনাকরার সময় দুই অংশের মাঝে সেমিকোলন বসে। যেমন- আমরা স্বাধীন জাতি; আমাদের উন্নতি কীসে হবে, কিভাবে হবে তা ভেবে দেখতে হবে।

ছ. শ্রেণিভুক্ত করার সময় এর জাতীয় বিষয়কে অন্য শ্রেণি থেকে পৃথক করতে সেমিকোলনের ব্যবহার হয়। যেমনঃ শীতকালে ফুলকপি, গাজর, বাধাকপি; কমলা ও আঙুর পাওয়া যায়।

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণছেদ (।)

বাংলাভাষায় দাঁড়ি একটি বহুল ব্যবহৃত যতিচিহ্ন। বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ হলে দাড়ি বা পূর্নচ্ছেদ বসে। এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে–

ক. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন: কাল একবার এসো।

খ. নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন: সব সময় সত্য কথা বলবে।

গ. পরোক্ষ প্রশ্নের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নের বদলে দাড়ি ব্যবহার হয়। যেমন: সীমা জানতে চাইল রীমা কবে আসবে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসা হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র–

ক. বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমনঃ তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

খ. সন্দেহ বোঝাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন: সে কি কাল আসবে?

গ. ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশে কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমনঃ আপনার মতো উপকারী বন্ধু (?) না থাকাই ভালো।

ঘ. প্রশ্নবাচক পদের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন করতে পারে। যেমন: কোথায় যাবেন?

৫. বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

ক. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমনঃ আহা! কি চমৎকার দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

খ. আবেদন, ভীতি, হতাশা, আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে (!) চিহ্নটি বসে। যেমনঃ দয়া করে আমার কথা শুনুন!

গ. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গায় প্রশ্ন চিহ্নের পরিবর্তে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমনঃ তোমার হৃদয় কি পাষাণে গড়া! একটি বারও পলাশের কথা ভাবলে না!

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তরের শেষে কখনো কখনো পূর্ণচ্ছেদ না বসে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমনঃ আমাকে একটু আদর করবে!

৬. কোলন (:)

বিষয়ান্তের অবতারণা প্রসঙ্গের পরিণতি অথবা দৃষ্টান্ত দেখানের জন্য কোলন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তবে সতর্ক থাকা দরকার, কোলন কখনোই যেন দেখতে বিসর্গ (ঃ) এর মত না হয়। কোলনের মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকবে না। এর ব্যবহার হলো–

ক. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে আর একটি বাক্যের অবতারণা করতে গেলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ সভায় সাব্যস্ত হলো: এক মাস পরে নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ. কোনো বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমনঃ পদ পাঁচ প্রকারঃ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

গ. নাটকের চরিত্রের পরে ও সংলাপের আগে কোলন বসে। যেমনঃ সিরাজ : আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাকে আমার অপমান করতে হয়েছে।

ঘ. আবেদন পত্রে ভুক্তি, উপভুক্তির পরে কোলন বসে। যেমনঃ নাম : পিতার নামঃ ঠিকানা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর : তারিখঃ।

ঙ. সময়কে সংখ্যায় নির্দেশ করতে : **১২:৩০, ২:১৫**।

৭. ড্যাশ চিহ্ন (−)

ড্যাস শব্দের বাংলা অর্থ বাক্য সঙ্গতি চিহ্ন। বাক্যের মধ্যে গতির জন্য ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার কোনো বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে।

খ. উদাহরণ প্রয়োগ করতে হলে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ বচন দুই প্রকার- একবচন, বহুবচন।

গ. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ হয়। যেমনঃ বার্ধক্য তাহাই- যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ঘ. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন হয়। যেমনঃ বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে"-ইত্যাদি।

ঙ. উদ্ধৃতি চিহ্নের পরিবর্তে ড্যাশ চিহ্ন বসে। যেমনঃ শিক্ষক বলিলেন– এই দিকে আয়।

চ. স্বরকে দীর্ঘ করে দেখানোর জন্য ড্যাশ চিহ্ন হয়। যেমনঃ ঘু-ম-আ-সে-না দু-চো-খে-আ-মা-র।

৮. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

হাইফেন সবসময় দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে বসে। বাংলা লেখার সময় এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ হাট-বাজার, সাত-পাঁচ।

খ. একই শব্দ পরপর দুবার বসলে তাদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমনঃ চলতে-চলতে কোথায় চলে যায়। যেতে-যেতে হয়রান হয়ে পড়েছি।

গ. দিক বা স্থান বা সময় নির্দেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাইফেন বসে। যেমনঃ উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে।

ঘ. কোনো কোনো উপসর্গের পরে হাইফেন বসে। যেমনঃ অ-তৎসম, কু-অভ্যাস, বে-আক্কেল।

ঙ. সংখ্যা বা পরিমাণগত ব্যবধান বোঝাতে হাইফেন হয়। যেমনঃ আমাদের দল ৪-০ গোলে জিতেছে।

চ. দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন- মুক্তিযোদ্ধা-মন্ত্রণালয় যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিতরণ করছে।

৯. ইলেক (’) বা লোপ চিহ্ন বা উর্ধ্বকমা

ক. শব্দে বর্ণের লোপ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন হয়। যেমনঃ মাথার’ পরে জ্বলছে রবি (’পরে=ওপরে), পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা’রা? (কা’রা = কাহারা) দু’বেলা ভাত জোটে না– রেডিও কিনবো কি দিয়ে?

খ. হাইফেনের বিকল্প চিহ্ন হিসেবে ইলেক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ তোমার মা’র অসুখ সেরেছে কি?

গ. সালের বর্জিত সংখ্যা বোঝাতে ইলেক চিহ্ন বসে। যেমনঃ **২৬** মার্চ **’৭১**, **২১** ফেব্রুয়ারি **’৫২**।

১০. উদ্ধরণ চিহ্ন (“ ”)

বক্তার বক্তব্য অবিকৃতভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র-

ক. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন: শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার"।

খ. কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এবং গ্রন্থের নামে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে। যেমন: শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী'।

গ. উদ্ধৃতির মধ্যে উদ্ধৃতি থাকলে ভিতরের অংশের শুরুতে ও শেষে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হয়। যেমন: "শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির / 'লিখে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির'।"

ঘ. বাক্যের মধ্যে বাগধারা অথবা বিশেষার্থক শব্দ ব্যবহার করলে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে। যথা- "ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয়দিন ইন্দ্র 'চুরিবিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে।"

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন (), {}, [].

বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করার জন্য এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাক্যে সাধারণত প্রথম ও তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়।

সাধারণত এই তিনটি চিহ্ন (), {}, [] গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১২. বর্জন চিহ্ন ....

রচনার বিশেষ অংশ বর্জন করা হলে সেখানে বর্জন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটে।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

ক. ধাতু বা ক্রিয়ামূল বোঝাতে (√) চিহ্ন : √কৃ+অক = কারক

খ. পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন হয়। যেমন: গাঁ < গ্রাম।

গ. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন হয়। যেমন: স্বর্ণ > সোনা।

ঘ. সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে (=) সমান চিহ্ন হয়। পিতা ও মাতা = পিতামাতা

নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ দেখানো হলো:

১. রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা তপু বলতো দেখো রাহাত আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান।

   উ: রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা। তপু বলতো, দেখো, রাহাত, আমরা মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান?

২. শকুন্তলা অনুসুয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন সখি শকুন্তলে বোধ করি তাত কণু আশ্রমপাদদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।

   উ: শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।

৩. সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয় কাব্যের ঝুমঝুমি বিজ্ঞানের চুষিকাঠি দর্শনের বেলুন রাজনীতির রাঙালাঠি ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

   উ: সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক– এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

৪. কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম বয়স যাই হোক খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

উঃ কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

৫. এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে করবে কে প্রকাশক না ক্রেতা প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ দেউলে হবার ভয়ে কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।

উঃ এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ– দেউলে হবার ভয়ে। কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিরাম চিহ্ন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সাধারণত কতগুলো বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

২. বাংলা ভাষার বিরাম চিহ্নের ব্যবহারগুলো লিখুন।

৩. নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ দেখান।

ক. বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয় বিঘ্ন শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না পারে না যাহারা জীব হইয়াও জড় যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

খ. বালিকা বলিল হাঁটিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি আমি বলিলাম কিছুমাত্র না কিন্তু তোমার কথা হইবে না না আমি ত রোজই হাঁটিয়া বাড়ি যাই।

গ. দেখ আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি খাইতে পাইলে কে চোর হয় দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না।

ঘ. মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হবে।

ঙ. সৌদামিনীর স্বামী স্থির করল আরেকটা বিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক বংশতো গুম করে দেওয়া চলে না কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায় নি হঠাৎ মরে গেল অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে।

ইউনিট-৮
নির্মিতি

পাঠ ৮.১ : বিপরীতার্থক শব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিপরীত শব্দের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- বিপরীত শব্দ কীভাবে গঠিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূল শব্দ ও তার বিপরীতার্থক শব্দ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বাক্যে বিপরীতার্থক শব্দের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই এমন অনেক শব্দ আছে যা একটি শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। আমাদের বাংলা ভাষায়ও এরূপ অনেক শব্দ আছে যা প্রচলিত একটি শব্দের উল্টো বা বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। প্রতিটি শব্দেরই একটি বিশেষ অর্থ থাকে, যদিও বাক্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে অর্থেরও ভিন্নতা থাকতে পারে। ভাষার ব্যবহারে এমন অনেক শব্দ আসে যার সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত একটি অর্থ রয়েছে। অর্থের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত বা ভিন্ন এই শব্দটিই ঐ মূল শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ। ভাষার সৌন্দর্যবিধান ও ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই এটি এসে পড়ে।

একটি শব্দের বিপরীত অর্থবাচক শব্দকে বিপরীতার্থক শব্দ বলে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার ও শিক্ষার্থীর শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্য বিপরীতার্থক শব্দ জানা আবশ্যক। বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার করতে জানলে মনের ভাব অনেকক্ষেত্রে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব।

বিপরীতার্থক শব্দ বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে–

ক. উপসর্গযোগে : শব্দের পূর্বে বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়ে বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে। সাধারণত অ, অন, অনা, অপ, অব, দুর, ন, না, নি, নির প্রভৃতি উপসর্গ শব্দের পূর্বে বসে প্রায়ই না-বাচক বা নিষেধবোধক অর্থ প্রকাশ করে।
যেমন : কাজ– অকাজ, ইচ্ছা– অনিচ্ছা, আগ্রহ– অনাগ্রহ, যশ– অপযশ, রোগ– নীরোগ, পথ– বিপথ প্রভৃতি।

খ. ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে : মূল শব্দের সঙ্গে মিল না রেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শব্দ দ্বারা বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে।
যেমন : অগ্র– পশ্চাৎ, আয়– ব্যয়, উষ্ণ– শীতল, জ্যোৎস্না– অন্ধকার, স্বর্গ– নরক, হাল্কা– ভারি প্রভৃতি।

গ. শব্দের পরে কিছু যুক্ত হয়ে : মূল শব্দের পরে কোনো শব্দ বা শব্দাংশ যুক্ত হয়ে বিপরীতার্থক শব্দ গঠিত হতে পারে। সাধারণত কোনো শব্দের শেষে হারা, হীন, বিহীন, শূন্য প্রভৃতি যুক্ত হয়ে মূল শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : চরিত্রবান– চরিত্রহীন, প্রতিভাশালী– প্রতিভাহীন, সমৃদ্ধিশালী– সমৃদ্ধিহীন, রোগ– রোগহীন, বন্ধন– বন্ধনহারা প্রভৃতি।

নিচে বিপরীতার্থক শব্দের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	অনুকূল	প্রতিকূল
অম্ল	মধুর	অন্তর	বাহির

অধম	উত্তম	অলস	পরিশ্রমী
অজ্ঞান	সজ্ঞান	অমর	মর
অর্পণ	গ্রহণ	অনুরক্ত	বিরক্ত
আকাশ	পাতাল	আসল	নকল
আয়	ব্যয়	আলোক	অন্ধকার
আবির্ভাব	তিরোভাব	আবির্ভূত	তিরোহিত
আগে	পিছে	আকুঞ্চন	প্রসারণ
আবৃত	অনাবৃত	আমদানি	রপ্তানি
আবশ্যক	অনাবশ্যক	আস্তিক	নাস্তিক
আদি	অন্ত	আদিম	অন্তিম
আদান	প্রদান	আগমন	নির্গমন/প্রস্থান
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আঁঠি	শাঁস
আস্থা	অনাস্থা	আহার	অনাহার
আরোহণ	অবরোহণ	আত্মীয়	অনাত্মীয়
আশা	নিরাশা	আহার	অনাহার
আবিল	অনাবিল	আদ্র	অনার্দ্র
আসামী	ফরিয়াদী	আকস্মিক	চিরন্তন
ইহকাল	পরকাল	ইষ্ট	অনিষ্ট
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	ইতর	ভদ্র
ইতি	আদি	ইহলোক	পরলোক
ইচ্ছুক	অনিচ্ছুক	ইতিবাচক	নেতিবাচক
ইদানীন্তন	তদানীন্তন	ইহলৌকিক	পারলৌকিক
ঈর্ষা	প্রীতি	ঈমান	বেঈমান
ঈষৎ	অধিক	ঈশান	নৈর্ঋত
ঈদৃশ	তাদৃশ		
উদয়	অস্ত	উচিত	অনুচিত
উত্থান	পতন	উর্বর	অনুর্বর
উন্নতি	অবনতি	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উত্তপ্ত	শীতল	উষ্ণ	শীতল
উদ্ধত	বিনীত	উগ্র	সৌম্য/নম্র
উদার	সংকীর্ণ	উত্তর	দক্ষিণ
উদ্ভাসিত	ম্রিয়মান	উৎসাহ	নিরুৎসাহ
উজাড়	ভরপুর	উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
উজ্জ্বল	অনুজ্জ্বল	উজান	ভাটি
উর্বর	অনুর্বর	উল্লেখ	অনুল্লেখ
উপকারিতা	অপকারিতা	উপচিকীর্ষা	অপচিকীর্ষা
উন্মীলন	নির্মীলন	উন্মুখ	বিমুখ
উন্নতি	অবনতি	উদার	সংকীর্ণ
উপস্থিত	অনুপস্থিত	উতরানো	তলানো
উড়ন্ত	পড়ন্ত	উদ্বৃত্ত	ঘাটতি

উত্থিত	পতিত	উত্তরায়ন	দক্ষিণায়ন
উৎরাই	চড়াই	উদ্বিগ্ন	নিরুদ্বিগ্ন
ঊষর	উর্বর	ঊর্ধ্ব	অধঃ
ঊষা	সন্ধ্যা	ঊর্ধ্বগামী	নিম্নগামী
ঊর্ধ্বতন	অধস্তন	ঊর্ধ্বগতি	অধোগতি
ঊহ্য	স্পষ্ট	ঋজু	বক্র
একতা	বিচ্ছিন্নতা	এক	অনেক
এঁড়ে	বকনা	একাল	সেকাল
একূল	ওকূল	এদিক	ওদিক
ঐহিক	পারত্রিক	ঐক্য	বিভেদ/অনৈক
ঐচ্ছিক	আবশ্যিক	ঐশ্বর্য	দারিদ্র্য
ঐতিহাসিক	অনৈতিহাসিক	ঐকমত্য	মতভেদ
ওস্তাদ	সাগরেদ	ঔদার্য	কার্পণ্য
ঔদ্ধত্য	বিনয়	ঔচিত্য	অনৌচিত্য
ঔজ্জ্বল্য	ম্লানিমা		
কঠিন	কোমল/তরল	কড়ি	কড়িশূন্য
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	কপট	অকপট/সরল
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ/কৃতঘ্ন	কুৎসা	প্রশংসা
কুৎসিত	সুন্দর	ক্রন্দন	হাস্য
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	কোমল	কঠিন/কর্কশ
কৃষ্ণ	শুভ্র	কৃশ	স্থূল
কৃশকায়	স্থূলকায়	কুটিল	সরল
কল্পনা	বাস্তব	কল্যাণ	অকল্যাণ
কাজ	বিশ্রাম	কার্যকর	অকার্যকর
কুমেরু	সুমেরু	কুরুচি	সুরুচি
কুশিক্ষা	সুশিক্ষা	কেলেঙ্কারি	সুনাম
কু	সু	কৃত্রিম	স্বাভাবিক
ক্ষীণ	পুষ্ট	ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু
ক্ষিপ্ত	শান্ত	ক্ষয়	বৃদ্ধি
ক্ষীয়মাণ	বর্ধমান	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
ক্ষতি	লাভ		
খিড়কি	সিংহদার	গ্রাম্য	নাগরিক
গ্রহণ	বর্জন	প্রশংসা	নিন্দা
খুঁত	নিখুঁত	খণ্ড	অখণ্ড
খুব	অল্প	খাতক	মহাজন
খ্যাতি	অখ্যাতি	খ্যাত	অখ্যাত
খোঁজ	নিখোঁজ	খুশি	অখুশি
খাদ্য	অখাদ্য	খরিদ	বিক্রয়

গরল	অমৃত	গৌণ	মুখ্য
গ্রাম্য	শহুরে/বন্য	গৌরব	লাঘব
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গ্রহণ	বর্জন
গুরু	লঘু	গুণ	দোষ
গুরু	শিষ্য	গোপনীয়	প্রকাশ্য
গাঢ়	পাতলা	গোপন	প্রকাশ
গৃহী	সন্ন্যাসী	গণ্য	নগণ্য
গ্রহীতা	দাতা	গুপ্ত	ব্যক্ত
গ্রাহ্য	অগ্রাহ্য	গতি	স্থিতি
গভীর	অগভীর		
ঘন	তরল	ঘুমন্ত	জাগ্রত
ঘাটতি	বাড়তি	ঘর	বার
ঘাত	প্রতিঘাত	ঘরোয়া	বাহির
ঘাট	অঘাট		
চড়াই	উৎরাই	চ্যুত	অচ্যুত
চঞ্চল	স্থির/অবিচল	চেতন	অবচেতন
চপল	গম্ভীর	চোর	সাধু
চতুর	বোকা	চোখা	ভোঁতা
চলতি	সাধু	চিরায়ত	সাময়িক
চাক্ষুষ	অগোচর	চিরন্তন	ক্ষণকালীন
চিন্তনীয়	অচিন্তনীয়	চালু	অচল
ছায়া	কায়া	ছাত্র	শিক্ষক
ছটফটে	শান্ত	ছোকড়া	বুড়ো
জয়	পরাজয়	জানা	অজানা
জন্ম	মৃত্যু	জনাকীর্ণ	জনবিরল
জীবন	মরণ	জাগরণ	নিদ্রা
জটিল	সরল	জ্যেষ্ঠা	কনিষ্ঠা
জাগ্রত	সুপ্ত/ঘুমন্ত	জ্বলন্ত	নিভন্ত
জলে	স্থলে	জিন্দা	মুর্দা
জ্ঞাতসারে	অজ্ঞাতসারে	জ্যোৎস্না	অমাবস্যা
জোয়ার	ভাটা	জৈব	অজৈব
জীবিত	মৃত	জাল	আসল
জাতীয়	বিজাতীয়	ঝুনা	কাঁচা
ঝানু	অদক্ষ	ঝগড়া	ভাব
টক	মিষ্টি	টাটকা	বাসি
ঠিক	বেঠিক	ঠাণ্ডা	গরম
ঠুনকো	মজবুত	ডুবন্ত	ভাসন্ত
ডাগর	ছোট	ডুবা	ভাসা

তাপ	শৈত্য	তেজ	নিস্তেজ
তরল	কঠিন	তরুণ	বৃদ্ধ
তীক্ষ্ণ	ভোতা	তখন	এখন
তিরস্কার	পুরস্কার	তিক্ত	মধুর
ত্যাজ্য	গ্রাহ্য	তীব্র	লঘু
ত্বরিত	শ্লথ	তদীয়	মদীয়
তুষ্ট	রুষ্ট	তন্ময়	মন্ময়
তৃপ্ত	অতৃপ্ত	তপ্ত	শীতল
তেজি	মন্দা	তস্কর	সাধু
তিমির	আলো	থামা	শুরু
থৈ	অথৈ		
দুর্বল	সবল	দাতা	গ্রহীতা
দিবা	নিশি	দুষ্কৃত	সুকৃত
দয়ালু	নিষ্ঠুর	দোষী	নির্দোষী
দরদি	বেদরদি	দৃঢ়	শিথিল
দ্যুলোক	ভূলোক	দ্বৈত	অদ্বৈত
দ্বিধা	নির্দ্বিধা	দখল	বেদখল
দুর্দিন	সুদিন	দুর্জন	সুজন
দুর্গম	সুগম	দুরন্ত	শান্ত
দেশি	বিদেশি	দৃশ্য	অদৃশ্য
দুঃশীল	সুশীল	দীর্ঘায়ু	স্বল্পায়ু
দিক	বিদিক	দাস	প্রভু
ধনবান	ধনহীন	ধরা	মরা
ধনিক	শ্রমিক	ধনী	গরিব
ধনাত্মক	ঋণাত্মক	ধবল	শ্যামল
ধৃত	মুক্ত	ধূর্ত	বোকা
ধীর	অধীর	ধারালো	ভোঁতা
ধর্ম	অধর্ম		
নিমগ্ন	উদাসীন	নেতিবাচক	ইতিবাচক
নন্দিত	নিন্দিত	নির্দয়	সদয়
নব	পুরাতন	নশ্বর	অবিনশ্বর
নির্মল	পঙ্কিল	নিষেধ	বিধি
নিদ্রিত	জাগ্রত	নীরস	সরস
নিরত	বিরত	নিশ্চয়তা	অনিশ্চয়তা
নির্লজ্জ	সলজ্জ	নির্দেশক	অনির্দেশক
নিরাশ্রয়	সাশ্রয়	নিরপেক্ষ	সাপেক্ষ
নিরাকার	সাকার	নিন্দা	প্রশংসা
নিচেষ্ট	সচেষ্ট	নিরাশা	আশা
নর	নারী	পাপ	পুণ্য

পণ্ডিত	মূর্খ	প্রবল	দুর্বল
প্রবীণ	নবীন	প্রশস্ত	সংকীর্ণ
প্রকৃতি	বিকৃতি	প্রভু	ভৃত্য
প্রস্থান	আগমন	প্রচ্ছন্ন	ব্যক্ত
প্রকাশ	গোপন	প্রসারণ	সংকোচন
পরকাল	ইহকাল	পুষ্ট	ক্ষীণ
প্রত্যর্থী	অর্থী	প্রাচীন	নব্য, নবীন
প্রসন্ন	বিষণ্ন	প্রীতিকর	অপ্রীতিকর
প্রারম্ভ	শেষ	প্রাচ্য	পাশ্চাত্য
প্রতিকূল	অনুকূল	প্রশ্বাস	নিঃশ্বাস
প্রশংসা	নিন্দা	প্রশান্ত	অশান্ত
প্রবাসী	স্বদেশি	প্রাচী	প্রতীচী
পুরস্কার	তিরস্কার	পুণ্যবান	পুণ্যহীন
পরিশোধিত	অপরিশোধিত	প্রকৃত	অপ্রকৃত
প্রশান্তি	অশান্তি	পূর্ববর্তী	পরবর্তী
প্রফুল্ল	ম্লান	প্রধান	অপ্রধান
প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ	প্রতিযোগী	সহযোগী
প্রচুর	স্বল্প	প্রকৃষ্ট	নিকৃষ্ট
পদার্থ	অপদার্থ	পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ
পড়া	ওঠা	পরার্থ	স্বার্থ
পক্ষ	বিপক্ষ	পটু	অপটু
ফলবান	নিষ্ফলা	পক্ব	অপক্ব
ফল	অফল	ফলন্ত	নিষ্ফলা
ফাঁপা	নিরেট	ফর্সা	ময়লা
বাদী	বিবাদী	বাচাল	স্বল্পভাষী
বিধি	নিষেধ	বন্য	গৃহপালিত
বরখাস্ত	বহাল	বাদ	প্রতিবাদ
বধূ	বর	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
বিনীত	দুর্বিনীত, উদ্ধত	বিজয়	পরাজয়
বক্তা	শ্রোতা	বন্দনা	গঞ্জনা
বিরল	বহুল	বিয়োগান্ত	মিলনান্ত
বিজ্ঞ	অজ্ঞ	বিদ্বান	মূর্খ
ব্যর্থ	সার্থক	ব্যর্থতা	সার্থকতা
বিরহ	মিলন	বিষাদ	আনন্দ
ব্যক্ত	সুপ্ত	বিলম্বিত	দ্রুত
বিপন্ন	নিরাপদ	বিপথ	সুপথ
বিনয়	ঔদ্ধত্য	বিদ্যমান	অন্তর্হিত
বিজন	সজন	বাহুল্য	স্বল্পতা
বাস্তব	কল্পিত	বামপন্থী	ডানপন্থী
বন্ধন	মুক্তি	বাধ্য	অবাধ্য
বাদী	বিবাদী	বাড়তি	কমতি

বহু	কম	বহির্ভূত	অন্তর্ভুত
বন্ধুর	মসৃণ	বিরক্ত	অনুরক্ত
বিশ্রী	সুন্দর	বন্ধন	মুক্ত
ভীরু	নির্ভীক	ভণ্ড	সাধু
ভেজাল	খাঁটি	ভয়	সাহস
ভক্তি	অভক্তি	ভাঁটা	জোয়ার
ভাসা	ডোবা	ভোগ	ত্যাগ
ভেদ	অভেদ	ভূ-স্বামী	ভূমিহীন
ভূমিকা	উপসংহার	ভিন্ন	অভিন্ন
মধুর	তিক্ত	মিত্র	শত্রু
মুখ্য	গৌণ	মিলন	বিরহ
মুক্ত	বন্দি	মৃদু	তীব্র
মনীষা	নির্বোধ	মঙ্গল	অমঙ্গল
মনোযোগ	অমনোযোগ	মনোযোগী	অমনোযোগী
মর্যাদা	অমর্যাদা	মসৃণ	অমসৃণ
মৌখিক	লিখিত	মৌলিক	যৌগিক
মৃদু	প্রবল	মহৎ	নীচ
মিথ্যা	সত্য	মহাজন	খাতক
মহাত্মা	নীচাত্মা	মান্য	অমান্য
মানা	অমানা	মিঠা	তিতা
মিল	অমিল	মূর্ত	বিমূর্ত
মোটা	সরু	মোক্ষ	বন্ধন
যশ	কলঙ্ক	যোগ্য	অযোগ্য
যান্ত্রিক	প্রাকৃতিক	যত্ন	অযত্ন
যৌথ	একক	যুদ্ধ	শান্তি
যুগল	একক	যাওয়া	আসা
যশ	অপযশ	যাজক	বিয়োজক
রব	নীরব	রাগ	বিরাগ
রিক্ত	পূর্ণ	রাজা	প্রজা
রুগ্ন	সুস্থ	রুদ্ধ	মুক্ত
রত	বিরত	রানী	রাজা
রোদ	বৃষ্টি	রুষ্ট	তুষ্ট
রাজি	নারাজ	রসিক	বেরসিক
রক্ষক	ভক্ষক		
লঘু	গুরু	লেন	দেন
লঘিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	লাল	কালো
লম্ব	তির্যক	লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী
লাজুক	নির্লজ্জ	লব	হর
লিপ্সা	বিরাগ	লওয়া	দেওয়া

লৌকিক	অলৌকিক	লোভী	নির্লোভ
শিষ্ট	অশিষ্ট	শীতল	উষ্ণ
শত্রু	মিত্র	শৈত্য	উত্তাপ
শোক	হর্ষ/আনন্দ	শুভ	অশুভ
শূন্য	পূর্ণ	শীঘ্র	বিলম্ব
শ্রম	বিশ্রাম	শ্বাস	নিঃশ্বাস
শোভন	অশোভন	শুচি	অশুচি
শীত	গ্রীষ্ম	শান্তি	অশান্তি
শালীন	অশালীন	শারীরিক	মানসিক
শায়িত	উত্থিত	শঠ	সাধু
শর্বরী	দিবস	শ্রীযুক্ত	শ্রীহীন
শাসক	শাসিত	ষাঁড়	ষাঁড়
সিক্ত	শুষ্ক	স্থাবর	অস্থাবর
সকর্মক	অকর্মক	সংক্ষেপ	বিস্তর
সুষম	অসম	সাধু	তস্কর
সুখ্যাতি	কুখ্যাতি	স্মৃতি	বিস্মৃতি
সৃষ্টি	ধ্বংস	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
স্থির	চঞ্চল	সম্বল	নিঃসম্বল
স্থলভাগ	জলভাগ	স্থাবর	অস্থাবর
স্তুতি	নিন্দা	সৌভাগ্যবান	ভাগ্যাহত
সুশ্রী	কুশ্রী	সুলভ	দুর্লভ
সুর	অসুর	সুপ্ত	জাগ্রত
সাকার	নিরাকার	সসীম	অসীম
সরস	নীরস	সরল	কুটিল
সরকারি	বেসরকারি	সুধা	গরল
সুদর্শন	কুদর্শন	সুন্দর	সুৎসিত
সাহসিকতা	ভীরুতা	সাহসী	ভীরু
সার্থক	নিরর্থক	সামনে	পিছনে
সার	অসার	সাবালিকা	নাবালিকা
সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য	সমাপ্ত	আরম্ভ
সমতল	অসমতল	সম্প্রসারণ	সংকোচন
সরু	মোটা	সদাচার	কদাচার
সদর	অন্দর	সদয়	নির্দয়
সত্য	মিথ্যা	সত্বর	ধীর
সংশ্লেষণ	বিশ্লেষণ	সংহত	বিভক্ত
সংশ্লিষ্ট	বিশ্লিষ্ট	সংযোগ	বিয়োগ
সঞ্চয়	অপচয়	সজ্ঞান	অজ্ঞান
সজীব	নির্জীব	সচ্ছল	অসচ্ছল
সচ্চরিত্র	দুশ্চরিত্র	সংক্ষিপ্ত	বিস্তৃত
সংকীর্ণ	প্রশস্ত	সংকুচিত	প্রসারিত

স্মরণ	বিস্মরণ	সুগম	দুর্গম
হ্রাস	বৃদ্ধি	হর্ষ	বিষাদ
হুঁশ	বেহুঁশ	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
হক	বেহক	হলাহল	অমৃত, সুধা
হাজির	গরহাজির	হৃদ্যতা	শত্রুতা
হিসেবি	বেহিসেবি	হৃদ্য	ঘৃণ্য
হালকা	ভারি	হাল	সাবেক
হিত	অহিত		

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বিপরীতার্থক শব্দ কী? বিপরীতার্থক শব্দ কীভাবে গঠিত হতে পারে? উদাহরণ দিন।

২। নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দলিখুন।

শব্দ	**বিপরীতার্থক শব্দ**	**শব্দ**	**বিপরীতার্থক শব্দ**
আলোক		সুলভ	
গ্রহণ		উন্নতি	
সরস		হর্ষ	
হ্রাস		লাভ	
সমাপ্ত		সুখ	
শীতল		আসল	
গোপনীয়		আয়	
ক্ষুদ্র		অন্তর	
গুরু		গ্রাম্য	

৩। নিচের শব্দগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখান।

উৎকর্স-অপকর্ষ, অন্তর-বাহির, চেনা-অচেনা, চোখা-ভোঁতা, যোগ-বিয়োগ, সবল-দুর্বল, নির্মল-পঙ্কিল, পাপ-পুণ্য।

পাঠ ৮.২ : এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য-সংকোচন বা বাক্য-সংক্ষেপণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- এক কথায় প্রকাশ কী তা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত এক কথায় প্রকাশের উদাহরণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাক্যে এক কথায় প্রকাশের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

একাধিক পদ একত্রে মিলিত হয়ে বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করলে তাকে আমরা বাক্য বলি। আবার কখনো কখনো এই একাধিক পদ বা উপবাক্যের সমষ্টি অর্থাৎ বাক্যের মনের ভাব বা অর্থকে অক্ষুণ্ন রেখে তাকে একটি শব্দেও প্রকাশ করা যায়। তাহলে পুরো একটি বাক্য না বলে তার বিকল্প ঐ শব্দটি বলাই ভালো। এতে সময়ও কম লাগে, আর বাক্যটিও শ্রুতিমধুর হয়। এভাবে পুরো একটি বাক্যের বা উপবাক্যের অর্থকে সংকোচন করে বা সংক্ষিপ্ত করে একটি শব্দে প্রকাশ করাই হলো এক কথায় প্রকাশ। যেহেতু এতে বাক্যের অর্থ সংকুচিত বা সংক্ষিপ্ত হয় সেজন্য একে আমরা বাক্য-সংকোচন বা বাক্য-সংক্ষেপণও বলতে পারি।

একাধিক পদ বা উপবাক্যকে একটি শব্দে প্রকাশের নামই হলো এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংক্ষেপণ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে ভাষার ব্যবহার ও শিক্ষার্থীর শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্যও এক কথায় প্রকাশ জানা প্রয়োজন। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশের নামই বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ। ভাষাকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষায় বাক্য সংক্ষেপণ অত্যন্ত প্রচলিত একটি নিয়ম। সাধারণভাবে বাক্য সংক্ষেপণ সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের সাহায্যে হয়ে থাকে। আবার এগুলো ব্যতীত সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ দিয়েও এক কথায় প্রকাশ করা যেতে পারে।

নিচে এক কথায় প্রকাশের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

অ

অগ্রে বর্তমান থাকে যে – অগ্রবর্তী
অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ
অহংকার করে যে – অহংকারী
অভিজ্ঞতার অভাব – অনভিজ্ঞ
অনেকের মধ্যে একজন – অন্যতম
অগ্রে জন্মিয়াছে যে – অগ্রজ
অনুতে (পশ্চাতে) জন্মেছে যে – অনুজ
অতি দীর্ঘ নয় যা – নাতিদীর্ঘ
অক্ষির অগোচর – পরোক্ষ
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
অন্যদিকে মন যার – অন্যমনস্ক/অন্যমনা
অপকার করার ইচ্ছা – অপচিকীর্ষা
অন্য দেশ – দেশান্তর
অন্য বার – বারান্তর
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী
অতি শীতও নয় অতি উষ্ণও নয় – নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী
অশ্বের ডাক – হ্রেষা
অল্প কথা বলে যে –অল্পভাষী
অধ্যাপনা করেন যিনি – অধ্যাপক
অন্য উপায় নেই – অগত্যা
অন্তর্গত অপ যার – অন্তরীপ
অরিকে দমন করেন যিনি – অরিন্দম
অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা – অণুবীক্ষণ
অগ্র-পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী – আনুপূর্বিক
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে যে – উন্নাসিক

অতিকষ্টে যা নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার
অর্থহীন উক্তি – প্রলাপ
অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা – প্রতিভা
অল্প পরিশ্রমে শ্রান্ত নারী – ফুলটুসি
অলংকারের ধ্বনি – শিঞ্জন
অবলীলার সঙ্গে – সাবলীল
অসূয়া নেই যার (স্ত্রী) – অনসূয়া
অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি – অন্তর্যামী
অন্ধকার রাত্রি – তামসী
অতি উচ্চ ধ্বনি – মহানাদ
অতি উচ্চ রোল – উতরোল
অনুচিত বল প্রয়োগকারী – হঠকারী
অহনের পূর্বাংশ – পূর্বাহ্ণ
অহনের অপর অংশ – অপরাহ্ণ
অহনের মধ্য অংশ – মধ্যাহ্ন
অন্য গতি – গত্যন্তর
অশ্ব রাখার স্থান – আস্তাবল

আ

আকাশে চরে যে – খেচর
আচরণের যোগ্য – আচরণীয়
আপনাকে কেন্দ্র করেই যার চিন্তা – আত্মকেন্দ্রিক
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে যে – আস্তিক
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত
আকাশে গমন করে যে – বিহঙ্গ
আদরের সাথে – সাদরে
আটপ্রহর যা পরা যায় – আটপৌরে
আপনার রং লুকায় যে – বর্ণচোরা
আমিষের অভাব – নিরামিষ
আয় আনুসারে যিনি ব্যয় করেন – মিতব্যয়ী
আত্মাকে অধিকার করে – অধ্যাত্ম
আপনাকে ভুলে থাকে যে –আত্মভোলা
আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে – পণ্ডিতমন্য
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার – নাস্তিক
আজীবন অবিবাহিত আছে যে – চিরকুমার
আঘাতের বিপরীত – প্রত্যাঘাত, প্রতিঘাত
আদি নেই যার – অনাদি
আবক্ষ জলে নেমে স্নান – অবগাহন
আয়নায় দেখা মূর্তি – প্রতিবিম্ব
আরাধনার যোগ্য যিনি – আরাধ্য
আদরিণী কন্যা – দুলালি।

ই

ইতিহাস লেখেন যিনি – ঐতিহাসিক
ইহলোক বিষয়ক – ঐহিক
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে – জিতেন্দ্রিয়
ইষ্টক নির্মিত গৃহ – অট্টালিকা
ইহার তুল্য – ঈদৃশ
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি – দাগি

ঈ

ঈষৎ রক্তবর্ণ – আরক্ত
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি – আস্তিক
ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার – আঁষটে
ঈশ্বর বিষয়ক – ঐশ্বরিক
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ – ধূসর
ঈষৎ নীলবর্ণ – নীলাভ
ঈষৎ হাস্য – স্মিত

উ

উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে – অকৃতজ্ঞ
উপকারীর অপকার করে যে – কৃতঘ্ন
উপকার করার ইচ্ছা – উপচিকীর্ষা
উল্লেখ করা হয় না যা – উহ্য
উপন্যাস রচয়িতা – ঔপন্যাসিক
উপায় নেই যার – নিরুপায়
উদ্ভিদের নতুন পাতা – পল্লব/কিশলয়।

ঊ

ঊর্ধ্বদিকে গমন করে যে –ঊর্ধ্বগামী
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা – অবতরণ
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার – ঊর্ধ্বগতি

ঋ

ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি – ঋত্বিক।

ঋষির ন্যায় – ঋষিকল্প।

ঋণশোধে অসমর্থ – দেউলিয়া

এ

একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ

একই মাতার উদরে জাত যারা – সহোদর

এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মায়নি – অজাতশত্রু

এক থেকে আরম্ভ করে – একাদিক্রমে

এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে – যাযাবর

একই সময়ে – যুগপৎ

একবার শুনলে যার মনে থাকে – শ্রুতিধর

একই কালে বর্তমান – সমকালীন

একই সময়ে বর্তমান – সমসাময়িক

একসঙ্গে যারা যাত্রা করে –সহযাত্রী

এঁটেল ও বেলেমাটির মিশ্রণ – দোআঁশ

ঐ

ঐক্যের অভাব আছে যাতে –অনৈক্য

ঐশ্বর্যের অধিকারী যিনি –ঐশ্বর্যবান

ও

ওষ্ঠ ও অধর – ওষ্ঠাধর

ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত – ঔষ্ঠ্য

ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে – তুলাদণ্ড

ঔ

ঔষধি থেকে উৎপন্ন – ঔষধ।

ঔষধের বিপণি – ঔষধালয়

ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য – পথ্য

ক

কবিতা লেখেন যিনি – কবি

কোথাও নত কোথাও উন্নত – বন্ধুর

কাচের তৈরি ঘর – শিশমহল

ক্রিয়ার বিপরীত – প্রতিক্রিয়া

কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী – কর্মঠ

কর্মে অতিশয় কুশল – কর্মঠ

কোকিলের ডাক – কুহু

কণ্ঠ পর্যন্ত – আকণ্ঠ

কর্ণ পর্যন্ত – আকর্ণ

কী করতে হবে যে স্থির করতে পারে না –
কীংকর্তব্যবিমূঢ়

কুৎসিত আকার যার – কদাকার

কৃষি থেকে উৎপন্ন –কৃষিজ

ক্ষমা করার ইচ্ছা – তিতিক্ষা

কূলের বিপরীত –প্রতিকূল

কিছু বলতে যার ঠোঁটে বাধে না – ঠোঁটকাটা

খ

খাইবার ইচ্ছা – ক্ষুধা

খুব দীর্ঘ নয় –নাতিদীর্ঘ/অনতিদীর্ঘ

খরচের হিসাব যার নেই – বেহিসেবি

খাতাপত্র রাখার ঘর – দপ্তরখানা

গ

গণনার অযোগ্য – নগণ্য

গাছে উঠতে পটু যে – গেছো

গৃহে থাকে যে –গৃহস্থ

গমনের ইচ্ছা – জিগমিষা

গোপন করার ইচ্ছা – জুগুপ্সা

গভীর রাত্রি – নিশীথ

গমন করতে পারে যে – জঙ্গম

গাড়ি চালায় যে – গাড়োয়ান

গ্রন্থ রাখার গৃহ – গ্রন্থাগার।

ঘোড়া থাকার স্থান – ঘোড়াশাল/আস্তাবল

ঘোর অন্ধকার রাত্রি – তামসী/তমিস্রা

ঘটনার বিবরণ – প্রতিবেদন

চ

চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যা জানতে পারা যায় না– অতীন্দ্রিয়

চিরস্থায়ী নয় যা – অনিত্য/নশ্বর

চৈত্র মাসের ফসল – চৈতালি

চিবিয়ে খেতে হয় যা – চর্ব্য

চার রাস্তার মিলনস্থল – চৌরাস্তা

চোখে দেখা যায় যা –চাক্ষুষ
চুষে খেতে হয় যা – চূষ্য
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি – চশমখোর
চোখে দেখা যায় যা – প্রত্যক্ষ
চোখের দ্বারা দৃষ্ট – চাক্ষুষ
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য – চিরস্মরণীয়

ছ

ছন্দে নিপুণ যিনি – ছান্দসিক
ছয় মাস অন্তর – ষান্মাসিক
ছল করে কান্না – মায়াকান্না

জ

জানিবার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা
জয় করিবার ইচ্ছা– জিগীষা
জানু পর্যন্ত – আজানু
জলে স্থলে যে জন্তু বিচরণ করে – উভচর
জীবিত থেকেও যে মৃত – জীবন্মৃত
জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে যা – জাজ্বল্যমান
জয়সূচক যে উৎসব – জয়ন্তী
জল দেখে ভয় পাওয়া – জলাতঙ্ক
জলে চরে যে – জলচর
জলে জন্মে যা – জলজ
ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কা – ঝাপট
ঝন ঝন শব্দ – ঝঙ্কার/ঝনৎকার

ট

টাইমের বাইরে – বেটাইম
টোল পড়েনি এমন – নিটোল।

ঠ

ঠিক নয় – বেঠিক
ঠাকুরের ভাব – ঠাকুরালি
ঠান্ডায় পীড়িত – শীতার্ত।

ড

ডুব দিতে জানে যে – ডুবুরি
ডাক বহন করে যে – ডাকহরকরা
ডিঙি বইবার দাঁড় – বৈঠা

ঢ

ঢিপির মতো – ঢ্যাপসা
ঢাক বাজায় যে – ঢাকি

ত

তাল জ্ঞান নেই যার – তালকানা
তির নিক্ষেপ করে যে – তিরন্দাজ
তালু থেকে উচ্চারিত – তালব্য
তার মতো – তাদৃশ
তবলায় নিপুণ – তবলচি
ত্রিকাল দর্শন করেন যিনি – ত্রিকালদর্শী
ত্রাণ করেন যিনি – ত্রাতা
তুলা থেকে তৈরি – তুলট
তল স্পর্শ করা যায় না যার – অতলস্পর্শ

দ

দিবসের শেষ ভাগ – অপরাহ্ণ
দ্বীপের সদৃশ – উপদ্বীপ
দেহে, মনে ও কথায় – কায়মনোবাক্যে
দু'দিকে অপ যার – দ্বীপ
দু'বার জন্ম হয় যার – দ্বিজ
দু'রথীর যুদ্ধ – দ্বৈরথ
দোহনের যোগ্য – দোহনীয়
দু'বার বলা – দ্বিরুক্তি
দু'হাতে সমান কাজ করতে পারে যে – সব্যসাচী
দাড়ি জন্মে নি যার – অজাতশ্মশ্রু
দেখা যায় না যা – অদৃশ্য

ধ

ধ্যান করেন যিনি – ধ্যানী
ধূলায় পরিণত – ধূলিসাৎ
ধীরে যে গমন করে – ধীরগামী/মন্দগামী
ধনের দেবতা – কুবের

ন

নৌকা চালনা করে যে – নাবিক
নূপুরের ধ্বনি – নিক্বণ

নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময় – নিদাঘ
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার – নশ্বর
নিকৃষ্ট ব্যক্তি – দুর্জন
নাটকের পাত্রপাত্রী – কুশীলব
নৌ চলাচলের যোগ্য – নাব্য
নিষ্কাশিত সারবস্তু – নির্যাস

প

পা থেকে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক
পান করার ইচ্ছা – পিপাসা
পরে জন্মেছে যে – অনুজ
পূর্বে ছিল এখন নেই – ভূতপূর্ব
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
পাখির কলরব – কূজন
পূর্বে যা শোনা যায়নি – অশ্রুতপূর্ব
পুর্বে যা দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব
পান করার যোগ্য নয় – অপেয়
পশ্চাতে গমন করে যে – অনুগামী
পেতে ইচ্ছা –ঈপ্সা
পরস্পরে আলিঙ্গন – কোলাকুলি
পশুহত্যা করে যে – কসাই
পরের ভালো যে দেখতে পারে না – পরশ্রীকাতর
পুরাকালের বিষয় যিনি জানেন – পুরাতাত্ত্বিক
পান করার যোগ্য – পেয়।
পঙ্কে জন্মে যা – পঙ্কজ
পড়া হয়েছে যা – পঠিত
পরিমিত ব্যয় করে যে – মিতব্যয়ী
পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাচ্ছে যা – দেদীপ্যমান
পরিমিত আহার করে যে – মিতাহারী

ফ

ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় – ওষধি
ফুল হতে জাত – ফুলেল
ফুটছে এমন – ফুটন্ত

ব

বাঘের চামড়া – কৃত্তি
বসন আগলা যার – অসংবৃত
বিসংবাদ নেই যাতে – অবিসংবাদিত
বিদেশে থাকে যে – প্রবাসী
বিশ্বজনের হিতকর – বিশ্বজনীন
বহুর মধ্যে একটি – অন্যতম
বর্ণনা করা যায় না যা – অবর্ণনীয়
বুকে হেঁটে গমন করে যে – উরগ
বলা হয়েছে যা – উক্ত
বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে – উদ্বাস্তু
বপন করা হয়েছে যা – উপ্ত
বীণার ধ্বনি – ঝঙ্কার
বচনে কুশল – বাগ্মী
বেদ সম্বন্ধীয় – বৈদিক
বৃদ্ধি পাওয়া যার স্বভাব – বর্ধিষ্ণু
বেশি কথা বলে যে – বাচাল
বিধিকে অতিক্রম না করে – যথাবিধি

ভ

ভিতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন – অন্তর্ঘাত
ভ্রমরের শব্দ – গুঞ্জন
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে – দূরদর্শী
ভোজন করতে যে চায় – বুভুক্ষু
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা – ভস্মীভূত
ভ্রমণ করা স্বভাব যার – ভ্রমর

ম

মমতা নেই যার – নির্মম
মরণ পর্যন্ত – আমরণ
মৃতের মতো অবস্থা যার – মুমূর্ষু
ময়ূরের ডাক – কেকা
মর্মকে ভেদ করে যা – মর্মভেদী
মরে না যে – অমর
মনোগত ইচ্ছা – ঈপ্সিত
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক – মুমুক্ষু
মধু পান করে যে – মধুপ
মর্ম স্পর্শ করে যা – মর্মস্পর্শী
মন হরণ করে যা – মনোহর
মৃৎ অঙ্গ যার – মৃদঙ্গ

য

যা হতে পারে না – অসম্ভব
যা বিশ্বাস করা যায় না – অবিশ্বাস্য
যা মৃতের মতো – মৃতবৎ
যা সহজে লাভ করা যায় – সুলভ
যা যুক্তিসঙ্গত নয় – অযৌক্তিক
যা দেখা যায় না – অদৃশ্য
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে – বর্ধিষ্ণু
যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি – অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়
যা জলে ও স্থলে চরে – উভচর
যা লেহন করে খেতে হয় – লেহ্য
যা বর্ণনা করা যায় না – অবর্ণনীয়
যা সারাদিন ব্যবহার করা হয় – আটপৌরে
যা পূর্বে ছিল এখন নাই – ভূতপূর্ব
যা পরিমাপ করা যায় না – অপরিমেয়
যা বলার যোগ্য নয় – অকথ্য
যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ
যা উড়ছে – উড্ডীয়মান
যার বংশ পরিচয় ও স্বভাব কেউ জানে না– অজ্ঞাতকুলশীল
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙ্গুর
যা প্রবীণ বা প্রাচীন নয় – অর্বাচীন
যা চিবিয়ে খাওয়া যায় – চর্ব্য
যা জলে জন্মে – জলজ
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়
যা কষ্টে নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার
যার কোনো ভয় নেই – অকুতোভয়
যার শেষ নেই – অশেষ
যা উড়িতেছে – উড্ডীয়মান
যা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে – পরিবর্তনশীল
যা পূর্বে দেখা যায় নি – অদৃষ্টপূর্ব
যা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ
যা বপন করা হয়েছে – উপ্ত
যা মাটি ভেদ করে ওঠে – উদ্ভিদ
যা পানের যোগ্য – পেয়
যা উদিত হয়েছে – উদীয়মান
যা দমন করা যায় না – অদম্য
যাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় – হৃদয়বিদারক
যার কোথাও কোনো ভয় নাই – অকুতোভয়
যার স্ত্রী বিগত হয়েছে – বিপত্নীক
যার হৃদয় শোভন – সুহৃদ
যারা এক মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে – সহোদর
যার গন্ধ ভালো – সুগন্ধ
যার আকার কুৎসিত – কদাকার
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি
যার অন্য উপায় নেই – অনন্যোপায়
যিনি অধিক ব্যয় করেন না – মিতব্যয়ী
যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী
যিনি বিদ্যালাভ করেছেন – কৃতবিদ্য
যিনি কষ্ট সহ্য করতে পারেন – কষ্টসহিষ্ণু
যে স্ত্রীর বশীভূত – স্ত্রৈণ
যে নারীর সন্তান হয় না – বন্ধ্যা
যে রমণী প্রিয় কথা বলে – প্রিয়ংবদা
যে উপকারীর অপকার করে – কৃতঘ্ন
যে গমন করে না – নগ
যে হিত ইচ্ছা করে – হিতৈষী
যে জামাই শ্বশুর বাড়িতে থাকে – ঘরজামাই
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না – আগাছা
যে পুরুষ বিয়ে করেনি – অকৃতদার
যে ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী
যে রমণীর বিয়ে হয় নি – কুমারী/অনূঢ়া
যে জমিতে দুবার ফসল হয় – দোফসলী

র

রব শুনে এসেছে যে – রবাহুত
রেশমের দ্বারা তৈরি – রেশমি
রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ায় যে – হাতুড়ে

ল

লজ্জা বেশি যার – লাজুক
লজ্জা নেই যার – নির্লজ্জ, বেহায়া
লাভ করিবার ইচ্ছা – লিপ্সা
লোক গণনা – আদমশুমারি

লয় প্রাপ্ত হয়েছে যা – লীন

শ

শ্রবণের যোগ্য – শ্রব্য
শ্রদ্ধার যোগ্য – শ্রদ্ধেয়
শৈশবকাল থেকে – আশৈশব
শত পাপড়িবিশিষ্ট – শতদল
শত অব্দের সমাহার – শতাব্দী

ষ

ষোল বছর বয়স্কা – ষোড়শী
সহজে ভয় পায় যে – ভীরু/ভীতু
সমস্ত জীবন ব্যাপী – যাবজ্জীবন

স

সবচেয়ে বড় – জ্যেষ্ঠ্য
সবচেয়ে ছোট – কনিষ্ঠ
সকলের জন্য প্রযোজ্য – সার্বজনীন
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ – সর্বশ্রেষ্ঠ
সেবা করেন যিনি – সেবক/সেবিকা
সর্বজনের হিতকর – সর্বজনীন
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান – সস্ত্রীক।

হ

হস্তীর ডাক – বৃংহতি
হরিণের চামড়া – অজিন
হিসাব করে চলে না যে - বেহিসাবি
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত – আসমুদ্রহিমাচল
হনন করার ইচ্ছা – জিঘাংসা
হেমন্তে জাত – হৈমন্তিক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। এক কথায় প্রকাশ বলতে কী বোঝায়?
২। বাংলা ভাষায় এক কথায় প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
৩। এক কথায় প্রকাশ করুন

আদরের সাথে
যা উড়ছে
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
লাভ করার ইচ্ছা
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
যা পানের যোগ্য
যাহা দমন করা যায় না
যা কষ্টে জয় করা যায়
যা জলে জন্মে
বাঘের চামড়া
গণনার অযোগ্য

৪। সত্য হলে স এবং মিথ্যা হলে মি লিখুন

ক. যা অতি দীর্ঘ নয় – নাতিদীর্ঘ
খ. যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাক্যটি সংক্ষেপ করা যায় না
গ. যা যুক্তিসঙ্গত নয় – সংক্ষিপ্ত রূপ হবে অযৌক্তিক
ঘ. খাইবার ইচ্ছা – সংক্ষিপ্ত রূপ রান্নাঘর
ঙ. উড্ডীয়মান শব্দটির বিস্তারিত রূপ 'যা উড়ছে'।

পাঠ ৮.৩ : বাগধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাগধারা কী তা বলতে পারবেন।
- শব্দ বা শব্দসমষ্টির আক্ষরিক অর্থ ও বিশেষ অর্থের পার্থক্য করতে পারবেন।
- বাক্যে বাগধারার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবেন।
- বাগধারার অর্থ জেনে তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

আমাদের বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ বা শব্দসমষ্টি আছে যার আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ একরকম কিন্তু বাক্যে ব্যবহারের পর তার ভিন্ন বা বিশেষ একটি অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন : 'অর্ধচন্দ্র' দিয়ে আমরা এর আক্ষরিক অর্থ 'অর্ধেক চাঁদ'-কে বুঝি। কিন্তু যখন এটি বাক্যে এভাবে ব্যবহৃত হয় যে 'করিম চোরটিকে **অর্ধচন্দ্র** দিয়ে বিদায় করে দিল' তখন এটি একটি বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, যার অর্থ 'গলা ধাক্কা' দেয়া। এই 'অর্ধচন্দ্র' শব্দটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে আক্ষরিক অর্থ প্রকাশ না করে একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করার রীতি হলো বাক্যরীতি বা বাগধারা। তাহলে আমরা বলতে পারি–

কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টি বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে যখন তার একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগধারা বলে।

বাগধারা বাংলা ভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এটি ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এর দ্বারা খুব সহজে ও আকর্ষণীয় করে মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়। বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত শব্দাবলি সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে যায় বলে ভাষা প্রাণবন্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বাক্য-ব্যবহারে একটি চমক ও রসময়তার সৃষ্টি হয়। এতে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও শ্রুতিমধুরতা আনে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে এর একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাগধারার বিশেষ অর্থটি জানা ও তার যথার্থ ব্যবহার করতে জানলে মনের ভাব প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা সহজ হয়।

আসুন, আমরা এই পাঠে বাগধারার বিশেষ অর্থ ও বাক্যে তার ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হই–

অ

১. অকাল কুষ্মাণ্ড (অপদার্থ) – অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটা প্রতিবছর ফেল করে, তাকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না।
২. অক্কা পাওয়া (মারা যাওয়া) – লোকটা দুদিনের জ্বরেই অক্কা পেয়েছে।
৩. অগস্ত্য যাত্রা (চিরদিনের জন্য প্রস্থান) – গরিবের টাকা চুরি করে লোকটা গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।
৪. অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) – বুড়ি মায়ের একমাত্র ছেলেটিই অন্ধের যষ্টি।
৫. অরণ্যে রোদন (নিষ্ফল আবেদন) – ঐ কৃপণ বুড়োর কাছে টাকা চাওয়া আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা।
৬. অগাধ জলের মাছ (চতুর ব্যক্তি) – সে তো অগাধ জলের মাছ, তার মনের ফন্দি-ফিকির বুঝবে কী করে?
৭. অন্ধকারে ঢিল মারা (না জেনে কিছু করা) – বিষয়টা আগে ভালো করে জেনে নাও, অন্ধকারে ঢিল মারা ঠিক নয়।
৮. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (অল্পবিদ্যার গর্ব) – অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী বলেই ফটিক মিয়া সবার সমালোচনা করে।
৯. অর্ধচন্দ্র (গলাধাক্কা) – বেয়াদব লোকটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে মজলিশ থেকে বিদায় করে দাও।
১০. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শনীয়) – তুমি যে অমাবস্যার চাঁদ হয়ে গেলে, তোমার আর দেখাই পাওয়া যায় না।

১১. অগ্নিপরীক্ষা (কঠিন পরীক্ষা) – জাতীয় জীবনে এ এক অগ্নি পরীক্ষা– এতে আমাদের উত্তীর্ণ হতেই হবে।

১২. অহিনকুল সম্পর্ক (ভীষণ শত্রুতা) – ভাইয়ে ভাইয়ে এখন অহিনকুল সম্পর্ক– কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না।

১৩. অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরিটা হারিয়ে সে এখন অথৈ জলে পড়েছে।

১৪. অগ্নি শর্মা (অতিশয় ক্রুদ্ধ) – কথাটি শোনামাত্র তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

১৫. অকূল পাথার (সীমাহীন বিপদ) – ভিটে মাটি সর্বস্ব হারিয়ে এখন আমি অকূল পাথারে ভাসছি।

১৬. অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কঠিন কাজ করার সম্মতি জ্ঞাপন) – এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয় তবু বন্ধুদের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে।

১৭. আদায় কাঁচকলায় (পরম শত্রুতা) – শ্বাশুড়ি-বৌতে একেবারে আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক।

১৮. আসরে নামা (অবতীর্ণ হওয়া) – আশরাফ সাহেব এবার সুযোগ বুঝে রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছেন।

আ

১৯. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) – ঘরে বসে আকাশ কুসুম কল্পনা করলে কিছু হবে না– চাই পরিশ্রম আর নিষ্ঠা।

২০. আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) – বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে ৫০ টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে ফিরে এলাম।

২১. আঙুল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক হওয়া) – কাঁচামালের ব্যবসা করে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

২২. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি) – তার মিথ্যা অভিযোগ শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

২৩. আমড়া কাঠের ঢেঁকি (অপদার্থ) – সে একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকি– তাকে কোনো দায়িত্ব দিয়ে লাভ নেই।

২৪. আকাশ ভেঙে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরি হারিয়ে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

২৫. আষাঢ়ে গল্প (আজগুবি গল্প) – তুমি খালি হাতে বাঘ মেরেছ –এটা আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কিছুই নয়।

২৬. আমড়াগাছি করা (তোষামোদ করা) – বড় সাহেবকে আমড়াগাছি করে সে এবার বড় একটা ঠিকাদারি পেয়ে গেছে।

২৭. আকাশ থেকে পড়া (না জানার ভান করা) – তার জেল হয়েছে শুনে তুমি আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।

২৮. আকাশ পাতাল (দুস্তর ব্যবধান) – আকাশ-পাতাল ভেবে কোনো লাভ নেই, যে সুযোগটা আছে সেটাই গ্রহণ কর।

২৯. আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ছেলে) – ওতো আলালের ঘরের দুলাল, সে এত পরিশ্রমের কাজ পারবে কেন?

৩০. আঁতে ঘা দেওয়া (মনে কষ্ট দেওয়া) – তুমি এমন আঁতে ঘা দেওয়া রূঢ় কথা বলছ কেন?

৩১. আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বাত্মক চেষ্টা করা) – পরীক্ষা পাশের জন্য তুমি এবার আদাজল খেয়ে লেগেছ মনে হচ্ছে।

৩২. আঠার মাসে বছর (দীর্ঘসূত্রিতা) – তোমার তো আঠার মাসে বছর, এই সামান্য কাজ করতেই এতদিন লেগে গেল।

৩৩. আদিখ্যেতা (ন্যাকামি স্বভাব) – বাবা মায়ের শাসন না থাকায় মেয়ের আদিখ্যেতা বেড়ে গেছে।

৩৪. আপন পায়ে কুড়াল মারা (নিজের ক্ষতি করা) – লেখাপড়া না শিখে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছ।

ই

৩৫. ইঁচড়ে পাকা (অকালপক্ক) – ও ইঁচড়ে পাকা ছেলে– না হলে বাবা-মায়ের সঙ্গে এরকম তর্ক করে।

৩৬. ইতর বিশেষ (পার্থক্য) – ছেলে-মেয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ না করে দুজনেরই লেখাপড়ার সমান সুযোগ দাও।

৩৭. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) – আমি হলাম ইঁদুর কপালে - আমার ভাগ্যে কি আর লটারির টাকা জুটবে!

৩৮. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) – অনেক দিন পর ছেলে বাড়ি আসায় মা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়েছেন।

উ

৩৯. উত্তম মধ্যম (প্রহার) – পুলিশে দিয়ে কী হবে, চোরটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দাও।

৪০. উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অস্থানে মূল্যবান দ্রব্য প্রদান) –চোরকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।
৪১. উনপাঁজুরে (দুর্বল) – এই উনপাঁজুরে ছেলেটি দুপা হাঁটতেই হাঁপিয়ে উঠে।
৪২. উড়ো কথা (গুজব) – উড়ো কথায় কান দিও না।
৪৩. উড়নচণ্ডী (অমিতব্যয়ী) – রহিম সাহেবের উড়নচণ্ডী ছেলেটি অল্পদিনেই বাপের সম্পত্তি নষ্ট করে পথে দাঁড়িয়েছে।
৪৪. উড়োচিঠি (বেনামী চিঠি) – চেয়ারম্যান সাহেব উড়োচিঠি পেয়ে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন।
৪৫. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একজনের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপানো) – রহিমের খাতা দেখে লিখে করিম করল পাশ আর রহিমের গেল নম্বর কাটা –এ যেন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

এ

৪৬. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – গাঁয়ের মোড়ল একচোখা, তার কাছে সুবিচার পাবে কী করে?
৪৭. এলাহি কাণ্ড (বিরাট আয়োজন) – ছেলের জন্মদিনে এতবড় আয়োজন, এ যে এক এলাহি কাণ্ড।
৪৮. এক ঢিলে দুই পাখি (একসঙ্গে দুই কাজ করা) – রফিক এক ঢিলে দুই পাখি মারতে গিয়ে কোনো কাজই করতে পারলো না।
৪৯. এক মাঘে শীত যায় না (বিপদ একবারই আসে না)– যেই টাকাটা পেয়েছ, আর দেখা নাই তবে এক মাঘে শীত যায় না, ওকে আবার আসতেই হবে।
৫০. একাদশে বৃহস্পতি (সুসময়) – তোমার তো একাদশে বৃহস্পতি, যাতে হাত দাও তাতেই সোনা ফলে।
৫১. এক কথার মানুষ (প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকে) – আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব এক কথার মানুষ।
৫২. একহাত নেওয়া (সুযোগ বুঝে প্রতিশোধ নেয়া) – কায়দায় ফেলে নাকি আমাকে এক হাত দেখে নেবে।
৫৩. একক্ষুরে মাথা মুড়ান (একই প্রকৃতির) – তোমরা সবাই একই কথা বলছ, সকলেই কী এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছ।

ও

৫৪. ওষুধ ধরা (কাজ হওয়া) – মনে হয় ওষুধ করেছে– বুড়োটা এবার কথামতো কাজ করবে।

ক

৫৫. কথার কথা (গুরুত্বহীন কথা) – কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য একথা বলিনি, এ নেহায়েতই কথার কথা।
৫৬. কত ধানে কত চাল (হিসেব করে চলা) – তোমাকে তো উপার্জন করে সংসার চালাতে হয় না আমি উপার্জন করে সংসার চালাই– তাই জানি কত ধানে কত চাল।
৫৭. কড়ায় গণ্ডায় (পুরোপুরি) – আগে কড়ায় গণ্ডায় পাওনা বুঝিয়ে দাও তারপরে তোমার অন্য কথা।
৫৮. কেতাদুরস্ত (পরিপাটি) – করিম পোশাকে কেতাদুরস্ত হলে কী হবে লেখাপড়া তো কিছুই জানে না।
৫৯. কান পাতলা (বিশ্বাসপ্রবণ) – লোকটির ভয়ানক কান পাতলা, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।
৬০. কথায় চিড়া ভিজা (বিনা ব্যয়ে কাজ না হওয়া) – কথায় কী আর চিড়ে ভিজে, কিছু টাকা পয়সা ছাড়, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।
৬১. কেঁচে গন্ডুষ করা (পুনরায় আরম্ভ) – সবই ভুলে গেছি– এখন ছোট ভাইকে অঙ্ক করাতে গিয়ে কেঁচো গন্ডুষ করতে হচ্ছে।
৬২. কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) – ঠিকাদারি করা কাঁচা পয়সা তো তাই দুহাতে উড়াচ্ছে।
৬৩. কপাল ফেরা (অবস্থা ভালো হওয়া) – ওর কপাল ফিরেছে, এখন ভালো টাকা-পয়সা উপার্জন করে।
৬৪. কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া) – আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে ও বড় সাহেবের কান ভারি করেছে।
৬৫. কলুর বলদ (পরাধীন) – দিনরাত কলুর বলদের মতো সংসারের ঘানি টানছি, তবু কারো নেক নজরে পড়িনি।

৬৬. কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না) – চোরটির কই মাছের প্রাণ, না হলে এত মার খেয়েও মরল না।
৬৭. ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণ পরিচয়হীন) – ওতো একটা ক অক্ষর গোমাংস লেখাপড়া কিছুই জানে না।
৬৮. কাক ভুষণ্ডী (দীর্ঘায়ু) – বুড়িটা কাক ভুষণ্ডী– না হলে এত দিন ভিটে আগলে পড়ে আছে।
৬৯. কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া) – ঐ বিদ্যা নিয়ে এখানে কল্কে পাওয়া যাবে না– অন্য চাকরির চেষ্টা করো।
৭০. কাঁঠালের আমসত্ব (অসম্ভব বস্তু) – হিংসার পৃথিবীতে শান্তি এখন কাঁঠালের আমসত্বের মতোই অসম্ভব বস্তু।
৭১. কূপমণ্ডুক (সীমাবদ্ধ জ্ঞান) – মানুষের চাঁদ বিজয়ের কথাও শোননি– তুমি তো আচ্ছা কূপমণ্ডুক।
৭২. কাঠের পুতুল (নির্বাক ও অসাড়) – কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখছ না ছেলেটা পুকুরে ডুবে যাচ্ছে।
৭৩. কংস মামা (শত্রুভাবাপন্ন নিকট-আত্মীয়) – কংস মামার লোকেরা তোমার চারপাশে অশুভ ছায়া ফেলেছে, সাবধানে থেকো।
৭৪. কালেভদ্রে (কদাচিৎ) – শহরবাসীরা কালেভদ্রে গ্রামের বাড়িতে পা রাখে।
৭৫. কচুবনের কালাচাঁদ (অপদার্থ) – তোমার মতো কচুবনের কালাচাঁদের হাতে মেয়ে দেবে কে?
৭৬. কেষ্ট বিষ্টু (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) –দলীয় সম্মেলনে কেষ্ট বিষ্টুরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন।

খ

৭৭. খয়ের খাঁ (চাটুকার) – তুমি তো বড় সাহেবের খয়ের খাঁ, তুমি আমাদের আন্দোলনে আসবে না।
৭৮. খাল কেটে কুমির আনা (বিপদ ডেকে আনা) – ভাইয়ে-ভাইয়ের বিবাদে প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমির এনেছ, এখন ঠ্যালা সামলাও।

গ

৭৯. গড্ডলিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) – আমি তোমাদের মতো গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে চাই না, নিজের মতো করে নিজে বাঁচতে চাই।
৮০. গলগ্রহ (পরের বোঝা স্বরূপ) – আমি কারো গলগ্রহ নই, গায়ে খেটে নিজের অন্ন জোগাড় করি।
৮১. গোবর গণেশ (মূর্খ) – ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ, বুদ্ধিশুদ্ধি বলতে কিছুই নেই।
৮২. গোঁফ খেজুরে (অলস) – সে যা গোঁফ খেজুরে লোক, ঢাকনা খুলে হাঁড়ির ভাতটুকু নিয়েও খেতে পারবে না।
৮৩. গোড়ায় গলদ (আরম্ভে ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, গোড়াতেই যে গলদ করে বসে আছ।
৮৪. গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) – ভেবেছিলাম এবার ভালো ফসল পাব কিন্তু সে গুড়ে বালি, বান সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।
৮৫. গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা) – পুলিশের ভয়ে ও গা ঢাকা দিয়েছে।
৮৬. গায়ের ঝাল ঝাড়া (শোধ দেওয়া) – অনেকদিন পর বদমায়েশটার দেখা পেয়ে আচ্ছা করে গায়ের ঝাল ঝেড়েছি।
৮৭. গোকুলের ষাঁড় (বাধাবন্ধনহীন) – বাপের হোটেলে খাওদাও আর গোকুলের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়াও, বলি লেখাপড়া কি একেবারে ছেড়েই দিয়েছ!
৮৮. গোঁয়ার গোবিন্দ (কাণ্ডজ্ঞানহীন) – ছেলেটা একটা গোঁয়ার গোবিন্দ– নইলে ছোট ভাইটিকে এরকম করে মারে!
৮৯. গৌরচন্দ্রিকা (ভণিতা) – ওসব গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটি কী তা বলে ফেল।
৯০. গা তোলা (উঠা) – এবার গা তুলুন ট্রেন আসবার সময় হয়েছে।
৯১. গো বৈদ্য (হাতুড়ে) – গ্রামে গো বৈদ্যের হাতে পড়ে কত সাধারণ রোগী যে মারা যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে।
৯২. গভীর জলের মাছ (চালাক) – রহিম গভীর জলের মাছ– তার মতলব বোঝা কি আমার সাধ্য।
৯৩. গোবরে পদ্ম ফুল (অস্থানে ভালো জিনিষ) – দিন মজুরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়ায় এত ভালো– এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল।

৯৪. গরিবের ঘোড়ারোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করতে যাওয়া) – সামান্য আয়ের কেরানির গাড়ি কেনার শখ, গরিবের ঘোড়ারোগ ছাড়া আর কী।

৯৫. গদাই লস্করি চাল (অলস ভঙ্গি) – এমন গদাইলস্করি চালে হাঁটলে ট্রেন ধরতে পারবে না।

৯৬. গো-বেচারা (নিরীহ) – আজকাল সমাজে গো-বেচারা লোকের মর্যাদা নেই।

৯৭. গোঁজামিল (কোনমতে মেলানো) – কোন কিছুতে গোঁজামিল দিলে তার পরিণাম ভাল হয় না।

ঘ

৯৮. ঘোড়া রোগ (সাধ্যের অতিরিক্ত করা) – দুবেলা ভাত জোটে না, এদিকে প্রতি রাতে সিনেমা দেখার শখ, এ ঘোড়া রোগ ছাড়া আর কী!

৯৯. ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর (অপদার্থের বড় নাম) – ভাত জোটে না, নামে জমিদার! এ যে দেখছি ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর।

১০০. ঘাটের মড়া (অতি বৃদ্ধ) – গরিব বলে কি ঘাটের মড়ার কাছে মেয়ে সমর্পণ করব?

১০১. ঘোড়ার ডিম (বৃথা, অর্থহীন) – সারা বছর লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার খাতায় ঘোড়ার ডিম তো পাবেই।

চ

১০২. চিনির বলদ (ভারবাহী কিন্তু লাভের অংশীদার নয়) – সংসারে দিনরাত খেটে মরছি কিন্তু চিনির বলদের মতো লাভের লাভ কিছুই পাই না।

১০৩. চোখ টাটান (হিংসা করা) – পরের উন্নতি দেখলে তোমার চোখ টাটায় কেন?

১০৪. চোখের চামড়া (লজ্জা) – তোমার চোখের চামড়া থাকলে এ মিথ্যা কথাটা আর বলতে না।

১০৫. চাঁদের হাট (সুখের মিলন) – পুত্র কন্যাদের নিয়ে তোমার সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।

১০৬. চোখের বালি (অপ্রিয়) – ও চোখে মুখে মিথ্যা কথা বলে ওর চোখের পর্দা বলে কিছু নেই।

১০৭. চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকানো) – মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ পয়সা কামাচ্ছ; কিন্তু এটা চিরদিন চলবে না।

১০৮. চক্ষুদান করা (চুরি করা) সামনের টেবিল থেকে কলমটা কে যে চক্ষুদান করলো ঠিক বুঝতে পারিনি।

১০৯. চোখে সরষের ফুল দেখা (হতভম্ব) – পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়েনি– কাজেই চোখের সরষের ফুল দেখছি।

১১০. চোখের মনি (প্রিয়) – মায়ের চোখের মনিকে কখনো আড়াল হতে দেন না।

১১১. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা) – তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, সামনে দিয়ে একটা অপরিচিত লোক বাসায় ঢুকল আর তুমি দেখলে না।

১১২. চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা) – এই কাজ করেই চুল পাকিয়েছি– তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হবে না।

১১৩. চড় মেরে গড় (সর্বনাশ করে সম্মান দেখান) – মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে আমার সর্বস্ব নষ্ট করলে এখন এসেছো সান্ত্বনার কথা বলতে, একেই বলে চড় মেরে গড়।

১১৪. চক্ষুশূল (অসহ্য) – সপত্নীপুত্র বিমাতার চক্ষুশূল হবে, এতো জানা কথা।

১১৫. চশমখোর (নির্লজ্জ) – তোমার মতো চশমখোর লোক আমি জীবনে দেখিনি।

১১৬. চুনোপুটি (সামান্য ব্যক্তি) – রাঘব বোয়ালরা ভয়ে কম্পমান, আর তুমি বাপু চুনোপুটি হয়ে লাফাচ্ছ।

১১৭. চোখের চামড়া (চক্ষুলজ্জা থাকা) – চোখের চামড়া থাকলে বাপের কাছে এমন নির্লজ্জ আবদার সে করতে পারত না।

১১৮. চোরাবালি (প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ) – লোভের চোরাবালিতে পড়ে তার ইহকাল ও পরকাল দুইই গেল।

১১৯. চাঁদের হাট (আত্মীয় স্বজন নিয়ে সুখের মিলন) – পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র নিয়ে অভীর ঘরে চাঁদের হাট বসেছে।

ছ

১২০. ছকড়া নকড়া (সস্তা দর) – বাজারে ইলিশ মাছের আমদানি বেশি, তাই ছকড়া নকড়া দরে বিক্রি হচ্ছে।

১২১. ছেলের হাতে মোয়া (সহজলভ্য) – একি ছেলের হাতে মোয়া– চাইলেই পেয়ে যাবে।

১২২. ছা পোষা (পোষ্য ভারাক্রান্ত) – ছা পোষা মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, আমার কি আর বিদেশ ভ্রমণে শখ করলে চলে!

১২৩. ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) – ছাই চাপা আগুন কোনো দিন ঢাকা থাকে না, একদিন প্রকাশ পাবেই।

১২৪. ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা) – সমিতির টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, তা হতে দেব না।

১২৫. ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো (যে ব্যক্তিকে শুধু অপ্রিয় কাজ করানোর জন্যেই স্মরণ করা হয়) – সুসময়ে আমার খোঁজ নেবে কেন, আমি তো আছি দুঃসময়ের সাথি, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর দরকার হবেই।

জ

১২৬. জিলিপির প্যাচ (কুবুদ্ধি)– তোমার পেটে এত জিলিপির প্যাচ – ক্ষতি আমার করবেই।

১২৭. জগদ্দল পাথর (গুরুভার) – নাবালক ভাইদের সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব জগদ্দল পাথরের মতো আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

১২৮. জগাখিচুড়ি (সবকিছু এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হয়ে থাকা) – গুছিয়ে বলতে না পারার জন্য ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জগাখিচুড়ি হয়ে গেল।

ঝ

১২৯. ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মেশা (সুযোগ পাওয়া মাত্র নিজের দলে ফেরা) – গরিবদের জন্য অনেক করলাম কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে গেল।

১৩০. ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগ বুঝে কার্যসিদ্ধি করা) – ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে অতি কঠিন কাজেও সফলতা লাভ করা যায়।

ট

১৩১. টনক নড়া (সজাগ হওয়া) – পরীক্ষা সামনে –এতদিনে তোমার টনক নড়েছে।

১৩২. টাকার গরম (ধনসম্পদের অহংকার) – টাকার গরম দেখিয়ে সমাজে যা খুশি করবে তা হতে দেব না।

১৩৩. টাকার কুমির (ধনী) – লোকটা টাকার কুমির কিন্তু গরীব দুখীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

১৩৪. টই টুম্বর (তরল বস্তুতে পরিপূর্ণ) – বর্ষাকালে বাংলাদেশের খাল-বিল, মাঠ-প্রান্তর, নদী-নালা সব পানিতে টই-টুম্বর হয়ে যায়।

১৩৫. টুপ ভুজঙ্গ (নেশায় চুর) – আরে, কাকে কী বলছ, দেখছ না নেশা করে একেবারে টুপ ভজঙ্গ হয়ে এসেছে।

১৩৬. টক্কর দেওয়া (পাল্লা দেওয়া) – যার তার সাথে টক্কর দিতে যেও না, শেষে বিপদে পড়বে।

ঠ

১৩৭. ঠোঁট কাটা (বেহায়া) – ও ছেলের ঠোঁট কাটা, মুরুব্বির সামনেও বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে।

ড

১৩৯. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) – তুমি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ নাকি, আর যে দেখাই পাওয়া যায় না।

১৪০. ডান হাতের ব্যাপার (আহার) – দুপুরে বেরোবার আগে ডানহাতের ব্যাপারটা সেরেই যাই, কখন ফিরব তার তো ঠিক নেই।

১৪১. ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা) – যুদ্ধের ডামাডোলে চোরাকারবারিরা দুহাতে পয়সা লুটছে।

১৪২. ডাকা বুকো (দুঃসাহসী) – তোমার বাবা ছিলেন রীতিমতো ডাকা বুকো মানুষ, আর তুমি হলে কী না ভীরু ও দুর্বল।

১৪৩. টিমে তেতালা (অলস ভঙ্গি) – যেভাবে টিমে তেতালা গতিতে কাজ করছে, তাতে শেষ হবে বলে তো মনে হয় না।

ঢ

১৪৪. ঢাক ঢাক গুড় গুড় (কপটতা) – অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছো কেন! যা বলবে বলে ফেল।

১৪৫. ঢাকের কাঠি (মোসাহেব) – কেরানি তো বড় সাহেবের ঢাকের কাঠি, যা বলবে তাই শুনবে।

১৪৬. ঢাকের বাঁয়া (অকেজো) – ছেলের বিয়ের যোগাড় করেছে মা, বাবাটি তো ঢাকের বাঁয়া।

ত

১৪৭. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – ওদের মধ্যে এত দহরম মহরম কিন্তু সামান্য স্বার্থের টানাপোড়নেই বন্ধুত্ব তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

১৪৮. তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) – লোকগুলো সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে– কিন্তু যিনি বস্ত্রদান করবেন তার দেখাই নেই।

১৪৯. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা (হঠাৎ অতিশয় রাগান্বিত হওয়া) – পাওনা টাকা চাইতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

১৫০. তালপাতার সেপাই (রোগা) – ছেলেটি তো তালপাতার সেপাই – কী করে সেনাবাহিনীতে সুযোগ পাবে।

১৫১. তুলসী বনের বাঘ (ভণ্ড) – দেখতে সাধুর মতো হলে কী হবে, লোকটা আসলে তুলসী বনের বাঘ।

১৫২. তামার বিষ (অর্থের কুপ্রভাব) – সে যে লম্বা কথা বলে তার মূলে আছে তামার বিষ।

১৫৩. তাল সামলানো (আকস্মিক বিপদ ঠেকানো): বাবার মৃত্যুতে সজল তাল হারিয়ে ফেললেও এখন তাল সামলিয়ে উঠতে পেরেছে।

১৫৪. তালকানা (হুঁশ নেই যার) – তোমার মতো তালকানা ছেলের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে।

১৫৫. তুষের আগুন (দীর্ঘস্থায়ী ও দুঃসহ যন্ত্রণা) – পুত্র শোক পিতার বুকে তুষের আগুনের মতো জ্বলছে।

১৫৬. তেলা মাথায় তেল দেয়া (ধনীর হাতে আরও ধন তুলে দেওয়া) – তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই ওস্তাদ।

দ

১৫৭. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – দুজনে খুব দহরম মহরম– এমন কি সব সময় এক সঙ্গেই থাকে।

১৫৮. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – এখন টাকা আছে তাই দুধের মাছির অভাব নেই।

১৫৯. দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (তুমুল কাণ্ড) – বিয়ে বাড়িতে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ঘটে গেল– ছেলের বাবা বিয়ে না দিয়েই বরকে নিয়ে চলে গেলেন।

১৬০. দাঁও মারা (মোটা অঙ্ক লাভ করা) – হঠাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়ায়, চালের দোকানদাররা ভালো দাঁও মেরেছে।

১৬১. দুধে ভাতে (ভালো অবস্থায় থাকা) – সব মা-বাবাই চায় তার সন্তানেরা দুধে ভাতে থাকুক।

১৬২. দায়সারা (অনিচ্ছুক ভাবে কাজ করা) – দায়সারাভাবে কাজ করলে কি আর কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়।

১৬৩. দু'মুখো সাপ (যে উভয় পক্ষের মিত্র সেজে থাকে, আসলে উভয়েরই শত্রু)– দু'মুখো সাপকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, সে যে কখন সর্বনাশ করবে তার ঠিক নেই।

ধ

১৬৪. ধামাধরা (চাটুকারিতা) – জলিল তো বড় সাহেবের ধামাধরা– ও কি আর আমাদের সঙ্গে থাকবে।

১৬৫. ধরাকে সরা জ্ঞান করা (তুচ্ছ জ্ঞান করা) – হঠাৎ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না।

১৬৬. ধনুর্ভংগ পণ (অটল প্রতিজ্ঞা) – কোনো অবস্থাতেই অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করব না– এরূপ ধনুর্ভংগ পণই জাতিকে দৃঢ় ও উন্নত করতে পারে।

১৬৭. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে বা ধর্মের ঢাক আপনি বাজে (অন্যায় আপনিই প্রকাশিত হবে) – কোনো সত্যকে জোর করে চাপা দেওয়া সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও দীর্ঘদিন তা চাপা থাকে না; কারণ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

১৬৮. ধর্মের ষাঁড় (নিষ্কর্মা, নিশ্চিন্ত বেকার) – তুমি তো আস্ত একটা ধর্মের ষাঁড়।

১৬৯. ধান ভানতে শিবের গীত (এক কাজ করতে বা বলতে গিয়ে অন্য কাজ করা বা বলা) – যে কাজ করতে এসেছ তা না করে তুমি তো দেখছি, ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করে দিয়েছ।

১৭০. ধকল সওয়া (সহ্য করা) – তুমি যা-ই বল না কেন, এ বয়সে এত বড় ধকল সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ন

১৭১. নয় ছয় (অপচয়) – দুদিনেই ছেলেটা পৈতৃক সম্পত্তি নয় ছয় করে উড়িয়ে দিল।

১৭২. ননীর পুতুল (শ্রম বিমুখ অপদার্থ) – ছেলেগুলোকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে ননীর পুতুল করে তুলেছ, ওরা জীবন পথে চলবে কী করে!

১৭৩. নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) – পড়েছি নেই আঁকড়াদের হাতে চাঁদা না দিয়ে কি রক্ষে আছে।

১৭৪. নবমীর পাঠা (যার সামনে আসন্ন বিপদ) – কর্তাবাবুর সামনে অপরাধী চাকরটি নবমীর পাঠার মতো কাঁপতে লাগল।

১৭৫. নবাব খাজা খাঁ (অতিশয় বিলাসী) – দুটো টাকা হাতে না আসতেই একেবারে নবাব খাজা খাঁ হয়ে বসেছ। এভাবে চললে রাজভাণ্ডারও শেষ হতে দেরি হবে না।

১৭৬. নাছোড়বান্দা (যার চাহিদা না মিটিয়ে উপায় নেই) – তুমি তো দেখছি বাপু একেবারে নাছোড়বান্দা, শেষ পর্যন্ত চাঁদা আদায় করে ছাড়লে।

১৭৭. নাড়ি নক্ষত্র জানা (আনুপূর্বিক সমস্ত কিছু জানা) – আমি চৌধুরী পরিবারের নাড়ি নক্ষত্র জানি, আর তুমি এসেছ এ ব্যাপারে আমাকে ওয়াকিবহাল করতে।

১৭৮. নাড়ির খবর (সকল খবর) নাড়ির খবর জেনেই তবে আমি একাজ করব।

১৭৯. নিজের কোলে ঝোল টানা (নিজের প্রাপ্য অনুচিতভাবে বেশি করে দেখানো)– চেয়ারম্যান সাহেব সমাজের উন্নতি করবেন কী, তিনি সব ব্যাপারে নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত।

১৮০. নজর লাগা (দৃষ্টিতে নষ্ট হওয়া) – নজর লেগে ছেলেটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

১৮১. নিমরজি (অল্পরাজি) – দলে আসবে বলে লোকটা নিমরাজি হয়েছে।

প

১৮২. পটল তোলা (মারা যাওয়া) – জনতার হাতে বেদম মার খেয়ে চোরটা গত রাতে পটল তুলেছে।

১৮৩. পরের ধনে পোদ্দারি (পরের টাকায় বাহাদুরি) – পরের ধনে পোদ্দারি সবাই করতে পারে– নিজের টাকা খরচ করে করলে বুঝতাম বাহাদুরি।

১৮৪. পুকুর চুরি (ব্যাপক চুরি) – একটু আধটু হলে না হয় বুঝতাম, এ যে পুকুর চুরি– গোটা প্রতিষ্ঠানটাই বেমালুম গায়েব।

১৮৫. পোয়াবারো (সুসময়) – মিলের ম্যানেজার অফিসে নেই, ছোটকর্তার তো এখন পোয়াবারো।

১৮৬. পায়াভারী (অহংকার) – এম.এ-তে ভালো রেজাল্ট করে তোমার পায়াভারী হয়েছে বুঝি।

১৮৭. পাথরে পাঁচ কিল (নিরাপদ ও উন্নত অবস্থা) – নিজে মোটা মাইনের চাকরি কর, ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় আসছে, তোমার তো এখন পাথরে পাঁচ কিল।

১৮৮. পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণ প্রাণ) – ওতো পুঁটি মাছের প্রাণ– ওকে ধমক ধামক দিয়ে কী লাভ।

১৮৯. পারের কড়ি (পরকালের জন্য সঞ্চয়) – সংসারের মোহে পরকালের কথা ভুলে গেলে চলবে না, পারের কড়ি সংগ্রহ করা দরকার।

১৯০. পিঠ টান দেওয়া (ভয়ে পালিয়ে যাওয়া) – জনগণের প্রতিরোধের মুখে পিঠ টান দিতে বাধ্য হলো নেতারা।

১৯১. পগার পার (পালিয়ে যাওয়া) – পুলিশ আসবার আগেই চোর পগার পার হলো।

ফ

১৯২. ফতে নবাব (নবাবি চালের নির্ধন ব্যক্তি) – ওর পোশাক-আশাক দেখে ভুলো না ও একটা ফতে নবাব।

১৯৩. ফুলবাবু (সৌখিন সজা-সজ্জাধারী) – ফুলবাবু সেজে ঘুরে বেড়ালে পেটের ভাত যোগাড় হবে কোত্থেকে।

ব

১৯৪. বউ কাঁটকী (বৌকে যে জ্বালাতন করে) – বৌটিকে সারাদিন খাটায়– এমন বৌ কাঁটকী শাশুড়ী তো দেখিনি।

১৯৫. বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) – বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর বালির বাঁধ সমান– এই খুশি এই নারাজ।

১৯৬. বক ধার্মিক (ভণ্ড) – লোকটি দেখতে সাধুর মতো হলে কী হবে আসলে একটা বকধার্মিক– লোকের সর্বনাশ করতে জুড়ি নেই।

১৯৭. বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ) – অফিসে বাঁ হাতের ব্যাপার খুব চলছে– স্বাভাবিকভাবে কোনো কাজই হতে চায় না।

১৯৮. বাঘের দুধ (দুষ্প্রাপ্য বস্তু) – টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

১৯৯. বুকের পাটা (সাহস) – বয়স কম হলে কী হবে, ছেলেটার বুকের পাটা আছে, না হলে তুফানের মধ্যে এত বড় নদী সাঁতরে পার হতে পারে।

২০০. বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা) – ও যে বুদ্ধির ঢেঁকি, ওকে দিয়ে এ শক্ত কাজ হবে না।

২০১. ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) – ব্যাঙের আধুলি পেয়েই এত লাফাচ্ছ– বেশি টাকা পেলে কী করবে ভেবে পাচ্ছি না।

২০২. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব) – ডাকাতকে দেখাচ্ছ পুলিশের ভয়? ব্যাঙের কোনো দিন সর্দি হয় নাকি!

২০৩. বিসমিল্লায় গলদ (গোড়ায় ভুল) – অঙ্ক মিলবে কী করে, বিসমিল্লায় গলদ করে বসে আছ।

২০৪. বড় মুখ (গর্ব) – বড় মুখ করে এসেছিলাম, ফিরিয়ে দিও না ভাই!

২০৫. বাগে পাওয়া (আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া) – এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি – সহজে ছাড়ছিনে।

২০৬. বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদ)– পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই।

২০৭. বসন্তের কোকিল (সুসময়ের বন্ধু) – টাকা পয়সা হাতে দেখলেই বসন্তের কোকিলরা ভিড় জমায়।

২০৮. বাদুড় ঝোলা (বাদুড়ের ন্যায় ঝুলে থাকা) – লোকজনের ভিড়ে বাসে উঠতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পা-দানিতে দাঁড়িয়ে বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতে হলো।

২০৯. বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড) – বৃদ্ধ বয়সে সাধু সেজে যারা সারা জীবনের পাপকে ঢাকতে চাচ্ছে, বিড়াল তপস্বী তারাই।

২১০. বিষবৃক্ষ (অন্যায়ের কেন্দ্রভূমি) – নিজের হাতে বিষবৃক্ষ রোপণ করলে তার ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

২১১. বিদুরের খুদ (শ্রদ্ধার সামান্য দান) – আমার এ বিদুরের খুদ দিয়ে যদি সমাজের কোনো মঙ্গল হয় তাহলে নিজকে ধন্য মনে করব।

ভ

২১২. ভরাডুবি (সব হারান) – পাটের দাম পড়ে গিয়ে ব্যবসায়ের ভরাডুবি হয়েছে – এখন একরকম সর্বসান্ত।

২১৩. ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান) – তোমার মতো অপদার্থকে অর্থসাহায্য করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

২১৪. ভূষণ্ডির কাক (দীর্ঘায়ু) – ভূষণ্ডির কাক এই বুড়িটা মরেও না, তার রোগ শোকও ভালো হয় না।

২১৫. ভুঁইফোড় (অর্বাচীন) – রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্বাচন না করে ভুঁইফোড় লেখকের নাটক নির্বাচন করেছ কেন?

২১৬. ভিজা বিড়াল (কপট) – ওতো একটা ভিজা বিড়াল, চেহারা শান্ত হলেও পেটে যত শয়তানি বুদ্ধি।

২১৭. ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা) – তুমি আমার পেছনে লেগেছ– তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব।

২১৮. ভানুমতির খেল (ভোজবাজি, ভেল্কি) – খুব তো ভানুমতির খেল দেখালে, তুমি যে এমন ফাঁকিবাজ তা আগে জানলে তোমাকে এ কাজের ভার দিতাম না।

২১৯. ভাগের মা গঙ্গা পায় না (অনেকের ওপর একই দায়িত্ব থাকলে সেটা আদৌ পালিত হয় না) – পাঁচ গ্রাম মিলে নাটকের মহড়া দিলে, এখন মঞ্চস্থ করতে টাকা নেই। সাধে কী কথায় বলে– ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

২২০. ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ (প্রচুর ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও কাজের কোনো সার্থকতা নেই) – পরের টাকা হাতে পেলে অযথা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করতে বাধে না।

২২১. ভূতের বেগার (অহেতুক শ্রম) – সারাটা জীবন অফিসে ভূতের বেগার খেটে গেলাম, লাভ পেলাম না কিছুই।

২২২. ভেরেণ্ডা ভাজা (অকাজের কাজ) – হাতে কাজকর্ম নেই তা বলে বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি।

ম

২২৩. মিছরির ছুরি (মুখে মধু অন্তরে বিষ) – ওর কথায় যত মধুই থাক ও মিছরির ছুরি।

২২৪. মগের মুল্লুক (অরাজক দেশ) – একি মগের মুল্লুক পেয়েছ যা খুশি তাই করবে।

২২৫. মাছের মা (নির্মম) – তুমি তো মাছের মা, নিজের ছেলের জন্যও তোমার মায়া মমতা নাই।

২২৬. মান্ধাতার আমল (পুরনো আমল) – মান্ধাতার আমলের নয়, আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর চাষাবাদ করে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে হবে।

২২৭. মাকাল ফল (অন্তঃসারশূন্য) – দেখতে সুন্দর হলে কী হবে, আসলে ও মাকাল ফল, গুণ বলতে কিছু নেই।

২২৮. মাছের মায়ের পুত্রশোক (লোক দেখানো কৃত্রিম সহানুভূতি) – নিজের ছেলে মরলে কাঁদল না, সতীনের ছেলের জন্য কান্নাকাটির শেষ নেই – একেই বলে মাাছের মায়ের পুত্র শোক।

২২৯. মাটির মানুষ (সরল ব্যক্তি) – রামবাবু সত্যি মাটির মানুষ, সকলের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করেন।

২৩০. মাথার মণি (পরম সমাদরে রাখা ব্যক্তি) – আমাদের অধ্যক্ষ সকালের মাথার মণি।

২৩১. মাথা খাওয়া (প্রশ্রয় দিয়ে নষ্ট করা) – ছেলেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে তারা মাথা খেয়েছে।

২৩২. মেও ধরা (বিপদ ঠেকানো) – সবাই যার যার ভাবে চলে গেল, মেও ধরার কেউ নেই।

২৩৩. মণিকাঞ্চন যোগ (অপূর্ব মিল) – যেমন সুশিক্ষিত ছেলে তেমনি সুশিক্ষিতা মেয়ে, একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ।

২৩৪. মামাবাড়ির আবদার (অতিরিক্ত দাবি যা যুক্তিসংগত নয়) – এটা মামাবাড়ির আবদার পেয়েছ যা খুশি তাই চাবে?

য

২৩৫. যত গর্জে তত বর্ষে না (আড়ম্বরের অনুপাতে ফল সামান্য) – তখনই বুঝতে পেরেছিলাম যত গর্জে তত বর্ষে না; সেলিম সাহেব যতটা রেগে গিয়েছিলেন তার তুলনায় প্রতিফল সামান্য।

২৩৬. যমের অরুচি (এমন ব্যক্তি যাকে যমও ছোঁয় না) – বুড়োটা পায়খানা প্রসাব করে একাকার করে রাখে, মরণ তার হয় না, সে একেবারে যমের অরুচি।

র

২৩৭. রাঘব বোয়াল (অতি ক্ষমতাধর) – ওতো একটা রাঘব বোয়াল, সুযোগ পেলে সহায় সম্পত্তি সবই গিলে খাবে।

২৩৮. রুই-কাতলা (গণমান্য লোক) – এখানে অনেক রুই-কাতলা এসেছিল, আমার মতো সামান্য লোকের জায়গা হবে কী করে?

২৩৯. রগচটা (বদরাগি) – রগচটা লোকের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা কঠিন কাজ।

২৪০. রক্তের টান (স্ববংশ প্রীতি) – প্রত্যেক মানুষেরই আপন জনের প্রতি রক্তের টান আছে।

২৪১. রাখে আল্লাহ মারে কে (বিপদ থেকে যে রক্ষা পাবার মতো সে রক্ষা পাবেই) – লঞ্চ ডুবে অনেকে মারা গেল, আমি ভাসমান কাঠ ধরে কোনো রকম বেঁচে গেলাম। রাখে আল্লাহ মারে কে।

২৪২. রাবণের চিতা (অনির্বাণ শোক) – উপর্যুপরি তিনটি ছেলের মৃত্যুশোক বৃদ্ধের বুকে রাবণের চিতার মতো জ্বলছে।

ল

২৪৩. লেফাফা দুরস্ত (বাইরের পরিপাটি ভাব) – লোকটা পোশাকে আশাকে লেফাফাদুরস্ত কিন্তু লেখাপড়া একটুও জানে না।

২৪৪. লম্বা দেওয়া (পালিয়ে আত্মরক্ষা) – পুলিশ দেখা মাত্র চোরটা লম্বা ছিল।

শ

২৪৫. শাঁখের করাত (উভয় সংকট) – আমার হয়েছে শাঁখের করাত –এখন হ্যাঁ বললেও বিপদ না বললেও বিপদ।

২৪৬. শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) – সামনের মাসে চাকুরি থেকে অবসর নেব, এখন আমার শিরে সংক্রান্তি; তোমার সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার সময় নেই আমার।

২৪৭. শকুনি মামা (অসৎ বুদ্ধিদাতা আত্মীয়) – অসৎ কাজে প্রেরণা দিতে শকুনি মামারা চিরকালই লেগে আছে।

২৪৮. শাপে বর (আপাতদৃষ্টিতে মন্দ হলেও পরিণামে যা ভালো) – চৌধুরী বাড়ির শিক্ষিতা মেয়ের সাথে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার শফিক মনে কষ্ট পেলেও এ তার পক্ষে শাপে বর হয়েছে, কারণ মেয়েটির নাকি ক্যান্সার।

২৪৯. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (নিন্দনীয় কাজ গোপন করার চেষ্টা) – ছেলের কুকর্ম ঢাকতে গিয়ে মিথ্যা বললেন হাজি সাহেব, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়।

২৫০. শিবরাত্রির সলতে (একমাত্র ভরসা) – বিধবার একমাত্র ছেলেটি তার শিবরাত্রির সলতে।

২৫১. শিয়ালের যুক্তি (নিরর্থক পরামর্শ) – ধূর্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা ঠিক নয়, কারণ তারা শিয়ালের যুক্তি দিয়ে হয়রানি করতে ওস্তাদ।

ষ

২৫২. ষোলকলা (সম্পূর্ণ) – জীবনে যা কাম্য সবই পেয়েছেন তিনি– বলা চলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।

স

২৫৩. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) – যেমন বর তেমন কনে, একেই বলে সোনায় সোহাগা।

২৫৪. সাপে নেউলে (শত্রুভাব) – দু ভাইয়ে এখন সাপে-নেউলে ভাব, কেউ কারো মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

২৫৫. সরস্বতীর বরপুত্র (বিদ্বান) – সরস্বতীর বরপুত্ররা একটা দেশ ও জাতির গৌরব।

২৫৬. সবুরে মেওয়া ফলে (ধৈর্য্যলব্ধ সুফল) – এতে অধৈর্য হলে চলবে কেন, তুমি তো জানো সবুরে মেওয়া ফলে।

২৫৭. সাত পাঁচ (নানা রকম) – সাত পাঁচ ভাববার সময় নেই, শত্রু দোর গোড়ায়, এখনই বেরিয়ে পড়।

২৫৮. সোনার পাথর বাটি (অসম্ভব ব্যাপার) – যে সংবাদ তুমি পরিবেশন করলে তা সোনার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব ও অলীক।

২৫৯. সুখের পায়রা (সৌভাগ্যের সহচর এবং দুর্দিনে যে থাকে না) – সুদিনে সুখের পায়রা চারদিক ঘিরে থাকে।

হ

২৬০. হাটে হাঁড়ি ভাঙা (গোপন কথা ফাঁস করা) – আমাকে জব্দ করার চেষ্টা করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দেব।

২৬১. হাত টান (চুরির অভ্যাস) – টাকা পয়সা সাবধানে রাখ, চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে।

২৬২. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – অফিসের ফাইলপত্র সব হ-য-ব-র-ল হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

২৬৩. হাতে খড়ি (আরম্ভ) – ব্যবসায়ে ছেলেটার হাতে খড়ি দিলাম, কিছু করে খেতে হবে তো।

২৬৪. হরিষে বিষাদ (আনন্দে বিষাদ) – যেদিন চাকরি পাবার খবর এল তার পরের দিনই বাবা মারা গেলেন – এ যে হরিষে বিষাদ।

২৬৫. হস্তীমূর্খ (বোকা) – তুমি একটা হস্তীমুর্খ –দেহ বিরাট হলে কী হবে মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই তোমার।

২৬৬. হাড়ে বাতাস লাগা (শান্তি পাওয়া) – চোরটা মরেছে; এবার গাঁয়ের লোকের হাড়ে বাতাস লাগবে।

২৬৭. হা পিত্যেশ (আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করা) – সেই সকাল থেকে তোমার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছি, আর তুমি এলে কিনা রাত দশটায়।

২৬৮. হাতের পাঁচ (শেষ অবলম্বন) – না ভাই, হাতের পাঁচ এ ক'টি টাকা তোমাকে দিয়ে আমি ঝুঁকি নিতে রাজি নই।

২৬৯. হাঁড়ির হাল (অত্যন্ত দূরবস্থা) – ওমা, তোমার এ হাঁড়ির হাল অবস্থা কেমন করে হলো?

২৭০. হালে পানি না পাওয়া (কিছুতেই সুরাহা না করতে পারা) – দুর্দিনে আমার সংসারতরী হালে পানি পাচ্ছে না।

২৭১. হাড় হাভাতে (অভাবী) – তোমার এ হাড় হাভাতে অবস্থার জন্য তুমিই দায়ী।

২৭২. হাড়ে দুর্বা গজানো (লাঞ্ছনার একশেষ হওয়া) – ছেলেপেলেদের ব্যবহার আমার হাড়ে দুর্বা গজিয়েছে, আজ আমি অথর্ব হয়ে পড়ে আছি বলেই এ অবস্থা।

২৭৩. হিরের টুকরো (অতি মূল্যবান) – রশিদ সাহেবের ছেলেগুলো এক একটি হিরের টুকরো, লেখাপড়ায় সবাই ভালো।

২৭৪. হাঁড় জুড়ানো (শান্তি পাওয়া) – সতীনের ছেলে বিদেশ চলে যাওয়ায় আমার হাঁড় জুড়ালো।

২৭৫. হাড় হদ্দ (নাড়ি নক্ষত্র) – আমি তার হাড় হদ্দ সবই জানি।

২৭৬. হাতির খোরাক (বেশি খরচ) – এ সংসারে হাতির খোরাক যোগাতে আমি জীবনপাত করলাম, অথচ কেউ তার মূল্য দিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বাগধারা বলতে কী বোঝায় লিখুন।

২। কোনো শব্দ বা শব্দসমষ্টির আক্ষরিক অর্থ ও বিশেষ অর্থের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণ দিন।

৩। নিচের বাগধারাগুলোর অর্থ ডানে লিখুন।

বাগধারা	অর্থ	বাগধারা	অর্থ
বিসমিল্লায় গলদ		অহিনকুল	
হাপিত্যেশ		ওষুধ ধরা	
ইতর বিশেষ		গোঁফ খেজুরে	
কান ভারি করা		অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী	
ছা পোষা		চক্ষুদান করা	
দহরম মহরম		বাঘের দুধ	
অর্ধচন্দ্র দান		লেফাফা দুরস্ত	
পোয়াবারো		মাছের মা	

বিনা মেঘে বজ্রপাত		হাতটান	
খয়ের খাঁ		আমড়াগাছি করা	
আকাশপাতাল		পরের ধনে পোদ্দারি	

৪। নিচের বাগধারাগুলো দিয়ে সার্থক বাক্য রচনা করুন।

ক. ইতর বিশেষ --

খ. অর্ধচন্দ্র দান --

গ. কান পাতলা --

ঘ. ঘোড়া রোগ --

ঙ. ছকড়া নকড়া --

পাঠ ৮.৪ : প্রবাদ প্রবচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রবাদ-প্রবচনের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব লিখতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচন চিহ্নিত করতে পারবেন।
- প্রবাদ-প্রবচনের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবেন।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন ভাষার ব্যবহারে এমন কিছু উক্তি বা কথা বলে থাকি যা বহুদিন ধরে আমাদের সমাজে প্রচলিত এক-একটি বিশেষ ঘটনার সংক্ষিপ্তসার বা তাৎপর্যময় উক্তি। মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানপ্রসূত কালের আবর্তে গ্রহণযোগ্য সংক্ষিপ্ত অথচ ভাব প্রকাশক এসব উক্তিই প্রবাদ-প্রবচন। মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের নানা ঘটনা থেকে যে অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা অর্জন করে তা ছোট আকারে কথার মাধ্যমে সূতীক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে গণউক্তিমূলক প্রবাদ-প্রবচনে রূপ নেয়। আবার জ্ঞানী ব্যক্তিদের নীতি-উপদেশমূলক কথাও প্রবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– ধর্মের কল বাতাসে পড়ে। অথবা– যেমন কর্ম, তেমন ফল। প্রথম প্রবাদটি নীতিকথামূলক এবং দ্বিতীয়টি মানব চরিত্রের সমালোচনামূলক। উভয় প্রবাদ-প্রবচনই মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও চিন্তার ধারাবাহিক ফসল।

মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানপ্রসূত কালের আবর্তে গ্রহণযোগ্য সংক্ষিপ্ত অথচ ভাব প্রকাশক উক্তিই প্রবাদ-প্রবচন।

প্রবাদ-প্রবচন দীর্ঘ অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। তবে সব ক্ষেত্রেই যে এর অর্থ চিরসত্য বা সুনির্দিষ্ট হবে তা বলা যায় না। যেমন– 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' –এর সঙ্গে 'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল শ্রেয়' এর অর্থ-পার্থক্য দেখা যায়।

কালের প্রবর্তনে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মুখ থেকে যেমন এসব বাক্য উৎসারিত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের লেখা থেকেও এগুলো একটা সর্বজনীন রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন গ্রাম্য লেখক বা কবিয়ালদের উক্তি থেকেও এগুলো এসেছে। এছাড়া ডাক ও খনার বচন, বিভিন্ন জনশ্রুতি, মেয়েলি ছড়া, লোকসাহিত্য এবং সর্বোপরি আমাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, রীতিনীতি, চালচলন ও বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই প্রবাদ-প্রবচনের প্রচলন রয়েছে। ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে এসবের গুরুত্ব অনেক। প্রবাদ-প্রবচনের অর্থব্যঞ্জনা অর্থাৎ কম কথায় গভীর ভাব প্রকাশের প্রক্রিয়া রয়েছে, যা মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সহায়ক। এগুলো ব্যবহারযোগ্য ভাষায় সরল ও সুচারু আকারে প্রয়োগ করা যায়। শুধু তাই নয়, ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বহুকাল ধরে চলে আসছে। মানুষের মুখে মুখে চলে আসা অজ্ঞাত মানুষের তৈরি এসব প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে মানুষের অভিজ্ঞতা, নীতিকথা, ইতিহাস, সমালোচনা ও সমাজের রীতিনীতি ইত্যাদির প্রকাশ রসযোগ্য করে তুলে ধরা হয়।

নিচে প্রবাদ-প্রবচন ও তার অর্থের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দেয়া হলো–

১. অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী – অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির গর্ব বেশি।

২. অভাবে স্বভাব নষ্ট – অভাবে পড়লে স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়।

৩. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট – বেশি লোভ করলে সর্বস্ব হারাতে হয়।

৪. অতি দর্পে হত লঙ্কা – অহংকার পতনের মুল।

৫. অতি চালাকের গলায় দড়ি- বেশি চালাকি করতে গেলে নিজেরই বিপদ হয়।

৬. অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট – বেশি লোকের উপস্থিতি বিশৃঙ্খলা আনে।

৭. অল্পশোকে কাতর অধিক শোকে পাথর – সামান্য শোকে মানুষ কাতর হয়ে কান্নাকাটি করে, কিন্তু অধিক শোকে হতবাক ও স্তব্ধ হয়ে যায়।

৮. অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায় – হতভাগা লোক যে কাজই করে সেই কাজেই বিফল হয়।

৯. অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ – বেশি বাড়াবাড়ি কুমতলবের পরিচয়।

১০. অর্থই অনর্থের মূল – অর্থের লোভ খারাপ কাজকে টেনে আনে।

১১. অসারের তর্জন-গর্জন সার – ক্ষমতাহীনের নিরর্থক আস্ফালন।

১২. আলালের ঘরের দুলাল – অতি আদুরে ছেলে।

১৩. আটে-পিঠে দড়, তবে ঘোড়ায় চড় – যোগ্যতা অর্জন করে কাজে হাত দেওয়া উচিত।

১৪. আঠার মাছে বছর – দীর্ঘসূত্রিতা।

১৫. আদার ব্যাপারির জাহাজের খবর – সাধারণ লোকের বিরাট বিষয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ।

১৬. আপনি বাঁচলে বাপের নাম – আত্মরক্ষাই প্রথম কর্তব্য।

১৭. আপনি শুতে ঠাঁই নেই, শঙ্করকে ডাকে – নিজের বাঁচতে হয় অন্যের অনুগ্রহে, আবার আর একজনকে সাথি করা বা সাহায্য দিতে যাওয়া।

১৮. আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সইতে হয় – কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

১৯. ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় – দৃঢ় মনোবল সফলতা লাভের সহায়ক।

২০. ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় – অপরকে মারতে গেলে নিজেকেও মার খেতে হয়।

২১. উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায় – শুরুতেই বোঝা যায় ফলটা কী দাঁড়াবে। ছোটবেলাতেই টের পাওয়া যায় বড়ো হলে কী হবে।

২২. উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে – একজনের দোষ আরেকজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া।

২৩. উলুবনে মুক্তা ছড়ানো – অপাত্রে দান বিফলে যায়।

২৪. এক মাঘে শীত যায় না – বিপদ একবারেই শেষ হয়ে যায় না।

২৫. উনা ভাতে দুনা বল – কম খেলেই শরীর ভাল থাকে।

২৬. এক হাতে তালি বাজে না – বিবাদে দু'পক্ষের ভূমিকা থাকে।

২৭. এক ঢিলে দুই পাখি মারা – এক উপায় অবলম্বন করে দুই কাজ সমাধা করা।

২৮. ওল বলে মান কচু, তুমি বড়ো লাগো – একজন বেশি দোষী, কম-দোষীকে দোষের জন্যে গালি দেয়।

২৯. কনের ঘরে পিসি, বরের ঘরের মাসি – পক্ষের আপন লোক হিসেবে কাজ করে, উভয়কেই লেলিয়ে দিয়ে নিজে ভালো থাকার মানসিকতার কুটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি।

৩০. কয়লা যায় না ধুলে স্বভাব যায় না মরলে – খল তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না।

৩১. কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না – পরিশ্রম বা সাধনা না করলে জীবনে সাফল্য আসে না।

৩২. কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা – অল্প বয়সে পেকে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া।

৩৩. কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস – ছেলেবেলায় সুশিক্ষা না দিয়ে বড়ো হয়ে দিতে চাইলে আর সে গ্রহণ করতে চায় না।

৩৪. কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে ছাড়ে রা – সহজে স্বভাব ছাড়া যায় না।

৩৫. কানা গরু বামুনকে দান – দুষ্ট ব্যক্তির এমন দান, যা কারো প্রয়োজনে লাগে না।

৩৬. কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন – যার যেই গুণ নেই, তার প্রতি সেই গুণ আরোপ করা।

৩৭. কাজের বেলায় কাজি কাজ ফুরালেই পাজি – স্বার্থসিদ্ধির পর অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ করা।

৩৮. কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ – কারো সুসময়, কারো আবার দুঃসময়।

৩৯. খিদে পেলে বাঘে ধান খায় – প্রয়োজনের গুরুত্ব বোঝানো।

৪০. গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না – আপন লোকেরা গুণীর কদর করে না।

৪১. গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল – কাজ শুরুর আগেই ফল ভোগের জন্য তৈরি।

৪২. গরু মেরে জুতো দান – কারও অনিষ্ট করে আবার তার সাহায্যে এগিয়ে আসা।

৪৩. গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়া – কোনো বিপজ্জনক কাজে এগিয়ে দিয়ে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া।

৪৪. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল – নিজেকে নেতা বলে জাহির করা।

৪৫. ঘোড়া দেখে খোঁড়া – সুযোগ বুঝে অক্ষম সাজা।

৪৬. ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায় – একবার যে বিপদে পড়েছে, পরে অল্পেই সে আতংকিত হয়।

৪৭. ঘর থাকতে বাবুই ভেজা – নিজের সম্পদ থাকতেও কষ্ট করা।

৪৮. ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো – বিনা লাভে কোনো কর্ম করা।

৪৯. চকমক করলেই সোনা হয় না – চেহারা দেখেই কারো বা কোনো কিছুর ভালোমন্দ বিচার করা যায় না।

৫০. চাঁদেরও কলঙ্ক আছে – নিজের দোষ লাঘবের চেষ্টা।

৫১. চেনা বামুনের পৈতা লাগে না – পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় পত্র দরকার হয় না বা তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না।

৫২. চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে – প্রয়োজনের সময় সমস্যা সমাধানের উপায় না হয়ে পরে তা সমাধানের উপায় বের হয়।

৫৩. চোরে চোরে মাসতুতো ভাই – মন্দ লোকের সাথে মন্দ লোকের বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক।

৫৪. চোরের ওপর বাটপাড়ি – প্রতারকের ওপর দিয়ে প্রতারণা করা।

৫৫. চোরের মার বড়ো গলা – দোষী ব্যক্তির দোষ ঢেকে সাধু সাজতে সাহায্য করা ও বাগাড়ম্বর করা।

৫৬. চোরের সাক্ষী গাঁট-কাটা – খারাপ লোকেই খারাপ লোককে সাহায্য করে।

৫৭. ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা – সামান্য লাভের জন্যে মন্দ কাজে হাত না দেয়া।

৫৮. জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ – দুদিকে বিপদ।

৫৯. ঝড়ে বগ মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে – অপরের দ্বারা সাধিত কর্মের কৃতিত্ব নিজের বলে জাহির করা।

৬০. ঝি-কে মেরে বউকে শেখানো – একজনকে মেরে অন্যকে শেখানো।

৬১. ঝোপ বুঝে কোপ মারা – সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

৬২. ডুবে ডুবে জল খাওয়া – গোপনে গোপনে কোনো কাজ সম্পন্ন করা

৬৩. ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার – ক্ষমতা নেই, অথচ আস্ফালন আছে।

৬৪. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে – যার যা স্বভাব সে তাই-ই করে যায়।

৬৫. দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ – একতাবদ্ধভাবে কাজে নেমে ব্যর্থ হলেও তাতে লজ্জা বা গ্লানির কোনো কারণ নেই।

৬৬. দশের লাঠি একের বোঝা – একজনের জন্য যে কাজ কষ্টসাধ্য অনেকে মিলে করলে সে কাজ সহজ হয়ে যায়।

৬৭. দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না – সুখের অভাব না ঘটলে সুখের বিষয়টাকে অনুভব করা যায় না।
৬৮. দিনে-দুপুরে ডাকাতি – প্রকাশ্যে অন্যায় করা।
৬৯. দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা- আদর দিয়ে শত্রুকে লালন করা।
৭০. ধর্মের কল বাতাসে নড়ে – পরিণামে সত্যের জয় হয়।
৭১. ধর্মের ঢাক আপনি বাজে – সত্য কখনো চাপা থাকে না, আপনিই প্রকাশিত হয়।
৭২. ধান ভানতে শিবের গীত – মূল কথা ছেড়ে বাজে প্রসঙ্গ আলোচনা করা।
৭৩. ধরি মাছ না ছুঁই পানি – কষ্ট এড়িয়ে কার্যোদ্ধার।
৭৪. ধরাকে সরা জ্ঞান করা – অতি অহংকারে বা ক্ষমতার দম্ভে বড়োকে ছোট মনে করা।
৭৫. নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না – কেবল নামেই আছে ভেতরে নেই।
৭৬. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা – নিজের ব্যর্থতা অন্যের ঘাড়ে চাপানো।
৭৭. নিজের পায়ে কুড়াল মারা – নিজের ক্ষতি করা।
৭৮. নুন খায় যার গুণ গায় তার – উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও তার পক্ষে কাজ করা।
৭৯. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা – নিজের ক্ষতি করেও অপরের অনিষ্ট সাধন করা।
৮০. পাপের দান প্রায়শ্চিত্যে যায় – অসৎ উপার্জন অসৎ পথেই যায়।
৮১. পায় না, তাই খায় না – অভাবে কোনো জিনিষের প্রতি কপট অনীহা প্রকাশ।
৮২. পেটে খেলে পিঠে সয় – লাভের সম্ভাবনা থাকলে অনেক কষ্ট সহ্য করা যায়।
৮৩. বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা – দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়লে কিছু-না কিছু ক্ষতি হবেই।
৮৪. বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড় – কর্তার চেয়ে কর্মচারির তেজ বেশি।
৮৫. বিনা মেঘে বজ্রপাত – হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হওয়া।
৮৬. বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো – বাইরে কাড়কাড়ি ভিতরে ঢিলেমি।
৮৭. বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি – যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দু’পক্ষেই কথা বলে।
৮৮. বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া – যা পাওয়ার আশা নেই তা লাভ করা।
৮৯. বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর – সামর্থ্য নেই অথচ লাফ-ঝাঁপ বেশি।
৯০. ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া – যা এমনিতেই পাওয়া যায় তাতে দোষ-ত্রুটি থাকলেও কিছু যায় আসে না।
৯১. ভাগের মা গঙ্গা পায় না – দায়িত্ব ভাগ না করে যদি একই কাজে সবার দায়িত্ব থাকে তো সে কাজ সুসিদ্ধ হয় না।
৯২. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন – যেভাবে হোক কাজে সফল হওয়ার প্রতিজ্ঞা।
৯৩. মরা হাতি লাখ টাকা – যোগ্য ব্যক্তি দুর্যোগে পড়লেও অন্তঃসারশূন্য হয় না।
৯৪. মশা মারতে কামান দাগা – সামান্য কাজের জন্য বিরাট আয়োজন।
৯৫. মুখে চুন কালি পড়া – অপমানিত হওয়া।
৯৬. মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত – সীমার অতিরিক্ত কাজ কেউ করতে পারে না।
৯৭. যার লাঠি তার মাটি – জোর যার মুল্লুক তার।
৯৮. যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ – যতোক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বাঁচে, ততোক্ষণই সে আশা রাখে।
৯৯. যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দুই – একজন খাটে, ফল ভোগ করে অন্য জন।
১০০. যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া – জিনিসের মালিককে সেই জিনিস নিয়ে জব্দ করা।
১০১. যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল – দুর্বৃত্তের উপযুক্ত শাস্তি।
১০২. যেমন কর্ম তেমন ফল – যে যেমন কাজ করে, সে তেমন ফল পায়।
১০৩. যে সয় সে রয় – কষ্ট সহ্য করার যার ক্ষমতা আছে, জীবন-যুদ্ধে সে-ই জয়ী হয়।

১০৪. যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা – শত্রুর সব কাজেই দোষ হয়।

১০৫. যত গর্জে তত বর্ষে না – আড়ম্বর অনুযায়ী কাজ হয় না।

১০৬. যেখানে বাঘের ভয় যেখানে রাত হয় – বিপদের উপর বিপদ আসে।

১০৭. রথ দেখা ও কলা বেচা – একটা কাজ করতে গিয়ে সেই সঙ্গের আর একটা কাজ সমাধা করা।

১০৮. রাখে আল্লা মারে কে – স্রষ্টা রক্ষা করলে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।

১০৯. সস্তার তিন অবস্থা – সস্তা জিনিস প্রায়ই খারাপ হয়।

১১০. সবুরে মেওয়া ফলে – ধৈর্য ধরে থাকলে সুফল পাওয়া যায়।

১১১. সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ – সৎ সঙ্গে পরিণাম ভালো কিন্তু অসৎ সঙ্গের পরিণাম খারাপ।

১১২. লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন – প্রয়োজনে অর্থ জোগানোর ব্যক্তি থাকলে তার ভরসায় বেশি খরচ করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ।

১১৩. সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে – যে যেই প্রকৃতির লোকের সাথে চলাফেরা করে সে সেই প্রকৃতির লোকের মেজাজ ভালোভাবে বুঝতে পারে ।

১১৪. সুখে থাকতে ভূতে কিলায় – দুঃখের অভিজ্ঞতা নেই, এমন ব্যক্তির দুঃখ ডেকে আনার মতো ব্যবহার বা আচরণ।

১১৫. সোনা ফেলে আঁচলে গিরো – মূল্যবান বস্তু বা ব্যক্তিকে অনাদর করে মূল্যহীন বস্তুর আদর।

১১৬. স্বভাব যায় না মলে ইজ্জত যায় না ধুলে – যাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় না তাদের সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ।

১১৭. হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী – অপদার্থ ব্যক্তির অপদার্থ সহকারী বা সমর্থক।

১১৮. হাতি ঘোড়া গেলো তল ভেড়া বলে কতো জল – বড়ো বড়ো লোক যে কাজ করতে পারেনি, সামান্য ব্যক্তির সে- ই কাজ করতে যাওয়ার স্পর্ধা।

১১৯. হাতির পাঁচ পা দেখা – অহংকারী ব্যক্তির স্পর্ধিত আচরণ।

১২০. হাত ঝাড়া দিয়ে পর্বত – বড়ো লোকের মুখের কথাতেই অনেক কিছু হয়।

১২১. হিসেবের গরু বাঘে খায় না – বিবেচনা থাকলে ঠকতে হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। প্রবাদ-প্রবচন বলতে কী বোঝায় লিখুন।

২। কোন কোন উৎস থেকে প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব হয়েছে লিখুন।

৩। প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্ব লিখুন।

৪। নিচের প্রবাদ-প্রবচনগুলোর অর্থ লিখুন।

অল্পশোকে কাতর অধিক শোকে পাথর, আলালের ঘরের দুলাল, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, ওল বলে মান কচু, তুমি বড়ো লাগো, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়া, চেনা বামুনের পৈতা লাগে না

৫। নিচের প্রবাদ-প্রবচনগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখান।

ঝি-কে মেরে বউকে শেখান, দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা, নুন খায় যার গুণ গায় তার, বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা, হাতির পাঁচ পা দেখা

পাঠ ৮.৫ : পারিভাষিক শব্দ

ভূমিকা

আমরা যদি কম্পিউটার নিয়ে কোনো আলোচনা করি তাহলে হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার, প্রোগ্রামিং, উইন্ডোজ, ডাটা, কমান্ড, হ্যাং, স্কিপ, ফাইল, ডিরেক্টরি এরকম বেশ কিছু শব্দ অবশ্যই আলোচনায় আসবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই এমন কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয়, যে শব্দগুলো সাধারণভাবে আমাদের রোজকার কথা-বার্তায় ব্যবহৃত হয় না, বা প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু ওই বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় শব্দগুলোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রায় অনিবার্য। যেমন– কম্পিউটার সম্পর্কিত আলোচনায় আসে হ্যাং, ডাটা, স্কিপ, ফাইল ইত্যাদি শব্দ, তেমনি হয়তো অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় চাহিদা, যোগান, বাজার, মুদ্রা এসব শব্দ ঘুরেফিরে আসবে। অনেক সময় দেখা যায়, এই বিশেষ শব্দগুলোর ব্যবহার না করে ওই বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করাই যাচ্ছে না। এই শব্দগুলোই হচ্ছে পরিভাষা। হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, ডাটাবেজ, হ্যাং এগুলো যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞানের পরিভাষা, তেমনি বাজার, যোগান, চাহিদা, মুদ্রা এগুলো অর্থনীতির পরিভাষা। আর পরিভাষাগুলো যেহেতু এক একটি শব্দ সেজন্য আমরা সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দও বলতে পারি। যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা এই পাঠে পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করব।

সাধারণ উদ্দেশ্য

এই ইউনিটে পারিভাষিক শব্দ পড়া শেষে আপনি–

১. পরিভাষার সংজ্ঞার্থ বলতে পারবেন।
২. পারিভাষিক শব্দ চিনতে পারবেন।
৩. পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখতে পারবেন।
৫. বাংলা পরিভাষা রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।
৬. পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭. বাংলা ভাষায় প্রচলিত পরিভাষার একটি তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

পাঠ ৮.৫.১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পরিভাষার সংজ্ঞার্থ বলতে পারবেন।
- পারিভাষিক শব্দ চিনতে পারবেন।
- পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

‘পরিভাষা’ শব্দটি আসলে ইংরেজি 'defination' শব্দের বাংলা অনুবাদ। এর কাছাকাছি আরেকটি শব্দ আমরা জানি ‘technical term’-যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে ‘পারিভাষিক শব্দ’। আজকাল ‘পরিভাষা’ ও ‘পরিভাষিক শব্দ- প্রায় একই অর্থ বুঝিয়ে থাকে; যদিও ‘পরিভাষা’ এই বিশেষ্যবাচক শব্দটির বিশেষণ হচ্ছে ‘পারিভাষিক’। পরিভাষা শব্দটি এদেশে ইংরেজ আসার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল সংজ্ঞাবাচক বিশেষ অর্থে। অর্থান্তর নেই এমন বিশেষ অর্থবোধক সংজ্ঞার নাম পরিভাষা। বস্তুত পরিভাষা বলতে বোঝায় কোনো বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত এমন কিছু শব্দ যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ধারণাকে যথার্থভাবে, নির্ভুলভাবে, দ্ব্যর্থহীনভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করে। পণ্ডিতেরা একমত হয়ে একটি বিশেষ ধারণার (concept) জন্য একটি বিশেষ শব্দকে বেঁধে দেন যে শব্দটি সংশয়হীনভাবে কেবল ওই বেঁধে দেওয়া অর্থকেই বোঝাবে অন্য কোনো অর্থ বোঝাবে না।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপনকারী শব্দই হচ্ছে ওই বিশেষ জ্ঞানের পরিভাষা।

পরিভাষা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কাছে হাতিয়ার স্বরূপ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠিক কথাকে ঠিকমতো বোঝানো; ইংরেজিতে যাকে বলে hitting the nail on the head সাধারণ শব্দের সঙ্গে পারিভাষিক শব্দের পার্থক্য এখানেই। একটি ‘পরিভাষা’ বা পারিভাষিক শব্দ একাধিক অর্থে যেমন ব্যবহৃত হতে পারবে না, তেমনি একাধিক ভাব নির্দেশের জন্য একই পরিভাষা ব্যবহৃত হতে পারবে না। যেমন ‘সমাস’ বললে পরস্পর অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। কিংবা ‘কারক’ বললে বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য শব্দের কোনো না কোনো প্রকাশের সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। তাই ‘সমাস’ বা ‘কারক’ বাংলা ব্যাকরণ শাস্ত্রের দুটি পারিভাষিক শব্দ। তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হয় অসংখ্য পরিভাষা বা পারিভাষিক শব্দ।

কীভাবে চিনবেন পারিভাষিক শব্দ

আজকাল আমরা জেনেই হোক আর না জেনেই হোক পদে পদে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এসব পারিভাষিক শব্দ আপনি চিনবেন কী করে? একটু আগেই আমরা বলেছি জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই রয়েছে কিছু নিজস্ব পারিভাষিক শব্দ। যে শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ কথাবার্তায় তেমন প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু ওই বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় শব্দটি যদি অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তাহলেই বুঝতে হবে শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। মনে করুন আপনি সমাস সম্পর্কে আলোচনা করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনি ‘পূর্বপদ’, ‘পরপদ’, ‘সমস্যমান পদ’, ‘ব্যাসবাক্য’ এসব শব্দের সাহায্য ছাড়া আপনি আলোচনাই করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি ধরে নেবেন ওই শব্দগুলো পারিভাষিক শব্দ।

সব সময় পারিভাষিক শব্দ আবার এতো সহজে চেনা যায় না। কারণ পারিভাষিক শব্দটির বহুল ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা। উকিল, মোক্তার, আবাসিক, অনাবাসিক এগুলো যে পারিভাষিক শব্দ তা আজ আর আমাদের মনেই হয় না। একারণে পারিভাষিক শব্দ চেনার জন্য আমাদের প্রয়োজন খানিকটা অতিরিক্ত সতর্কতা। যখনই কোনো পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে

পরিচিত হবেন, শব্দটি একাধিকবার আবৃত্তি করে মনে গেঁথে নিন, প্রয়োজনে একটি নোট খাতায় আপনার পরিচিত পারিভাষিক শব্দগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

পরিভাষা কেন প্রয়োজন

এক-একটি পরিভাষার সঙ্গে বিশেষ ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্মৃতি ধারণা-বোধ মিশে থাকে। সে সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা। নাইট্রোজেন চক্র, শীতনিদ্রা, অভিযোজন ক্ষমতা, নিরক্ষীয় বায়ু, মরাকাটাল এ পারিভাষিক শব্দগুলো যেমন বিশেষ বিশেষ জ্ঞান-জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি প্রতিটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের অনুভূতি। ফলে রসায়ন (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনায় শীতনিদ্রা ও অভিযোজন ক্ষমতা, ভূগোল (এটি একটি পারিভাষিক শব্দ) সম্পর্কিত আলোচনার বেলাতেই নিরক্ষীয় বায়ু ও মরাকাটাল শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়। ফলে ওই পারিভাষিক শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত মানুষের মনে জড়িয়ে থাকে বিশেষ ধরনের অনুভূতি, যার ফলে বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলো বাণিজ্যের আলোচনায় কিংবা ভূগোলের পরিভাষাগুলো রসায়নের আলোচনায় অচল। যেহেতু পরিভাষাগুলোর সঙ্গে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে তাই বিশেষ জ্ঞানের আলোচনায় ওই জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিভাষা অবশ্যই প্রয়োজন। যার সাহায্যে সহজেই বক্তব্যের মূলকথা পাঠকের বা শ্রোতার মনে সঞ্চারিত করে দেয়া যায়। এজন্য রাজশেখর বসু বলেছেন, পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। মোট কথা পরিভাষা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা প্রায় অসম্ভব। পরিভাষার ব্যবহারের মাধ্যমে লেখক-পাঠক বা বক্তা-শ্রোতার মধ্যে নির্বিঘ্ন যোগাযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া পরিভাষা ব্যবহারের ফলে তত্ত্বমূলক রচনার প্রকাশভঙ্গি শক্তিশালী ও সংহত হয়ে ওঠে।

পরিভাষা ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় যখন প্রচলিত শব্দটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও সেটি যদি অপ্রচলিত থাকে তবে পরিভাষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। এ কথা সত্য যে, ভাষা চাপিয়ে দেবার বিষয় নয়। ভাষা প্রবহমান নদীর মতো। বিদেশি বা ইংরেজি শব্দ আমাদের ভাষায় এসেছে প্রচুর। যেটি গ্রহণ করবার তা গ্রহণ করেছে, আর যা বর্জন করবার তাও বর্জন করেছে। তাছাড়া পরিভাষা সুনির্দিষ্ট ও অর্থবহ বলেই তা প্রচলিত হয়েছে। অনেক সময় মূলভাষার শব্দ টেকসই থাকে না বলেও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিকল্প ভাষা সহজবোধ্যতার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- পুলিশ, ফ্যান, এর প্রতিশব্দ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত বলেই পরিভাষা ব্যবহার না করে উপায় নেই।

সারসংক্ষেপ

পরিভাষা সংক্ষেপে কোনো বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করে, পণ্ডিতগণের সম্মতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত, একটি মাত্র ভাবকেই কেবল প্রকাশ করে, একাধিক ভাবকে প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং মূলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হলেও তার প্রযুক্ত অর্থই শব্দটির যথার্থ পারিভাষিক অর্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থ তাৎপর্য জ্ঞাপনকারী শব্দই হচ্ছে ওই বিশেষ জ্ঞানের পরিভাষা। যখন প্রচলিত শব্দটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও সেটি যদি অপ্রচলিত থাকে তবে পরিভাষার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। অনেক সময় মূল ভাষা শব্দ টেকসই থাকে না বলেও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। বিকল্প ভাষা সহজবোধ্যতার জন্যেই ব্যবহৃত হয়। যেমন- পুলিশ, ফ্যান, এর প্রতিশব্দ অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত বলেই পরিভাষা ব্যবহার না করে উপায় নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. পরিভাষার সংজ্ঞার্থ দিন।
২. পারিভাষিক শব্দ কীভাবে চেনা যায়?
৩. পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.৫.২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা পরিভাষা রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।
- পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখতে পারবেন।

বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই সৃষ্টি হয় পরিভাষার। ওই যে একটি কথা বলা হয় যে, প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী– একথাটি যেন পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্যি বলে মনে হয়। যে দেশ বা জাতি নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যত বেশি নিবেদিত তাদের জন্য পরিভাষার প্রয়োজন তত বেশি এবং তারা তৈরি করেন বা করতে বাধ্য হন নতুন সব শব্দ। বিগত দুশো বছরে দেশি ও বিদেশি প্রশাসক, সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের সমবেত চেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলা পরিভাষা এবং এখনো সেই চেষ্টা শেষ হয়নি। এদেশে প্রথমে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বঙ্গপ্রদেশে। শাসনযন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা এদেশে চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করা শুরু হয়। ইংরেজি ভাষায় রচিত বৃটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই অনুবাদকেরা অনুভব করেন পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা। এজন্য বলা যায়, আইন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৭৮৪ সালে জনাথান ডানকান 'মপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' বাংলা ভাষায় ও বাংলা হরফে ছেপে প্রকাশ করেন। ডানকানের পর এডমন স্টোন, ফরস্টার, উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অনুবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইংরেজি আইন বাংলায় রূপান্তর ঘটে। এই সকল বিদেশিদের প্রয়োজনের হাত ধরেই বাংলা ভাষায় আইনের আলোচনায় পরিচিত হয়ে ওঠে হাকিম, আদালত, ইজারা, জজ, তহশীল, তহশীলদার প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজ অনুবাদকদের হাতে সৃষ্ট ওই সব পারিভাষিক শব্দ এখন বাংলা ভাষার প্রায় নিত্য পরিচিত শব্দে পরিণত হয়েছে।

আইনের অনুবাদের মাধ্যমে পরিভাষা তৈরির যে সূচনা ঘটে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় তার পরবর্তী পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়। বাংলায় বিজ্ঞান পুস্তক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরির প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবিদার ফেলিকস্ কেরী। তিনি বাংলাতে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার খানিকটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'বিদ্যাহারাবলি' নাম দিয়ে। তাঁর অপর মূল্যবান গ্রন্থ 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা' প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সালে। ওই বইতে তিনি যে সকল পরিভাষা তৈরি করেছিলেন সেগুলো এখনো আমরা ব্যবহার করছি। কয়েকটি উদাহরণ :

Anatomy – ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা	Solid – ঘন
Muscle – মাংস পেশী	Surgery – অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা
Nerve – নাড়ী	Vein –শিরা।

ফেলিকস কেরীর পর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় অন্য যাদের অবদান রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন জন ম্যাক, পীটার বৃটন, পীয়ারসন প্রমুখ।

বাঙালিদের মধ্যে যিনি বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা তৈরিতে মনোযোগী হন তিনি অক্ষয় কুমার দত্ত। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্যিক। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক যে চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেগুলো হচ্ছে :

১। ভূগোল (১৮৪১); ২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয়ভাগ ১৮৫৯); পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)। এসব বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তিনি তৈরি করেন বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ। তাঁর সৃষ্ট বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের নমুনা এখানে দেওয়া হলো–

Magnet – চুম্বক	Compass – দিগ্‌দর্শন
Solid – কঠিন	Biology – প্রাণিবিদ্যা
Microscope –অনুবীক্ষণ যন্ত্র	Botany –উদ্ভিদবিদ্যা
Telescope –দূরবীক্ষণ যন্ত্র	Southpole –কুমেরু
Astrology – জ্যোতিষ	North pole –সুমেরু

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অধিকাংশই পরবর্তীকালে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে– আজো ব্যবহৃত হচ্ছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়, বি.এন.শীল, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন শব্দের বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। এঁদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে বাংলা পরিভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা ভাষা।

শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই নয় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যোগ্য নেতৃত্বে একদল কৃতবিদ্য বাঙালি সম্মিলিতভাবে পরিভাষা তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন তা দীর্ঘ ৪২ বৎসর যাবত (১৮৯৪-১৯৩৫) পরিষদের মুখপত্র ‘সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা’য় মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতি গঠনে করে (১৯৩৪) বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে খণ্ডে খণ্ডে তা প্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাজনের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার গঠন করে পরিভাষা সংসদ (১৯৪৮)। সংসদ বিভিন্ন ধরনের পরিভাষা নির্মাণের আত্মনিয়োগ করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার ভাষা কমিটি (১৯৪৮), বাংলা একাডেমি (১৯৫৭), কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড (১৯৬৩), সরকারি শিক্ষা বিভাগ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বাংলা পরিভাষা বহুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটিও (১৯৭৪) বাংলা পরিভাষা তৈরিতে বড় রকমের ভূমিকা রেখেছেন।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন পরিভাষা তৈরি একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ ঘটছে নতুন নতুন শব্দের, আর আমরা পরিচিত হচ্ছি সে সব শব্দের সঙ্গে। ফলে প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে শব্দটির একটি বাংলা পরিভাষার। যখনই প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে তখনই হয়তো আমরা তৈরি করছি বা করতে বাধ্য হচ্ছি নতুন একটি পরিভাষা তৈরিতে। সঙ্গে সঙ্গে যোগ হচ্ছে আমাদের ভাষায় একটি নতুন শব্দ এবং সবার অজান্তেই ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি

যে কোনো পারিভাষিক শব্দেরই থাকতে হয় চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য। সেগুলো হচ্ছে : সর্বজনস্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ, আড়ষ্টহীনতা। কিন্তু এই সব গুণসম্পন্ন শব্দ তৈরি করতে হলে, যিনি পরিভাষা তৈরি করবেন, তাঁকে অবশ্যই মেনে নিতে হয় ভাষাবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো। তা ছাড়া ভাষাবিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কেও পরিভাষা সৃষ্টিকারীর থাকতে হয় পরিষ্কার ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই তিনি নির্বাচন করবেন এমন শব্দ যা সহজেই সমাজে গৃহীত হবে। দুরূহ ও দুরুচ্চার্য শব্দে পরিভাষা তৈরি হলে তা জনসাধারণের কাছে গৃহীত হয় না। তাছাড়া, আমরা আগেই বলেছি যে শব্দটি পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে তার থাকবে সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থ এবং স্পষ্ট তাৎপর্য। প্রত্যেকটি শব্দই একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে তাকে দ্বিতীয় কোনো অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না।

পদ্ধতি

যে কোনো ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি তিনটি হলো : ঋণ, ঋণ-অনুবাদ ও নির্মাণ। আসুন আমরা ঐ তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। ঋণ

ভাষার ঋণ মানুষকে ধনী ও সমৃদ্ধ করে। যে ভাষায় যতো বেশি ঋণকৃত শব্দ আছে সে ভাষা ততো সমৃদ্ধ। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অন্য সকলের মতো বাঙালিরও সমান অধিকার আছে। তাই যে ভাষা থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করব তার শব্দ, ভাব, প্রেরণা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। উগ্র স্বাদেশিকতা দ্বারা তাড়িত হয়ে হাইড্রো অক্সাইডকে 'অম্লজানমূলক উদ্বায়ী গ্যাস', টেলিফোনকে 'দূরালাপনী', বুনসেন বার্নারকে 'পিনাল-দাহক', ইনকেজশনকে 'সূচিকাভরণ' না লেখাই সঙ্গত। আজকাল আমরা সবাই লোডশেডিং, চ্যারিটি বা ওয়ার্মআপ ম্যাচ, বাস, স্টেশন, অক্সিজেন এসব পারিভাষিক শব্দ অপরিবর্তিত ভাবেই গ্রহণ করেছি। অর্থাৎ এসব শব্দ আমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি এবং ঋণ শোধ না করলেও কেউ কখনো তাগাদা দিতে আসবে না; বরং বাংলা ভাষাকে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ করবে।

২। ঋণ-অনুবাদ

পুরনো, ভুলে যাওয়া কোনো বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। শব্দের আগের অর্থটা জানা থাকলে বা বহাল থাকলেও ধীরে ধীরে নতুন অর্থটাই সবার কাছে পরিচিতি পেয়ে, নতুন অর্থ ধারণ করে ফেলে। ঋণ-অনুবাদ হতে পারে দু-ধরনের। সংস্কৃত বা দেশি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যাবে যেগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ অর্থ একটিই কিন্তু শব্দ অনেক। এ ধরনের শব্দগুলোর ভেতর থেকে একটি বেছে নিয়ে আমরা নতুন অর্থে প্রয়োগ করে গড়ে তুলতে পারি একটি পরিভাষা। 'বিজ্ঞান', ইতিহাস, পদার্থ প্রভৃতি শব্দ এমন ধরনের ঋণ অনুবাদের উদাহরণ। বিজ্ঞান শব্দটি বোঝাতো বিশেষ জ্ঞান– তা সে যে কোনো জ্ঞানকেই বোঝাতো কিন্তু এখন পরিভাষা হিসেবে আমরা বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করছি।

৩। নির্মাণ

শব্দ নির্মাণের মতো পরিভাষা নির্মাণের বেলাতেও ভাষার মূল প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ হতে গৃহীত পরিভাষা, যেমন : 'দ্রাঘিমা', 'বিষুবরেখা', 'লসাগু', 'গসাগু' ইত্যাদি শব্দ পরিভাষা হিসেবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

পরিভাষিক শব্দ-প্রয়োগ বিধি

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে, রাষ্ট্রভাষা বাংলা সর্বস্তরে চালু করার নির্দেশ দেয়া হলে সেই নির্দেশ অনুসারে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ব্যবহারের প্রয়াস অব্যাহত থাকে। কিন্তু বাংলা ভাষা ব্যবহারের কিছু সমস্যা দেখা যায়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে অফিস-আদালত ও উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার বহুল প্রচলন থাকায় কতিপয় শব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় যা আমাদের বাংলা ভাষা সর্বত্র প্রচলনের ক্ষেত্রে দীনতারই পরিচায়ক। বহুল প্রচলিত এই সকল ইংরেজি শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভব হয়নি বা কিছু কিছু শব্দ বাংলায় রূপান্তর হলেও তার ব্যবহার করা হয় সেগুলোকেই পরিভাষা বলা হয়।

প্রয়োগ বিধি

পরিভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সেগুলো নিম্নরূপ:

(১) মূল ভাষায় প্রতিশব্দ না থাকলে পরিভাষায় প্রয়োগ করা যায়। যেমন : পুলিশ চোরকে ধরতে এসেছে। পুলিশের প্রতিশব্দ নেই।

(২) মূলভাষায় টেকসই প্রতিশব্দ না থাকলে পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। যেমন :- ছেলেমেয়েরা টেলিভিশন দেখছে । টেলিভিশন শব্দের প্রতিশব্দ দূরদর্শন, তবে এ শব্দটি টেকসই নয়।

(৩) মূল ভাষায় প্রতিশব্দটি অপ্রচলিত হলে পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। যেমন : টেবিলে কলমটা রাখো। টেবিলের প্রতিশব্দ চৌপায়া এটি প্রচলিত নয়।

(৪) মুল ভাষার প্রতিশব্দটি সর্বসাধারণের বোধগম্য না হলে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন : গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪° ডিগ্রী সেলসিয়াস। ডিগ্রীর প্রতিশব্দ মান নির্ণয়ক বিশেষ বলে অভিহিত করা হয়। তাই ডিগ্রী লেখাই শ্রেয়।

(৫) পৌনঃপুনিক ব্যবহারের কারণে প্রতিশব্দ থাকলেও পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যেমন : একাউনটেন্ট পদে লোক নিয়োগ করা হবে। একাউনটেন্ট এর প্রতিশব্দ হিসাব রক্ষক। কিন্তু একাউনটেন্ট এর ব্যবহার বহুল ও সর্বজনগ্রাহ্য।

(৬) সহজে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যেমন : টেলিফোন নষ্ট হয়ে গেছে। টেলিফোনের প্রতিশব্দ দূরালাপনি কিন্তু টেলিফোন শব্দটি সহজে গ্রহণযোগ্য।

(৭) অফিস আদালতে ব্যবহার্য শব্দ পরিভাষিক হওয়াই উত্তম। যেমন : বিল জমা দেয়া হোক। এখানে বিলের পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ তেমন অর্থবহ নয় না।

অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মূলভাষার প্রতিশব্দ সৃষ্টি করে শব্দের সার্বজনীনতা নষ্ট না করাই বাঞ্ছনীয়। সে ক্ষেত্রে পরিভাষা প্রয়োগ করা শ্রেয়। যেমন : স্কুল খোলা নেই। স্কুলের পরিবর্তে বিদ্যালয় শব্দ প্রয়োগ করলে সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ন হয়।

সারসংক্ষেপ :

ব্রিটিশ আইন বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়েই বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের প্রথম উদ্যোক্তা িসেবে জনাথান ডানকানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। আইনের অনুবাদের পর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে প্রাথমিক কৃতিত্বের দাবীদার ফেলিকস্ কেরী। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরিতে অক্ষয়কুমার দত্ত অগ্রগণ্য। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক চারটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ওই চারটি বইতে তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা এখনও সাদরে গ্রহণ ও ব্যবহার করে থাকি। অক্ষয়কুমার দত্তের পর ব্যক্তিগতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গুণীব্যক্তি বিভিন্ন প্রয়োজনে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পাশাপাশি যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিভাষা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ও রাখছে সেগুলো হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমি প্রভৃতি।

যে কোনো ভাষাতেই পরিভাষা তৈরি হয় সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। পদ্ধতি তিনটি হলো : ঋণ, ঋণ-অনুবাদ ও নির্মাণ। কিছু শব্দ আমরা ঋণ করে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছি। পুরনো ভুলে যাওয়া কোনো বাংলা শব্দকে তুলে এনে নতুন অর্থে ব্যবহার করেও পরিভাষা তৈরি করা যায়। বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি থেকে উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। পরিভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১। বাংলা পরিভাষা রচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখতে পারবেন।

২। পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩। পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখতে পারবেন।

৪। পরিভাষা তৈরির তিনটি পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

৫। টীকা লিখুন

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ফেলিকস্ কেরী, বাংলা একাডেমি।

পাঠ ৮.৫.৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের পারিভাষিক শব্দ বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার পারিভাষিক শব্দ লিখতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন পরিভাষার একটি তালিকা তৈরি করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বাংলা পরিভাষা

১.	President`s Secretariat অধিদপ্তর/পরিদপ্তর Bureau of Anti-corruption স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা Elcetion Commission Parliament Secretariat	১.	রাষ্ট্রপতির সচিবালয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২.	Prime Minister`s Secretariat	২.	প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়
৩.	Ministry of Defence স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Meteorological Department Inter-Service Public Relations Directorate	৩.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর।
৪.	Ministry of Communications স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা Bangladesh Road Transport Corporation	৪.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
৫.	Ministry of Post and Tele-Communication	৫.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৬.	Ministry of Ports, Shipping and Inland Water Transport	৬.	বন্দর, সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়
৭.	Ministry of Education স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা National Curriculum and Text Book Board.	৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৮.	Ministry of Agriculture	৮.	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.	Ministry of Fisheries and Livestock.	৯.	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়

১০.	Ministry of Irrigation, Water Development and Flood Control.	১০.	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
১১.	Ministry of Finance	১১.	অর্থ মন্ত্রণালয়
১২.	Ministry of Planning	১২.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৩.	Ministry of Energy and Mineral Resources Bangladesh Power Development Board. Rulal Electrification Board.	১৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড
১৪.	Ministry of Extablishment	১৪.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
১৫.	Ministry of Foreign Affairs	১৫.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৬.	Ministry of Food	১৬.	খাদ্য মন্ত্রণালয়
১৭.	Ministry of Relief and Rehabilitation	১৭.	ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়
১৮.	Ministry of Health and Family Planning	১৮.	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১৯.	Ministry of Home Affairs	১৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
২০.	Ministry of Commerce	২০.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
২১.	Ministry of Industries	২১.	শিল্প মন্ত্রণালয়
২২.	Ministry of Jute	২২.	পাট মন্ত্রণালয়
২৩.	Ministry of Textiles	২৩.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়
২৪.	Ministry of Information	২৪.	তথ্য মন্ত্রণালয়
২৫.	Ministry of Labour and Manpower	২৫.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
২৬.	Ministry of Law and Justice	২৬.	আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়
২৭.	Ministry of Works	২৭.	পূর্ত মন্ত্রণালয়
২৮.	Ministry of Local Government Rural Development and Co-operatives.	২৮.	স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
২৯.	Ministry of Social Welfare and Women`s Affairs	২৯.	সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩০.	Ministry of Youth and Sports	৩০.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩১.	Ministry of Land	৩১.	ভূমি মন্ত্রণালয়
৩২.	Ministry of Religious Affairs.	৩২.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দ

A

Abandoned property	পরিত্যক্ত সম্পত্তি
Absconder	ফেরারি
Absorption	আত্মীকরণ
Abolish	বিলোপ করা
Abrogate	রদ করা
Absolutely	পুরোপুরি
Abstract	সার, সংক্ষিপ্ত
Account	হিসাব
Accounts Officer	হিসাব রক্ষণ অফিসার
Accused	আসামী
Acquired	হুকুমদখলকৃত/অধিগৃহীত
Acknowledge	স্বীকার করা
Acknowledgement due	প্রাপ্তি স্বীকারপত্র
Acting	ভারপ্রাপ্ত
Ad hoc appointment	এ্যাড্হক নিয়োগ
Administration	প্রশাসন
Administrator	প্রশাসক
Adult Franchise	প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার
Advertisement	বিজ্ঞাপন
Advice	পরামর্শ/উপদেশ
Adviser	উপদেষ্টা
Additional	অতিরিক্ত
Ad interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Adjournment	মূলতবী
Adjusted	সমন্বিত
Admiral	নৌ-সেনাপতি
Adult education	বয়স্ক শিক্ষা
Advance	অগ্রিম
Agenda	আলোচ্যসূচি
Agreement	চুক্তি
Aid	সাহায্য
Alliance	মৈত্রীজোট
Allocate	বরাদ্দ করা
Allotment	বরাদ্দ
Allowance	ভাতা
Amended	সংশোধিত
Amendment	সংশোধন
Annexure	সংযুক্তি
Annual Confidential Report (ACR)	বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট
Antrhopology	নৃতত্ত্ব
Anticorruption	দুর্নীতি দমন
Appendix	পরিশিষ্ট
Applicant	আবেদনকারী
Argument	যুক্তি
Arrear	বকেয়া
Article	অনুচ্ছেদ
Assessee	করদাতা
Assessment	নির্ধারণ
Assessor	কর নির্ধারক
Assets	পরিসম্পদ
Associate	সহযোগী
Association	সংঘ
Attendance	হাজিরা
Attestation	সত্যায়ন
Attested	প্রত্যয়িত, সত্যায়িত
Audit	নিরীক্ষা
Authority	কর্তৃপক্ষ
Authorised	কর্তৃত্বপ্রাপ্ত
Autorgraph	স্বাক্ষর, স্বলেখন
Author	লেখক
Autonomous	স্বায়ত্তশাসিত
Autonomy	স্বায়ত্তশাসন
Average	গড়

B

Baggage	মালপত্র
Bail	জামিন
Ballot	ভোট
Bank draft	ব্যাংক ড্রাফট
Bankrupt	দেউলিয়া
Basic Education	বুনিয়াদি শিক্ষা
Basic pay	মূল বেতন
Balance	বাকি, উদ্বৃত্ত
Bank balance	ব্যাংকস্থিতি
Bar Association	আইনজীবী সমিতি
Bar Council	আইনজীবী পরিষদ
Bargaining	দরকষাকষি
Biased	পক্ষপাত দুষ্ট
Bio data	জীবন বৃত্তান্ত
Biology	জীববিদ্যা
Birth control	জন্ম নিয়ন্ত্রণ
Biography	জীবনী

Blue print	প্রতিচিত্র, নীলনকশা
Black list	কালো তালিকা
Body search	দেহতল্লাসি
Bond	মুচলেকা
Book-post	খোলা-ডাক
Budget allotment	বাজেট বরাদ্দ
Bureaucracy	আমলাতন্ত্র
Bumping	উঠানামা
By-law	উপআইন
By product	উপজাত
By-election	উপ-নির্বাচন

C

Cabinet	মন্ত্রিপরিষদ
Calendar	বর্ষপঞ্জি
Cancel	বাতিল করা
Care of (C/O)	প্রযত্নে
Cash	নগদ
Cash-memo	ক্যাশ-মেমো
Casual leave	নৈমিত্তিক ছুটি
Calligraphy	হস্তলিপি বিদ্যা
Call money	তলবি টাকা
Capital	পুঁজি
Cartoon	ব্যঙ্গচিত্র
Certificate	প্রত্যয়ন/প্রমাণপত্র/সনদপত্র
Certified	প্রত্যয়িত
Chalan	চালান
Chancellor	আচার্য
Chief Justice	প্রধান বিচারপতি
Chief Guest	প্রধান অতিথি
Circular	পরিপত্র
Citizen	নাগরিক
Civil Court	দেওয়ানি আদালত
Clam	দাবি
Client	মক্কেল
Co-education	সহশিক্ষা
Consolidate	একত্রীকৃত
Cold storage	হিমাগার
Cold war	স্নায়ু যুদ্ধ
Collaborator	সহযোগী
Compensation	ক্ষতিপূরণ
Conduct	আচরণ
Conductor	পরিচালক
Conference	সম্মেলন
Confidential	গোপনীয়
Consent	সম্মতি
Contempt of court	আদালত অবমাননা
Cordon	বেষ্টনি
Credit	জমা
Criticism	সমালোচনা
Curriculum	পাঠক্রম
Customer	খদ্দের
Cyclone	ঘূর্ণিঝড়
Compulsory	বাধ্যতামূলক
Complimentary Copy	সৌজন্য সংখ্যা
Compromise	আপস

D

Daily Balance	দৈনিক জের
Debit Balance	খরচের জের
Defence	প্রতিরক্ষা
Defendant	বিবাদী
Deputation	প্রেষণ
Discrepancy	গরমিল
Discrimination	বৈষম্যমূলক
Dispensary	ঔষধালয়
Dock worker	ডক শ্রমিক
Duty	শুল্ক
Daily allowance	দৈনিক ভাতা
Data	উপাত্ত
Death rate	মৃত্যুহার
Debate	বিতর্ক
Debit	খরচ
Defamation	মানহানি
Defaulter	খেলাপি
Deficit	ঘাটতি
Deligation	প্রতিনিধিবর্গ
Demotion	পদাবনতি

Deposit	আমানত
Despatch	প্রেরণ করা
Design	নকশা
Diplomacy	কূটনীতি
Discharge	বরখাস্ত, খালাস
Dismiss	পদচ্যুত করা
Disolve	ভেঙে দেয়া
Dual	দ্বৈত
Due	বাকি, বকেয়া, দেয়
Due date	নির্দিষ্ট তারিখ
Duplicate	দ্বিতীয়ক, প্রতিরূপ
Duplicate copy	অনুলিপি

E

Earnest money	জামানত
Earned leave	অর্জিত ছুটি
Eid advance	ঈদ অগ্রিম
Edition	সংস্করণ
Editor	সম্পাদক
Editorial	সম্পাদকীয়
Educationst	শিক্ষাবিদ
e.g.	যেমন
Efficiency	সামর্থ্য, কর্মদক্ষতা
Employee	কমর্চারী
Employer	নিয়োগকর্তা
Enclosure	সংলগ্নী
Enchyclopaedia	বিশ্বকোষ
Employment	কর্মসংস্থান/চাকুরি
Enclosure	সংলগ্নী
Enquiry	তদন্ত
Enquiry Commission	তদন্ত কমিশন
Enrol	তালিকাভুক্ত করা
Enterpriser	উদ্যোক্তা
Entertainment	চিত্তবিনোদন
Environment	পরিবেশ
Envoy	দূত
Equation	সমীকরণ
Equipment	উপকরণ, সরঞ্জাম
Escort	প্রহরী/রক্ষী
Estimate	মূল্যানুমান, প্রাক্কলন
Ethics	নীতিমালা
Evaluation	মূল্যায়ন
Examine	পরীক্ষা
Excise	আবগারি
Excise duty	আবগারি শুল্ক
Export promotion	রপ্তানী উন্নয়ন
Exhibition	প্রদর্শনী
Exit	নির্গম
Ex-officio	পদাধিকারী
Extension	বৃদ্ধি
Expenditure	ব্যয়
Experiment	নিরীক্ষা, পরীক্ষণ
Expert	বিশেষজ্ঞ
Expiry	অবসান, মৃত্যু
Eye wash	ধোঁকা

F

Factories	কলকারখানা
Faculty	অনুষদ
Fair	মেলা, ন্যায্য
Fare	যাত্রী ভাড়া
Fiction	কথা সাহিত্য
Filing	নথিভুক্ত
First aid	প্রাথমিক চিকিৎসা
Fixation	স্থায়ী/স্থিরকরণ
Flaxible	নমনীয়
Formation	গঠন
Foreman	সর্দার, কর্মনায়ক
Forwarded	প্রেরিত
Founder	প্রতিষ্ঠাতা
Free market	খোলা বাজার/মুক্তবাজার
Free trade	অবাধ বাণিজ্য
Fundamental	মৌলিক
Fundmentalist	মৌলবাদী
Field worker	মাঠকর্মী
Final report	চূড়ান্ত প্রতিবেদন
Financial year	অর্থ বছর
Fire Service	দমকল বাহিনী

Firm	খামার/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান
Foreign aid	বৈদেশিক সাহায্য
Freight	মাশুল

G

Gain	লাভ
Global	বৈশ্বিক
Godown	গুদাম
Goods	পণ্য, মাল
Goodwill	সুনাম
Governing body	পরিচালনা পর্ষদ
Grade	পর্যায়
Gratuity	আনুতোষিক
Gravitation	মহাকর্ষ
Guardian	অভিভাবক
Gymnasium	ব্যায়মাগার
Gist	সারমর্ম
Good conduct	শিষ্টাচার
Govt. Security	সরকারি ঋণপত্র
Grant	অনুদান/মঞ্জুরি
Growth	প্রবৃদ্ধি

H

Hand bill	প্রচারপত্র, ইশতেহার
Handicraft	হস্তশিল্প
Handloom	তাঁত
Hangar	বিমানশালা
Harbour	পোতাশ্রয়
Hard money	নগদ টাকা
Hawker	ফেরিওয়ালা
Headline	শিরোনাম
Hearing	শুনানী
Haggling	দর কষাকষি
Hijacker	ছিনতাইকারী
Home Minister	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
Hostage	জিম্মি
Housing	আবাসন
Humidity	আর্দ্রতা
Humanity	মানবতা
House Search	গৃহ তল্লাশি
House building advance	গৃহ নির্মাণ ঋণ
Housing and Settlement	গৃহ সংস্থা

I

Ideology	মতাদর্শ
Idiom	বাগধারা
Identification	শনাক্তকরণ
Identified	শনাক্তকৃত
Identity	পরিচয়
Illustration	উদাহরণ, চিত্রণ
Illiterate	নিরক্ষর
Incidental	আনুষঙ্গিক খরচ
Incumbent	পদধারী
Indemnity	ক্ষতিপূরণ
Index	নির্দেশক, নির্ঘণ্ট
Industry	শিল্প
Inefficient	অযোগ্য
Initial	প্রারম্ভিক, অনুস্বাক্ষর
Inquiry	অনুসন্ধান
Insolvent	দেউলিয়া
Inspection	পরিদর্শন
Inspector	পরিদর্শক
Invigilator	পর্যবেক্ষক
Instrument	যন্ত্র
Intellectual	বুদ্ধিজীবী
Instalment	কিস্তি
Institute	সংস্থা, প্রতিষ্ঠান
Instruction	নির্দেশ
Interim	অন্তর্বর্তীকালীন
Internal	আভ্যন্তরীণ
Interpreter	দোভাষী
Interval	বিরাম, বিরতি
Irregular	অনিয়মিত
Interest	সুদ
Immigration	বহির্গমন
Implementation	বাস্তবায়ন
In-charge	ভারপ্রাপ্ত
Incidental	আনুষজ্ঞিক
Income tax	আয়কর

Inspector পরিদর্শক
Inspector-General মহা-পরিদর্শক
Investment বিনিয়োগ

J

Jobber দালাল
Joint Account যুক্ত হিসাব
Joint Editor যুগ্ম সম্পাদক
Joint Secretary যুগ্ম সচিব
Journal পত্রিকা
Judge বিচারক
Judgement রায়
Judiciary বিচার বিভাগ
Joint collaboration যৌথ সহযোগিতা
Joint venture যৌথ উদ্যোগ
Junior কনিষ্ঠ
Jute goods পাটজাত দ্রব্য
Jute mill চটকল

K

Keeper রক্ষক
Keying সূত্রানুসন্ধান
Key note মূলভাব
Kidnapper অপহরণকারী
Know-how কৌশল

L

Labour court শ্রম আদালত
Land Record ভূমি রেকর্ড/পরচা
Land revenue জমির খাজনা/খাজনা
Land tax জমির খাজনা/খাজনা
Landing অবতরণ
Landlord জমিদার
Lease ইজারা
Leave ছুটি
Lecturer প্রভাষক
Ledger খতিয়ান
Leftist বামপন্থি
Lender মহাজন
Library গ্রন্থাগার
Liguistics ভাষাবিজ্ঞান
Literate স্বাক্ষর
Lobbying তদবির
Liabilities দায়-দায়িত্ব
Livestock পশুপালন
Look after দেখাশুনা করা

M

Magistrate হাকিম
Management ব্যবস্থাপনা
Manpower employment জনশক্তি কর্মসংস্থান
Marginal প্রান্তিক
Manketing বিপণন
Mass Communication গণ যোগাযোগ
Magnet চুম্বক
Mail ডাক
Maintenance রক্ষণাবেক্ষণ
Majority সংখ্যাগুরু
Makeup রূপসজ্জা
Manuscript পাণ্ডুলিপি
Martial Court সামরিক আদালত
Mass educaton গণশিক্ষা
Mass-media গণমাধ্যম
Materialism বস্তুবাদ
Maternity মাতৃসদন
Manifesto ইশতেহার
Memo স্মারক
Memorandum স্মারকলিপি
Message বার্তা
Misconduct দুর্ব্যবহার
Microseope অণুবীক্ষণ যন্ত্র
Middle class মধ্যশ্রেণি/মধ্যবিত্ত শ্রেণি
Midwife ধাত্রী
Mint টাকশাল
Miscellaneous বিবিধ
Monsoon মৌসুমী বায়ু, বর্ষা
Mortgage বন্ধক
Mortality মৃত্যুহার
Mutual পারস্পরিক
Mythology পুরাণ, পুরাতত্ত্ব

Mercantile Marine নৌ-বাণিজ্য
Metropolitan Magistrate মহানগর হাকিম
Metropolitan Police মহানগর পুলিশ
Minimum Wage নিম্নতম মজুরি

N

Nominal নামমাত্র
Note মন্তব্য
Nutrition পুষ্টি
Nationality Certificate জাতীয়তা সনদপত্র
News commentary সংবাদভাষ্য
Notice নোটিশ
Notification প্রজ্ঞাপন
Nuclear পারমাণবিক

O

Oath শপথ
Obedient অনুগত
Observation পর্যবেক্ষণ
On approval অনুমোদন সাপেক্ষে
On demand চাহিবামাত্র
On deputation প্রেষণে
Optics আলোক বিজ্ঞান
Optional ঐচ্ছিক
Orpanage এতিমখানা, অনাথাশ্রম
Office দপ্তর
Official দাপ্তরিক
On duty কর্তব্যরত
Ordinance অধ্যাদেশ
Organization সংগঠন

P

Para অনুচ্ছেদ
Parade কুচকাওয়াজ
Parallel সমান্তরাল
Panel নামসূচি
Particulars বিবরণ
Pathology রোগবিদ্যা
Pen-name ছদ্মনাম (লেখকের)
Pessimism দুঃখবাদ
Philology ভাষাবিদ্যা
Phonetics ধ্বনিবিজ্ঞান
Pleader উকিল
Poetics সাহিত্যতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব
Poster প্রাচীরপত্র
Post Graduate স্নাতকোত্তর
Post mortem ময়নাতদন্ত
Preface ভূমিকা
Press-note সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
Project প্রকল্প
Proposal প্রস্তাব
Provision বিধান
Provost প্রাধ্যক্ষ
Psychology মনোবিজ্ঞান
Publication প্রকাশ, প্রকাশনা
Publicity প্রচার
Public sector সরকারি খাত
Put up পেশ করা
Passport পাসপোর্ট/ছাড়পত্র
Pay Fixation বেতন নির্ধারণ
Pay increase বেতন বৃদ্ধি
Permanent স্থায়ী
Postage ডাকমাশুল
Prescription ব্যবস্থাপত্র
Printing মুদ্রণ
Probation শিক্ষানবিসী
Promotion পদোন্নতি
Provisional সাময়িক
Public Health জনস্বাস্থ্য
Public holiday সাধারণ ছুটি

Q

Quack হাতুড়ে
Quarters আবাস
Query জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন
Queue সারি
Questionnaire প্রশ্নমালা
Quarterly ত্রৈমাসিক
Quotation মূল্যজ্ঞাপন, দরপত্র
Quote উদ্ধৃত করা

Quoted	উদ্ধৃত

R

Race	জাতি, দৌড়
Radiation	বিকিরণ
Radical	মৌলিক
Radius	ব্যাসার্ধ
Rank	পদমর্যাদা
Rationalism	যুক্তিবাদ
Rating	নির্ধারণ
Realist	বাস্তববাদী
Rebate	বাটা
Recreation	বিনোদন
Renewal	নবায়ন
Republic	প্রজাতন্ত্র
Reprint	পুনর্মুদ্রণ
Requisition	অধিযাচন, তলব
Research	গবেষণা
Reserved	সংরক্ষিত
Retirement	অবসর
Re-union	পুনর্মিলন
Review	পুনর্মূল্যায়ন
Revised	সংশোধিত
Rural	গ্রামীণ
Recruitment	নবনিয়োগ
Regulation	প্রবিধান
Remark	মন্তব্য
Residence	বাসা
Residential	আবাসিক
Revenue	রাজস্ব
Rural Development	পল্লি উন্নয়ন
Rural Electrification	পল্লি বিদ্যুতায়ন

S

Sale tax	বিক্রয় কর
Safeguard	রক্ষাকবচ
Sample	নমুনা
Sanitation	স্বাস্থ্য ব্যবস্থা
Satellite	উপগ্রহ
Schedule	তফসিল, তালিকা, সময়সূচি
Screening	বাছাই
Script	লিপি
Sector	খাত
Secular	ধর্ম নিরপেক্ষ
Secularism	ধর্ম নিরপেক্ষতা
Security	জামিন, নিরাপত্তা
Seniority	জ্যেষ্ঠতা
Settlement	নিষ্পত্তি
Session	অধিবেশন
Signature	স্বাক্ষর
Socialism	সমাজতন্ত্র
Solar eclipse	সূর্যগ্রহণ
Sovereign	সার্বভৌম
Specialist	বিশেষজ্ঞ
Specimen	নমুনা
Spokesman	মুখপাত্র
Statement	বিবৃতি, বিবরণ
Statutory	সংবিধিবদ্ধ
Stenotypist	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক
Strike	ধর্মঘট
Study	শিক্ষা
Study Leave	শিক্ষা ছুটি
Subjudice	বিচারাধীন
Submission	পেশ, দাখিল
Sub-rule	উপবিধি
Sub-section	উপ-ধারা
Subsidiary	সম্পূরক
Surgeon	শল্য চিকিৎসক
Surrender	আত্মসমর্পণ
Syllabus	পাঠ্যসূচি, সিলেবাস
Synonymous	সমার্থক
System	পদ্ধতি
Search warrant	তল্লাসী পরোয়ানা
Selection Committee	বাছাই কমিটি
Social Service	সমাজ সেবা
Standing Committee	স্থায়ী কমিটি
Steering Committee	পরিচালনা কমিটি
Summary	সার সংক্ষেপ
Supplement	ক্রোড়পত্র

Survey জরিপ

T

T.A. ভ্রমণ ভাতা

Take over কার্যভার গ্রহণ

Taxable করযোগ্য

Tarriff মাশুল, শুল্ক

Tenancy প্রজাস্বত্ব

Tenure ধারণকাল, মধ্যস্বত্ব

Termination অবসান

Terminology পরিভাষা

Terrorist সন্ত্রাসী

Testimonial প্রশংসাপত্র

Thesis গবেষণাপত্র

Tidal bore জলোচ্ছ্বাস

Tariff শুল্ক

Technology প্রযুক্তি

Telegraph তার

Town Development শহর উন্নয়ন

Traffic jam যানজট

Transport যানবাহন/পরিবহণ

U

Ultimatum চরমপত্র

Undersigned নিম্নস্বাক্ষরকারী

Un-employed বেকার

Unpaid অপরিশোধিত

Unskilled অদক্ষ

Up-to-date হালনাগাদ

Urban পৌর

Undertaking অঙ্গীকার

Uniform উর্দি

Urban Development নগর উন্নয়ন

V

Vacancy খালি

Vacation অবকাশ

Caccination টিকা, টিকাদান

Vegetarian নিরীমিষাশী

Valid বৈধ

Valuation মূল্য নির্ধারণ

Venue স্থান

Verbal মৌখিক

Verification প্রতিপাদন

Vice-versa তদ্বিপরীত

Violation লংঘন

Visitor সাক্ষাৎপ্রার্থী

Voluntary স্বেচ্ছাসেবক

Voucher রসিদ

W

Wages মজুরি

Waiter খাদ্য পরিবেশক

War criminal যুদ্ধাপরাধী

Warrent পরোয়ানা

Wastage অপচয়

Weekly সাপ্তাহিক

White paper শ্বেতপত্র

Wireless বেতার

Wit রসিকতা

Writ রিট

Water Transport নৌ পরিবহণ

Wealth সম্পদ

Weather আবহাওয়া

X

X-ray রঞ্জনরশ্মি

Y

Yard অঙ্গন

Year বর্ষ

Year Book বর্ষপঞ্জি

Yearly বার্ষিক

Yours faithfully আপনার বিশ্বস্ত

Z

Zodiac রাশিচক্র

Zonal আঞ্চলিক

Zonal Office আঞ্চলিক কার্যালয়

Zone অঞ্চল

Zoo চিড়িয়াখানা

Zoology প্রাণিবিদ্যা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন :

১. আইন সম্পর্কিত দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
২. বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর বিষয়ক দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
৩. আপনার জানা যে কোন দশটি পারিভাষিক শব্দ লিখুন।
৪. নিচের ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক শব্দ লিখুন–

Autonomous	Bargaining	Circular	Death rate
Evaluation	Field worker	Humanity	Incidental
Manuscript	Post mortem	Quotation	Remark
Study Leave	Technology		

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. পরিভাষার সংজ্ঞার্থ লিখুন।
২. পারিভাষিক শব্দ কীভাবে চেনা যায়।
৩. পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৪. পরিভাষার প্রয়োগবিধি লিখুন।
৫. বাংলা পরিভাষা রচনার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখুন।
৬. পরিভাষা তৈরির নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
৭. নিচের ইংরেজি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক শব্দ লিখুন–

Arrear
Bankrupt
Civil Court
Demotion
Fiction
Harbour
Interpreter
Lease
Mandate
Oath
Provision
Requisition
Secularism
Surgeon
Tariff
Visitor
Writ
Zonal Office

পাঠ ৮.৬ : অনুবাদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অনুবাদ কী তা বলতে পারবেন।
- অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা কী সে সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জ্ঞানবিস্তারে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অনুবাদের সাহায্যেই পৃথিবীর বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা সম্পর্কে সাধারণ পাঠক জ্ঞান লাভ করতে পারে। অনুবাদ হলো কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা। কোনো রচনার বক্তব্য বিষয়কে পরিবর্তন না করে শুধু ভাষার পরিবর্তনকেই অনুবাদ বলা হয়। কোনো ভাষার সমৃদ্ধি সাধনে ও বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

> **অনুবাদ হলো কোনো বক্তব্য বা রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা। কোনো রচনার বক্তব্য বিষয়কে পরিবর্তন না করে শুধু ভাষার পরিবর্তনকেই অনুবাদ বলা হয়।**

বিশ্বের অগণিত ভাষায় যে বিপুল জ্ঞানচর্চা হচ্ছে, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব এবং মানববিদ্যার যে কোনো বিষয় নিয়ে জ্ঞানের যে প্রবাহ বিকাশ লাভ করছে তা সারাবিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছানোর অন্যতম উপায় হল অনুবাদ। অনুবাদের গুরুত্বের কারণে বিভিন্ন সাহিত্যে অনুবাদ নামক বিশেষ এক শাখা গড়ে উঠেছে। অনুবাদের দ্বারা পরস্পরের ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

অনুবাদের শ্রেণিবিভাগ

অনুবাদ কাজকে দুই ভাগে ভাগকরা যায়। যেমন :

ক) আক্ষরিক অনুবাদ

খ) ভাবানুবাদ

মূল ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়। আক্ষরিক অনুবাদে ভাবার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না। 'Many men many mind'এই বাক্যের অর্থ যদি করা হয় 'অনেক মানুষ অনেক মন'-- তাহলে তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায়।

মূল ভাষার ভাব ঠিক রেখে সুবিধামত নিজের ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করাকে ভাবানুবাদ বলা হয়। ভাবানুবাদে মূল রচনার প্রতিটি শব্দের অনুবাদ করা হয় না। 'Many men many mind'এই বাক্যের অর্থ যদি করা হয় 'নানা মুনির নানা মত'– তাহলে তাকে ভাবানুবাদ বলা যায়।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের নমুনা

১. Students have youth and energy. They are filled with high ideals. They are free from the responsibility of maintaining families. So it is easy for them to devote themselves to social service besides their normal duty of acquiring knowledge.
অনুবাদ : **ছাত্রদের আছে যৌবন ও শক্তি। তাদের মন উচ্চাদর্শে পরিপূর্ণ। তারা পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব থেকেও মুক্ত। তাই জ্ঞানার্জনের স্বাভাবিক কর্তব্যের বাইরে তারা সমাজসেবায় নিজেদের সহজে নিয়োজিত করতে পারে।**

২. No man can live alone. When we are children, the family protects us. When we grow up, we need the help of all the people round us. If we try to live alone, our lives are no better than those of animals. Our fathers an mothers, our teachers, our government, our nation, all these train us to do our duty.
অনুবাদ : **কোনো মানুষই একাকী বাস করতে পারে না। আমরা যখন শিশু থাকি, তখন আমাদের পরিজনবর্গ আমাদের প্রতিপালন করেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের আশেপাশের সকলেরই সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হয়।**

৩. Our country is very fertile. On the plains of this country grow crops of various kinds. Paddy and wheat are our staple food. Jute grows abundantly in Bangladesh. Jute is sold to the different countries. So jute is rightly called the `golden fibre'.
অনুবাদ : **আমাদের দেশ অত্যন্ত উর্বর। এদেশের সমতল ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার শস্য জন্মে। আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধান ও গম। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। পাট বিভিন্ন দেশে বিক্রি করা হয়। পাটকে তাই যথার্থই সোনালি আঁশ বলা হয়।**

৪. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lesson interesting. She keeps pupils and students awake.
অনুবাদ : **যে কোনো দেশে একজন ভাল শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ লোকদের অন্যতম। বাংলাদেশে ভাল শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন ভাল শিক্ষক পাঠদানকে আনন্দদায়ক করে তোলেন। তিনি ছাত্রদের সতর্ক রাখেন।**

৫. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early can enjoy the fine air of the morning. He can take a walk by the river side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds.
অনুবাদ : **সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। যে বালক সকালে উঠে সে সকালের চমৎকার বাতাস উপভোগ করে। সে নদীর ধারে বা খোলা মাঠে বেড়াতে পারে। সে পাখির মধুর গান শুনতে পারে।**

৬. A newspaper is a storehouse of knowledge.We can know the conditions of other countries from a newspaper. It is, in fact, the summary of all current history. In this scientific age the world without newspaper is unthinkable.
অনুবাদ : **সংবাদপত্র হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। আমরা সংবাদপত্র থেকে অন্যান্য দেশের অবস্থা জানতে পারি। আসলে এটি সমসাময়িক ইতিহাসের সারকথা। এই বৈজ্ঞানিক যুগে সংবাদপত্র ছাড়া পৃথিবীকে চিন্তা করা যায় না।**

৭. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment.Those who smoke cannot live long. Smoking causes cancer,heart attack. So everyone should give up smoking.
অনুবাদ : **ধূমপান মারাত্মক ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও বটে। ধূমপান পরিবেশকে দূষিত করে। যারা ধূমপান করে তারা বেশিদিন বাঁচে না। ধূমপান থেকে ক্যান্সার, হৃদরোগ সৃষ্টি হয়। তাই প্রত্যেকেরই ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।**

৮. You must have heard the name of Quazi Nazrul Islam. He is a famous poet. His contribution to Bengali literature is incomparable. He is a poet of life and of youth. He is source of our inspiration.
অনুবাদ : **তোমরা অবশ্যই কাজী নজরুল ইসলামের নাম শুনে থাকবে। তিনি একজন বিখ্যাত কবি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান তুলনাহীন। তিনি জীবনের কবি, যৌবনের কবি। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস।**

৯. We are the inhabitants of an independent country. Freedom is the right of man. But no nation can achieve it without effort. Again, the people of a country must be determined to defend it. It is the sacred duty of every citizen to defend the freedom of the motherland.
অনুবাদ : **আমরা স্বাধীন দেশের বাসিন্দা। স্বাধীনতা মানুষের অধিকার। তবে চেষ্টা ছাড়া কোনো জাতি তা অর্জন করতে পারে না। আবার, দেশের জনগণকে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সংকল্পবদ্ধ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব।**

১০. We live in society. So we must learn to live in peace and amity with others. We have to respect others life and property. We have a lot of duties and responsibilities to the society.
অনুবাদ : **আমরা সমাজে বাস করি। তাই আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, কীভাবে অন্যদের সাথে শান্তিতে ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। অন্যের জান-মালের প্রতিও সম্মান দেখাতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।**

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অনুবাদ কী ? অনুবাদের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

২। অনুবাদ কত প্রকার ও কী কী ব্যাখ্যা করুন।

৩। অনুবাদ লিখুন।

ক. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired throgh all our works from our childhood. Childhood is the seed-time. The habit formed at this time will continue all through our life. æEverything at right time" should be our motto.

খ. Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlesness. An honest man passes his days in respect and happiness. Honesty is the best policy.

গ. Patriotism is love for one's country. It is powerful sentiment and wholly usselfish and noble. A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. It is idealism that gives courage and strenght. But false patriotism makes a man narrow-minded and selfish.

ঘ. We are living in an age of science. Science has discovered and invented many things. We use them in our daily life for our comfort and convenience. Electricity is one of the greatest and most important gift of science to man. Electricity has almost changed the mode of our life.

ঙ. The newspaper is a very useful thing. At present we find many newspapers in Bangladesh. Newspaper helps the progress of a nation. People are eager to know what is going on in the world. They can know this and that by reading the newspaper. It gives us all sorts of news of our own land as well as foreign lands.

চ. The necessity of learning English cannot be ever-stated. English is an international language. It is essential in our day-to-day activities. We must know English in order to go in for any job. There is handly any situation where the employees can do without English.

ছ. Bangladesh is not a very big country. But it is one of the most densely populated countries in the world. More than one hundred and four million people live in this small country. Its population is still on the increase. If the present rate of increase continues uncontrolled, her population will be doubled within next twenty years.

জ. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable in him. A good teacher discovers the treasure hidden inside each student.

ঝ. Computer is the new miracle of science. It can make thousand of calculations in a moment. It can store in its memory millions of facts and figures. It can also recall them at ease. In our country the use of computer is growing rapidly. Now a day computers are used in banks, shops, airlines, offices, libraries, everywhere. It seems that computer is going to dominate the future civilization of man.

ঞ. It is impossible to describe the beauty of the Taj Mahal in words. It has been called a dream in marble' and 'a tear drop on the forehead of time' but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj Mahal is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river.

পাঠ ৮.৭ : অনুচ্ছেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অনুচ্ছেদ কী তার বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদের সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদের প্রকারভেদ লিখতে পারবেন।
- অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ইংরেজি paragraph–এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ অনুচ্ছেদ। কম কথায় ও কম লেখায় কোনো বিষয়কে অনুচ্ছেদ আকারে প্রকাশ করা হয়। মূল বক্তব্যকে সহজ-সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করাই অনুচ্ছেদ রচনার উদ্দেশ্য।

অনুচ্ছেদ অর্থ হলো ছোট আকারের গদ্য রচনা। কোনো একটি বিষয়কে শিরোনাম করে সে বিষয়ে মোটামুটি পরিপূর্ণভাবে ছোট আকারের যে রচনা তাকে অনুচ্ছেদ বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো একটি বিষয়ের বক্তব্য প্রকাশের জন্য পরস্পর সম্পর্কিত কিছু বাক্যের সমষ্টিকে অনুচ্ছেদ বলা হয়। অল্প সময়ে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করতে হয় বলেই অনুচ্ছেদ আকারে ছোট হয়।

কোন একটি বিষয়কে শিরোনাম করে সে বিষয়ে মোটামুটি পরিপূর্ণভাবে ছোট আকারের যে রচনা তাকে অনুচ্ছেদ বলা হয়।

অনুচ্ছেদের প্রকারভেদ

অনুচ্ছেদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক) বস্তুনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ
খ) ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা

অনুচ্ছেদে অল্প কথায় পূর্ণাঙ্গ একটি বিষয়কে প্রকাশ করা যায় বলে একে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বলে মনে করা হয়। বক্তব্যকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উপস্থাপনের জন্য অনুচ্ছেদ রচনার বাস্তব ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনুচ্ছেদে মূল কথাগুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হয় বলে সবার কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়।

অনুচ্ছেদ রচনার নিয়ম

- সহজ-সরল ও ছোট আকারে বক্তব্য প্রকাশই অনুচ্ছেদ রচনার মূল প্রতিপাদ্য।
- অনুচ্ছেদ একটি প্যারাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
- শুরুতে শিরোনাম দিয়ে একটি প্যারার মধ্যে সূচনা, মূল বক্তব্য ও মন্তব্যকে উপস্থাপন করতে হবে।
- অনুচ্ছেদে উপমা-অলংকারের ব্যবহার না করাই সমীচীন।
- সাধু ও চলতি ভাষা একসঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে না।
- অনুচ্ছেদ আকারে ছোট হলেও বক্তব্য হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কতিপয় অনুচ্ছেদ রচনার নমুনা

বাংলাদেশের উৎসব

বৈচিত্র্যময় দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। উৎসবে-উপলক্ষ্যে-আয়োজনে বাংলাদেশ প্রায় সারা বছরই মুখর থাকে। বিভিন্ন উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এদেশের শত দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ উৎসবমুখী। এই উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পারিবারিক–ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব। বাংলাদেশ একটি উদার সহিষ্ণু দেশ। জাতীয় নানা উৎসবের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। নববর্ষের উৎসব বাংলাদেশের সব মানুষের উৎসব। এটি একটি সর্বজনীন ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। বর্ণ–ধর্ম নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ বাঙালি হিসেবে নিজের পরিচয় তুলে ধরে। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত পরিচয়টি ফুটে ওঠে। সামাজিক উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের সমাজবন্ধন-সম্প্রীতি ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক উৎসব ও সামাজিক উৎসবের মধ্যে মূলত তেমন পার্থক্য করা যায় না। পারিবারিক উৎসবগুলোও সামাজিক উৎসবের নামান্তর। বিবাহ-জন্মদিন প্রভৃতি উৎসবগুলো পারিবারিক গণ্ডি ছাপিয়ে সামাজিক উৎসবের রূপ লাভ করে। কৃষিভিত্তিক নবান্ন উৎসবটিও একইসঙ্গে পারিবারিক ও সামজিক উৎসব হয়ে ওঠে। নবান্নতে আত্মীয়স্বজন ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশে ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে ইদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা। মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ রীতি মেনে এইসব উৎসব পালন করে থাকে। উৎসব বাঙালির প্রাণ, বাঙালির আনন্দ। ধর্মীয় উৎসবগুলোও এখন সামাজিক রূপ নিয়েছে। বছরব্যাপী উৎসব হওয়াতে আমাদের অর্থনীতি ও ব্যবসাবাণিজ্যেও এর দারুণ সুফল লক্ষ করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে, ভালো বেচাকেনা হয়, মানুষের জীবনে সচ্ছলতা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে ঘিরেই মানুষের আবেগ প্রকাশ পায়। বাঙালির এই আবেগ ও মমতার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে **১৯৫২** সালের **২১**শে ফেব্রুয়ারিতে। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এইদিনে বাঙালি সন্তানেরা প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই দিনটিই সারা বিশ্বে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। **১৭**ই নভেম্বর **১৯৯৯** জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা এর সদরদপ্তর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ২০০০ সাল থেকে জাতিসংঘের সদস্য **১৮৮**টি দেশে এই দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হচ্ছে। বাংলার গৌরব ও অহংকার আজ ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। প্রথম দিকে **২১**শে ফেব্রুয়ারি শহিদদিবস হিসেবে পালিত হতো, তারপর পালিত হয় ভাষাদিবস হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। সব ভাষাই মূল্যবান, সব ভাষাই মানুষের ঐতিহ্য– এই চেতনার বিকাশ ঘটেছে মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থেকে। মূলত নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাই হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য।

বর্ষণমুখর দিন

আষাঢ়ের পথ ধরেই আসে বর্ষা। শ্রাবণে বর্ষা পায় পূর্ণ রূপ। সকাল থেকেই কালো মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। শ্রাবণের এই দিনে মেঘ-বৃষ্টির খেলা। গ্রীষ্মের দাবদাহে বর্ষা নিয়ে আসে স্বস্তির পরশ। বড় খেয়ালি এই বর্ষার দিন। কখনো অতিবর্ষণ, কখনো অল্পবর্ষণ, কখনো বা প্লাবন বা বন্যা। বর্ষণমুখর দিনে হঠাৎ অন্ধকার করে আসে, কখনো বা শুরু হয় বিজলির চমকানি। সবুজ শ্যামল গাছেরা ভিজতে থাকে অঝোর ধারায়। সমস্ত পশুপাখি নীড়ে আশ্রয় নেয়, মানুষও ঘরে থেকে উপভোগ করে বর্ষার সৌন্দর্য। দিনের বেলাতেও নিবিড় অন্ধকার চারপাশ আবৃত করে রাখে। একটানা বৃষ্টিতে ধান-পাট ক্ষেতের উপর দিয়ে বয়ে যায় বাতাসের ঢেউ। ডোবা-নালা থেকে ব্যাঙের ডাক, ঘরে দীর্ঘ কর্মহীন দিন। অঝোর ধারাবর্ষণ এই সময়ে মানুষের মনকে উদাস করে তোলে। বর্ষা মানবমনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। মানবমন হয়ে ওঠে চঞ্চল, পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা জেগে ওঠে মানুষের মনের কোণে। কবিহৃদয়ে বর্ষার আবেদন গভীর। কবি কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু কবি বর্ষা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বর্ষা ও বিরহ নিয়ে লেখা হয়েছে কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য 'মেঘদূতম্', মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রচনা করেছেন বর্ষাবিরহের পদ, গোবিন্দদাস রচনা করেছেন বর্ষাভিসার

বিষয়ক পদাবলি। তবে একটানা বর্ষণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে সংকট ডেকে আনে। যারা কায়িক শ্রমের বিনিময়ে দিন এনে দিন খায় তাদের জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এই সময়ে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৪ বছরের শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে বাঙালি জাতি তার কষ্টার্জিত মুক্তি লাভ করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এই মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির গৌরব, আমাদের অহংকার। মুক্তিযদ্ধের ইতিহাসকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে সেই ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এটি বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ। ঢাকার সেগুনবাগিচা এলাকায় এই জাদুঘরের অবস্থান। কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তির উদ্যোগে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য এটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশপথের মুখেই রয়েছে 'শিখা চির অম্লান'। এই জাদুঘরটি দ্বিতলা ছিল। গত ১৫ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নয় তলাবিশিষ্ট নতুন ভবনে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরটি স্থানান্তর করা হয় এবং পরের দিন ১৬ এপ্রিল 'শিখা চির অম্লান' প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রায় দুই বিঘা জায়গাজুড়ে নির্মিত ভবনের ব্যবহারযোগ্য আয়তন ১ লক্ষ ৮৫ হাজার বর্গফুট। মুক্তিযুদ্ধের নানা তথ্য, প্রমাণ, দলিল, ছবি, নিদর্শন, রেকর্ডপত্র, স্মারকচিত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা রয়েছে এই জাদুঘরে। বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতির হাজার বছরের ধারবাহিকতা সংরক্ষিত হয়েছে এখানে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে এই প্রজন্মের তরুণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেয়াই এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য। এই জাদুঘর প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে যা আমাদের এই মহান ইতিহাসের চেতনাকে বিকশিত করে তুলবে দিন দিন। তবে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব বাড়াতে এই জাদুঘরকে কেবল সংগ্রহশালা ও প্রদর্শনশালা হিসেবে ব্যবহার করলে চলবে না। সবধরনের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একে আরও উন্নত করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত পোশাক শিল্প। 'পোশাককন্যা' নামটি পোশাকশিল্পের কারণেই আজ এত বিখ্যাত। কারণ বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে সবচাইতে বেশি শ্রম দেয় নারীরাই। বাংলাদেশের শিল্পায়নে এই তৈরি পোশাকশিল্প বর্তমানে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিল্পায়ন শুরু হয়েছে শিল্প বা পোশাকশিল্পের মাধ্যমে। তৈরি পোশাক বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। স্বাধীনতার আগে আমরা যখন পশ্চিম পাকস্তানিদের অধীনে ছিলাম তখন পোশাকশিল্প নিয়ে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। মূলত ১৯৭৬ সাল থেকেই এদেশে পোশাকশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দেশের তৈরি পোশাকশিল্প জাতীয় আয়ের ৬৪ শতাংশ সরবরাহ করছে। বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ নরনারী পোশাকশিল্পে কর্মরত। তার মধ্যে ৮৫ শতাংশ নারী। আমাদের পোশাক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের স্থান পঞ্চম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারপরেই ইউরোপ ও কানাডা। বিশ্বের ১২২টিরও বেশি দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি করা হয়। এর বাজার যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি এর উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যা সমাধান, দ্রুত শিল্পায়নে পোশাকশিল্পের ভূমিকা বিরাট। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও মুক্ত বাজারের চাপ এ শিল্পকে বেশ খানিকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেছে। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও সম্প্রসারণ করা দরকার। বর্তমান সরকার এই শিল্পের বিকাশে নানারকম সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন। বাণিজ্য মেলার আয়োজন করছেন এবং বাংলাদেশকে এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত করাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

ইন্টারনেট

একুশ শতক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির শতক। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। ইন্টারনেট তার দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগ হলো তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। ইন্টারনেট একটি বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বাহিনী সর্বপ্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সফটওয়ার এর মূল উপকরণ। বর্তমানে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে ইন্টারনেটের ছোঁয়া লাগেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিয়েছে। মাত্র কয়েক

সেকেন্ডের মধ্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজেই ই-মেইল পাঠিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রিকা, ম্যাগাজিন পড়া যায়। লাইব্রেরিতে লেখাপড়া করা যায়, ক্যাটালগ দেখে ইচ্ছেমত বই বাছাই করা যায়। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রিন্টও করা যায়। ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দেখে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ইন্টারনেটে দেশে-বিদেশের ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ইন্টারনেটে ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে সমস্ত রকম সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। ইন্টারনেটের বিরাট সুফলের পাশাপাশি কিছু কুফলও রয়েছে। ইন্টারনেট আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর বহুমুখী ব্যবহার মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

ছিটমহল বিনিময়

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ছিটমহল বিনিময় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ছিটমহল হলো একটি রাষ্ট্রের ভেতর অন্য রাষ্ট্রের কোনো ভূখণ্ড থাকা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হবার সময় এই ছিটমহলের উৎপত্তি হয়। রেডক্লিফের তৈরি মানচিত্রের কারণে এই ছিটমহল সংকটের সৃষ্টি হয়। বিতর্কিত বিভাজনের ফলে এক দেশের ভূখণ্ডে থেকে যায় অন্য দেশের অংশ। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ভারতের ১১১টি ছিটমহল ছিল বাংলাদেশের ভেতরে এবং বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ছিল ভারতের ভূখণ্ডে। ছিটমহলের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫১ হাজার। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল অবস্থিত। লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি ও নীলফামারিতে ৪টি ছিটমহল ছিল ভারতের। বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির মধ্যে ৪৭টি কুচবিহার জেলায় এবং ৪টি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত ছিল। দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে ছিটমহল সমস্যা এক গভীর মানবিক সংকটের সৃষ্টি করে রেখেছিল। কোনোরকম বাছবিচার না করে হুট করে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা ভাগ করায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির পর ছিটমহলগুলোর তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়। তালিকায় গড়মিল দেখা দেয়ায় আবারো তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে ২০১৫ সালের ০১ আগস্ট রাত ১২:০১ মিনিটে দুই দেশ মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আওতায় ছিটমহলগুলো একে অপরের কাছে ফেরত দেয়। কুড়িগ্রামের দাসিয়ার ছড়া এই সময়ে মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার পায়। ৬৮ বছরের পরাধীন জীবন থেকে ছিটমহলের মানুষেরা মুক্তি পায়। তারা নিজেদের পরিচয় ও ঠিকানা খুঁজে পায় এই ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে।

পর্যটনশিল্প

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব শিল্প বিকাশ লাভ করেছে পর্যটনশিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যটনশিল্প বেড়েই চলেছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই শিল্পকে ঘিরে মানুষের নানারকম কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বহু আগে থেকেই এদেশে অনেক বিখ্যাত লোক ভ্রমণে এসেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পর্যটনশিল্পে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। বছরে বাংলাদেশে পর্যটকের সংখ্যা দেড় লাখের মতো। কিন্তু ভারত, নেপাল ও মালদ্বীপের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক কম। অথচ আমাদের রয়েছে অপরূপ সুন্দর ভূ-প্রকৃতি, রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল ছাড়াও সুন্দরবনের মোহনীয় রূপ পর্যটনশিল্পে যোগ করেছে নতুন মাত্রা। দক্ষিণে পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির মনোরম প্রকৃতি, পাহাড়-পর্বত, জলপ্রপাত, সিলেট-শ্রীমঙ্গলের চোখ জুড়ানো চা-বাগান, পাহাড়পুর-ময়নামতি-লালবাগের ঐতিহাসিক নিদর্শন আমাদের মূল্যবান পর্যটন-সম্পদ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই শিল্প ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এর জন্য দরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের রয়েছে গুরুদায়িত্ব। পর্যটনশিল্পের বিকাশে সরকার বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করলেও তা আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারেনি। বাংলাদেশ ভ্রমণে বিদেশিদের আগ্রহ থাকলেও ভিসাসহ নানা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেকেই এদেশে আসতে অনীহা বোধ করে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী জঙ্গিবাদী হামলার কারণেও সাময়িকভাবে পর্যটনশিল্পে একধরনের স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশের চমৎকার প্রকৃতি, ভূ-দৃশ্য, সমুদ্রতট, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, দিগন্তবিস্তৃত সুন্দরবন, ঋতুবৈচিত্র্য এবং এদেশের মানুষের সহজ সরল ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমাদের পর্যটনশিল্পের বিকাশে অনুপম উৎস হতে পারে।

নারীশিক্ষা

জাতীয় উন্নয়নে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ নারীরাও দেশের মানবসম্পদ। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতিতে এখন নারীদের জয়জয়কার। গুহাবাসী

আদিম সমাজে নরনারীদের যৌথ চেষ্টার ফলেই গড়ে উঠেছে আজকের সভ্যতা। সামন্ত যুগে ধর্ম ও নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখা হতো। শিক্ষা দূরে থাক, নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। ভোগের পণ্য হিসেবে মনে করা হতো তাদের। কিন্তু সেই সময় পেছনে ফেলে নারীদের বিজয়গাথা এখন চারদিকে শোনা যাচ্ছে। মেধায়, দক্ষতায়, কর্মে ও শিক্ষায় নারীরা আজ বিশ্বকে জয় করেছে। ইউরোপের মতো উন্নত বিশ্বে নারীরা শিক্ষা-সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে নারীশিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ওই সব স্থানে যেন প্রাচীন অন্ধকার ফিরে এসেছে। ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীদের কেবল যৌনদাসী বানানোর চেষ্টা চলছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সবার মতো নারীদের জন্যও শিক্ষাকে কেবল বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং তাদের নানারকম সুযোগসুবিধাও দেয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার সুযোগ সীমিত। পথশিশুরা অনেকেই এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহের কারণে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, ফলে শিক্ষাগ্রহণ আর হয় না। ইভ টিজিং ও এসিড সন্ত্রাসের ভয়ে অনেক মা-বাবা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, সংসদের স্পিকার প্রত্যেকেই নারী, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসক, নারী উদ্যোক্তাসহ বিমানচালক এবং বেসরকারি নানা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনে নারীরা যোগ্যতার সঙ্গে অধিষ্ঠিত হলেও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আরও অনেক উন্নতি করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে শুধু সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে সমাজের সকলকেই নারীশিক্ষার বিস্তারে এগিয়ে আসতে হবে।

মিতব্যয়িতা

জীবনকে সুন্দরভাবে যাপন করার জন্য মিতব্যয়িতার প্রয়োজন অপরিসীম। পরিমিত ব্যয় করার অভ্যাসের নাম মিতব্যয়িতা। এটি মানুষের জীবনের একটি প্রধান গুণ। জীবনের সবক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার দরকার পড়ে। কথায়, আচরণে, আয়-ব্যয়ে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন সর্বাধিক। আয় বুঝে ব্যয় না করলে তার কপালে দুঃখ অনিবার্য। আয় বেশি হলেও দরকারের চেয়ে বেশি খরচ করাটা অপচয়মাত্র। মিতব্যয়ী মানুষ জীবনে কখনো সংকটে পড়ে না। মিতব্যয়ী হলে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যায়। এই সঞ্চিত অর্থ দুর্দিনে অনেক কাজে লাগে। কেবল নিজের কাজে নয়, সঞ্চিত অর্থ অন্যের বিপদেও উপকারে লাগে। মিতব্যয়ী না হলে মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দিনের আলোতে যদি কেউ শখ করে মোমের বাতি জ্বালিয়ে অহেতুক অপচয় করে তবে এমন একদিন আসবে যখন রাতের অন্ধকারেও তার ঘরে আলো জ্বলবে না। জীবনকে গুছিয়ে যাপন করার জন্যই মানুষ অর্থ আয় করে কিন্তু সেই অর্থ অযথা উল্লাসে, অসংযত বিলাসে ব্যয় করলে তার পরিণতি ভালো হয় না। মিতব্যয়িতা কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিকভাবেও মানুষের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিতব্যয়ী হতে হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সংযমী না হলে দেশের কল্যাণ ও জবাবদিহিতা হুমকির মুখে পড়ে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের সবার সম্পদ। তাই রাষ্ট্রের কল্যাণে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে অর্থ অপচয় না হয় বা বাজে কাজে বিপুল পরিমাণ টাকা নষ্ট না হয়। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা অধিক। ফলে সব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উদ্যোগ হতে হবে জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নবান্ধব। অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলাও স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বাকসংযম ব্যক্তির দায়িত্ব ও ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। মিতব্যয়ী হলে জীবন সহজ ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অনুচ্ছেদ বলতে কী বোঝায় ? অনুচ্ছেদের সংজ্ঞার্থ আলোচনা করুন।

২। অনুচ্ছেদ রচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে অনুচ্ছেদ রচনা করুন :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মাদকাসক্তি, বই পড়ার আনন্দ, জনসংখ্যা সমস্যা, সুন্দরবন

পাঠ ৮.৮ : দিনলিপি লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি−

- দিনলিপি কী তা বলতে পারবেন।
- দিনলিপি লিখনের শর্তগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষ তার প্রতিদিনের ঘটনাগুলো যখন লিপিবদ্ধ করে রাখে তখন সেটিকেই দিনলিপি বলা হয়। সুখ-দুঃখ, ঘটনা-দুর্ঘটনা, আবেগ-অনভূতি নিয়েই মানুষের জীবন। জীবনের প্রতিদিনের এই অভিজ্ঞতাকে মানুষ স্মৃতির মতো ধরে রাখতে চায়। নানাজন নানাভাবে এই অভিজ্ঞতা অক্ষয় করে রাখতে চেষ্টা করে। কেউ লিখে কবিতা, কেউ গল্প, উপন্যাস− কেউবা গানের কথার মধ্য দিয়ে নিজের বিচিত্র কথাকে সাজিয়ে রাখে। দিনলিপি রচনার ব্যাপারটিও সেরকম। নিজের জীবনে প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখে রাখলেই দিনলিপি রচিত হয়।

দিনলিপি হচ্ছে তাই, যেখানে মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখে।

দিনলিপি লিখনের শর্তসমূহ

দিনলিপি লিখনে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়−

১। নির্দিষ্ট দিনের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।
২। দিনলিপিতে সময় ও স্থানের উল্লেখ করতে হবে।
৩। দিনের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর বিবরণ সংক্ষেপে লিখতে হবে।
৪। ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয় উল্লেখ করতে হবে।
৫। ব্যক্তিগত অভিমত বা বিশ্লেষণ থাকতে পারে।

নির্বাচনি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনের দিনলিপি

ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৬

গ্রাম থেকে আমার সেই প্রথম শহরে আসা। প্রথম এই ধরনের বড় নির্বাচনি পরীক্ষায় বসা। খুব ভালো করার আশা তো ছিল দুরাশামাত্র, ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পরীক্ষা শেষ করেছিলাম। অবশেষে ফল প্রকাশের দিন চলে আসল। কিছুতেই মনের শঙ্কা কাটছিল না। নতুন শহরে বন্ধুবান্ধবও তেমন ছিল না। যতই ফল ঘোষণার সময় ঘনিয়ে আসছিল, হৃদকম্পনও ততই বেড়ে চলল। টান টান উত্তেজনার মধ্যে সবাই অপেক্ষা করছিল। সব আনুষ্ঠানিকতা অবশেষে শেষ হলো। বিকেল চারটার দিকে ঘোষণা করা হলো ফল। বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে শুনলাম আমি প্রথম হয়েছি। আমি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

মুহূর্তেই সব কিছু যেন বদলে গেল আমার। কয়েকজন ছুটে এসে আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমার দু-একজন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তারা ফল শুনেই বাড়িতে আমার মা-বাবাকে ফোনে জানিয়ে দেয়। আমি বাড়িতে খবরটি জানানোর আগেই তারা ফোন দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং শহরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা হয়। প্রথম হওয়ায় আমাকে পুরস্কার হিসেবে বেশকিছু বই ও একটি সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর দেয়া হয়।

মা-বাবা আমাকে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেই কান্না শুরু করে দেন। আমিও আবেগ সামলাতে পারিনি, শুরু হয় আমারও কান্না। খুশি হয়ে বাবাও আমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দিতে চান। একটি পরীক্ষায় ভালো করে এত পুরস্কার পেয়ে আমার আনন্দ দেখে কে ?

বিজয় দিবসের দিনলিপি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

বছরের এই দিনটি অন্যরকম আনন্দের, উচ্ছ্বাসের এবং মুক্তির। বিজয় দিবস আজ। বিজয় দিবসের এই দিনটি অসাধারণ কাটল। আমাদের ইতিহাসের ঘটনাগুলোর মধ্যে অদ্ভুত এক মিল রয়েছে। ৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলন, ২৬শে মার্চ ৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু এবং তারই পথ ধরে ১৬ ডিসেম্বর ৭১–এ পেলাম বিজয়। বিজয়ের মহাআনন্দের মধ্য দিয়ে বছরটি শেষ হয়। প্রতিবছর দিনটি আনন্দ-উৎসবে পালিত হলেও এবার আমার ক্ষেত্রে বিজয় দিবসটি নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এ বছর কলেজে পা রেখেছি আমি। বিপুল সমারোহের সঙ্গে কলেজেই উদ্‌যাপন করা হলো দিবসটি।

খুব ভোরে চলে আসলাম কলেজে। রাঙা সূর্যের প্রথম আলো দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অধ্যক্ষ স্যারের সঙ্গে শত শত ছাত্রছাত্রী রঙবেরঙের পোশাকে জাতীয় সংগীত গাইল। কলেজে যেন রঙের উৎসব। ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। বিজয় দিবসের কথা নানাজনের বক্তব্যে উচ্চারিত হলো, আলোচনায় উঠে এলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম। গান, কবিতা, দলীয় নাচ, স্মৃতিচারণ, অভিনয়, কৌতুক সবকিছুই ছিল অনুষ্ঠানে। বিজয় দিবসের রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কারও দেয়া হলো। ৩য় পর্বে দেখানো হলো মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র 'যুদ্ধজয়ের গান'। এর পাশাপাশি ছিল সারাদিনব্যাপী রক্তদান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। একাত্তর আমি দেখিনি কিন্তু আজকের এই দিনে বুঝতে পেরেছি স্বাধীনতার মূল্য। বুঝতে পেরেছি কত রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই দেশ।

তোমার প্রিয় শিক্ষকের বিদায় দিনের দিনলিপি

১ জানুয়ারি, ২০১৭

প্রত্যেকের জীবনেই কোনো একটি দিন আসে যেদিনের কথা মনে হলে বেদনা ও বিষণ্নতার স্মৃতি জেগে ওঠে। ১ জানুয়ারি দিনটি আমার জীবনে তেমনি একটি দিন। সব থেকে কাছের, সব থেকে প্রিয় মানুষটিকে আজ হারিয়েছি আমি। আমার ভালোলাগার শিক্ষক অশোক স্যারের কথা বলছি। অশোকতরুর মতোই আমার জীবনে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার। ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন বলেই শুনেছি, শখের বশে এসেছিলেন শিক্ষকতা করতে– স্যার বলতেন 'মাস্টারি'। একাত্তরে যুদ্ধ করেছেন দেশের জন্য। কারো বাধা মানেননি। স্কুলের উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বড় চাকরির লোভ ত্যাগ করে চলে গেছেন লড়াইয়ের মাঠে। গ্রামে জমিদারের ছেলে বলেই সবাই ডাকত। জমি-জমা, খেতি-খোলা ছিল অজস্র। সেজন্যই বোধ হয় 'জমিদার' সম্বোধন। ব্রিটিশ আমলে সত্যিকারের জমিদারি ছিল তাঁদের। এখন জমিদারি নেই, কিন্তু নামটি আছে। গ্রাম থেকে প্রথম যেদিন শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম সেদিন খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। শহুরে ছেলেদের মতো চটপটে নই আমি, পোশাক-আশাকও সাধারণ মানের। ফর্সা তক্‌তকে টাকাওয়ালা ছেলেদের দেখে বুক কাঁপতো। অন্য কেউ নয়, কোনো সহপাঠি বন্ধু নয়– আমার প্রিয় অশোক স্যারই সেদিন ধরতে পেরেছিলেন আমার এই অসহায়ত্বটা। হাতের ইশারায় কাছে ডেকে নিয়েই জিজ্ঞাসা করেন কোত্থেকে এসেছি। গ্রামের নাম শুনে বললেন চিন্তার কারণ নেই আমিও গ্রামেরই মানুষ। এক মুহূর্তেই ভরসার একটি জায়গা পেয়ে গেলাম। সেই ভরসা পরিণত হলো পরম মমতা, শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায়। ক্লাশে খুব প্রাণবন্ত ছিলেন স্যার। সাহিত্যটা ভালো জানা ছিল তাঁর। তার চেয়ে বেশি জানতেন জীবনের গল্প। কতো গল্পের ভাণ্ডার যে তাঁর মধ্যে ছিল তার হিসেব নেই। দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেল। একদিন কলেজে গিয়েই শুনলাম আমাদের সবার প্রিয় অশোক স্যার বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। যশোরে পৈত্রিক বাড়ি স্যারের। সেখানেই নামকরা একটি কলেজে বদলি হয়েছেন স্যার। চাকরি জীবনের শেষ দিনগুলো বাড়ির কাছেই কাটাতে চান তিনি।

বিদায় অনুষ্ঠানে ছিল এক গভীর বিষণ্নতা। অধ্যক্ষ মহোদয় অশোক স্যারের অনেক প্রশংসা করলেন। প্রশংসা করলেন তাঁর প্রজ্ঞার। কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন সে কথাই বারবার আসলো সবার কথায়। অশোক স্যার যাবার আগে আমাকে কিছু বই উপহার দিয়ে গেছেন। সেগুলো পড়ার টেবিলে রেখেছি। বইগুলো দেখলেই স্যারের কথা মনে পড়ছে।

হাসপাতালে বন্ধুর অসুস্থ পিতার শয্যাপাশে রাত কাটানোর দিনলিপি

২ মার্চ ২০১৭

খবরটা হঠাৎ করেই পেলাম। প্রিয় বন্ধু নাজমুলের বাবা হাসপাতালে। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা বোধ করায় তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে তাঁকে। ওখান থেকেই ফোন করেছে ও। নাজমুল আমার এত কাছের যে, ও ডাকলেই আমাকে ছুটে আসতে হয়। স্কুল জীবন থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি। একই গ্রাম, একই স্কুল। কলেজ ছুটি থাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম ধরলা নদীর পাড়ে। প্রায় প্রতিদিন বিকালে এখানে আসি। নাজমুলের ফোন পেয়েই দে ছুট। হাসপাতালে গিয়ে যখন পৌঁছালাম দেখি একজন ডাক্তার নাজমুলের বাবাকে পরীক্ষা করছেন। সকালেই ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ কথা বললাম ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে। ভাবতেই পারছি না যে, এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বেন উনি। ডাক্তার সবকিছু দেখে ইসিজি করার জন্য বললেন। সন্ধ্যার পর ইসিজি রিপোর্ট পাওয়া গেল। হার্টে সামান্য সমস্যা। দুতিন দিন থাকতে হবে হাসপাতালে। খবর পেয়ে নাজমুলের আত্মীয়-স্বজনরা আসতে শুরু করলো হাসপাতালে। ওর বড় বোন, খালা এবং খালু চলে আসলেন কিছুক্ষণের মধ্যে। নাজমুল বলল ভয়ের কিছু নেই। সামান্য ওষুধেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। ওর বোন, খালা হাসপাতালে এসেই কান্না শুরু করলেন। নাজমুলের কথা শুনে কিছুটা স্বস্তি পেলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্য ওয়ার্ডে গেলেন। রাতে হাসপাতালে থেকে যাবার জন্য নাজমুল আমাকে অনুরোধ করলো। আমি সাগ্রহে রাজি হলাম। নিজের বাবা হলে তো আমি হাসপাতালেই থাকতাম। সে রাতের কথা আজও মনে পড়ে। আমরা দুই বন্ধু সারারাত দুচোখের পাতা এক করিনি। গল্পের পর গল্প। এমন কোনো কথা নেই যা আমরা বলা বাকি রেখেছি। আমাদের ব্যক্তিগত-পারিবারিক কথা থেকে শুরু করে চারপাশের সামাজিক পরিস্থিতি সবই আমরা বলাবলি করেছি। প্রথমে ঠিক করেছিলাম একজন ঘুমাবো, অন্যজন জেগে থাকবো। এভাবে চলবে পালাক্রমে। কিন্তু একবার গল্প জমে ওঠার পর ঘুম পালালো। অনেক রাতে ডিউটির ডাক্তারটি রোগীকে দেখে খুশি হলেন। আমাদের টেনশনও বেশ কমে গেল। কিছুক্ষণের জন্য নাজমুলের একটু ঝিমুনি এসেছিলো। আমি ওকে জাগাইনি। ভোরের আজানের সময় ওর ঘুম ভাঙল। খুব লজ্জা পেল আমাকে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে। পরদিন এই আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম যে, নাজমুলের বাবা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তোমার কলেজে নজরুল জয়ন্তী উদযাপনের দিনলিপি

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, রোববার

সকাল ১০টা

বাঙালির প্রাণের কবি নজরুল। আমাদের সংগ্রামী চেতনার কবি নজরুল। বিদ্রোহী কবি নজরুল আমার প্রিয় কবি। আজ কলেজে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মদিন উদযাপন করা হলো। কয়েকদিন থেকেই নানা প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল। বেশ সকালেই হাজির হলাম কলেজে। মঞ্চটি চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল। প্রখ্যাত একজন শিল্পীর আঁকা একটি ছবি মঞ্চের পেছনে রাখা হয়েছিল। নজরুলের সেই বিখ্যাত বাবরি চুলের বিদ্রোহী চেহারার ছবিটি দেখে প্রাণ ভরে গেল।

সকাল ১০টার মধ্যে অডিটরিয়াম কানায় কানায় পূর্ণ। তিন ভাগে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল উদ্বোধনী ও আলোচনা সভা। কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ড. রফিকুল ইসলাম।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্য থেকে কয়েকজন আলোচনায় অংশ নেন। আমাদের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দও চমৎকার আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উঠে আসে কবি নজরুলের নানা দিক। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি মমত্ব, মানবতার জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর কথা শুনে আমরা আলোড়িত হই। গোঁড়া মুসলিম ও গোঁড়া হিন্দু উভয়ের দ্বারাই আক্রান্ত হন কবি। প্রেম ও বিদ্রোহের এমন যুগল মিলন বাংলা সাহিত্যে খুব কমই ঘটেছে বলে মত দেন শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ জনাব হামিদুর রহমান নজরুলের চেতনাকে জীবনে ধারণ ও লালন করার ওপর জোর দেন। নজরুলের সাহিত্য বেশি করে পড়ার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া নজরুলের সাহিত্য নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া উচিত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

দ্বিতীয় পর্বে আবৃত্তি অনুষ্ঠান। কলেজের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী কমল ও ফারিয়া নজরুলের একাধিক কবিতা আবৃত্তি করে সবাইকে মাতিয়ে তোলে। এক পর্যায়ে অধ্যক্ষ স্যার নিজেই নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করে শোনান। সবাই খুব উপভোগ করি স্যারের এই আবৃত্তি।
তৃতীয় পর্বে সংগীতানুষ্ঠান। বিখ্যাত 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি দিয়ে এই পর্বের যাত্রা শুরু। কলেজের অনেক তরুণ শিক্ষার্থী গান গেয়ে মুগ্ধ করে শ্রোতাদের। সবশেষে মঞ্চে আসেন শিল্পী কমলকলি। তিনি মঞ্চে ওঠার সাথে সাথেই প্রচণ্ড করতালিতে ফেটে পড়ে অডিটরিয়াম। প্রেম ও বিদ্রোহের বেশ কটি গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন এই শিল্পী। 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব', 'শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গান এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিন ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করলাম। অনেক আনন্দ আর একরাশ স্মৃতি নিয়ে ফিরলাম ঘরে।

বইমেলা দেখার অনুভূতি

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

মফস্বল শহরে থাকি। বহুদিনের ইচ্ছে একুশের বইমেলায় যাব। পত্রিকায় পড়ি মেলার খবর, টেলিভিশনে দেখি। কত লোকজন, ছাত্রছাত্রী, জ্ঞানীগুণী, কবি-সাহিত্যিকরা মেলায় আসেন, কথা বলেন, কত অনুষ্ঠান হয় বইমেলায়। অবশেষে এবছর ১৬ ফেব্রুয়ারি সেই দিনটি আসল আমার জীবনে। আজ পুরোটা দিনই কাটলো বাংলা একাডেমির বইমেলায়। গেট দিয়ে ঢোকার পর বিশাল সোহরাওয়ার্দি মাঠ। সুন্দর সারিবদ্ধ প্যাভেলিয়ান আর দোকান। দারুণভাবে সাজানো হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণ। মূল মঞ্চে নানারকম অনুষ্ঠান হয় প্রতিদিন। আজও ছিল চমৎকার আলোচনা আর সংগীতানুষ্ঠান। কিছুক্ষণের জন্য আমিও দর্শকদের সারিতে বসে গান শুনলাম।

মেলার ঠিক মাঝখানে বাংলা একাডেমির প্যাভেলিয়ান। সুন্দরভাবে সজ্জিত। অসংখ্য ক্রেতা পছন্দের বইয়ের জন্য ভিড় করেছে সেখানে। আমার কয়েকটি বইয়ের দরকার ছিল, একটি কোষগ্রন্থ এবং অভিধান। জমানো টাকা দিয়ে তার কয়েকটি বই কিনে ফেললাম। বাংলা একাডেমি অনেকগুলো জীবনীগ্রন্থ বের করেছে এবার। সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখলাম। মেলার একপাশে ছিল শিশুদের জন্য চমৎকার আয়োজন– সিসিমপুর। কচিকাঁচাদের ভিড় সেখানে উপচে পড়ছে।

নতুন লেখকদের প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জন্য নজরুল মঞ্চ রয়েছে মেলায়। প্রখ্যাত ব্যক্তিদের দিয়ে মূলত নতুন লেখকরা তাদের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ পায় এই মেলার সময়। হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়লো নজরুল মঞ্চের দিকে। কয়েকজন তরুণ লেখক সেখানে অপেক্ষা করে আছেন তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য। অনেক প্যাভেলিয়ানে লেখকরা নিজেই বসে আছেন– উদ্দেশ্য তাঁদের বইবিক্রির সময় ক্রেতাদের অটোগ্রাফ দেওয়া। প্রখ্যাত লেখক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারকে এই প্রথম স্বচক্ষে দেখলাম। অনেক তরুণ শিক্ষার্থী তাঁর অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

শেষ বিকেলে মেলা থেকে বেরিয়ে আসার পর ঘুরে দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কত সংগ্রাম আর গর্বের এই বিশ্ববিদ্যালয়। রাস্তার দুপাশে হরেকরকম জিনিসের দোকান। বাড়ির জন্য কয়েকটি সৌখিন জিনিস কিনে ফেললাম ছোট ভাইবোনকে দেয়ার জন্য। ভাবছিলাম আগামীকাল সকালেই আবার ফিরে যাব চিরচেনা গ্রামে কিন্তু বুকের ভেতর বয়ে নিয়ে যাব বইমেলার এই দারুণ উজ্জ্বল স্মৃতি।

সিলেটের দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের দিনলিপি

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

ফেব্রুয়ারির এই মিষ্টি শীতের সকালে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে এসে পৌঁছালাম। সৌন্দর্যের চমৎকার লীলাভূমি এই সিলেট। শাহজালাল (রা.) ও শাহ পরানের (রা.) মাজার ছাড়াও প্রকৃতি অরূপ সাজে সজ্জিত। রাতে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে খুব ভোরে পৌঁছালাম শ্রীমঙ্গলে। বেশ খানিকটা সময় ঘুম আর বিশ্রাম। সকাল ১০টার দিকে বেরিয়ে পড়লাম টিলা আর চাবাগান দেখার জন্য। শ্রীমঙ্গল যে কতটা শ্রীমণ্ডিত তা না দেখলে বুঝতাম না। সিলেটে প্রায় ১৫০টি চা বাগান থাকলেও সবচেয়ে বড় চা বাগান এবং দেশের একমাত্র চা গবেষণা ইন্সটিটিউটও এই শ্রীমঙ্গলেই অবস্থিত। অনেকটা সময় নিয়ে দেখলাম টিলা আর চা বাগানের মনোরম ছবি। আমাদের দেশ এত সুন্দর কখনো সেভাবে জানতাম না। হোটেল গ্রান্ড

সুলতান দেখার সুযোগ হাতছাড়া করিনি আমরা। সেইদিনই দুপরের পর গেলাম লাউয়াছড়া ইকো পার্ক দেখতে। কত রকমের গাছপালা যে এখানে আছে তার ইয়ত্তা নেই। লাউয়াছড়ার অদ্ভুত নির্জনতা আর সবুজ দৃশ্য কিছুতেই ভুলে যাবার নয়। ফেরার পথে এখানকার বিখ্যাত সাতরঙা চায়ের স্বাদ নিতে ভুল করলাম না। কত রকমের চা যে এখানে আছে তা কে জানে। পিঠে বাচ্চা বেঁধে নিয়ে চা বালিকারা দারুণ আনন্দে চা পাতা তোলার দৃশ্যটি চোখে পড়লো। সারাদিন পাহাড়-টিলা আর চা বাগানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরলাম।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

আজ সারাদিন কাটল মাধবকুণ্ডের ঝর্ণায়। শ্রীমঙ্গল থেকে গাড়ি ভাড়া করে দেড় ঘণ্টায় আসি মাধবকুণ্ডে। এই ঝরনার কথা অনেক আগে শুনলেও কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি সেই সুবিশাল পাহাড়ি ঝরনার সামনে। বনবনানির মধ্যে ঝরনার জল পড়ার অদ্ভুত শব্দ। অনেক উঁচু থেকে অবিশ্রাম জলের ধারা নেমে আসছে। ইচ্ছেমতো সেই জলে লাফালাফি করলাম সবাই মিলে। নানা ভঙ্গিতে ছবি তুললাম। পার্কের বাইরে কারুপণ্যের নানা জিনিস সাজিয়ে বসে আছে দোকানিরা। কিছু কেনাকাটার লোভ সামলাতে পারলাম না।

বাংলা নববর্ষ উদযাপনের ওপর দিনলিপি

১৪ এপ্রিল ২০১৭

নববর্ষ বাঙালির প্রাণের উৎসব। এই উৎসব আমাদের ঐতিহ্যে রূপ নিয়েছে। এই উৎসবের সঙ্গে মিশে আছে বাঙালির সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন ও সংগ্রামের উজ্জ্বল ছবি। সারাদেশে আজ উদযাপিত হলো নববর্ষ। আজ ধর্মের কোনো ভেদ নেই, বর্ণের ভেদ নেই– আজ প্রত্যেকেই বাঙালি হয়ে শামিল হয় এই উৎসবে। কীভাবে দিনটি উদযাপন করবো এই পরিকল্পনাই করেছি গত কদিন থেকে। কলেজ মাঠেই নববর্ষের অনুষ্ঠান হবে এটা জানতাম। তাই অনেক সকালেই চলে আসলাম কলেজে। দেখলাম আমি আসার আগেই পৌঁছে গেছে আমার অনেক বন্ধুসাথি। আমাদের আনন্দ দেখে কে? নতুন ফতুয়া ধরনের একটি পোশাক পরেছিলাম। মঙ্গল শোভাযাত্রায় যোগ দিলাম সবাই। কলেজের অধ্যক্ষ স্যার, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বাইরের শত শত নরনারী এই শোভাযাত্রায় শামিল হয়। ছোট্ট শহরটি প্রদক্ষিণ করলাম আমরা নেচেগেয়ে। রাস্তার দুপাশে অনেক মানুষ ভিড় করেছিল শোভাযাত্রা দেখার জন্য। শহরে যেন আনন্দের রঙ লেগেছিল।

শোভাযাত্রাটি কলেজমাঠে এসে শেষ হয়। দেখলাম মাঠের এক পাশে পান্তা-ইলিশের আয়োজন করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ, সহযোগিতায় ছিল একটি বহুজাতিক কোম্পানির স্থানীয় শাখা। মাঠের দক্ষিণ দিকে ঐতিহ্যবাহী পিঠেপুলির দোকানও চোখে পড়লো।

এরপর শুরু হয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং তারপর চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নববর্ষের ঐতিহ্য ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর কথা বললেন বিশিষ্টজনেরা। কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, নাচ-গান সবই ছিল অনুষ্ঠানে। মেলায় হরেক রকমের জিনিস নিয়ে দোকান বসেছিল। সেখান থেকে পছন্দের টুকিটাকি জিনিস কিনলাম। এতসব হৈচৈ আনন্দের মধ্যে কখন যে বছরের নতুন দিনটি চলে গেল বুঝতেই পারলাম না।

কলেজে প্রথম দিনের অনুভূতির দিনলিপি

৪ এপ্রিল ২০১৭

কলেজ জীবন প্রত্যেক ছাত্রের কাছেই স্বপ্নের একটি দিন। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের বড় পরিসরে প্রবেশ সব ছাত্রের কাছেই অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা। সেই অদ্ভুত অনুভূতি আজ আমার হচ্ছে। আমার আজ কলেজ জীবনের প্রথম দিন। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে একটু বড় শহরের কলেজে ভর্তি হয়েছি। বুকে ভয় ভয় ভাব। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। গোসল সেরে খেতে বসে ঠিকমতো খেতে পারছিলাম না। কোনোরকমে মুখে কিছু দিয়ে ইউনিফর্মটা পরে নিলাম। আইডি কার্ড তখনও হয়নি বলে ভর্তি রশিদ দেখিয়ে প্রবেশ করলাম কলেজ প্রাঙ্গণে। সোজা চলে গেলাম ক্লাশ রুমে। ক্লাশভর্তি ছাত্র– সবাই অচেনা। পাশের জনকে নাম জিজ্ঞাসা করায় বলল ফারহান। খুব প্রাণবন্ত হাসিখুশি ছেলে। কথা হলো আরও কয়েকজনের সঙ্গে। দু'একজন ছাত্র বেশ দুরন্ত প্রকৃতির বলে মনে হলো। প্রথমেই বাংলা ক্লাশ– যিনি প্রথম শিক্ষক হিসেবে বাংলা ক্লাশটি নিলেন তাঁর নাম অনাদিনাথ রায়। তিনি কথা বললেন অদ্ভুত সাবলীল

ভঙ্গিতে। কলেজ জীবনে কীভাবে পড়ালেখা করতে হবে, আমরা যাতে অহেতুক সময় নষ্ট না করি– প্রতিটি মহূর্ত যেন কঠোর পরিশ্রম করি, না হলে কী ক্ষতি হতে পারে আমাদের, আমরা কে কী হতে চাই সেসব বিষয় নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন এবং আমাদের কাছে জানতে চাইলেন। অনাদি স্যারের আন্তরিক ব্যবহার এবং আমাদের জন্য তাঁর উদ্বেগ সব ছাত্রকেই স্পর্শ করলো। এরপর আরও দুটো ক্লাশ হয়ে টিফিনের বিরতি। এই ফাঁকে পুরো কলেজটি ঘুরে দেখলাম। বিশাল ক্যাম্পাস, খেলার মাঠ, একদিকে একটি চমৎকার ঘাটলাবাঁধা পুকুর– তাতে শাপলা ফুটে আছে, বিরাট লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, অডিটোরিয়াম– মুহূর্তেই মনটা গর্বে ভরে গেল। টিফিনের পরে আরও তিন পিরিয়ড শেষে যখন বাসায় ফিরছিলাম তখন এই আনন্দ হচ্ছিল যে, আমি আজ থেকে এরকম দারুণ একটি কলেজের ছাত্র। সারাদিন সারারাত এই আনন্দ আমাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

একটি বৃষ্টিমুখর দিনের দিনলিপি

২১ জুলাই ২০১৬

প্রচণ্ড গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। জানালা খুলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু এই সকাল অন্য দিনের মতো নয়। প্রবল বর্ষণের সঙ্গে চলছে বজ্রপাত। কিছুক্ষণ পর বজ্রপাত কমে গেল বটে কিন্তু বৃষ্টির আর বিরাম নেই। দুচোখে যেন আবারও রাজ্যের ঘুম নেমে এলো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, যখন বিছানা ছেড়ে উঠলাম ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, আর সেই সঙ্গে চলছে অবিরল বৃষ্টি। গরম এক কাপ চা নিয়ে জানালার পাশে বসলাম। গাছপালা ভিজছে, গাছের ডালে ভিজে চুপসে কাক বসে আছে এক ঠাঁয়। বাইরে যেতে না পেরে বাড়ির কুকুরটা মন মরা হয়ে বসে আছে। বারান্দায় হাঁস-মুরগিগুলো জড়ো হয়েছে। আমাকে একটুও ভয় পাচ্ছে না ওরা। আমার মতোই ওরাও বৃষ্টির দাপট দেখছে। মনে পড়লো বর্ষা ও বৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ কবিতা ও গান রচনা করেছেন। মেঘলা দিনে কৃষ্ণকলি নামের কালো মেয়ের কালো চোখকে দেখেছিলেন কবি। কালিদাসের মেঘদূত তো সর্বকালের বিরহীর মনোবেদনাকেই প্রকাশ করেছে। হঠাৎ শুনলাম কাছেই কোথাও রেকর্ডে বাজছে – ‘এমন দিনে তারে বলা যায় এমন ঘনঘোর বরিষায়’ গানটি।

এতক্ষণ আমি বর্ষার একটি দিকই কেবল দেখছিলাম। নতুন আরেকটি দিক দেখলাম একটু পরেই। পত্রিকা বিক্রি করে পেট চালায় যে কিশোর ছেলেটি সে খুব দ্রুত চলে গেল ভিজতে ভিজতে। পত্রিকা বিক্রি করতে না পারলে আজ হয়ত ওকে না খেয়েই থাকতে হবে। সামনের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা রিক্সাগুলো যাত্রীর জন্য ব্যাকুল। কিন্তু খুব প্রয়োজন ছাড়া এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কে আর বাইরে বেরোবে? ভাবছিলাম সুখি মানুষের জন্য বৃষ্টি বিলাসিতার সুযোগ করে দিলেও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের কাছে বর্ষা কখনোই রোমান্টিক কিছু না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। দিনলিপি কী ?

২। দিনলিপি রচনার শর্তসমূহ উল্লেখ করুন।

৩। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে দিনলিপি রচনা করুন :

সুন্দরবন ভ্রমণের দিনলিপি, বনভোজন থেকে ফিরে এসে দিনলিপি, কলেজ থেকে শিক্ষাসফরে যাবার দিনলিপি।

পাঠ ৮.৯ : অভিজ্ঞতা বর্ণনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অভিজ্ঞতা কী তা জবলতে পারবেন।
- অভিজ্ঞতা বর্ণনার কলাকৌশল সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনকেই অভিজ্ঞতা বলা হয়। অভিজ্ঞতাকে ইংরেজিতে Experience বলে। কোনোকিছু শিখনের মধ্য দিয়ে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মানুষ সাধারণত দুইভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। প্রথমটি হলো ইন্দ্রিয়জাত অনুভবেব মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি দেখেশুনে ও হাতেকলমে। কাজেকর্মে সংযুক্ত হলে মানুষকে ভালোমন্দ নানারকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। এই অভিজ্ঞতা তাকে ভবিষ্যতে সঠিক সচেতনভাবে চলতে সাহায্য করে।

কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনকেই অভিজ্ঞতা বলা হয়।

অভিজ্ঞতা বর্ণনের কলাকৌশল

১. একটি অখণ্ড ভাবের মধ্যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে হয়।
২. বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়।
৩. অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ভূমিকা, মূল অংশ ও উপসংহার থাকতে পারে। আলাদাভাবে লেখা যেতে পারে, একসঙ্গে একটি অখণ্ড ভাবের মধ্যেও প্রকাশ করা যেতে পারে।
৪. অভিজ্ঞতা বর্ণনার ভাষা হবে সহজ-সরল-সাবলীল।

শিলাইদহের আলোকিত দিনে

শিলাইদহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নামটি জড়িত একথা আমাদের ভালোভাবেই জানা ছিল। কবির লেখায় কুষ্টিয়ার শিলাইদহ গভীরভাবে জড়িত। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কুষ্টিয়ার সুনাম রয়েছে। বাউল সাধক লালনের জন্ম ও সাধনা এই শিলাইদহের মাটিতে। অমর রচনা 'বিষাদ–সিন্ধু'র রচয়িতা মীর মশাররফ হোসেনের পৈত্রিক ভিটা কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায়। এর পাশেই রয়েছে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কাঙাল হরিনাথের বসতভিটা। এক শীতের সকালে বন্ধু অতনু ও আমি মিলে রওনা হলাম কুষ্টিয়ার উদ্দেশে। আগে কখনো যাওয়া হয়নি তাই কেমন যেন একটা শঙ্কা কাজ করছিল বুকের ভেতর। যাত্রাপথে বাসের ভেতর দারুণ কাটছিল। সঙ্গে নানারকম টুকিটাকি খাবার, আচার, বিস্কুট নিয়েছিলাম। বিকেল নাগাদ ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া বাস টার্মিনালে গিয়ে পৌঁছলাম। ঝটপট কাছের একটি হোটেল 'রজনীগন্ধায়' দুজনের জন্য ডাবল একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে নিলাম। রুম ভাড়া ঢাকার তুলনায় অনেক সস্তা, হোটেলে খাবারের দামও তুলনামূলকভাবে কম। পদ্মার টাটকা ইলিশ দিয়ে ভাত খেতে দারুণ লাগছিল। হোটেল ম্যানেজারকে শিলাইদহে যাবার উপায় জিজ্ঞাসা করলে বললেন যে, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন গিয়ে তেমন কিছু দেখা যাবে না। বরং আজ রাতে বিশ্রাম নিয়ে একেবারে তরতাজা হয়ে আগামীকাল সকালে বেরিয়ে পড়ুন। বাসে কুষ্টিয়া শহর থেকে শিলাইদহে যেতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগে। আমরা আগেই ঠিক করেছিলাম যে, সারাদিন আজ শিলাইদহের সমস্ত বিখ্যাত জায়গা ঘুরে দেখব। সকাল নয়টার দিকে বাসে উঠে পড়লাম। গড়াই সেতু পার হয়ে চলেছি– দুধারে গ্রামের পর গ্রাম, অবারিত সবুজ, বয়ে চলা গড়াই নদী। শীতের সময় গড়াইতে তেমন পানি না থাকলেও ধুধু বালিরাশি এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। গড়াই সেতু পার হবার আরও আধা ঘণ্টা পর শিলাইদহে গিয়ে পৌঁছলাম। ভাবছিলাম কবি রবীন্দ্রনাথ যখন এখানে এসেছিলেন তখন তো এরকম সুন্দর রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না। কত কষ্ট করে নদীপথে নৌকায় করে কবিকে যাতায়াত করতে হয়েছে। কুঠিবাড়ির সামনেই বিশাল মাঠ– এই মাঠের পথেই হয়ত গগন হরকরা হেঁটে আসতেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান গাইতে গাইতে– 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে –'। দশ টাকায় টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। মনটা আনন্দে ভরে গেল। কী বিশাল বাসভবন, কী

চমৎকার সিঁড়ি। দোতলায় উঠে কবির ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র দেখলাম। পদ্মার বুকে যে বোটে করে কবি চলাচল করতেন সেই বোটটিও দেখলাম। দোতলার ঘরে বসেই তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। এ ছাদে দাঁড়িয়েই তিনি বিস্তৃত পদ্মার রূপ দেখতেন। সবচেয়ে অবাক হলাম কবির আঁকা অনেক ছবি দেখে। এত ছবি তিনি এঁকেছেন তার কিছুই আমরা জানতাম না। এখানেই 'সোনার তরী' 'মানসী' কাব্যের অনেক কবিতা লেখা হয়েছে, ছিন্নপত্রের পাতায় লেখা হয়েছে কবির বিচিত্র অনুভূতির কথা। কুঠিবাড়ির সীমানা প্রাচীরটিও দেখার মতো। পদ্মার ঢেউয়ের মতো প্রাচীরটি ঢেউ খেলানো। কুঠিবাড়ির পেছনেই পদ্মার ঘাটে একসময় কবির 'পদ্মা' নামক বোটটি এসে ভিড়ত। এখন এই ঘাটে কত নৌকা এসে ভিড় করে। এই পদ্মাবোটে বসে কবি গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবনকে দেখেছেন, তাঁর লেখায় চিত্রিত হয়েছে সেইসব নরনারীর ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কাহিনি। বন্ধু অতনু আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানালো; জোর করে ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্য। এখানে না আসলে নাকি ওর জীবন অসম্পূর্ণই থেকে যেত। বিকেলে শিলাইদহ থেকে ফেরার পথে মীর মশাররফ হোসেনের ভিটেমাটি, তাঁর বসতগৃহ, তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল দেখার সৌভাগ্য হলো। কাঙাল হরিনাথের সেই বিখ্যাত ছাপাযন্ত্রটিও দেখলাম তাঁর বসতবাড়িতে। তাঁর 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র কয়েকটি পুরনো কপি দেখে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান বলে মনে হলো। দুদিনের কুষ্টিয়া সফরের তরতাজা স্মৃতি নিয়ে পরদিন ঢাকার পথে রওনা হলাম।

ছিটমহলের পথে পথে

দাসিয়ার ছড়া একটি ছিটমহল– উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম জেলায় এটি। মিডিয়া আর পত্রপত্রিকার কল্যাণে এই ছিটমহলের নাম সবার হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছে। এখানকার মানুষের কথা, তাদের জীবনযাপনের কথা, সুখদুঃখের কথা এতবার শুনেছি যে, সিদ্ধান্ত নিয়েই নিলাম একবার ওখানে যাব। সব ঠিকঠাক করে গত সপ্তাহে রওনা দিলাম কুড়িগ্রামের পথে। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু পেরিয়ে যেতে হয়। উত্তরবঙ্গে আগে কখনো যাইনি আমি। কেমন সেখানকার পথঘাট, পরিবেশ কিছুই জানা ছিল না। দাসিয়ার ছড়াটি একেবারে ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায় বলে শুনেছি কিন্তু সেটা যে আসলে কতদূর কোনো ধারণাই ছিল না। যাদের সে ধারণা ছিল তারা বলেছিল ৭ ঘণ্টার পথ। কিন্তু রওনা হবার পর মনে হলো পথ আর শেষ হয় না। সঙ্গে ছিল আবির ও প্রবীর। আমার চেয়েও বেশি উৎসাহী তারা। বঙ্গবন্ধু সেতু পার হবার আধা ঘণ্টা পরে একটি রেস্টুরেন্টে যাত্রাবিরতি দেয়া হলো। মাথা ঝিমঝিম আর বমি বমি ভাব লাগছিল। তেমন কিছুই খেলাম না। শুধু এক কাপ গরম চা খাবার পরে মাথা ধরাটা ছেড়ে গেল বলে মনে হলো। বিরতির পর আবারও ছুটল গাড়ি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝলাম কেন উত্তরবঙ্গকে শস্যভাণ্ডার বলা হয়। যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ আর সবুজ। কোথাও সবুজ ক্ষেতের কোনো কমতি নেই। বাতাসে সবুজ-সোনালি শস্যের মাথা দোলানি না দেখলে বোঝার উপায় নেই কেন বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অনেকগুলো জেলা পেরিয়ে গেলাম একে একে। বঙ্গবন্ধু সেতুর পরই উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জ। সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম এই জেলায়। সিরাজগঞ্জের পরই শেরপুর হয়ে মহাস্থানখ্যাত বগুড়ায় প্রবেশ করলো আমাদের বাসটি। ইতিহাসের বিখ্যাত পুণ্ড্রবর্ধন নগরী এই বগুড়ার মহাস্থান নামক জায়গায়। এর পাশ দিয়ে বাসটি যাবার সময় মনে হচ্ছিল আমরা সেই প্রাচীন ইতিহাসে ফিরে গেছি। কতোকাল আগে এই জনপদেই গড়ে উঠছিলে সমৃদ্ধ এক সভ্যতা। বইয়ে পড়েছি এখানে প্রাপ্ত বৌদ্ধবিহারসহ নানা স্থাপত্য নিদর্শনের কথা। বগুড়ার পরই ঢুকলাম রঙ্গপুর তথা রংপুরে। মনে পড়লো রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা– এই রংপুরের পায়রাবন্দে জন্মে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন নারী জাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে। সন্ধ্যার পর আমাদের বাসটি সীমান্ত এলাকা ফুলবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। ছোট একটি হোটেলে উঠে সেদিনের মতো বিশ্রামে গেলাম। পরদিন গেলাম সেই বহুল আলোচিত দাসিয়ার ছড়া ছিটমহলে। ফুলবাড়ি সদর থেকে দাসিয়ার ছড়ার দূরত্ব ৬ কিমি। ওখানে পৌঁছানোর পর এক অন্যরকম অনুভূতি হলো আমাদের। দীর্ঘদিনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা–একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হবার চরম আনন্দে তারা আত্মহারা। ঘরে ঘরে অনেকের সঙ্গে কথা বললাম, তাদের চোখেমুখে চরম খুশির উচ্ছ্বাস। এখন আর তাদের কারো কাছে মাথা নত করতে হবে না, নিজের পরিচয় নিয়ে আর কোনো ভয় থাকবে না, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ালেখা করতে পারবে, এলাকার উন্নতি হবে– এইসব কথা মনে করে তাদের আনন্দ দেখে কে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো হয়েছে কয়েকটি জায়গায়। দু-একটিকে অফিস বা ক্লাবঘর ধরনের মনে হলো। নেতাগোছের কয়েকজনকে দেখলাম রাস্তায় বাজারে সঙ্গীসাথিসহ কী যেন সব বলছে। কিন্তু আমাদের এই অভিজ্ঞতা আর একরকম রইল না। এক জায়গায় খুব কান্নাকাটি শুনে সেখানে এগিয়ে গেলাম। দেখি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে দুজন মেয়ে-

পুরুষ কাঁদছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওরা ভারতে চলে যাবে, তাই আজন্মের ভিটামাটি ছেড়ে চলে যাবার সময় এই বুকফাটা কান্না। এরকম আরও কয়েকজনকে দেখেছি নানা কারণে তারা ভারতে যেতে বাধ্য হচ্ছে বটে কিন্তু এদেশ ছেড়ে চলে যেতে তাদের কোনো ইচ্ছাই ছিল না। স্বদেশভূমির টান যে কত গভীর এই প্রথম কাছ থেকে দেখলাম। জন্ম থেকে যে ভিটায় বড় হয়েছে– সেই ভিটা, ঘর, পুকুর, জমি, গাছপালা, গরুছাগল ছেড়ে যেতে কে-ই বা চায়। এক অদ্ভুত বিষণ্নতা নিয়ে আমরা সেদিন রাতে হোটেলে ফিরে আসলাম। মনে হলো পত্রিকা বা মিডিয়ায় দাসিয়ার ছড়া নিয়ে অনেক উচ্ছ্বাস দেখা গেলেও তার আড়ালে কত মানুষের কান্না আর দীর্ঘশ্বাসও মিশে আছে। বুকের ভেতর দারুণ এক কষ্ট আর আনন্দ নিয়ে ফিরে চললাম নিজ ঠিকানায়।

লোকশিল্প জাদুঘর

সোনারগাঁওয়ের নাম শুনেছি সেই কবে। ঘুরে বেড়ানোর নেশাটাও আমার পুরোনো। হুট করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা তিনজন। ছাত্র হিসেবে তুখোড় নই, ভ্রমণকারী হিসেবে কিছুটা নাম আছে। সেই নামের মর্যাদা রাখতে সোজা গিয়ে হাজির হলাম সোনারগাঁওয়ে। সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার রাজধানী। এ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন ঈশা খাঁ। ঈশা খাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সোনাবিবি। এই সোনাবিবির নামানুসারে এর নাম হয় সোনারগাঁও। সেই সোনারগাঁওয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার লোকশিল্প জাদুঘর। ১৯৭৫ সালে এই ঐতিহাসিক স্থানে জাদুঘরটি গড়ে উঠে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টায়। এই জাদুঘরে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। লোকশিল্প গড়ে ওঠে সাধারণ অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের দ্বারা। তাদের কল্পনা ও দক্ষতার স্পর্শে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ সব শিল্পকর্ম। কত বিচিত্র জিনিস তারা তৈরি করেছে, না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। মাটির মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার স্বাক্ষর এইসব শিল্পকর্ম। মাটি, বাঁশ ও বেত দিয়ে কত জিনিস তারা তৈরি করেছে। কাঠ ও মাটির পুতুল, মুখোশ, নানা ধরনের শৌখিন পাত্র, অলংকার– সবকিছুই নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে। সৌন্দর্য আর লাবণ্যে ভরপুর সব জিনিস। নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তারা এগুলো সৃষ্টি করেছে। তাদের নৈপুণ্য দক্ষতা, ধৈর্য ও কল্পনাশক্তির তুলনা নেই। নকশিকাঁথার এক বিপুল সম্ভার দেখলাম এই জাদুঘরে। গ্রামগঞ্জে তৈরি আরও নানারকম সূচিকর্ম দিয়ে সাজানো জাদুঘরটি। নগরজীবনে থেকে আমরা হয়ত অনেকেই এইসব লুকানো প্রতিভার মূল্য বুঝি না। এরপর ঢুকলাম 'জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালায়'। জয়নুলের আঁকা বিচিত্র ছবির এই সংগ্রহটি আমাদের অমূল্য সম্পদ। প্রতিটি ছবিতে রয়েছে শিল্পীর দেশপ্রেম, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। অপূর্ব তাঁর তুলির কাজ। জয়নুলের ছবিতে সমগ্র বাংলাদেশ তার প্রকৃতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা তাঁর বিখ্যাত ছবি 'ম্যাডোনা–৪৩' দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ স্মৃতিকেই মনে করিয়ে দেয়। 'বিদ্রোহী' ছবির ষাঁড়টি যেন দড়ি ছিঁড়ে এখনি তাড়া করবে আমাদের। ভাওয়াইয়া গানের গাড়িয়াল ভাইয়ের সেই গাড়ির চিত্র দেখে মন ভরে গেল। মনে হলো শহরের মধ্যে আমরা একটুকরো গ্রামকে খুঁজে পেলাম। বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়েছে এই লোকশিল্প জাদুঘরে। বাঙালি হিসেবে আমিও এই গৌরবের অধিকারী– এই ভেবে হৃদয় আনন্দে হেসে উঠল।

যানজটের দীর্ঘ সারি

যানজটে কাহিল হতে হয় প্রতিনিয়ত। ঢাকা এখন যানজটের শহর। যানজট এখানে উৎসবের মতো। মেসে থেকে কলেজে পড়াশুনা করি। প্রতিদিনই যাতায়াতে জ্যামে পড়তে হয়, এ আর নতুন কী ? কিন্তু সেদিনের সেই যানজটের অভিজ্ঞতা মনের পাতায় তুলে রেখেছি। বাড়ি থেকে খবর এসেছে মা অসুস্থ। যেতে হবে রংপুর। মাথা কাজ করছিল না একদম। দুপুরে নাকেমুখে একটু খাবার গুঁজে রওনা দিলাম গাবতলির দিকে। ওখান থেকেই বগুড়ার বাস ধরব। আরামবাগ থেকে দুপুর দুটায় লোকাল গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু মনে হলো হেঁটে রওনা হলে ভালো করতাম। একদম গাড়ি নড়ছে না। একটু এগোয় আবার স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। মনটা একদম ভালো ছিল না। বারবার মায়ের কথা মনে পড়ছিল। কত কষ্ট করে তিনি আমাকে শহরে পাঠিয়েছেন পড়ালেখার জন্য। মায়ের একটিই স্বপ্ন– ভালো রেজাল্ট করে পছন্দমতো কোনো জায়গায় ভর্তি হই। কোনোকিছুই মা জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দেন না। আমার ওপর মায়ের অগাধ বিশ্বাস। সেই মাকে গিয়ে সুস্থ দেখতে পাব তো? আরামবাগ থেকে শাহবাগ আসতেই বিকেল চারটা। সারি সারি গাড়ির ভিড়। অসহ্য গরমে ঘেমেনেয়ে উঠেছে সবাই। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে গরম আরও তীব্র মনে হলো। কেউ কেউ পত্রিকা দিয়ে বাতাস করছে।

এসবের মধ্যে দুএকজন দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে। গালাগালি চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ আসছে আশপাশ থেকে। বাইরে তাকিয়ে দেখি ফুলবালিকা– প্রাইভেট কারের জানালা দিয়ে উঁকি মারছে। হাতে গাঁদা ফুলের মালা আর রজনীগন্ধার স্টিক। কতভাবে কাকুতিমিনতি করছে ফুল বিক্রির জন্য। এই বয়সে যাদের স্কুলে যাবার কথা তারা ফুল ফেরি করছে, যাদের হাতে থাকার কথা বইপুস্তক, কলম-খাতা তাদের হাতে ফুলের গাদা। কেউ কেউ ফুল কিনল ওদের কাছে নিরুপায় হয়ে, অনেকে ভীষণ রাগ দেখালো। শামুকের গতিতে এগোচ্ছে বাসটি। ফুটপাতের দিকে চোখ গেল। নানা বয়সী ভিক্ষুকের মেলা। বিচিত্র ভঙ্গিতে চিৎকার করে তারা ভিক্ষা করছে। অনেকেই দেখলাম ভিক্ষা দিচ্ছে। অধৈর্য হয়ে অনেকে গালিগালাজ করছে ট্রাফিক পুলিশকে, কেউবা জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে মেজাজ খারাপ করে। হোটেল শেরাটন পার হয়ে বাংলা মোটরের দিকে যেতে যেতে দেখি একজন ফুটপাত দিয়ে খুব জোরে দৌড়াচ্ছে। শুনলাম ছিনতাইকারী, কার যেন সোনার চেইন টান দিয়ে দৌড়। তাকে ধরার জন্য পিছে পিছে কয়েকজন দৌড়াচ্ছে। জ্যাম ছাড়া এখন আর ঢাকা শহরকে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেদিনের জ্যাম সব রেকর্ডকেই বুঝি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাগে গজড়াতে গজড়াতে অনেকে গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাঁটা ধরল। কোন একজন ভিআইপি নাকি এই পথ দিয়ে যাবেন– তাই এই অবস্থা। একটুপর বাস আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। যখন গাবতলি গিয়ে পৌঁছলাম নির্দিষ্ট গাড়ি ছেড়ে গেছে। অতএব নিরুপায় আমি পরের ট্রিপের জন্য বসে রইলাম একাকী।

লালবাগ কেল্লা

ইতিহাস আর ঐতিহ্যের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। ইতিহাসের নানা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে দেশের নানা প্রান্তে। ঢাকা শহরের লালবাগ কেল্লার কথা বইয়ে পড়েছি। এবার শীতের ছুটিতে ঠিক করলাম আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ঢাকায় বেড়াতে যাব এবং লালবাগ কেল্লা মন ভরে দেখবো। রাজশাহী থেকে আমরা তিন বন্ধু ঢাকায় চাচার বাড়িতে এসে উঠলাম– দুদিন থাকব, আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম। চাচার বাসার একটি কক্ষে আমাদের তিনজনের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন চাচা-চাচি। বিকেলে ঢাকায় পৌঁছে রাতে বিশ্রাম নিলাম। চাচার কড়া নির্দেশ না বলে-কয়ে যেন ঢাকায় কোথাও না যাই। গেলে নাকি হারিয়ে যাবার ভয় আছে। সঙ্গে টাকাপয়সা কীভাবে রাখতে হবে, কীভাবে ছিনতাইকারির হাত থেকে দূরে থাকতে হবে এরকম নানা পরামর্শ দিয়ে চললেন। চাচা-চাচির ধারণা যে, প্রথম ঢাকায় এসেছি, না জানি কী হয়।

সব পরামর্শ মাথায় রেখে সকালবেলা আমরা তিন বন্ধু টিকেট কেটে লালবাগ কেল্লায় প্রবেশ করলাম। পুরোনো ঢাকার রিয়াজউদ্দিন রোডে এই কেল্লা।

কী বিশাল কেল্লার তোরণ বা ফটক। বড় ফটকটা দিয়ে ঢুকলাম। অন্য দুটি দরজা বন্ধ। গেরুয়া রঙের প্রাচীর, ফটক সহজেই নজর কাড়ে। তোরণ দিয়ে ঢুকেই মনটা আনন্দে ভরে গেল। সামনেই বিশাল সুসজ্জিত বাগান– ফুলে ফুলে সাজানো। হরেক রকমের ফুলের মধ্যে গোলাপের সমারোহই বেশি চোখে পড়লো। একটু এগিয়ে গেলেই সামনে পরীবিবির সমাধিসৌধ। ইতিহাসখ্যাত সুবেদার শায়েস্তা খাঁয়ের প্রিয়তম কন্যা পরীবিবি। কত সালে কীভাবে তার মৃত্যু হয় সেটা জানা না গেলেও ধারণা করা হয় ১৬৮৭–১৬৮৮ সালে পরীবিবির মৃত্যু হয়। প্রিয় কন্যার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য শায়েস্তা খাঁ এই অপূর্ব ইমারত নির্মাণ করেন। মূল্যবান পাথর, কষ্টি পাথর এবং নানারকম ফুল-লতা-পাতায় শোভিত টালি দিয়ে ইমারতটি অলংকৃত। এই ইমারতের ভেতরে নয়টি কক্ষ আছে। কক্ষগুলোর ওপরের অংশ গম্বুজাকৃতি এবং কষ্টিপাথরে শোভিত। সমাধিসৌধের মূল গম্বুজটি দামি তামার পাত দিয়ে আবৃত। আরও সমাধি আছে এখানে, আছে ফোয়ারা, পাহাড়ের মতো উঁচু টিলা এবং সুড়ঙ্গ পথ। কেল্লার দক্ষিণ দিকে রয়েছে তোপমঞ্চ। কেল্লার পূর্বদিকে রয়েছে ঘাট বাঁধানো পুকুর, চমৎকার সিঁড়ির ব্যবস্থা রয়েছে পুকুরটিতে। এর পেছনেই দেখা যায় সেই সময়ের সৈনিক ব্যারাক। এখন এটি আনসার ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লালবাগ কেল্লা মসজিদটিও দেখলাম– যেটি নির্মিত হয়েছে শাহজাদা আযমের সময়। সুবাদার আযম ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র। আয়তাকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি মোগল স্থাপত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত। যতই দেখি ততই বিস্মিত হই। এই বিস্ময় নিয়েই দেখলাম শায়েস্তা খাঁয়ের বাসভবন এবং তার দরবার মহল। আরও আছে সে সময়ে ব্যবহৃত মানচিত্র, তৈজসপত্র, সোরাহি ও শিলা পাথর।

এছাড়াও সতের-আঠার শতকের আরও অনেক নিদর্শন দেখার সুযোগ হলো– বর্শাফলক, লোহার জালের বর্ম ছোরা, খাপ, তীর, বর্শা, পাত্র, ঢাল, তরবারি, বন্দুক, রাইফেল, সৈনিকদের পোশাক, রাজপোশাক ইত্যাদি। সতের শতকে পারস্যে তৈরি চমৎকার কার্পেট, ঝাড়বাতি, ল্যাম্প, জায়নামাজ, আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মসজিদ ও বাগান তৈরির বিবরণসংবলিত শিলালিপি। রাজার প্রতিকৃতি, শাহজাদা আযম শাহের প্রতিকৃতি, সিংহাসনে আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি, যুবরাজ ও

রাজকন্যার অশ্বচালনার ছবি আমাদের যেন ইতিহাসের সেই প্রাচীন সময়ে নিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা কীভাবে কেটে গেল জানি না। আনন্দ আর বিস্ময় নিয়ে ফিরে চললাম বাসায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। অভিজ্ঞতা বলতে কী বোঝায় ? অভিজ্ঞতা বর্ণনার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন :

জাতীয় যাদুঘর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, সেন্টমার্টিনে এক রাত, রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা

পাঠ ৮.১০ : ভাষণ লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাষণ কী তা লিখতে পারবেন।
- ভাষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সার্থক ভাষণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কোনো সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে বক্তা যা বলেন অর্থাৎ তার বক্তব্যকে সাধারণত ভাষণ বলা হয়। বাচন বা বাকশিল্পের একটি বিষয় হলো ভাষণ। বিভিন্ন প্রয়োজনে সভা-সমিতিতে, নানা অনুষ্ঠানে কিংবা আয়োজনে বা কোনো আলোচনায় অনেককে বক্তব্য প্রদান করতে হয়। ভাষণে কোনো বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে হয়। ভাষণ মাধুর্যমণ্ডিত ও সাবলীল হওয়া উচিত। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে বক্তৃতাবিদ্যা বা বাগ্মিতার চর্চা করা হতো। বাগ্মিতার জন্য গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস স্মরণীয়। এডমন্ড বার্ক ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে অভিভূত করেছিলেন তাঁর বাগ্মিতা দ্বারা। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। যিনি ভাষণ দেন তাকে বলে বক্তা এবং যারা সেই বক্তব্য শোনেন তাকে বলা হয় শ্রোতা। ভাষণে কোনো একটি বিষয়কে সাবলীল ও আকর্ষণীয়ভাবে শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়।

কোনো সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে বক্তা যা বলেন অর্থাৎ তার বক্তব্যকে সাধারণত ভাষণ বলা হয়। বাচন বা বাকশিল্পের একটি বিষয় হলো ভাষণ।

ভাষণের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত কোনো একটি বিষয় শ্রোতা-দর্শকদের কাছে বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ভাষণের গুরুত্ব অনেক। কোনো বিষয়ে জনমত গঠনে অথবা কোনো পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণের সমর্থনে ভাষণ খুব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ভাষণের উদ্দেশ্য হলো কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে মানুষকে বুঝিয়ে বলা।

সার্থক ভাষণের বৈশিষ্ট্য

১. বিষয়বস্তু সম্পর্কে বক্তার স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
২. বক্তব্যে যুক্তি ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। এলোমেলো বক্তব্য শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে পারে না।
৩. বক্তব্যে আবেগ-আন্তরিকতা ও বক্তার গভীর বিশ্বাসের ছাপ থাকতে হবে যাতে শ্রোতারা মনে না করে যে, তিনি কৃত্রিম কথা বলছেন।
৪. ভাষণে চলিত ভাষা ব্যবহার করতে হবে– সাধুভাষা গ্রহণযোগ্য হয় না।
৫. উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি সুন্দর হলে ভাষণ শুনতে ভালো লাগে।
৬. ভাষণে আঞ্চলিকতা ও অন্যান্য মুদ্রাদোষ পরিহার করা উচিত।

কতিপয় ভাষণের নমুনা

‘নবীনবরণ’ অনুষ্ঠানে নবাগতদেরকে স্বাগত জানিয়ে একজন ছাত্রের ভাষণ তৈরি করুন।

আজকের এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ এবং যাদের জন্য এই আয়োজন সেই নবাগত শিক্ষার্থী ভাইবোনেরা– প্রথমেই সবার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।

স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে তোমরা আজ কলেজ জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। তোমাদের চোখেমুখে উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। নতুন জীবনের স্বপ্ন তোমাদের চোখে। নিয়ম আর ঐতিহ্য মেনে আমরা একাদশ শ্রেণির নবাগত ছাত্রছাত্রীদের বরণ করে নিই প্রতিবছর। এবছরও তার ব্যতিক্রম নয়। এই কলেজের সুন্দর পরিবেশে তোমাদের সবাইকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ।

নবীন শুভার্থী ভাইবোনেরা

সময়ের টানে কারো শুরু হয়, কারো বা হয় শেষ। এ অঞ্চলের স্বনামধন্য এই কলেজে পুরোনোদের বিদায় আর নতুনদের আগমন চিরাচরিত একটি প্রথা। সেই প্রথা মেনেই আজ তোমরা একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পদার্পণ করলে পবিত্র কলেজ প্রাঙ্গণে। এই যাওয়া আসার মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলে। ফুলেল শুভেচ্ছায় তোমাদের অভিনন্দন। অল্প কিছুদিন পরেই হয়তো তোমরা আমাদের বিদায় জানাবে। আমাদের দ্বাদশ শ্রেণির পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই উদাত্ত অভিনন্দন।

প্রিয় নবীন শিক্ষার্থীরা

প্রকৃতিতে প্রাণের স্পর্শ আজ। আকাশ জুড়ে আনন্দধ্বনি। প্রকৃতির এই আনন্দ সাড়া ফেলেছে চারদিকে। তোমরা প্রকৃতির এই মধুর হিল্লোলে ভেসে এই কলেজে পা রেখেছ। তোমাদের পদচারণায় মুখর এই কলেজ। তোমাদের জ্ঞান ও চেতনাকে জাগ্রত করবে এই প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায় না। শিক্ষিত মানুষ না হলে দেশ-জাতির মুক্তিও সম্ভব হবে না। আমরা প্রত্যাশা করি এই শিক্ষালয়ে তোমরা প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। বিনয় ও নম্রতা তোমাদের আলোকিত করে তুলক।

সোনালি সন্তানেরা

প্রাণপ্রিয় এই কলেজে শিক্ষকেরা হলেন পিতামাতার মতো। তাদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের বন্ধনটিও গভীর। শুধু ক্লাশের পড়া নয়, তার বাইরেও সংস্কৃতি-খেলাধুলার এক ঐতিহ্য রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষার্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতিতেও তোমরা এগিয়ে যাবে প্রত্যাশা রইল আমাদের।

মুক্তির অগ্রদূতেরা

নবীন ছাত্রছাত্রীরা,তোমরা মনে রাখবে শিক্ষা মানে আলো– শিক্ষা মানে মুক্তি। ভালোভাবে লেখাপড়া শেষ করে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে তোমাদের। কিন্তু কেবল নিজেরা ভালো থাকলেই চলবে না– দেশ-জাতির মুক্তি ও উন্নতির জন্য তোমাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে তোমাদের সেই শক্তি অর্জন করতে হবে। তোমাদের চলার পথ সুন্দর হোক, আনন্দময় হোক সেই কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

‘নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনের জন্য প্রধান অতিথির একটি ভাষণ রচনা করুন।

সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং মঞ্চের সামনে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী– আপনাদের সবার প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

সুধীবৃন্দ, আমরা জানি নারী পুরুষের সম্মিলিত অবদানেই আজকের পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। নারী হিসেবে কাউকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সৃষ্টির প্রথম থেকেই পুরুষের সাথে সাথে নারীরাও কাজে অংশগ্রহণ করেছে। মাতৃনির্ভর সমাজ ছিল একসময়। কিন্তু সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ আজ নানাভাবে নারীদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের ঘরের ভেতরে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। শিক্ষাদীক্ষা-জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি-গবেষণা সবকিছু থেকে নারীদের দূরে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত চলছে। কিন্তু এর ফলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। মেয়েদের অংশগ্রহণ ছাড়া দেশ এগোতে পারে না। তাই নারীদের শিক্ষা অপরিহার্য।

সম্মানিত সুধী

সময় অনেক পাল্টে গেছে। কাউকে আর ঘরের ভেতর বন্দি করে রাখার দিন নেই। ধর্মের নামে, নৈতিকতার নামে, সমাজরক্ষার নামে নারীদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখার কোনো সুযোগ নেই। রক্ষণশীলতা একটি ব্যাধি। মানবিক সমাজ তৈরির জন্য নারীপুরুষ সবাইকে হাতে হাত রেখে কাজ করতে হবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশের মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সংসদের স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেত্রী সবাই নারী। এছাড়াও নারী বিচারপতি, নারী মন্ত্রী, নারী প্রশাসক, নারী বৈমানিক সবই আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, নারীদের সামগ্রিক মুক্তি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে এখনো নারীরা নানারকম শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

প্রিয় নাগরিক সমাজ

ঐতিহাসিকভাবেই এ অঞ্চলে সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে দেরিতে। বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, তালাক ব্যবস্থা, কথায় কথায় নারীদের উপর পরিবারের অত্যাচার এখনো হরহামেশাই ঘটছে। পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়বে এরকম অসংখ্য ঘটনার কথা। এসবের প্রতিকারে আমাদের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। শুধু শহরে বসে নারীদের জন্য হাহুতাশ করলেই চলবে না। তার জন্য থাকতে হবে সত্যিকারের দরদ।

প্রিয় শিক্ষিত সমাজ

নারীশিক্ষার প্রসারে এবং বেশি সংখ্যায় মেয়েদের লেখাপড়ায় নিয়ে আসার জন্য নানা রকম উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আরও অনেক সুযোগ তৈরি করেছে সরকার নারী শিক্ষার বিস্তারে। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে অনেক স্কুল-কলেজ গড়ে উঠলেও মেয়েরা কতটা শিক্ষিত হচ্ছে তার কোনো পরিসংখ্যান আমাদের নেই। বাস্তবক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়াও সাধারণ পরিবারে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি আছে। অনেক পিতা-মাতা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোকে অর্থের অপচয় বলে মনে করে। একধরনের রক্ষণশীল পুরুষ নারীদের কেবল ঘরসংসারে বন্দি রাখাকে পছন্দ করে ও তাদের ভোগের সামগ্রী বলে মনে করে। নানারকম কেতাব ঘেঁটে তারা দেখানোর চেষ্টা করে নারীশিক্ষার দরকার নেই। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখবে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা বীরত্বের ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। তারা মিছিল করেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র চালিয়েছে, আহত যোদ্ধাদের সেবা দিয়েছে ক্যাম্পে। নানা বাঁধার ভেতর দিয়ে আজ নারীরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে জায়গা করে নিয়েছে। এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাশের হার ও সাফল্য অনেক বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীশিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেক, কোথাও এর চেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী অধ্যাপকের সংখ্যা পুরুষের প্রায় অর্ধেক।

শ্রদ্ধেয় সুধী

বেগম রোকেয়া অনেক আগে নারীশিক্ষার জন্য যে আলো জ্বালিয়ে গেছেন এখনকার মেয়েরা সেই পথ ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাদের এই অগ্রযাত্রাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। স্কুল-কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়-প্রশাসন-এনজিও–বিমানচালনা-কোর্টকাচারি-ব্যবস্য-বাণিজ্য সর্বত্র নারীরা নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত। শুধু সরকারের উপর নির্ভর না করে বেসরকারি সাহায্য ও উদ্যোগে মেয়েদের জন্য আরও সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির কথাটি কেবল শ্লোগান হবে না, সত্যিকারের উন্নয়ন হবে নারীদের । নজরুল বলেছেন– 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।' সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছিলেন "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" এর থেকে বোঝা যায় নারীশিক্ষা ও নারী উন্নয়ন ছাড়া দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তি অর্জিত হতে পারে না। আপনারা যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন তাদের আবারও শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

'ইভটিজিং প্রতিরোধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে একজন বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ রচনা করুন।

আজকের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, শ্রদ্ধাভাজন আলোচকবৃন্দ, প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ, আমন্ত্রিত সুধীসমাজ ও উপস্থিত সকলে– আপনাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আজ একটি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে আমরা উপস্থিত হয়েছি। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় নানা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু আজকের এই সেমিনারটি নানা দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'ইভটিজিং' বা 'যৌন হয়রানি' বর্তমান সময়ের এক জটিল সমস্যা। ইভটিজিংয়ের কারণে প্রায়ই দেশের নানা জায়গায় মেয়ে–ছাত্রী ও নারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানির কারণে অনেকে আত্মহত্যার মতো পথও বেছে নিচ্ছে। অনেকে স্কুল-কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে রাস্তাঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে কিংবা অন্য কোন জায়গায় পুরুষের দ্বারা নারীর প্রতি যে কোন যৌন হয়রানিমূলক আচরণকে ইভটিজিং হিসেবে ধরা হয়। সভ্য যুগে প্রবেশ করে আমরা বোধ হয় আদিম

অসভ্য সমাজে আবার ফিরে যাবার চেষ্টা করছি। আমাদের চারদিকের পরিবেশ অসুস্থ করে ফেলছে, দম আটকে আসার মতো ঘটনার খবরে আমরা গভীর উদ্বিগ্ন। এই সংকট মোকাবেলায় ছাত্রসমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সুধীসমাজ

নারীর প্রতি সহিংসতা আর নিপীড়ন নতুন কোন বিষয় নয়। যুগে যুগে তারা অবহেলা ও বৈষম্যের শিকার। ইভটিজিং তারই বর্তমান ফল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মেয়েদের মেধা ও যোগ্যতাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করায় ইভটিজিংয়ের মতো নোংরা ঘটনার জন্ম হয়েছে। বখে যাওয়া ছেলেরা এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটাচ্ছে। তাদের ওপর পরিবারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, মা-বাবার বাধ্য নয় তারা। ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তারা হয়তো আমাদের বিপথগামী ভাই কিংবা সন্তান, আত্মীয় অথবা পাড়া-প্রতিবেশি স্বজন। ইভটিজিংয়ের সঙ্গে তরুণ-যুবকরা ছাড়াও মধ্যবয়সী বিকৃত রুচির কিছু লোকও জড়িত।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ

ঘরের বন্দিদশা কাটিয়ে মেয়েরা যখন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-অফিস-আদালত ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যাওয়া শুরু করে ইভটিজিংয়ের ঘটনা তখন থেকেই বেশি পরিমাণে ঘটতে শুরু করে। অনেক মূর্খ অশিক্ষিত পুরুষ ইভটিজিংয়ের জন্য মেয়েদের খোলামেলা পোশাককে দায়ী করে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে শালীন রক্ষণশীল পোশাক পরিহিত মেয়েরাও ইভটিজিংয়ের শিকার হয়। অনেক নারীবাদী সংগঠন এই ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কিন্তু আমরা মনে করি এটা নারীদের একার কোন ব্যাপার নয়। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে আমাদের সবাইকে। বিশেষ করে ছাত্রসমাজকে এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচারণা চালাতে পারে। সরকারকেও এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সচেতনতামূলক কবিতা, গান, পোস্টার প্রদর্শনী, ডক্যুমেন্টারি, জারি গান ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্ররা তৈরি করতে পারে ব্যাপক সচেতনতা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ

ইভটিজিং বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এর হাত থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায় আমাদের সেই উপায়ই বের করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনিকে কঠোর হতে হবে এর প্রতিরোধে। এর পাশাপাশি ইভটিজারদের আমরা বয়কট করে চলবো। তারা কেন এধরনের আচরণ করে সরকারকেও তার কারণ খুঁজে দেখতে হবে। তাদের ভালো পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকারেরও একটি নৈতিক দায় রয়েছে।

প্রিয় সুধীজন

সময় এসেছে আমাদের নারীদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হবার। পরিবার থেকেই এই শিক্ষা শুরু করতে হবে। কোন মৌলবাদী ধর্মান্ধ ফতোয়া দিয়ে যাতে নারীদের হেয় করা না হয় সেদিকে সরকারের বিভাগগুলোর খেয়াল রাখতে হবে। বেশি বেশি করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চা করতে হবে। খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও সৃষ্টিশীল নানা কাজের সঙ্গে তরুণ সমাজকে সংযুক্ত করতে হবে। বেকার সমস্যা সমাধানেরও কোনো বিকল্প নেই। কাজের সুযোগ থাকলে এই ধরনের নোংরা ঘটনা কমে আসবে। আমাকে এরকম একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়ে আমাকে আপনারা সম্মানিত করেছেন। তাই আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার কথা এখানেই শেষ করলাম। ভালো থাকবেন সবাই।

'দুর্নীতি : উন্নয়নের বাধা' শিরোনামে প্রধান অতিথির একটি ভাষণ রচনা করুন।

আজকের এই সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, বিশেষ অতিথি, বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলি– আপনাদের প্রতি রইল আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।

সুধীজন

আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সভায় আমরা মিলিত হয়েছি। কারণ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা সবাই উদ্বিগ্ন এবং আমরা কমবেশি সবাই যার শিকার সে বিষয়টি হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি যেভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যেভাবে মানুষকে গ্রাস করছে তা খুবই চিন্তার কারণ। পরপর কয়েকবার বাংলাদেশ বিশ্বে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এটি

আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক। বাংলাদেশ স্বাধীন একটি দেশ কিন্তু দুর্নীতি আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করে চলেছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য সর্বত্র দুর্নীতি মহামারির আকার ধারণ করেছে। এর ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের সব সম্ভাবনা।

প্রিয় সুধীবৃন্দ

দুর্নীতি বর্তমানে সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতিবাজের সংখ্যা কম হলেও তার ফল ভোগ করতে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে। সরকারি অফিসগুলো হচ্ছে দুর্নীতির আখড়া। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান, সরকারি কর্মচারিকে অপরাধে সহায়তা করা, অসৎ উদ্দেশ্যে ভুল নথিপত্র তৈরি, জালিয়াতি করে সম্পত্তি আত্মসাৎ, নথি জাল করা, হিসাব বিকৃত করা দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা স্বার্থ উদ্ধার করাই হলো দুর্নীতি। নানা কারণে আমাদের সমাজে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। এটি একদিনে ঘটেনি। সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সৎ ও স্বচ্ছ হতে হয়। দুর্নীতি বাড়ার পেছনে একটি বড় কারণ হলো রাজনৈতিক প্রভাব। রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে এবং নিজের ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত এই অরাজকতা চলছে। ত্যাগের চেয়ে ভোগের দিকে সবার লক্ষ্য। বড়লোক হবার জন্য বিকৃত প্রতিযোগিতা, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি দুর্নীতির অন্যতম কারণ। দারিদ্রের কারণেও মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। এদেশের মানুষ ধর্মের প্রতি আগ্রহী হলেও অনেক সময় বাধ্য হয়ে দুর্নীতি করে। অভাব-অনটন ও দারিদ্রের কারণে যেমন অনেকে দুর্নীতিগ্রস্ত হয় তেমনি লোভ ও অতিরিক্ত বড়লোক হবার আশায়ও অনেকে লাগামহীনভাবে দুর্নীতি করে থাকে।

দুর্নীতি একটি রাষ্ট্রের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বিদেশি সরকার ও সংস্থাগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য দিলেও তার বেশিরভাগ টাকা লুটপাট হয়। সে কারণে বিদেশিরা সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক বাদবিচার করে এবং নানারকম শর্ত আরোপ করে। শিক্ষা-চিকিৎসা-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি খাতে বিদেশি সাহায্য প্রচুর পরিমাণে আসে। কিন্তু তারপরও এক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নয়ন নেই।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ

দুর্নীতি হলো অক্টোপাশের মতো। এখন সময়ের দাবি এই দুর্নীতির হাত থেকে নিজে রক্ষা পাওয়া এবং অন্যকে রক্ষা করা। দুর্নীতি কমাতে না পারলে অন্য দেশগুলোও আমাদের উন্নয়নে সাহায্য করতে চাইবে না। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর সবচেয়ে বড় সমস্যা দুর্নীতি। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব না এই দুর্নীতি দূর করা। এর জন্য দরকার আইনের শাসন এবং ব্যাপক সামাজিক উদ্যোগ। কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া আইনের প্রয়োগ করা যায় না। দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব থাকলে দুর্নীতি দূর করা যাবে না। সরকারি প্রভাব খাটালে দুর্নীতিবাজরা উৎসাহিত হবে। মানুষের জীবনমানের দিকে লক্ষ রেখে বেতন বৃদ্ধি, দ্রব্যমূলের দাম ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিকভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই ছালিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন কমিশন যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে তবে সেটা দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় বাংলাদেশে বেশিরভাগ দুর্নীতি হয়ে থাকে। অতএব রাজনৈতিকভাবে দুর্নীতি মোকাবিলা করতে হবে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যদি স্পষ্টভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া না হয় তবে একা দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে এই ব্যাধি নির্মূল করা সম্ভব না। এক্ষেত্রে মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান, আলোচনা, কথিকা, নাটক প্রভৃতি প্রচার করে মানুষকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা উচিত। এর পাশাপাশি পারিবারিকভাবে নৈতিক শিক্ষার উপরও জোর দো দরকার। অতিরিক্ত ভোগ-লালসা-চাহিদা থেকে বিরত থাকার জন্য নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

সচেতন সুধীসমাজ

এ দেশ আমাদের সবার। কেউ খাবে কেউ খাবে না এরকমটি এদেশে আমরা হতে দিতে পারি না। আমাদের নবীন প্রজন্মকে সুখী ও নিরাপদ রাখতে আসুন আমরা সবাই দুর্নীতর বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করি। দুর্নীতি দূর হলে দেশ উন্নত হবে, শক্তিশালী হবে, মানুষের কল্যাণ হবে। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করে বক্তব্য শেষ করছি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। ভাষণ কী ? ভাষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। সার্থক ভাষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

৩। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে ভাষণ রচনা করুন :

ক) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বিষয়ক একটি ভাষণ তৈরি করুন।
খ) যুবসমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে একটি ভাষণ রচনা করুন।
গ) 'বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিষয়ে একটি ভাষণ তৈরি করুন।

পাঠ ৮.১১ : প্রতিবেদন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রতিবেদন কী সে সম্পর্কে করতে পাবেন।
- প্রতিবেদন রচনার বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

ইংরেজি রিপোর্ট (Report) শব্দটির বাংলা পরিভাষা হলো প্রতিবেদন। রিপোর্ট শব্দটির অর্থ বিবরণ, বিবৃতি। কোনো তথ্য, ঘটনা বা বক্তব্য সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দেয়ার নাম প্রতিবেদন। প্রতিবেদন যিনি রচনা বা তৈরি করেন তাকে বলা হয় প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। প্রতিবেদককে সাধারণত কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য, উপাত্ত, সিদ্ধান্ত, মূল্যায়ন, ফলাফল ইত্যাদি অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হয়। সংবাদপত্রে প্রতিদিন এরকম অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এধরনের প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজস্ব চিন্তাধারা বা মূল্যায়ন প্রকাশ করার কোনো সুযোগ নেই। তবে অন্যান্য প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের নিজস্ব ধারণা, চিন্তা ও মূল্যায়ন থাকতে পারে। সেই কারণে অনেকে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিবেদনের পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন।

প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য

১। কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন রচনা করতে হবে।
২। প্রতিবেদনে তথ্য ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকতে হবে।
৩। প্রতিবেদন হবে সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ। পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে প্রতিবেদন রচনা করা যাবে না।
৪। আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করা ঠিক নয়।
৫। প্রতিবেদনের বিষয়টি কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে রচনা করা যেতে পারে।
৬। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই প্রতিবেদনে প্রধানভাবে আলোচিত হবে।

প্রতিবেদনের নমুনা

'পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষমেলা' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	জীবনের জন্য বৃক্ষ
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০–৮-২০১৬
সংযুক্তি	:	বৃক্ষরোপণের ছবি (৩টি)

জীবনের জন্য বৃক্ষ

বৃক্ষ প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি ছাড়া পৃথিবী ও মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের জীবনের অপরিহার্য উপাদান বৃক্ষ। মানবজীবনের এমন কোনো দিন নেই বা মুহূর্ত নেই যে, বৃক্ষ ছাড়া মানুষ চলতে পারে। কারণ বৃক্ষ থেকেই নির্গত হয় অক্সিজেন এবং এই অক্সিজেন ছাড়া মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা চিন্তাই করতে পারে না। পরিবেশের অন্যতম উপাদান বৃক্ষ ও গাছপালা।

বাংলাদেশে খুব দ্রুত নগরায়ণ ঘটছে। ফলে গাছপালা ও বনভূমির পরিমাণ কমে আসছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা বলেন যে, কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে মোট ভূমির শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এই বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৬ ভাগ। উত্তরবঙ্গে এই বনভূমির পরিমাণ আরও কম। ফলে একধরনের দীর্ঘ মেয়াদি খরা ও মরুকরণের শঙ্কায় আছে আমাদের দেশ। যেভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গাছপালা কেটে নেয়া হচ্ছে তার মারাত্মক প্রভাব পড়েছে পরিবেশের ওপর। বৃক্ষের প্রতি মানুষ যদি সদয় ও যত্নবান না হয় তবে সামনে আরও বিপদ রয়েছে। বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। গাছপালার অভাবে প্রকৃতিতে দেখা দিচ্ছে ভূমিক্ষয়, বৃষ্টিহীনতা, ঊষরতা। ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আমাদের জনসংখ্যা। এই বাড়তি মানুষের চাপে বনভূমির পরিমাণ দ্রুত কমে যাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছ কাটা হচ্ছে সেখানে লাগানো হচ্ছে একটি গাছ। দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। এরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে। দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম আর রাত্রিবেলা থাকে কনকনে ঠাণ্ডা। বৃক্ষ শুধু প্রকৃতির ভারসাম্যই রক্ষা করে না, গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙা করেও তোলে। বাংলাদেশে প্রথম ১৯৭৬ সালে সরকারি উদ্যোগে গাছ লাগিয়ে বনাঞ্চল তৈরির কর্মসূচি নেয়া হয়। ১০-১৫ একর জমি নিয়ে কৃত্রিম বন সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়।

বৃক্ষের প্রতি মানুষকে আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলার জন্য প্রতিবছর ১৩ জুন সারাদেশে 'বৃক্ষরোপণ অভিযান' সরকারি কর্মসূচি হিসেবে পালিত হচ্ছে। প্রতিটি জেলা ও থানা সদরে কয়েকদিন ব্যাপী বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয় এবং নানা স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে গাছ রোপণ করা হয়। সবাইকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্নরকম পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা হয়েছে। 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার' দেয়া হয় এজন্য। এর ফলে একধরনের সামাজিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এখন পুরস্কার হিসেবে বৃক্ষচারাও দেয়া হয়। বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাস্তার দুপাশে এবং পরিত্যক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে তারা প্রচুর বৃক্ষরোপণ করছে। এইসব বৃক্ষরাজি কেবল চারদিকের শোভাই বৃদ্ধি করেনি, পরিবেশ রক্ষার্থেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি নানাভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা চলছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অসাধু বনকর্মকর্তা এবং স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তির কারণে প্রচুর বৃক্ষ লোপাটও হয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজন অসাধু বন কর্মকর্তা বৃক্ষনিধনে সহায়তা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়ায় শাস্তির মুখোমুখি হয়েছেন। রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে রাস্তার পাশের বহু গাছ রাতের আঁধারে কেটে বিক্রি করে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। এদের বিরুদ্ধে যদি এখনই ব্যবস্থা না নেয়া যায় তবে পরিণতি খুব ভয়াবহ হতে পারে। প্রতিটি নাগরিকের বৃক্ষরোপণ অভিযানে শরিক হওয়া উচিত। কারণ বৃক্ষই জীবন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ শুধু অরণ্য সংরক্ষণ নয়, অরণ্য সম্প্রসারণেরও কাজ চলছে। তাই বৃক্ষরোপণ শুধু প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাই নয়, মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যও এক বিরাট প্রয়াস।

'বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬

বাংলাদেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষার মূল্য অর্থ দিয়ে করা যায় না। শিক্ষার কারণেই মানুষ ও পশুতে পার্থক্য তৈরি হয়। মানবসভ্যতা শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। মাটিতে কেবল বীজ ছড়িয়ে দিলেই হয় না, সেই বীজ থেকে সবুজ পাতা সৃষ্টিতে দরকার হয় উর্বর মাটি, জল ও প্রয়োজনীয় আলো। তেমনি একটি মানবশিশু জন্ম নিলেই হবে না, তাকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দরকার উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচর্যা। বর্তমান বিশ্ব হলো প্রতিযোগিতামূলক। তাই বর্তমান প্রজন্মকে কেবল শিক্ষা দিলেই হবে না, তাকে সুশিক্ষায় মানবসম্পদে পরিণত করতে

হবে। মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করার প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সেই বৃহত্তর শিক্ষার প্রথম সোপান। জাতীয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হওয়ায় একে 'সার্বজনীন শিক্ষা' বলা হয়।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান বেশ নাজুক। শিক্ষার মানের অবনতি পীড়াদায়ক। আগের তুলনায় শিক্ষার হার বাড়লেও তা যথেষ্ট নয়। বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষ দেশের জন্য বোঝাস্বরূপ। তাদের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণাও পুরোনো। তারা আধুনিক জীবন-জগৎ সম্পর্কে কোনো সুষ্ঠু জ্ঞান রাখে না। ফলে সাধারণ শিক্ষার অভাবে এই জনগোষ্ঠী দেশ ও জাতির কোন কাজে লাগে না। তারা রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রায় দেড়শ বছর আগে থেকে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এই সংবিধানে শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়। রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাবও বাস্তবায়ন করা যায়নি। ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারপরও প্রায় সাত কোটি মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমাতে না পারলে আমাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। গত বছরগুলোতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল। জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে শিক্ষার সুফল লাভে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নানা বাধা-বিপত্তি রয়েছে। দারিদ্র্য তার মধ্যে বড় একটি কারণ। গরিব মা-বাবারা তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজেকর্মে পাঠাতে বেশি আগ্রহী। সন্তান টাকা রোজগার করে সংসারে সাহায্য করবে এই হলো তাদের মনোভাব। লেখাপড়া শেখাকে তারা সময়ের অপচয় বলে মনে করে। সেজন্য দারিদ্র হ্রাস পাবার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এশিয়ার বহু দেশে শিক্ষার হার অনেক বেশি। শ্রীলঙ্কা, জাপান ও রাশিয়ায় এই সংখ্যা প্রায় শত ভাগ। সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করে প্রাথমিক শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেই হবে। তা নাহলে উন্নয়ন সঠিকভাবে হবে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার ও সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাকে সবশ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে দেশ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি।

'নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬
সংযুক্তি	:	

নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। প্রায় ৬৮হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এই দেশ। কিন্তু ধীরে ধীরে নগরায়ণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুত গতিতে শুরু হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ নগর ও শহরে বাস করতে থাকে। বাংলাদেশে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা বেশি দিনের নয়। ১৯৬৫ সালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম থেকেই এই অধিদপ্তর ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখছে।

নগরায়ণের ফলে অনিবার্য কিছু সমস্যা দেখা যায়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন ও অপরাধপ্রবণতা সাগরিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। নগরে বসবাসকারী মানুষ সবাই ধনী নয়, অনেক গরিব লোকজনও নগরে বাস করে। গ্রামের আর্থিক উন্নতি না ঘটলে নগরের উন্নয়ন ঘটে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ নগরের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল। পরিবহন সমস্যা, যানজট সমস্যা, সড়ক দুর্ঘটনা নগরবাসীর জন্য চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। নগরজীবনে নানারকম সেবা পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেবা পাবার ক্ষেত্রে বহু বৈষম্য দেখা যায়। নগরে অনেক গরিব লোক বাস করে। বস্তিগুলোতে

অনেক গরিব লোক ঠাঁই নিয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় মানুষের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে। নারী ও শিশু নির্যাতন, ছিনতাই ইত্যাদি নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নগরবাসীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। বায়ু, পানি ও শব্দদূষণ তীব্র আকার ধারণ করায় জনজীবন যেমন অসহ্য হয়ে উঠেছে তেমনি অসাধু ব্যক্তিরা উন্মুক্ত স্থান, পার্ক ও উদ্যান, লেক, নদী, জলাশয় প্রভৃতি দখল করে নেয়ায় নগরের পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। তাছাড়া দখলদারদের হাত থেকে পাহাড়, বনবনানীও রেহাই পাচ্ছে না। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা। বর্তমান সময়ে এসে নগর উন্নয়নের পরিকল্পনা খুব গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি গ্রাম হলেও নগরজীবন আমাদের উন্নয়নের সূতিকাগার। সে লক্ষ্যেই বর্তমানে সরকার শহর ও নগরগুলোর বিকেন্দ্রিকরণের কথা ভাবছেন। নগরায়ণের ভালো দিকগুলো চিহ্নিত করে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। নগর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আজ ব্যাপকভাবে অনুভব করা যাচ্ছে। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন আগে করতে হবে। বিভিন্ন সংস্থা, সুশীল সমাজ, নাগরিক প্রতিনিধির সহযোগিতায় পরিকল্পিত নগরায়ণের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য নগরের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। মহানগর, মাঝারি শহর এবং ছোট শহরগুলোকে এই উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আমরা জানি, কাজের সন্ধানে প্রতিদিন রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে অনেক গরিব মানুষ ভিড় করে। এর ফলে নগরে বাড়তি চাপ পড়ে এবং মানুষের জীবন নানাভাবে বিপন্ন হয়। সেইজন্য নগরায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে শহরমুখী মানুষের এই স্রোত বন্ধ করা যায়। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে জনগণকে যুক্ত করতে হবে উন্নয়নের সঙ্গে এবং লক্ষ রাখতে হবে যাতে বিনিয়োগ বাড়ে। বিনিয়োগ বাড়লে নগরের শিল্পায়ন হবে এবং মানুষের কাজ ও আয় বাড়বে, দারিদ্র্য কমবে। দারিদ্র্য দূর হলে জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

আবাসিক এলাকার সঙ্গে অফিস ও বাণিজ্যিক এলাকা তৈরি করা , গতিশীল পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং রাজধানী ঢাকা ও চট্রগ্রামের দিকে জনস্রোত হ্রাস করা অপরিহার্য। নগরে আবাসন তৈরির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সড়ক পথের উন্নয়ন করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি নগর উন্নয়নের জন্য পরিবেশের ক্ষতি করে এমন সব কার্যক্রম বন্ধ করে ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে। এই নগর উন্নয়নের সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানসমূহ রক্ষা করা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, পাহাড়ি জেলাগুলোতে পাহাড়, টিলা রক্ষা করা, শহরের নিকটবর্তী অঞ্চল বা শহরতলি এলাকাকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে নগরায়ণজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ। বাংলাদেশ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট ২০২১ পরিকল্পনাকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে। দেশের সুষ্ঠু উন্ননের জন্য নগরায়ণের কোন বিকল্প নেই। পল্লির মানুষ ও কৃষির উন্নতির সাথে সাথে পরিকল্পিত নগরায়ণ না হলে সত্যিকারের জীবনমানের উন্নয়ন অর্জিত হবে বলে মনে হয় না। অতএব এখনি দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, দরকার তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

'সুখী কমলগঞ্জ কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা' সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬

সুখী কমলগঞ্জ কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা গত ৬ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। সুখী কমলগঞ্জ কলেজটি এই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পড়াশুনোর পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চা ও খেলাধুলায় এই কলেজের সুনাম দীর্ঘদিনের। জাতীয় পর্যায়েও এই কলেজটি পুরস্কৃত হয়েছে ইতোমধ্যে। স্বনামধন্য সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সবার আগ্রহ ও মনোযোগ দাবি করে প্রতিবছর।

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ছাত্র সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এছাড়াও সংস্কৃতিমনা অন্য কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী এই

আয়োজনকে সফল করে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছে। সপ্তাহ ধরে চলা এই প্রতিযোগিতাটি ছিল উন্নত রুচি ও মূল্যবোধের পরিচায়ক।

সুদক্ষ অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনও করেন তিনি। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে সেজন্য অনেক রকম বিষয়কে প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বরচিত কবিতা, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি, নির্ধারিত বক্তৃতা, বিতর্ক, পুথিপাঠ, গল্প বলা, প্রবন্ধ রচনা, স্বরচিত গল্প-কবিতা, সুন্দর হস্তাক্ষর, একক অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুল সংগীত, উচ্চাঙ্গ সংগীত, পল্লিগীতি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, লালনগীতি, আধুনিক গান, ছড়া গান, নৃত্য, কৌতুক, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনেকজন করে প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়, যার ফলে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় প্রতিটি শাখায়। শিক্ষকবৃন্দ আগ্রহ নিয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং উপভোগ করেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি। বাড়তি উৎসাহ যুগিয়েছে অডিটোরিয়াম ভর্তি শিক্ষার্থীর সরব উপস্থিতি। যারা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি, দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে তারা অনুষ্ঠানকে মাতিয়ে রাখে। স্কাউট ও রোভার দলের সদস্যরা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

প্রতিযোগিতার শেষ দিনে এলাকার সম্মানিত সংসদ সদস্য প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সবার উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। কলেজের এই সাংস্কৃতিক চর্চায় প্রধান অতিথি মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করে আরও বেশি বেশি সাংস্কৃতিক চর্চা অব্যাহত রাখার পক্ষে মত দেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় আরও মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন এবং কলেজের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। শিক্ষা যেমন আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী করে তোলে তেমনি সংস্কৃতিচর্চা শিক্ষার্থীদের সুকুমার বৃত্তিকে বিকশিত করে তুলবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সপ্তাহব্যাপী প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান বিজয়ীদের মধ্যে মূল্যবান বই ও স্মারক প্রদান করা হয়। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুনন্দা অধিকারী পাঁচটি বিষয়ে বিজয়ী হয়ে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার কৃতিত্ব অর্জন করে। এই সাফল্যের জন্য তাকে বিশেষ পুরস্কার একটি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়।

সুখী কমলগঞ্জ কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয় প্রতিযোগিতায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থেকে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। পুরো আয়োজনের জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রচেষ্টা ও আগ্রহের ভূয়সীপ্রশংসা করা হয়। বিপুল সংখ্যক অভিভাবক সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তারা অকুণ্ঠচিত্তে এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। অভিভাবকদের জন্যও কয়েকটি প্রতিযোগিতা নির্ধারিত ছিল। তাতে অনেক অভিভাবক অংশ নেন এবং তাদের মধ্যে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। সাত দিনব্যাপী দারুণ উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এই প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটে।

বন্যার পর তোমার এলাকার গৃহীত পুনর্বাসন কাজ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

প্রতিবেদনের প্রকৃতি	:	সংবাদ প্রতিবেদন
প্রতিবেদনের শিরোনাম	:	বন্যার পর তোমার এলাকার গৃহীত পুনর্বাসন কাজ
প্রতিবেদন তৈরির সময়	:	দুপুর ১২.০০ টা
তারিখ	:	২০-৮-২০১৬
সংযুক্তি	:	

বন্যাকবলিত চিলমারি উপজেলার পুনর্বাসন

উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকা চিলমারি। মঙ্গা আর দারিদ্র্যের ছবি এখানকার নিষ্ঠুর বাস্তবতা। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলটি মাত্র গত মাসেই ভয়াবহ বন্যার কবলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। অবিরল বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে চিলমারি উপজেলাটি স্মরণকালের প্রচণ্ড বন্যায় তছনছ হয়ে যায়। একই সময়ে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলাও বন্যার কবলে পড়ে। হঠাৎ এই বন্যায় চিলমারি উপজেলাটি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা অবর্ণনীয়। বন্যায় কেবল মানুষই মারা যায়নি বা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়নি, কৃষি ফসল এবং গবাদি পশুরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রায় মাসব্যাপী এই বন্যায় সমগ্র চিলমারি উপজেলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। টানা বর্ষণ এবং সীমান্তের ওপার থেকে আসা পাহাড়ি ঢলে একদিনেই পাল্টে যায় এলাকার চিরচেনা চিত্র। নিচু এলাকার ঘরবাড়ি তলিয়ে যায় পানিতে, জমির ফসল ভেসে যায়, গবাদি পশুর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে। উপজেলার যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে বাঁধে-স্কুল-কলেজে এবং শহরের পরিত্যক্ত ভবনে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেয়। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি নিয়ে বিপাকে পড়ে মানুষজন। খাবারের অভাবে অনেক পশু দুর্বল হয়ে পড়ে, পানিতে ভেসে যায় কোন কোনটি। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-সরকারি প্রতিষ্ঠান-বাজার-দোকানপাট এমনকি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনেও পানি ওঠে। স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। সরকারি সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ অর্ধাহার-অনাহারে দিন কাটায়।

বন্যার পানি প্রায় দুই সপ্তাহ পরে নেমে যেতে শুরু করে। বর্তমানে এখানে পুনর্বাসন কাজ শুরু হয়েছে এবং সরকারি নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ভেঙে যাওয়া রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় সংস্কার করা হচ্ছে। এতে করে বেকার লোকেরা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। গরিব-অসহায় মানুষদের মধ্যে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। কৃষিজমির ফসল পানিতে ভেসে যাওয়ায় তারা পথে বসতে বসেছে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক প্রদান করা হচ্ছে। সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করবেন বলে সরকার ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে তা বাস্তবায়নের নির্দেশও দেয়া হয়েছে। গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণেও অর্থ বন্টন করা হয়েছে। সরকারের এই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু মহৎ এই উদ্যোগ সত্ত্বেও অনেক মানুষই বঞ্চিত হয়েছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে। অসাধু দুর্নীতিবাজ স্থানীয় কিছু মানুষের জন্য সত্যিকারের অনেক গরিব লোক এবং বানভাসি মানুষ সাহায্য পায়নি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, ব্রিজ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি মেরামতের জন্য সরকারি অনুমোদন দেয়া হয় এই উপজেলার জন্য।

বন্যা পরবর্তী সময়ে এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। চিলমারিতে সে ধরনের কিছু রোগবালাই দেখা গেলেও তা যাতে মহামারির আকারে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে ওষুধপত্র প্রস্তুত রাখা, ডাক্তারদের ছুটি বাতিল করাসহ এনজিও প্রশিকা, ব্র্যাক ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলো সার্বক্ষণিকভাবে স্বাস্থ্য সহায়তা প্রদান করায় প্রাণহানির কোন ঘটনা এখানে ঘটেনি। বিভিন্ন প্রকারের ওষুধ সরবরাহ করা এবং আক্রান্ত রোগীদের ব্যবস্থাপত্র দেয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বন্যা-পরবর্তী কৃষি কার্যক্রম যাতে চালিয়ে নেয়া যায় এবং ক্ষতি হয়ে যাওয়া ফসলের কারণে যাতে খাদ্যাভাব দেখা না দেয় সেজন্য আগাম প্রস্তুত থাকতে কৃষিদপ্তরকে ইতোমধ্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বীজতলা তৈরি করে কৃষকদের মধ্যে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের ব্যাপক অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হবার কারণে সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা বেশ কঠিন। বন্যায় মানুষের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করা খুব কঠিন। তারপরও এসব সামান্য সাহায্য-সহযোগিতা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে মানুষকে সাহস জোগায়, তাদের টিকে থাকার লড়াইয়ে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে সব এলাকার প্রতিই সরকারকে নজর দিতে হয়। তারপরেও চিলমারি এলাকার পুনর্বাসন কাজে সরকারের সহযোগিতা ও তৎপরতা প্রশংসার দাবি রাখে। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। যেকোনো প্রাকৃতিক সংকটে সরকারের পাশাপাশি দেশের জনসাধারণকেও পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। প্রতিবেদন বলতে কী বুঝায় ? সার্থক প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবেদন রচনা করুন :

ক) কলেজ গ্রন্থাগার সম্পর্কে প্রতিবেদন

খ) লোডশেডিং সম্পর্কে প্রতিবেদন

গ) যানজট সমস্যা সম্পর্কে প্রতিবেদন

পাঠ ৮.১২ : বৈদ্যুতিন চিঠি ও খুদেবার্তা লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বৈদ্যুতিন চিঠি লিখার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- খুদেবার্তা লিখার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ই-মেইল বা বৈদ্যুতিন চিঠি ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিনির্ভর পত্র-যোগাযোগের মাধ্যম। এ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সহজে ও দ্রুততার সঙ্গে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক, দাপ্তরিক বা যে কোনো ধরনের বার্তা, চিঠি, প্রতিবেদন, তথ্য-উপাত্ত, নথি, ভিডিও ইত্যাদি প্রেরণ করা যায়। এর জন্য দরকার ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার এবং gmail, yahoo, hotmail এসব ওয়েবসাইটের যে কোনোটিতে একটি একাউন্ট। একটি ই-মেইল একই সঙ্গে অসংখ্য মানুষের কাছে পাঠানো সম্ভব।

বৈদ্যুতিন চিঠির নিয়ম-কানুন :

১. To লিখিত বক্সে প্রাপকের ঠিকানা লিখতে হয়। অন্য কাউকে বৈদ্যুতিন চিঠি সম্পর্কে অবগত করতে Cc বক্সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে।
২. Subject বক্সে সংক্ষেপে বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
৩. Text অংশে মূল বিষয় সংক্ষেপে, সংহতভাবে ও সহজবোধ্যরূপে উল্লেখ করতে হবে। একাধিক বিষয় থাকলে ক্রমিক নম্বর অনুসারে বিষয়গুলোকে সাজিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।
৪. বৈদ্যুতিন চিঠিতে সাধারণ চিঠির মতোই প্রয়োজনানুসারে সম্বোধন করতে হয়।
৫. নথি, ফাইল, ভিডিও ইত্যাদি প্রেরণের জন্য Attatchment অংশের সাহায্য নিতে হবে।
৬. সবশেষে Send -এ Click করে বৈদ্যুতিন চিঠি প্রেরণ করতে হবে।

বৈদ্যুতিন চিঠির কতিপয় নমুনা :

১. জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	pjmina@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	জন্মদিনের শুভেচ্ছা।
Text : প্রিয় মিনা, আজ তোমার ২৪তম জন্মদিন। এ শুভদিনে তোমার প্রতি অশেষ শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। তোমার জীবন সাফল্যে ও আনন্দে ভরে উঠুক তোমার জন্মদিনে আমার এ অকৃত্রিম কামনা। শুভেচ্ছান্তে হেনা	

২. পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের সংবাদ জানিয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রতি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	Sajid1990@yahoo.com, jhsakib_175@gmail.com, younus@email.com, k.saz_bd@hotmail.com, tafiq75@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন।

Text :

প্রিয় শিক্ষার্থীরা,

অনিবার্য কারণে তোমাদের আগামীকাল **১৬/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার** অনার্স ২য় বর্ষের টিউটরিয়াল পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে না। পরীক্ষাটি ১৮/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার একই সময়ে একই কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সহপাঠীদের সংবাদটি জানিয়ে দিও।

শুভেচ্ছাসহ

তোমাদের কোর্স শিক্ষক

হাসান কবীর

৩. খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ছোট ভাইকে বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	rumel_1995@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হও।

Text :

স্নেহের রুমেল,

তোমার শারীরিক অসুস্থতার কথা জেনে উদ্বিগ্ন আছি। ইদানিং প্রায়শই তুমি অসুস্থতায় ভুগছ। মনে হচ্ছে খাবারের বিষয়ে তুমি অনিয়ম করছ। হোস্টেলে খাবারের যে ব্যবস্থা তা পর্যাপ্ত ও সুষম হওয়ার কথা নয়। এছাড়া সঠিক সময়ে খাবার গ্রহণের বিষয়েও তোমার অবহেলা আছে বলে মনে হচ্ছে। মনে রাখবে, সুষম খাবার আর সঠিক খাদ্যাভ্যাসই সুস্থ থাকার উত্তম উপায়। দুধ ও ডিম নিয়মিত খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কাচা খাওয়া যায় এমন সবজি প্রতিদিন খাবে। ভাল লেখাপড়া করে উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়েই তুমি আমাদের থেকে দূরে আছ। কিন্তু শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থাকলে তোমার স্বপ্ন পূরণ বাধাগ্রস্ত হবে। তাই খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে সচেতন ও যত্নশীল হবে। তোমার মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

শুভেচ্ছাসহ

তোমার প্রিয় বড় বোন

মিতু

৪. বিবাহের নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	h.reza@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	বিবাহের নিমন্ত্রণ।

Text :

প্রিয় রেজা,

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আগামী ২৮/০৬/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার আমার বড় ভাই সাজিদ কবীরের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে তোমার আনন্দময় উপস্থিতি গভীরভাবে কামনা করছি। আশা করছি, তোমার ব্যস্ততা সত্ত্বেও যথাসময়ে আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।

শুভেচ্ছাসহ

জিহান

৫. বই সরবরাহের তাগিদ দিয়ে প্রকাশককে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

To	mollikbrothers@yahoo.com
Cc	
Bcc	
Subject	বই সরবরাহের তাগাদাপত্র।

Text :

জনাব,

বাংলা বিভাগের সেমিনারে জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহের জন্য গত ১২ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বইয়ের তালিকাসহ আপনার কাছে একটি ই-মেইল পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি। আশা করছি , জরুরি বিবেচনা করে দ্রুত বই পাঠিয়ে তা ফিরতি ই-মেইলে আমাকে অবগত করবেন।

ধন্যবাদান্তে

মুনীরা কবীর,বিভাগীয় প্রধান,বাংলা বিভাগ

.... কলেজ, ... ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বৈদ্যুতিন চিঠি কী?

২. বৈদ্যুতিন চিঠি লেখার নিয়ম লিখুন।

৩. বৈদ্যুতিন চিঠির একটি নমুনা লিখুন।

৪. পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লিখুন।

পাঠ ৮.১৩ : পত্র লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পত্র কী ও কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার পত্ররচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

মূলপাঠ

দূরবর্তী লোকের সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে চিঠিপত্র। এটি একটি পরোক্ষ যোগাযোগ মাধ্যম। চিঠিপত্রে সংবাদ আদান-প্রদানের বৈষয়িক প্রয়োজন যেমন সিদ্ধ হয়, তেমনি রচনার গুণে আর লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে চিঠি, বিশেষত ব্যক্তিগত চিঠি কখনো কখনো সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। চিঠিপত্রে লেখকের জ্ঞান ও রুচিবোধের পরিচয় মেলে। চিঠিপত্র রচনার সূত্রপাত প্রাচীন কালেই। তবে চিঠিপত্র প্রেরণের যে বিশ্বব্যাপী ডাকব্যবস্থা তা নিতান্তই হাল আমলের।

সাধারণভাবে চিঠিপত্র চার ধরনের –

১. ব্যক্তিগত পত্র
২. সামাজিক পত্র
৩. ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্র
৪. বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক পত্র

একেক ধরনের চিঠির কাঠামো একেক রকমের, তবে প্রতিটি ধরনের রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং ভাষাভঙ্গিও প্রায় নির্দিষ্ট। কেবল ব্যক্তিগত পত্রে লেখক নিজস্ব ধরনে চিঠি রচনার স্বাধীনতা ভোগ করেন।

চিঠি লেখার কিছু সাধারণ নিয়ম–

১. চিঠির ভাষা হবে আকর্ষণীয়, প্রাঞ্জল ও সহজে বোধগম্য।
২. শুদ্ধ বানানে, সঠিক বাক্যে ও সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠি লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩. চিঠি মূল বক্তব্যকে ঘিরে লিখিত হবে; বাহুল্য বা অতিরঞ্জন পরিত্যাজ্য।
৪. কাঠামো মেনে চিঠি রচনা করতে হবে এবং খামে প্রেরক ও প্রাপকের পূর্ণ ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৫. পত্রিকায় প্রকাশের চিঠির দুটো অংশ– একটি মূল চিঠি, অপরটি সম্পাদকের প্রতি ছাপানোর অনুরোধ।
৬. স্মারকলিপিতে সব সময় 'আপনি' সম্বোধন ব্যবহার করতে হয়।

১. ব্যক্তিগত পত্র :

সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের তাগিদে মানুষ আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-স্বজন বা পরিচিতজনের কাছে চিঠি লিখে থাকেন। এই ধরনের ব্যক্তিগত ভাবনা তাড়িত চিঠিই ব্যক্তিগত চিঠি হিসেবে চিহ্নিত।

প্রচলিত কাঠামোতে ব্যক্তিগত চিঠির পাঁচটি অংশ। সেগুলো হচ্ছে––

(১) ঠিকানা ও তারিখ
(২) সম্ভাষণ
(৩) মূলপত্র
(৪) বিদায় সম্ভাষণ
(৫) স্বাক্ষর

(১) ঠিকানা ও তারিখ : পত্রের বামদিকের ওপরের অংশে প্রথমে পত্রলেখকের পূর্ণ ঠিকানা ও তার নিচে তারিখ লিখতে হয়। যেমন :

৫০/১, নর্থ রোড
ঢাকা-১২০৫
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ **অথবা,**
গ্রাম- ভুরবুড়িয়া
ডাক- পুটিয়া বাজার
জেলা- নরসিংদী
২৬ আগষ্ট, ২০১৬খ্রি.

(২) সম্ভাষণ : যাকে উদ্দেশ্য করে চিঠিটি লেখা হচ্ছে তার সম্মান, মর্যাদা ও পত্রলেখকের সঙ্গে তার সম্পর্কের নিরিখে সম্ভাষণসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। আর সম্ভাষণ লিখতে হয় পত্রের বামদিকে ঠিকানার পরের ধাপে। যেমন :

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু/শ্রদ্ধেয় আব্বা/প্রিয় সুলতান/স্নেহাস্পদ রাসেল/সুজনেষু ইত্যাদি।

(৩) মূলপত্র : এটিই চিঠির মূল অংশ। এ অংশে পত্রলেখক তার বক্তব্যকে সুন্দর করে গুছিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করবে। একই পত্রে একাধিক বক্তব্য থাকলে তা আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে লিখতে হবে।

(৪) বিদায় সম্ভাষণ : মূলপত্রের পরের ধাপে পত্রের বামদিকে বিদায় সম্ভাষণ লিখতে হয়। পত্রপ্রাপকের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিদায় সম্ভাষণসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন :

ইতি, আপনার স্নেহাস্পদ/ স্নেহধন্য
ইতি, প্রীতিমুগ্ধ/ প্রিয় বান্ধব
ইতি, তোমার মঙ্গলপ্রার্থী
ইতি, বিনীত ইত্যাদি।

(৫) স্বাক্ষর : এটি চিঠির শেষ অংশ। এখানে পত্রলেখকের পুরো নাম বা প্রচলিত মুদ্রাকৃতি ব্যবহার করা যায়।

চিঠি প্রাপকের কাছে পৌঁছলেই এর সার্থকতা। প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর জন্য খাম ব্যবহার করতে হয় এবং খামের ডানদিকে প্রাপকের ও বামদিকে প্রেরকের পূর্ণ ঠিকানা লিখতে হয়। নিম্নে একটি চিঠির পূর্ণ কাঠামো উপস্থাপিত হলো –

(১) তারিখ ও ঠিকানা
(২) সম্ভাষণ
(৩) মূলপত্র
(৪) বিদায় সম্ভাষণ
(৫) স্বাক্ষর

		স্ট্যাম্প
প্রেরক, নাম ঠিকানা	প্রাপক, নাম ঠিকানা	

ব্যক্তিগত পত্রের কতিপয় নমুনা উপস্থাপিত হলো –

পত্র ১. জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন।

৮ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি.
মনোহরপুর, কুমিল্লা

প্রিয় আরিয়ান,
আমার স্নেহের পরশ নিও। আজই সকালে তোমার চিঠি পেয়েছি। ভালো আছ জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আর অশেষ আনন্দে পুলকিত হয়েছি এসএসসি পরীক্ষায় তোমার জিপিএ ৫ পাওয়ার সংবাদে। ভালো ফল অর্জনের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।
ভালো ফল তোমার সামনে এক অবারিত দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। এখন তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করার পালা। মনে রেখো, লক্ষ্য স্থির না থাকলে তোমার মেধা ও সামর্থ্যের সঙ্গে জীবনের প্রকৃত সফলতার মেলবন্ধন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। বড় কোনো লক্ষ্য সামনে স্থির করা থাকলেই কেবল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্যম তোমার মধ্যে তৈরি হবে। আরেকটি কথা স্মরণে রেখো, মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। নিজের লক্ষ্যকে কখনো ছোট করো না, তাতে নিজের শক্তির উপর নিজেরই অবিচার করা হবে। কী হতে চাও সে লক্ষ্য ঠিক করে তার পেছনে এখনি ছুটতে শুরু করো, ঝাঁপিয়ে পড় লক্ষ্য অর্জনের মিশনে। আর তাতেই তোমার জীবন সাফল্যের আলোয় উদ্ভাসিত হবে, নিজেকে খুঁজে পাবে সফল মানুষদের কাতারে।
পরবর্তী পত্রে তোমার লক্ষ্যের কথা জানিও। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিও। আমরা সবাই ভালো আছি। তুমি ভালো থেকো।
ইতি

তোমার নিত্য শুভার্থী
ঊর্মি

স্ট্যাম্প

প্রেরক,	প্রাপক,
ঊর্মি	আরিয়ান ইউসুফ
৪৮, মহিলা কলেজ রোড	৩৬৪, সেন্ট্রাল রোড
মনোহরপুর, কুমিল্লা।	ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

পত্র ২. কোথাও বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে পিতার কাছে পত্র লিখুন।

১৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.
ঢাকা কলেজ, ঢাকা

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা
আমার সালাম নিবেন। আশা করি সবাই মিলে ভালো আছেন। গতকাল আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষাও আশানুরূপ হয়েছে, ভালো ফল অর্জন করতে পারব বলে আশা করছি। কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করব। পরীক্ষার কারণে শরীর ও মনের ওপর অনেক ক্লান্তি জমা হয়েছে। কোথাও একটু বেড়াতে যেতে পারলে এই ক্লান্তি দূর হতো। ইতোমধ্যে আমার বন্ধুরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামি ২৫ মে তারিখে তিন দিনের সফরে তারা রওনা হবে। পৃথিবীর বৃহত্তম ও আশ্চর্য সুন্দর এই সমুদ্র-উপকূলে বেড়ানো আমার দীর্ঘদিনের শখ।
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর সুযোগটি আমি হাতছাড়া করতে চাই না। আপনার অনুমতি পেলেই আমার এই ইচ্ছাটি পূরণ হবে। আশা করি পরবর্তী পত্রে শীঘ্রই অনুমতি পাব। অনুমতি দিলে খরচ বাবদ ১০০০ টাকা পাঠাবেন। আমি ভালো আছি। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিবেন। সোহানকে আমার শুভেচ্ছা ও মাকে আমার সালাম জানাবেন।
পুনশ্চ, কক্সবাজার থেকে ফিরেই কয়েকদিনের জন্য বাড়িতে বেড়াতে আসব।
ইতি

আপনার স্নেহের
কমল

স্ট্যাম্প

প্রেরক,	প্রাপক,
কমল	আবু কায়সার শিকদার
২০৪, নর্থ হোস্টেল	গ্রাম ও পোষ্ট – আদিয়াবাদ
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।	জেলা – নরসিংদী।

পত্র ৩. নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লিখুন।

পহেলা বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
আজিমপুর, ঢাকা

সুপ্রিয় পরশ,
আজ শুভ বাংলা নববর্ষ, বাঙালি জাতির জীবনে এক পরম আনন্দের দিন। একরাশ পরম ভাল-লাগা আর নতুনের বার্তা নিয়ে আমাদের জীবনে ঘটেছে আজকের সূর্যোদয়। বাংলা নববর্ষের এই শুভ লগ্নে তোমাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। অতীতের সকল ব্যর্থতা আর গ্লানি ঘুচে যাক, নতুন বছরটি হোক তোমার জন্য সাফল্য-রঙিন, নববর্ষের প্রথম প্রহরে তোমার প্রতি রইল এই শুভ কামনা।

মঙ্গল পরিপূর্ণ হোক তোমার সারাটি বছর।

তোমার সুহৃদ

নোহাশ

স্ট্যাম্প

প্রেরক,	প্রাপক,
নোহাশ	কবীর আহমদ পরশ
২৬৪, পশ্চিম নাখালপাড়া	৩৮৭/১ পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	উপজেলা মোড়, নরসিংদী।

২. সামাজিক পত্র :
সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে যেসব চিঠি লিখিত হয়, সেগুলোকেই সামাজিক পত্র বলা হয়।

সামাজিক পত্রের কয়েকটি নমুনা :

পত্র ৪. বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র (হিন্দু রীতি)।

শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ

মহাত্মন,
প্রণামপূর্বক নিবেদন এই, আগামী ২৬ জানুয়ারি,২০১৭ খ্রি./ ১৩ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ বৃহস্পতিবার হাজীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলকান্তি রায়ের সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা শুকলা রায়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবে। উক্ত দিবসে আমার নিজ বাড়িতে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা হবে।
উক্ত অনুষ্ঠানে সপরিবারে উপস্থিত থেকে শুভ কাজে যোগদান ও মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করে কৃতার্থ করবেন।
পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ প্রদানের ত্রুটি মার্জনা করবেন।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
২রা মাঘ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বিনয়াবনত
হরেন্দ্রলাল রায়

স্ট্যাম্প

প্রেরক,
হরেন্দ্রলাল রায়
ভুলতা, রূপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ ।

প্রাপক,
পুলক কুমার সাহা
২২/৩ চাষাঢ়া, নারায়ণগঞ্জ।

পত্র ৫: আপনার কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের একটি নিমন্ত্রণ পত্র লিখুন।

নবীন বরণ অনুষ্ঠান–২০১৭

সুধী,
আগামী ২০ বৈশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩ মে, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত একাদশ শ্রেণি, ডিগ্রি (পাস) ১ম বর্ষ, অনার্স ১ম বর্ষ ও মাস্টার্স ১ম পর্ব শ্রেণির ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি. মহোদয় উপস্থিত থাকবেন বলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনার/ আপনাদের উপস্থিতি কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে
প্রফেসর রুহুল আমিন ভূঁইয়া
অধ্যক্ষ, কুমিল্লা সরকারী মহিলা কলেজ, কুমিল্লা।

অনুষ্ঠানসূচি :

১ম পর্ব :

১০:০০ - প্রধান অতিথিকে গার্ড অব অনার প্রদান

১০:১৫ - অতিথিদের মঞ্চে আসন গ্রহণ

১০:২০ - পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠ

১০:৩০ - অতিথিদের বরণ

১০:৩৫ - স্বাগত ভাষণ

১০:৪০ - নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ

১০:৫০ - অতিথিবৃন্দের বক্তব্য

২য় পর্ব :

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

[বি. দ্র. খাম সংযুক্ত করতে হবে।]

পত্র ৬. আপনার কলেজে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি নিমন্ত্রণ পত্র লিখুন।

সুধী,

আগামী ২৫ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ(৮ মে, ২০১৭ খ্রি.) সোমবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৬তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলেজ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা, রবীন্দ্র-রচনা থেকে পাঠ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবে বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন।

এ অনুষ্ঠানে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করছি।

বিনীত

১৫ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

কাশফিয়া মুনজেরিন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
কলেজ ছাত্রসংসদ
ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

অনুষ্ঠানসূচি :

১ম পর্ব :

১০:০০ - প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ

১০:০৫ - আলোচনা

১২:০০ - রবীন্দ্র-রচনাবলি থেকে পাঠ

১২:৩০ - রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

০১:৩০ - অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা।

[বি. দ্র. খাম সংযুক্ত করতে হবে।]

৩. ব্যবহারিক বা বৈষয়িক পত্র :

অফিসের কাজে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে সংবাদপত্রে লেখা চিঠি এ শ্রেণিভুক্ত।

কতিপয় নমুনা দেওয়া হলো–

পত্র ৭. হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লিখুন।

তারিখ : ১৭ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.

বরাবর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
দেশ-বাংলা গ্রুপ
৪৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

বিষয় : . হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের আবেদন।

জনাব
সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ১১ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রি. তারিখের 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম, আপনার স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কিছু সংখ্যক শিক্ষানবীশ হিসাব সহকারী নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন প্রার্থী হিসেবে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করলাম।

১. নাম : সানজিদা শাহনাজ
২. মাতার নাম : ফেরদৌস আরা
৩. পিতার নাম : মোঃ দৌলত হোসেন
৪. জন্ম তারিখ : ৫ মার্চ, ১৯৯৩ খ্রি.
৫. ধর্ম : ইসলাম
৬. জাতীয়তা : বাংলাদেশি (জন্মসূত্রে)
৭. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- হাসনাবাদ, ডাকঘর - হাসনাবাদ, উপজেলা- রায়পুরা, জেলা- নরসিংদী।
৮. বর্তমান ঠিকানা : ২১, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা- ১১০০।
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পরীক্ষা	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	ফলাফল	বছর
এস.এস.সি	ঢাকা	জি.পি.এ. ৩.২০	২০০৮
এইচ.এস.সি	ঢাকা	জি.পি.এ. ৩.০৫	২০১০
বি.বি.এস (অনার্স)	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	জি.পি.এ. ২.৭৩	২০১৫

অতএব, মহোদয় সমীপে নিবেদন উপর্যুক্ত তথ্যের আলোকে আমাকে আপনার প্রতিষ্ঠানের হিসাব সহকারী পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সানজিদা শাহনাজ
সংযুক্তি :

১. সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
২. সকল পরীক্ষার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. এককপি চারিত্রিক সনদ।
৪. নাগরিক সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।

পত্র ৮. ছুটির আবেদনপত্র।

তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রি.

বরাবর
অধ্যক্ষ
লোহাগড়া আদর্শ সরকারি কলেজ, নড়াইল।

বিষয় : দুই দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন।

জনাব
বিনীত নিবেদন এই যে, বিশেষ পারিবারিক প্রয়োজনে আমার ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খ্রি. তারিখ সোম ও মঙ্গলবার এই দুদিন ছুটি প্রয়োজন।

অনুগ্রহপূর্বক কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতিসহ উক্ত দুদিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জোনায়েদ আহম্মেদ
প্রভাষক, বাংলা
লোহাগড়া আদর্শ সরকারি কলেজ, নড়াইল।

পত্র ৯. বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি লিখুন।

সম্পাদক
দৈনিক ইত্তেফাক
১ নং আর.কে. মিশনরোড, ঢাকা।

জনাব,
আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় নিম্নলিখিত চিঠিটি ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত

কাজী আলাওল
গ্রাম– সৈয়দ নগর
ডাকঘর – ঘোষগ্রাম
জেলা – দিনাজপুর।

বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। জনভারে এদেশের প্রকৃতি বিপর্যস্ত। মানুষের বিপুল জ্বালানি ও আসবাবপত্রের চাহিদার কারণে বন কেটে উজাড় করা হচ্ছে। পাহাড় ও বনভূমি কেটে আবাদী জমিতে পরিণত করা হচ্ছে, সেখানে বাড়িঘর বানানো হচ্ছে। ফলত বৃক্ষহীন হয়ে যাচ্ছে এদেশ, যার পরিণাম ভয়াবহ। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এদেশ দিন দিন মরুময়তার দিকে এগোচ্ছে। যা কখনোই কাম্য হতে পারে না।

ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের জন্য একটি দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকতে হয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে আছে মাত্র ৭ থেকে ৮ শতাংশ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সারাদেশ জুড়ে বৃক্ষনিধন রোধের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দেশের প্রত্যেককে জীবন ও পরিবেশের জন্য বৃক্ষের গুরুত্ব বোঝাতে হবে এবং সকলকে বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগে প্রতি বছর পয়লা জুলাই থেকে সাতই জুলাই পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে সরকারের এ প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু ভয়াবহতার তুলনায় সরকারের এ প্রচেষ্টা খুবই অপ্রতুল। এখন দরকার ব্যক্তিগত ও বেসরকারী পর্যায়ের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর উদ্যোগে গড়ে তুলতে হবে বৃক্ষরোপণ আন্দোলন। প্রত্যেকের বাড়িতে ও প্রতিটি পরিত্যক্ত জায়গায় বৃক্ষরোপণ করে বাংলাদেশকে বৃক্ষের সবুজে পরিপূর্ণ করতে হবে। তবেই আমরা প্রাণের প্রাচুর্যে বাঁচব, বাঁচবে বাংলাদেশ।

বিনীত
কাজী আলাওল
গ্রাম– সৈয়দ নগর
ডাকঘর – ঘোষগ্রাম
জেলা – দিনাজপুর।

পত্র ১০. কলেজের নবীনদের বরণ উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করুন।

ঢাকা কলেজের একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীদের

বরণপত্র

তারিখ: ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

হে স্বপ্নসারথী

সীমাহীন সবুজাভ স্বপ্ন ও অফুরন্ত বর্ণিল সম্ভাবনা সত্তার শেকড়ে ধারণ করে তোমরা প্রবেশ করেছ প্রথিতযশা বিদ্যায়তন ঢাকা কলেজের পবিত্র অঙ্গনে। জ্ঞান সাধনার এই আলোকিত ভূবনে তোমাদের উষ্ণ স্বাগতম ও প্রাণঢালা অভিবাদন।

হে জ্ঞানার্থী

জ্ঞানসাধনার এক উর্বর তীর্থভূমি ঢাকা কলেজ। এই কলেজের অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিভিন্ন অঙ্গনে রেখেছে তাদের অসামান্য প্রতিভার ছাপ; নিজেরা আলোকিত হয়েছে; আলোকিত করেছে দেশ, জাতি ও বিশ্বকে; এতদ্‌সঙ্গে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কলেজের সম্মান। তোমরা সেই জ্যোতির্ময় অগ্রজদের উত্তরসূরি; তাদের হাতের ঝাণ্ডা আজ তোমাদের হাতে সমর্পিত, যোগ্যতম অনুজের মতোই সেই ঝাণ্ডা বহন করে নিয়ে যাবে সম্ভাবনার দূরলোকে– এটাই তোমাদের কাছে আজ প্রাণের দাবি।

হে ভবিষ্যতের কাণ্ডারি

তোমরা বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী–এটা অবশ্যই তোমাদের জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সৌভাগ্য তখনই চূড়ান্ত সার্থকতা পাবে, যখন তোমরা কলেজের সকল শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে, আন্তরিক নিষ্ঠায় করবে জ্ঞানের সাধনা । তোমরা এ দেশের ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সকল অঙ্গনের নেতৃত্বভার তোমাদেরকেই বহন করতে হবে। বিচক্ষণ প্রশাসন, প্রাজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলি ও দক্ষ কর্মচারীদের সমন্বয়ে ঢাকা কলেজে বিদ্যমান রয়েছে শিক্ষার এক আদর্শ পরিবেশ। এই চির সবুজের ক্যাম্পাসে মেধা আর মননশীলতা চর্চার মাধ্যমে তোমাদের প্রতিভা শতদল শতপুষ্পে বিকশিত হোক, হিরণ্ময় হোক তোমাদের জ্ঞান-অভিযাত্রা। তোমাদের যোগ্যতম নেতৃত্ব, মেধা, প্রতিভা আর সাধনার কর্ষণে সমৃদ্ধ হোক এ জনপদ।

হে আলোর অভিসারী

আলোর সঙ্গেই যেমন মিশে থাকে অন্ধকার, তেমনি মাদকসেবন, ইভটিজিং, জুয়াখেলা, বখাটেদের সঙ্গে আড্ডা এমনি বহু প্রতিভানাশী, আত্মঘাতী প্রলোভন ওৎ পেতে আছে সর্বত্র। তোমাদেরকে সতর্ক হতে হবে সেই সব প্রলোভন সম্পর্কে, মুক্ত থাকতে হবে সেই সব মোহ থেকে। স্বীয় বিবেক ও বিচার-বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। মনে রাখতে হবে, তোমরা বড় হয়েছ; নিজের অভিভাবকত্ব এখন নিজেকেই করতে হবে, এখন নিজেই নিজের সবচেয়ে বড় পাহারাদার । কবির ভাষায় :

"এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"

তোমরা যুবক, তোমরা তরুণ। তোমাদেরকে এখন যুদ্ধ করতে হবে শত প্রলোভনের বিরুদ্ধে, নিজের ভেতরকার রিপুর বিরুদ্ধে, প্রতিভা-বিকাশের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। তোমাদেরকে এখন লড়াই করতে এমন একটি জীবন অর্জনের জন্য যে জীবন হবে বিভাময়, সাফল্যে মোড়ানো, মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত, দেশপ্রেমে উচ্চকিত ও সর্বজনীন কল্যাণবোধে প্রাণিত।

ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

পত্র ১১. আপনার এলাকার উন্নয়নের আবশ্যকীয়তা বর্ণণা করে মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি রচনা করুন।

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
লে. কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (বীর প্রতীক) এম. পি. সমীপে

শ্রদ্ধা-স্মারক

হে নরসিংদীর সূর্য-সন্তান

মেঘনা-শীতলক্ষা-হাড়িধোয়া- ব্রক্ষপুত্রের পলি বিধৌত প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ নরসিংদী জেলার উর্বর মাটির কোলে জন্ম নিয়েছে কীর্তিধন্য অগণিত সন্তান। আপনি সেই সূর্য-সন্তানদের অন্যতম চূড়ামণি; স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা, শ্রম আর অধ্যবসায়ে সফল হয়েছেন নিজে, গর্বিত করেছেন নরসিংদীবাসীকে।

হে মুক্তির জ্যোতির্ময় বীর সেনানী

পরাধীনতার ঘন অন্ধকারভেদী বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যোদয়ে আপনি এক পরাক্রমশালী বীর মুক্তিযোদ্ধা। ঔপনিবেশিক শাসনে, পেষণে এই দেশের মানুষ যখন দিশেহারা, মুক্তির জন্য আপামর বাঙালি যখন মরীয়া, তখনই বাঙালির মুক্তির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবিনাশী ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিরাপদ চাকুরির মায়া বিসর্জন দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন; জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে এনেছেন পরম কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন মুক্তির সৌরভ। মুক্তিযুদ্ধে আপনার অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ রাষ্ট্র আপনাকে ভূষিত করেছে 'বীর প্রতীক' খেতাবে। আমরা আপনার সম্মানে প্রণতি জানাই।

হে আদর্শ রাজনীতিবিদ

আপনি ছিলেন দেশপ্রেমে নিবেদিত একজন অত্যন্ত চৌকষ সেনাকর্মকর্তা। সেনাবাহিনীর গৌরবময় চাকুরি থেকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আপনি অবসর নিয়েছেন, কিন্তু অবসর নেননি দেশপ্রেমের অকৃত্রিম ব্রত থেকে; নিজেকে জড়িয়েছেন দেশের সেবা করার আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত অঙ্গনে––রাজনীতিতে। আপনি সুস্থ ধারার প্রগতিশীল ও উন্নয়নমুখী রাজনীতির এক আদর্শ কাণ্ডারি; বর্তমান বিবদমান ও সংঘাতময় রাজনীতির পটভূমিতে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। জনগণের সরাসরি ভোটে পর পর দুই বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন যা আপনার প্রতি জনগণের এক অফুরন্ত ভালবাসা ও আস্থারই প্রতিফলন। জনগণের মতো আপনার ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন জননেত্রী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আপনাকে নিযুক্ত করেছেন তাঁর মন্ত্রিসভার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে। আপনার এ অর্জন আমাদের জন্য গৌরবের, অধিকন্তু সৌভাগ্যের।

হে উন্নয়নের রূপকার

উন্নয়নের একটি রূপকল্প নিয়েই আপনি রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন। নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন সেই রূপকল্পকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার। জনদরদী বন্ধু হিসেবে আপনি রাস্তা -ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার-হাট, কৃষকের মাঠ, শিল্প-কারখানা – সর্বত্র আপনি সরকারের উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আপনার নতুন দায়িত্ব আমাদেরকে বিশেষভাবে আশান্বিত করে তুলেছে; কারণ আমরা প্রমত্ত মেঘনার তীরবর্তী নদীভাঙন কবলিত জনপদের বাসিন্দা। নদী-ভাঙনে প্রতি বছর আমাদের ব্যাপক জীবন ও সম্পদহানি ঘটে থাকে। ফসল, জমি ও ঘরবাড়ি হারিয়ে আমাদের নিঃস্ব হওয়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। নদীর বুকে হারিয়ে গেছে আমাদের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, রাস্তা, ঘাট। নদীর প্রমত্ত স্রোতের কারণে এতদঞ্চলে কোনো পাকা রাস্তা, সেতু গড়ে ওঠেনি। মন্থর নৌপথই আমাদের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে একুশ শতকের পৃথিবীতেও আমরা কার্যত গৃহবন্দী। বর্তমানে আপনি শুধু আমাদের প্রতিনিধিই নন, আপনি পুরো দেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্ণধার। আমাদের গভীর আশা, আপনার নতুন দায়িত্ব আমাদের ভাগ্য খুলে দেবে, আমাদের জীবনে বয়ে আনবে সৌভাগ্যের সোনালি বার্তা। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ কোনো কিছুই আপনার অজানা নয়। তবু আমাদের ভাগ্যোন্নয়নের কিছু জোর দাবি নিয়ে আপনার দরবারে আমরা হাজির হয়েছি।

১. মেঘনার ভাঙন কবলিত এলাকাগুলোতে দ্রুত বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা করে আমাদের জীবন, সম্পদ রক্ষার কার্যকর উদ্যোগ নেবেন।
২. সড়ক যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য পাকা রাস্তা ও সেতু, বিশেষ করে নরসিংদী জেলা শহরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য মেঘনা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন।
৩. আমরা বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত; আমাদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।
৪. আমাদের চরাঞ্চলের মানুষের জন্য একটি আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। এ অঞ্চলে বিভিন্ন ধাপের কিছু উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

আপনি কাজ করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের একটি সমস্যাপীড়িত জনপদকে দারিদ্র্যমুক্ত, নিরক্ষরতামুক্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে; আমাদের দাবিগুলো আপনার কর্মসূচিরই অংশ মাত্র।

হে স্বপ্নসাধক

আধুনিক সমৃদ্ধ ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন নিয়ে আপনার কর্ম-প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তা অম্লান হোক, দীঘায়ু হোক আপনার স্বপ্ন, দীর্ঘায়ু হোন আপনি।

গুণমুগ্ধ এলাকাবাসী
নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

পত্র ১২. কোনো বিশিষ্ট শিল্পপতির উদ্দেশ্যে মানপত্র রচনা করুন।

বিশিষ্ট শিল্পপতি, দানবীর, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী
জনাব আবদুল বাছির মোল্লা-র
নরসিংদী সরকারি কলেজ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুভাগমন উপলক্ষে

সম্মাননাপত্র

তারিখ; ০৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

হে ধ্রুপদী আলোর অভিযাত্রী

বৈশাখের তপ্ত দাবদাহের তৃষাতুর বুকে বর্ষার মেঘমেদুর শীতলতার ন্যায় সবুজ শ্যামলিমায় ঘেরা পুষ্প-পত্রে সুশোভিত নরসিংদী সরকারী কলেজ ক্যাম্পাসে আপনার শুভাগমন আমাদেরকে করেছে সজীব, প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত; আপনার পদস্পর্শে আজ এ পবিত্র অঙ্গন হয়ে উঠেছে আনন্দমুখর। খুশির ফল্গুধারায় স্নাত এদিন আমাদের জন্য এক শুভ সূচনার বার্তাবহ স্মরণীয় দিন। আমাদের মাঝে আপনার মতো শিক্ষা-দরদি ও জ্ঞানপূজারিকে পেয়ে আমরা গর্বিত ও ধন্য। আপনি আমাদের আনন্দিত হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করুন।

হে কীর্তিমান সুধী

আপনি বর্তমান বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ও বরেণ্য শিল্পোদ্যোক্তা। স্বপ্নসম্ভব সাফল্যের এক অধীশ্বর আপনি; পরাভব না-মানা এক সর্বজয়ী সত্তা; সাফল্যগাথার এক রূপদক্ষ শিল্পী; সংগ্রামী মানুষদের জন্য এক আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। জন্মেছিলেন প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামে মমতাময়ী মায়ের কোলে, জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে লড়ে-যুঝেই তিলে তিলে বড় হয়েছেন। স্বীয় প্রজ্ঞা আর সাধনায় আপনি নিজ হাতে গড়ে নিয়েছেন আপন ভাগ্য; সামান্যের সমতল থেকে যাত্রা করে অসামান্য পারঙ্গমতায় আজ আপনি সাফল্যের হিমালয়-উচ্চতাকে স্পর্শ করেছেন। কিন্তু সমতলের কথা আপনি ভুলেননি, সমতলকে ছেড়েও যাননি; নিরুপম মহানুভবতায় সমতললগ্ন থেকে পরম প্রীতি ও ভালবাসায় অবহেলিত ও নিরক্ষর মানুষদের ভাগ্যোন্নয়নে আপনি এক অনলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, যা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে মানুষ ও মানবতার জন্য।

হে নিবেদিতপ্রাণ কর্মবীর

আমরা অনুভব করি, জ্ঞানে ও সম্পদে সমৃদ্ধ ও আলোকদীপ্ত জনপদ হিসেবে নরসিংদী জেলাকে গড়ে তোলার জন্য আপনি আপনার দান, ধ্যান ও কর্মকে নিবদ্ধ করেছেন। আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এতদঞ্চলের এক ব্যাপক বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করেছে, উন্নত করেছে এককালের হতদরিদ্র মানুষদের জীবনযাত্রা ও জীবনমান। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করেছেন উন্নত কর্ম-পরিবেশ এবং তাদের সন্তানদের জন্য উন্নত জীবনের স্বপ্ন। সুবিধাবঞ্চিত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে আলোকিত করার লক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন অগণিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; নিশ্চিত করেছেন উন্নত শিক্ষা-পরিবেশ ও গুণগত মান। তাছাড়া মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে আপনার মুক্ত হস্তের দান এতদঞ্চলের মানুষের ধর্মচর্চার পরিবেশকে উন্নত করেছে এবং নৈতিকতানিষ্ঠ মানুষ গড়ে তোলায় অসাধারণ প্রভাব রাখছে। মানবিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আপনার আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা একটি উন্নত সমাজ ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে এক সুদূরব্যাপ্ত ভূমিকা রেখে চলেছে – যা এ সমাজে অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। কর্মে, সাধনায় ও সাফল্যে আপনি প্রকৃতই একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব।

হে নন্দিত শিক্ষানুরাগী

নরসিংদী জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নরসিংদী সরকারী কলেজ আপনার সহযোগিতায় ঋদ্ধ হয়েছে বার বার। নরসিংদী সরকারী কলেজ, এর শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের প্রতি আপনার রয়েছে অনুপমেয় ভালবাসা। সম্প্রতি আপনার অনুদানে মাটি ভরাটের মাধ্যমে খেলার উপযোগী হয়ে ওঠেছে জলাবদ্ধতায় অকেজো হয়ে থাকা কলেজের খেলার মাঠ। নরসিংদী সরকারী কলেজের প্রতি আপনার আন্তরিকতা ও অনন্য ভালবাসার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাকে সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

হে মান্যবর
আপনি দীর্ঘায়ু লাভ করুন, ধন ও জ্ঞানের অন্বয়ী সাধনায় আপনি যে অসাধারণ জীবনমণ্ডল গড়ে তুলেছেন, তা আরো বিভাময় ও প্রসারিত হোক, আপনি মানুষ ও মানবতার জন্য এক অনশ্বর প্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে থাকুন, প্রত্ন-অক্ষরে লেখা থাকুক আপনার মহত্ত্বের কথা, নশ্বর পৃথিবীতে শত-সহস্র বছর পরেও লোকে লোকে ধ্বনিত হোক আপনার জয়গাঁথা– নরসিংদী সরকারী কলেজ পরিবার আপনার জন্য এই শুভ কামনা করে।

ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
নরসিংদী সরকারি কলেজ, নরসিংদী।

৪. ব্যবসায়িক পত্র :
ব্যবসায়িক লেন-দেন, কোনো দ্রব্যের অর্ডার, চুক্তি– এসব প্রয়োজনে যে সব চিঠি লিখিত হয়, সেগুলো ব্যবসায়িক পত্র হিসেবে পরিগণিত।

ব্যবসায়িক চিঠির নমুনা :

পত্র ১৩. কিছু বই সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে কোনো পুস্তক প্রকাশককে চিঠি লিখুন।

১৭/১২/২০১৩ খ্রি.
গ্রাম–কল্যাণপুর
ডাকঘর – কৃষ্ণপুর
উপজেলা – আজমিরিগঞ্জ
জেলা– নেত্রকোনা

ম্যানেজার
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

জনাব,
জরুরি ভিত্তিতে আপনার প্রকাশনার নিম্নলিখিত বইসমূহ আমার ঠিকানায় ভিপিপি ডাকযোগে পাঠালে বাধিত হবো। সবগুলো বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণ পাঠাবেন।
অগ্রিম হিসেবে ৩০০/– টাকা পাঠানো হলো।

১. আগুনপাখি – হাসান আজিজুল হক — ১ কপি
২. সাবিত্রী উপাখ্যান – হাসান আজিজুল হক — ১ কপি
৩. ফিরে যাই ফিরে আসি – হাসান আজিজুল হক — ১ কপি

আপনার বিশ্বস্ত
আলী হায়দার

স্ট্যাম্প

প্রেরক,	প্রাপক,
আলী হায়দার	ম্যানেজার
গ্রাম–কল্যাণপুর	ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
ডাকঘর – কৃষ্ণপুর	৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
উপজেলা – আজমিরিগঞ্জ	
জেলা– নেত্রকোনা	

নিম্নলিখিত চিঠিগুলো নিজে নিজে অনুশীলন করুন :

ব্যক্তিগত পত্র

১. বন্ধুর পিতৃ-বিয়োগে সান্ত্বনা জানিয়ে চিঠি লিখুন।
২. ছোট ভাইকে পড়াশুনায় মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখুন।
৩. একুশের বইমেলার বর্ণনা দিয়ে প্রবাসী বন্ধুকে চিঠি লিখুন।
৪. জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে পিতার সঙ্গে মতানৈক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের যুক্তি তুলে ধরে পিতার নিকট পত্র লিখুন।
৫. হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বড় ভাইকে চিঠি লিখুন।

সামাজিক পত্র

১. জন্মদিন উপলক্ষে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ পত্র লিখুন।
২. কলেজে সরস্বতী পুজা উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি দাওয়াতপত্র রচনা করুন।
৩. একটি সভার আহ্বান পত্র রচনা করুন।

আবেদন পত্র

১. শিক্ষা সফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে অধ্যক্ষের নিকট আবেদনপত্র লিখুন।
২. সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লিখুন।
৩. আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি চেয়ে পুলিশ সুপারের নিকট আবেদনপত্র রচনা করুন।
৪. রাস্তা-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি আবেদন লিখুন।
৫. ইভ-টিজিং নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পত্র লিখুন।

অন্যান্য

১. কলেজ অধ্যক্ষের বিদায় উপলক্ষে একটি মানপত্র রচনা করুন।
২. আপনার এলাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে একটি স্মারকলিপি রচনা করুন।
৩. কোনো নষ্ট পণ্য ফেরত নেওয়ার তাগিদ দিয়ে সরবরাহকারীকে একটি চিঠি লিখুন।

পাঠ ৮.১৪ : সারাংশ/সারমর্ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সারাংশ ও সারমর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে হবেন।
- সারাংশ ও সারমর্ম রচনার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
- ছোট আকারে বড় ভাব প্রকাশ করতে পারবেন।
- আবেগবহুল ভাষা বাদ দিয়ে সরাসরি মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন।

সারাংশ/সারমর্ম

মানুষের সমাজ জীবনে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা অন্যের সঙ্গে কথা বলি, অন্যকে চিঠিপত্র লিখি। এসবই ভাষার সাহায্যে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা। অথবা বলা যেতে পারে নিজের মনের ভাবনা বা ভাব অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। একেই বলে ভাবের আদান প্রদান। ভাষা ঠিক এ কাজটিই করে- যাকে আমরা বলতে পারি ভাবের আদান-প্রদান।

ভাব বা ভাবনা সব সময় একরকম হয় না। তাই এর ভাষাও একরকম হয় না। তাছাড়া যা বলছি বা যা লিখছি অবস্থাভেদে তার গভীরতা ও বিস্তৃতি সব সময় সমান হয় না। আমরা কম-বেশি সবাই রেডিও, টিভি শুনি ও দেখি। আপনি নিশ্চয় খেয়াল করে দেখেছেন যখন আমরা সংবাদ শুনি তখন সংবাদের মূল কথাগুলিই মাত্র শুনি। যেমন, ধরা যাক একটি সংবাদ "আজ সকাল ৫টায় চট্টগ্রাম সমুদ্র উপকূলে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এখন পর্যন্ত হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি।" এ দুবাক্যের সংবাদের উপর যখন সংবাদ ভাষ্য বা বিবরণ প্রকাশ করা হয় তখন কিন্তু অনেক বেশি কথা বলা হয়। যেমন ধরুন ঘুর্ণিঝড় সতর্ক সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে কিনা, ঘুর্ণিঝড় পূর্ব কি কি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, উপকূলে কতটা বিস্তৃত অঞ্চলে ঝড়টি আঘাত হেনেছে, আঘাত হানার আগে সারাদিনের আবহাওয়া কেমন ছিল, যে অঞ্চলে আঘাত হেনেছে সেখানে আশ্রয় কেন্দ্র আছে কিনা ইত্যাদি। সংবাদ ও সংবাদভাষ্যের মূল বক্তব্য এক হলেও ভাবপ্রকাশে ভাষার পরিস্থিতি অনেক পার্থক্য আছে। অর্থাৎ জানা গেল প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা বক্তব্যের মূল ভাবকে কখনও ছোট করে উপস্থাপন করি কখনও বিস্তৃত বা বড় করে উপস্থাপন করি। আবার দেখুন আমরা যখন লিখি তখনও ছোট বড়র ব্যাপারটিকে অনুসরণ করি। যেমন ধরুন টেলিগ্রাম ও চিঠির কথা। একই ভাব বা বক্তব্য দুটো মাধ্যমেই পাঠানো যায়। যদি একটি টেলিগ্রাম হয় এরকম মা অসুস্থ, তাড়াতাড়ি এসো। টেলিগ্রামের ঠিক এ বক্তব্যকে যদি আমরা চিঠিতে পুরে পাঠাই তবে অবশ্যই আমরা আরও বিস্তৃত করে লিখি। চিঠিপত্রের আঙ্গিক বা কাঠামো অনুসরণ করেই মূল বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয় আমরা আরও লিখব – মা কবে থেকে অসুস্থ, কী ধরনের অসুখ, ডাক্তার দেখেছেন, হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে কিনা ইত্যাদি আরও জরুরি বিষয়।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় জানা গেল – প্রয়োজনমত ভাষাকে আমরা ব্যবহার করি। মূল ভাব বা ভাবনা কখনও সংক্ষিপ্ত করেও কখনও বিস্তৃত করে প্রকাশ করতে পারি। ভাষার অনেক গুণের মধ্যে এটি একটি প্রধান গুণ যে ভাষাকে আমরা সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত দুভাবেই প্রয়োগ করতে পারি। ভাষার এগুণ আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

সারাংশে ও ভাবসম্প্রসারণ লিখন প্রকৃতপক্ষে ভাষার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত করে লেখার পদ্ধতির নাম। আগে যেমন আমরা দেখলাম একটি বিষয়কে প্রয়োজন মোতাবেক সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে এবং বিস্তৃত বা বড় করে লেখা যায়। সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত বা ছোট করে লেখার নামই সারাংশ আর বিস্তৃত বা বড় করে লেখার নামই ভাবসম্প্রসারণ। ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনেই ভাষার এ গুণকে আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। সঠিকভাবে সারাংশ ও ভাবসম্প্রসারণ লিখনের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলো দিকে নজর রাখতে হবে।

সারাংশ শব্দের অর্থ 'সার' অংশ বা 'মূল' অংশ। যে কোন একটি লেখা পড়লে আমরা দেখতে পাই, লেখকের মনের মূলভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূল ভাবের সহায়ক অনেক কথা বলতে হয়। একটি ভাবকে যথার্থ ও সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সে লেখাটির মূল কথা বা সার কথা বা সারবস্তুই আসলে সারাংশ। ইংরেজিতে তিনটি শব্দ আমরা লক্ষ করি Summary, Substance ও Precis এ শব্দগুলোর যথার্থ বাংলা শব্দ নাই। এ শব্দটির সঙ্গে ভাব অনুষঙ্গও এক নয়। এ তিনটি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সারাংশ নয়। তবে সারাংশ বলতে যে কাজটি বোঝায় তার সঙ্গে ঐ শব্দগুলোর মিল আছে। Summary লিখতে বললে মূল অংশের অর্ধেক, Substance এ মূলের এক তৃতীয়াংশে বা তিন ভাগের এক ভাগ ও Precis মূল অংশের চার ভাগের একভাগ লিখতে হয় Precis এ একটি শিরোনাম ও দিতে হয়। সারাংশ লিখতে আমরা মূল অংশের তিন ভাগের এক ভাগ লেখা উচিত। তবে সারাংশের আকৃতির দিকে যেমন নজর দিতে হবে তেমন নজর দিতে হবে তার প্রকৃতির দিকেও। সারাংশে মূলভাবটি যথার্থ ও সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করাটাই মূল বিষয়। বাহুল্য কথার মধ্য থেকে মূল কথাটি খুঁজে বের করাই সারাংশ লেখার উদ্দেশ্য।একটি রচনা নানা কারণে দীর্ঘ হতে পারে। বিষয়ের কারণে সেখানে যুক্ত হতে পারে উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্তের বাহুল্য। ঘটনার ঘনঘটাও বিচিত্র নয়।। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতায় এসব কিছুই হয়ত মানিয়ে যায়। কিন্তু সারাংশ রচনার ক্ষেত্রে এসব বাহুল্য একেবারে পরিতাজ্য। সেখানে অতিরিক্ত অলঙ্কার বাদ দিয়ে সহজ সরল ভাষায় বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। মোট কথা, কোনো লেখা ছোট আকারে আকর্ষণীয় ভাষায় প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম। কবিতার ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্তকরণকে বলা হয় সারমর্ম এবং গদ্যের ক্ষেত্রে একে সারাংশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

কোনো গদ্য বা কবিতা রচনায় যেসব যুক্তি, দৃষ্টান্ত, উপমা ও অলঙ্কার থাকে তা বাদ দিয়ে সহজ ও সরল ভাষায় বিষয়টি সংক্ষেপে প্রকাশ করার নামই সারাংশ বা সারমর্ম।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার নিয়ম

১. নির্ধারিত অংশটি বার বার পড়ে মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে।

২. মূল অংশে যেসব অপ্রয়োজনীয় উপমা, অলঙ্কার, দৃষ্টান্ত আছে সারাংশে তা বাদ দিয়ে আসল কথাটা লিখতে হবে।

৩. একই কথার পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। তেমনি প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া যাবে না।

৪. সারাংশ খুব ছোট কিংবা বড় হবে না। মূল অংশের চেয়ে তা অবশ্যই আকারে ছোট হবে।

৫. বক্তব্যের বর্ণনায় বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অলঙ্কার, উপমা, রূপক ইত্যাদি অবান্তর। বাহুল্য বাদ দিয়ে মূল বিষয়টি সরাসরি লিখতে হবে।

৬. মূল বিষয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো বিষয় সারাংশে অবতারণা করা যাবে না। অনুমান নির্ভর কোনো ব্যাখ্যা বাঞ্ছনীয় নয়।

৭. সারমর্ম কিংবা সারাংশ রচনার ভাষা মূলের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। সহজ-সরল মৌলিক ভাষায় বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সবার সহজবোধ্য হয়।

৮. উদ্ধৃত রচনায় একাধিক বিষয় থাকলে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে এবং মূল বিষয়টি থেকে যাতে রচিত অংশটি সরে না আসে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৯. শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে সংযম অবলম্বন করতে হবে। একাধিক বিশেষণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়।

১০. কোনো সাংকেতিক বিষয় থাকলে তার তত্ত্ব বের করতে হবে। ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য থাকলে দুই পক্ষের বক্তব্য আলাদাভাবে প্রকাশ করতে হবে।

১১. প্রদত্ত অনুচ্ছেদ অথবা কবিতাংশটি বারবার পড়ে মূলভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

১২. উদ্ধৃত অংশের মূলভাবের বাক্য/বাক্যগুলি চিহ্নিত করুন।

১৩. উপমা, উদাহরণ, উদ্ধৃতি ও রূপক আলাদাভাবে চিহ্নিত করুন।

১৪. সারাংশ লিখনের সময় লেখার আয়তনের দিকে লক্ষ রাখুন।

১৫. মূলভাবটি যথাযথ ও সহজ বাক্যবিন্যাসে লিখুন।
১৬. উপমা, রূপক উদ্ধৃতসহ সকল বাহুল্য বর্জন করুন।
১৭. একই কথার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য করুন।
১৮. উদ্ধৃতাংশটি কোন্ কবি বা লেখকের সেটি বলার দরকার নেই।
১৯. প্রথম বাক্যটি হবে সহজ সরল ও মূলভাবের প্রতি নির্দেশক।
২০. সারাংশটি লেখা হলে কয়েকবার পড়ে নিশ্চিত হন যে প্রয়োজনীয় কোনো কিছু বাদ যায়নি।

ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য অনুশীলন প্রয়োজন। সারাংশ রচনায় ভাষা পড়ে বুঝতে পারা ও সংক্ষিপ্ত করে লেখা এ দুটি বিষয়ের দক্ষতা প্রয়োজন হয়। এ দক্ষতা অর্জন করতে হলে সারাংশ রচনার অনুশীলন করতে হবে।

সারাংশ/সারমর্ম রচনার নমুনা

১.

কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষ দাঁত ফুটে বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার, তারি সাথে হায়, জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে বলে সে ভর্ৎসনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন বাবা ছেড়ে দিলে তারে, তোমার কি নেই দাঁত?"
কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল, " তুই রে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়ে দংশি কেমন করে?
কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তাই বলে কুকুরে কামড়ানো মানুষে শোভা পায়?"

সারমর্ম : যে অধম ও বিবেকহীন সে অনায়াসেই নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হতে পারে, অন্যের ক্ষতি সে করতে পারে অসঙ্কোচে। বিবেকবান রুচিশীল মানুষ প্রবৃত্তির অবাধ স্রোতে গা ভাসাতে পারে না। বিবেকে, মনুষ্যত্বে ও ক্ষমায় মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে হয়।

২.

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শিকলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা যদি সহসা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া ভঙ্গ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে, তবে সে বন্ধন মুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ-বিদেশ ভাসিয়া যাইত। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।
বিদ্যুৎ মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে। কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে পুরিয়া রাখিবে। কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী রাখিবে। অতলস্পর্শী কালো সমুদ্রের উপর কেবল একখানা বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

সারাংশ : মানবসভ্যতার কোটি কোটি বছরের ইতিহাস, ঐতিহ্য ধারণ করে আছে লাইব্রেরি। অভ্রভেদী হিমালয়ের কঠিন বরফ আর পাথুরে শরীরের ভেতরে যেমন করে অসংখ্য বন্যা বাঁধা পড়ে আছে, তেমনি লাইব্রেরির বইয়ের পাতায় নিশ্চুপ শব্দে গ্রথিত হয়ে আছে মানুষের জীবনপ্রবাহের কথামালা। পুস্তক মানুষের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের সেতু রচনা করে দিয়েছে।

৩.

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান,
কন্টক-মুকুট শোভা; দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী খুরধার
বাণী মোর শাপে তব হল তরবার।
দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্গেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ!
শীর্ণ করপুট ভরি সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই-- হে বুভুক্ষু, তুমি
অগ্রে আসি, কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক।

সারমর্ম : দারিদ্র্যের কঠিন পীড়নে ধৈর্য, স্থৈর্যের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের সত্য-স্বরূপের সন্ধান পায়, লাভ করে অসঙ্কোচে সত্য-প্রকাশের অমিত শক্তি। দারিদ্র্যের দহনে জীবন হয়ে ওঠে শুদ্ধ-শুচি, মহিমান্বিত। আবার দারিদ্র্যের পেষণেই মানুষের জীবনরস নিঃশেষিত হয়। দারিদ্র্য মানুষের বয়ে আনে মরণক্লিষ্ট রিক্ততা; দারিদ্র্যের রুদ্র স্পর্শে মানুষের শতদলে পুষ্পিত হওয়ার শক্তি হয় তিরোহিত।

৪.

বহুদিন ধরে বহুক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

সারমর্ম : প্রকৃতির সৌন্দর্যে অবগাহন করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরায়ত। আর এর জন্য সৌন্দর্য-মুগ্ধ মানুষের মহা আড়ম্বরে দেশ-বিদেশে ছুটাছুটির অন্ত নেই। অথচ ঘরের পাশের প্রকৃতির মধ্যেই লুক্কায়িত আছে অপরিমিত সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য উপভোগের জন্য শুধু প্রয়োজন প্রকৃতি নিহিত সৌন্দর্যের বিমুগ্ধ অন্বেষণ।

৫.

সার্থক জনম মোর জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে।
জানি না তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় বসে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল
কোন বনেতে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে।

সারমর্ম : জন্মভূমির সঙ্গে মানুষের আত্মার বন্ধন; মাতৃভূমির সবকিছুর সঙ্গেই অনুভব করে নিবিড় ভালবাসা। মাতৃভূমির ধন-ভাণ্ডারের সঙ্গে এ ভালবাসার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পদে রিক্ত হলেও দেশের প্রতি মানুষের ভালবাসার কমতি হয় না। জন্মভূমির আলো-হাওয়া আর প্রকৃতির মমতাময় সান্নিধ্যে মানুষ অনুভব করে সুগভীর প্রশান্তি। জন্মভূমির বুকে জন্ম নেওয়াকে যেমন সৌভাগ্যের মনে করে এর সন্তানেরা, তেমনি মৃত্যুর পরেও এরা জন্মভূমির কোলে আশ্রয় পেতে গভীর আকুলতা প্রকাশ করে।

৬.

বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা মায়াচ্ছন্ন, নবমানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নবযাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না, যাহারা জীব হইয়াও জড়, যাহারা অটল সংসারের পাষাণস্তূপ আঁকড়াইয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক পিয়াসী প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলকোলাহলকে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে। জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার, বৃদ্ধ তাহারাই। বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নীচে বার্ধক্যের কঙ্কালমূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘলুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।

সারাংশ : বার্ধক্য আসে বয়সে ভর করে নয়, আসে মানস-চেতনার শেকড় ধরে। মনে যখন ভর করে নতুনের প্রতি ভীতি আর পুরাতন জরাজীর্ণতার প্রতি আসক্তি, তখন নবীনের দেহেও দৃশ্যমান হয় বার্ধক্যের কম্পন। আর নতুনকে বুক জুড়ে প্রাণের বন্যায় ধারণ করার শক্তির মধ্য দিয়ে প্রবীণের ন্যুব্জ দেহ যৌবনের তেজে হয়ে ওঠে দীপ্তিময়।

৭.

পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোরে দিলেন ধাতা আপন হাতে
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কিছু বাড়ল তাতে?
আপনারে যে ভেঙেচুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন নামটা তার কদিন বাঁচে?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা রে
খাঁটি ধন যা যেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি না রে।

সারমর্ম : প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত হওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনা। কিন্তু হীনম্মন্যতাজনিত অন্ধ পরানুকরণে মানুষের অমিত শক্তির অপচয় ঘটে। এধরনের মানসিকতা নিদারুণ অপমানের। মানুষ সত্যিকারার্থে মর্যাদাবান হয়ে উঠতে পারে আপন প্রতিভার সযত্ন বিকাশে।

৮.

থাকবো নাক বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায় কেমন মরছে যে বীর লাখে লাখে
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।
কেমন করে পারলে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে
কিসের অভিমানে মানুষ চড়ছে হিমালয়ের চূড়ে
তুহিন মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চলে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিনপুরে
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে।

সারমর্ম : অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি ও কর্মোদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করে, দুর্জয়কে করে জয়। মানুষ তার দুর্বার শক্তিতে পরাভূত করে সাফল্যযাত্রার সকল প্রতিবন্ধকতাকে। দুর্মর ইচ্ছা আর কর্মপ্রেরণার যৌগে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, বিশ্বের অতল রহস্যের উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে মানুষ বিশ্বে তার বিজয়কেতন উড়িয়েছে।

৯.

আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই, এমন কি এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই। এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখানে থেকে তারা একটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে বাকী জীবনআরামে কাটিয়ে

দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণ সাপেক্ষ; অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একবারে ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়–– ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করে দিতে পারেন, তার বুদ্ধিকে জাগ্রত করে দিতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জাগ্রত করে দিতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না।

সারাংশ : শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ; ভূমিকাটি সহায়কের– শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের সন্ধান দান ও বিদ্যার্জনে উদ্দীপ্তকরণে। শিক্ষার্জনে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই মুখ্য, শিক্ষার্থীকেই আপন নিষ্ঠায়, পরম ধৈর্যে বিদ্যার সাধনা করতে হয়। শিক্ষার্থীর অন্তর্গত প্রেরণা, উদ্দীপনা ও কর্মপ্রচেষ্টায়ই সম্পন্ন হয়ে থাকে শিক্ষার্জন।

১০.

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র
নানাভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়
শিখছি সেসব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।

সারমর্ম : শিক্ষা কেবল প্রতিষ্ঠানের কাঠামোয় বন্দি নয়; শেখার উপাদান ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। বিশ্বের প্রতিটি ধূলি আর জলকণা, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ ইত্যাকার সবকিছুই জানার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই অবারিত উৎস থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজন কেবল জ্ঞানান্বেষী দৃষ্টি।

১১.

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সারমর্ম : মানুষ জন্মে একা; কিন্তু তাকে বাঁচতে হয় সমাজে, সবাইকে নিয়ে, পরার্থপরতায়। নিজের সুখে ব্যস্ত থাকার মধ্যে মানুষের জন্য সুখ থাকে না; নির্মল, নিখাঁদ সুখ নিহিত থাকে পরের হিতার্থে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার মধ্যে।

১২.

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
মাঠভরা দেই আমি কত শস্য ফল;
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি জানি কি কাজ
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু-নিচু
সে কথা আমি নাহি বুঝিতে পারি কিছু।
গিরি কহে সব হলে সমতল পারা,
নামিত কি ঝরনার সুমধুর ধারা?

সারমর্ম : বৈচিত্র্যের মধ্যে সৃষ্টির সচলতা। আপাতদৃষ্টে কোনো কিছুকে নিষ্ক্রিয় মনে হলেও সেও সৃষ্টির চলমানতার নিগূঢ় নিয়মে বাঁধা। সমতলভূমি ফুল-ফল-শস্যে পূর্ণ করে তোলে। পাষাণ পাহাড় সে তুলনায় কিছুই করে না; অথচ তার মর্যাদা রাজাধিরাজের। প্রকৃতপক্ষে পাহাড়ের বুক থেকে ঝরনার সুমধুর ধারার ওপরই নির্ভরশীল সমতলভূমির উৎপাদন-ক্ষমতা।

১৩.

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সারমর্ম : জীবনে বিপদ আসে প্রকৃতির নিয়মেই। অসীম ধৈর্যে আর অকুতোভয় সাহসে বিপদকে মোকাবেলার মধ্য দিয়েই মানুষের মানব-মহিমা দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। বিপদে অন্যের অনুকম্পা আর সান্ত্বনা মূল্যহীন।

১৪.

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। জগতের অন্যান্য প্রাণীর সহিত মানুষের পার্থক্য−−মানুষ বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী। এই বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান নাই বলিয়া আর সকল প্রাণী মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ জগতের বুকে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করিয়াছে, জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছে। পশুবল ও অর্থবল মানুষকে বড় বা মহৎ করিতে পারে না। মানুষ বড় হয় জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের বিকাশে। জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের প্রকৃত বিকাশে জাতির জীবন উন্নত হয়। প্রকৃত মানুষই জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন আনয়নে সক্ষম।

সারাংশ : মানুষ বিবেক, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনুষ্যত্বের সাধনায় প্রাণিজগতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। শারীরিক শক্তি আর অর্থনৈতিক সামর্থ্য মানুষকে মহত্ত্ব দান করে না, মানুষের মহত্ত্ব তার মনুষ্যত্বে, জগতের কল্যাণ সাধনের সামর্থ্যে, বুদ্ধিবৃদ্ধিক পরিচর্যায় অমরকীর্তি গড়ে তোলার ক্ষমতায়।

১৫.

জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন−− তাহাই সাহিত্য। বাতাসের উপর চিন্তা ও কথা স্থায়ী হইতে পারে না, মানবজাতি তাই অক্ষর আবিষ্কার করিয়াছে। মানুষের মূল্যবান কথা, উৎকৃষ্ট চিন্তাগুলি কোন যুগে পাথরে, কোন যুগে গাছের পাতায় এবং বর্তমানে কাগজে লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে। যে নিতান্তই হতভাগা, সে-ই সাহিত্যকে অনাদর করিয়া থাকে। সাহিত্যে মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার মীমাংসা হয়। তোমার আত্মা হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইতে পার না, সাহিত্যকেও তুমি অস্বীকার করিতে পার না− ইহাতে তোমার মৃত্যু− তোমার দুঃখও সমান হয়।

সারাংশ : সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ জীবনানুভূতি যখন লেখকের চেতনারসে মণ্ডিত হয়ে ভাষার অক্ষরে বাণীবদ্ধ রূপ পায়, তখন তা সাহিত্য অভিধা পায়। সাহিত্যের মর্মমূলে নিহিত থাকে কল্যাণ ও সুন্দরের নির্ভেজাল অভিব্যক্তি, মানুষের যাতীয় আকাঙ্ক্ষা। একারণেই মানুষের জীবনে সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬.

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূলেও ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ জাগে, একবার আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিবে। ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাও, দেখিবে, সেই স্বর্গের সুষমা আর নাই− নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকট যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

সারাংশ : ক্রোধ এমন এক শক্তিশালী রিপু, যা মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে, মানুষের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ, কল্যাণকামিতা, স্বর্গীয় সুষমাকে বিলীন করে দিয়ে মানুষকে পশুতুল্য করে তোলে। ক্রোধের উত্তেজনায় একটি আনন্দদায়ী প্রসন্ন মুখ মুহূর্তেই কালিমালিপ্ত বিভীষিকায় পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. নিচের সারাংশ / সারমর্মগুলো লিখুন।

ক.

আমি মরু-কবি-গাহি-সেই বেদে-বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব−অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্র সুখে

সাধ করে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে!
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব-সম কোন বাধা মানিল না,
বর্ষর বলি যাহাদের গালি পড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ-মণ্ডুক অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

খ.
স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালবাসে,
সুখের আলো জ্বালে বুকে, দুঃখের ছায়া নাশে।
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায়, পশুর হৃদয়তলে,
বুক ফুলায়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।
দর্পকরে পদানত উচ্চ করে শির,
শক্তিহীনেও স্বাধীনতা আখ্যাদানে বীর।

গ.
আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে এক হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,
এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।
এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

ঘ.

আমার একার সুখ, সুখ নহে ভাই,
সকলের সুখ, সখা, সুখ শুধু তাই।
আমার একার আলো সে যে অন্ধকার
যদি না সবারে অংশ আমি দিতে পাই।
সকলের সাথে বন্ধু সকলের সাথে,
যাইব কাহারে বলো ফেলিয়া পশ্চাতে?
ভাইটি আমার সে তো ভাইটি আমার।
নিয়ে যদি নাহি পারি হতে অগ্রসর,
সে আমার দুর্বলতা, শক্তি সে তো নয়।
সবই আপন হেথা, কে আমার পর?
হৃদয়ের যোগ সে কি কভু ছিন্ন হয়?
এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি
এসো বন্ধু, এ জীবন মধুময় করি।

ঙ.

অতীতকে ভুলে যাও। অতীতের দুশ্চিন্তার ভার অতীতকেই নিতে হবে। অতীতের কথা ভেবে ভেবে অনেক বোকাই মরেছে। আগামী কালের বোঝা অতীতের বোঝার সঙ্গে মিলে আজকের বোঝা সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায়। ভবিষ্যৎকেও অতীতের মত দৃঢ়ভাবে দূরে সরিয়ে দাও। আজই তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎকাল বলে কিছু নেই; মানুষের মুক্তির দিন তো আজই। আজই ভবিষ্যতের কথা যে ভাবতে বসে সে ভোগে শক্তিহীনতায়, মানসিক দুশ্চিন্তায় ও স্নায়ুবিক দুর্বলতায়। অতএব, অতীতের ভবিষ্যতের দরজায় আগল লাগাও– আর শুধু কর দৈনিক জীবন নিয়ে বাঁচতে।

চ.

কোন সভ্য জাতিকে অসভ্য করার ইচ্ছা যদি তোমার থাকে তাহলে তাদের সব বই ধ্বংস কর এবং সকল পণ্ডিতকে হত্যা কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখক, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতেরাই জাতির আত্মা। এই আত্মাকে যারা অবহেলা কর, তারা বাঁচেনা। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এটাই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভেতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুর আবশ্যকতা নেই।

ছ.

জীবন বৃক্ষের শাখায় যে ফুল ফোটে, তা-ই মনুষ্যত্ব। বৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালতে হবে এই ফুলের দিকে লক্ষ রেখে। শুধু শুধু মাটির রস টেনে গাছটা মোটাসোটা হয়ে উঠবে এই ভেবে কোন মালী গাছের গোড়ায় জল ঢালে না। সমাজ-ব্যবস্থাকেও ঠিক করতে হবে মানুষকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে তুলবার জন্য নয়, মানুষের অন্তরে মূল্যবোধ তথা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্বন্ধে চেতনা জাগিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে। যখন এই চেতনা মানুষের চিত্তে জাগে তখন এক আধ্যাত্মিক সুষমায় তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত জগৎ আলোকময় হয়ে দেখা দেয়। ফলে মানুষ ইতর জীবনের গুরুভার থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে লঘুপক্ষ প্রজাপতির মত হালকা মনে করে।

জ.

মানুষের জীবনকে একটি দোতলা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীব-সত্তা সেই ঘরের নিচের তলা, আর মানব-সত্তা বা মনুষ্যত্ব উপরের তলা। জীব-সত্তার ঘর থেকে মানব-সত্তার ঘরে উঠবার মই হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষাই আমাদের মানব-সত্তার ঘরে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য জীব-সত্তার ঘরেও সে কাজ করে, ক্ষুৎপিপাসার ব্যাপারটি মানবিক করে তোলা তার অন্যতম কাজ। কিন্তু তার আসল কাজ হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অন্য কথায় শিক্ষার যেমন প্রয়োজনের দিক আছে, তেমনি অপ্রয়োজনের দিকও আছে, আর অপ্রয়োজনের দিকই তার শ্রেষ্ঠ দিক। সে শেখায় কী করে জীবনকে উপভোগ করতে হয়, কি করে মনের মালিক হয়ে অনুভূতি ও কল্পনার রস আস্বাদন করা যায়।

পাঠ ৮.১৫ : ভাব-সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ভাব-সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বলতে হবেন।
- ভাব-সম্প্রসারণ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভাষার মাধুর্যময় আধারে ভাবের যথার্থ প্রকাশেই সাহিত্যিকের সিদ্ধি। কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় অনেক সময় ভাব-সংহত বাক্য বা চরণ থাকে, যার মিত-অবয়বে লুক্কায়িত থাকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত গূঢ় কথা, নিহিত থাকে ভূয়োদর্শনের শক্তি। ইঙ্গিতময়, রূপকাশ্রয়ী স্বল্প-বাক উক্তিগুলো বিশ্লেষণে বের হয়ে আসে জগৎ-জীবন সম্পর্কে বৃহৎ ভাব, জীবনের তত্ত্বদর্শন। এই ধরনের ভাবগূঢ় বাক্যগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হলো ভাব-সম্প্রসারণ। ভাবের সম্প্রসারণে বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট ও বোধগম্য হয়ে ওঠে। যথাযথ শব্দ প্রয়োগ আর উপমা, দৃষ্টান্ত, তুলনা ইত্যাদির আশ্রয়ে ভাবের সম্প্রসারণের কাজটি সম্পন্ন করতে হয়।

ভাব-সম্প্রসারণের তিনটি অংশ–

(১) আভিধানিক অর্থ
(২) মূল ভাব
(৩) মূল ভাব প্রকাশের উপযোগী যুৎসই দৃষ্টান্ত।

ভাব-সম্প্রসারণ রচনায় অনুসরণীয় –

১. বারংবার পাঠ করে উদ্ধৃত বাক্যের মর্মোদ্ধার করা প্রথম করণীয়।
২. বাক্যের অলংকারের আড়ালে নিহিত সারসত্য গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে।
৩. সহজ, সরল ও বাহুল্যবর্জিত বাক্য ব্যবহারে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রয়োজনানুসারে প্রাসঙ্গিকভাবে দৃষ্টান্ত, তথ্য ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হবে।
৪. উপমাত্মক বাক্যের ভাব-সম্প্রসারণে উপমান ও উপমেয় অংশকে দুটো অনুচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রথম অনুচ্ছেদে থাকবে আক্ষরিক অর্থ, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্যঞ্জনার্থ।
৫. ভাব-সম্প্রসারণ হবে মূলভাবের অনুসারী, অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য।
৬. প্রারম্ভিক বাক্যটি হবে সুসংহত, ঘনপিনদ্ধ ও শ্রুতিমধুর এবং ক্রিয়াপদ বিরহিত।
৭. নির্ভুল উক্তি ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে ভাব-সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে সৌকর্যময়।
৮. উদ্ধৃতি ব্যবহারে লেখকের নাম ব্যবহার অবশ্যই পরিহার্য।
৯. সম্প্রসারিত ভাবের আয়তন ততটুকুই হবে, যতটুকুতে ভাবের প্রকাশ সম্পূর্ণতা পায়।
১০. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি কঠোরভাবে পরিহার করতে হবে। এতে বক্তব্যের ভাব-গাম্ভীর্য ও ওজস্বিতা বিনষ্ট হয়।

কতিপয় নমুনা

১.

পথ পথিকের সৃষ্টি করে না, পথিকই পথের সৃষ্টি করে।

ভাব-সম্প্রসারণ : পথ প্রকৃতির কোনো উপহার নয়; পথের সৃষ্টি মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের পদচারণায়। পথ তৈরির ক্ষেত্রে পথের কোনো ভূমিকা নেই। দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ জমিনের ওপর দিয়ে মানুষ চলাচল করতে করতে পথের সৃষ্টি করেছে। যত বেশি মানুষের যত বেশি চলার প্রয়োজন হয়েছে পথ তত বেশি প্রশস্ত ও দীর্ঘ হয়েছে। এটাই পথ সৃষ্টির ইতিহাস। পথের জায়গা আগেই ছিল, কিন্তু পথ ছিল না; মানুষ চলার গতিকে স্বচ্ছন্দ ও আরামদায়ক করার প্রয়োজনেই পথ সৃষ্টি

করেছে। মানুষ যেমন প্রয়োজনের তাগিদে পথ সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানুষ জীবনযাপনকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল করার প্রয়োজনেই আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে। প্রকৃতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিচিত্র উপাদান-উপকরণকে ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছে বহু বিচিত্র জীবনোপকরণ। প্রকৃতিতে লোহা আগেই ছিল, কিন্তু কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে লোহা গলিয়ে বানিয়েছে বহু বিচিত্র ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি। এভাবেই কঠোর পরিশ্রম, কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রাণান্ত চেষ্টায় মানুষ গড়ে তুলেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ সভ্য জীবন। মানুষ যখনই কোনো সংকটে পড়েছে, তখনই মনন ও শ্রম দিয়ে তা কাটিয়ে উঠার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতির বৈরিতার কাছে মানুষ কখনো হার মানেনি; মানুষের অপরাজেয় মানসিকতা ও দুর্দমনীয় সংগ্রামের কাছে প্রকৃতি বশীভূত হয়েছে। পথ যেমন একদিনে তৈরি হয়নি, শত শত মানুষের নিরন্তর পদচারণায় তৈরি হয়েছে পথ, তেমনি মানবসভ্যতার উৎকর্ষ ও বিকাশের পেছনে রয়েছে অগণিত মানুষের শ্রম, অধ্যবসায়, নিরন্তর গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রয়াস। মানুষের কোনো অর্জনই সুলভ নয়; মানুষের সকল অর্জনের মূলে রয়েছে তার সর্বজয়ী মানসিকতা ও কঠোর শ্রম; হয়তো অনেক অর্জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অপরিমিত রক্তঝরার ইতিহাস। কোনো বাধার সামনেই মানুষ থমকে দাঁড়ায়নি; চলার পথের প্রতিকূলতাকে জয় করার জন্য গভীর নিষ্ঠায় নতুন পথ সন্ধান করেছে। তাই বলা যায়, পথিকই অগ্রগামী, পথ পথিকের অনুগামী মাত্র।

২.
বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।

ভাব-সম্প্রসারণ : জীবনের প্রয়োজনে বিদ্যা; আর একারণেই বিদ্যাকে হতে হয় জীবনমুখী। মানুষ বিদ্যার্জনের মাধ্যমে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে। মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা মুক্তি পায় বিদ্যার স্পর্শে। মানুষের অনন্ত সৃজনশীল ক্ষমতার কেন্দ্রে নিহিত রয়েছে বিদ্যার যাদুস্পর্শ। বিদ্যা মানবজীবনের অন্ধকার দূর করে মানুষকে আলোকিত, সমৃদ্ধ ও মহীয়ান করে তোলে। বিদ্যার বলেই মানুষ ক্ষুদ্রতার গণ্ডিমুক্ত হয়, পৃথিবীর অফুরন্ত সম্পদকে করায়ত্ত করে, সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যার আলোতেই প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় রহস্য ভেদ করে প্রকৃতিকে মানুষ আপন প্রয়োজনে ব্যবহারে সক্ষম হয়েছে। লোহা-লক্কড় দিয়েই ইঞ্জিন তৈরি হয়, যে কোনো ইঞ্জিনমাত্রই লোহা-লক্কড়ের সমষ্টি; কিন্তু লোহা-লক্কড়মাত্রই ইঞ্জিন নয়। মানুষ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে লোহা-লক্কড়কে ইঞ্জিনে রূপান্তরে সক্ষম হয়েছে। আবার প্রকৃতির সৌন্দর্য সবার সামনে সমানভাবেই দৃশ্যমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন, সাধারণ মানুষ সেভাবে উপলব্ধি করে না বা করতে পারে না। মানুষে মানুষে দেখার, শোনার, বলার এবং উপলব্ধির ক্ষমতার হেরফের হয় মানুষের জ্ঞানার্জনের তারতম্যের ওপর। জ্ঞান মানুষের সকল ইন্দ্রিয়ের চোখ খুলে দেয়, অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দেয়। মোদ্দাকথা হচ্ছে, অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিদ্যার্জন। বিদ্যার আলো-বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে ইতর প্রাণীর তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না; পশুর সঙ্গে মানুষের যতটুকু ব্যবধান রচিত হয়েছে সবটুকুর মূলে রয়েছে মানুষের জ্ঞানার্জনের প্রয়াস। বিদ্যার্জনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনকে উন্নত করা। অর্থাৎ বিদ্যাকে হতে হবে জীবনমুখী। যে বিদ্যা জীবনকে উন্নত করে না, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, জীবনের প্রয়োজন পূরণে অপারগ, সে বিদ্যা অর্থহীন। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা মানবসভ্যতার জন্য অনেক সময় বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রতিটি ধর্মের মৌলিক চেতনা হলো মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক মুক্তি; মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্যই ধর্মের আবির্ভাব। কিন্তু ধর্মের খণ্ডিত ও জীবনবিমুখ শিক্ষা মানুষের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা ধর্মের নামে পরিচালিত সাম্প্রতিক সহিংসতা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনধর্মী শিক্ষাই মানুষকে ধর্মে, কর্মে, জ্ঞানে মহিমান্বিত করে; আর জীবনবিমুখ শিক্ষা মানুষকে নিক্ষিপ্ত করে ধ্বংসস্তূপে।

৩.
বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়; গুরু উত্তরসাধক মাত্র।

ভাব-সম্প্রসারণ : বিদ্যা অর্জনে চাই সাধনা; আর এ সাধনায় মূল ভূমিকা বিদ্যার্থীর, গুরুর ভূমিকা এখানে কেবল সাহায্যকারীর। বিদ্যা অর্জন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া; শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্মিলিত চেষ্টায় এ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে। বিদ্যা-অর্জনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা হলো দিক-নির্দেশনামূলক। তিনি একটি বিষয়কে বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলেন। কিন্তু বিষয়টি রপ্ত করে বিদ্যার্জনের প্রক্রিয়াটিকে সম্পন্ন করার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর। শিক্ষার্থীকে

গভীর নিষ্ঠায় নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে বিদ্যা অর্জন করতে হয়। শিক্ষার্থীর শৈথিল্য বিদ্যা অর্জনের প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করে দেয়। আর শিক্ষার্থীর কর্ম-প্রচেষ্টা ও সাধনা বিদ্যা অর্জনের কাজটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে। আকাশের মেঘ বৃষ্টি হয়ে মাটিতে নেমে এলে মাটি যেমন তা শুষে নিয়ে নিজেকে উর্বর করে এবং পত্র-পুষ্প-শস্যে নিজের বুক ভরিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষকের দেওয়া নির্দেশনা শিক্ষার্থী গভীর অধ্যবসায়ে আয়ত্ত করে নিজের ভেতরকার সুপ্ত চিন্তা ও জ্ঞানশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। আর এভাবেই শিক্ষার্থীর শিক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন ও সার্থক হয়ে ওঠে। শিশু যখন হাঁটতে চায়, তখন তার সামনে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলে শিশুটির যেমন সাহস ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় এবং এক-পা দু-পা করে এক পর্যায়ে হাঁটা শিখে যায়। বড়দের কাজ শিশুর হয়ে হেঁটে দেওয়া নয়, বড়দের কাজ হলো অভয় দিয়ে সাহস জুগিয়ে শিশুকে হাঁটতে শেখানো। একইভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সামনে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন, শিক্ষার্থী তার নিজের চেষ্টায়, সাধনায় বিদ্যার্জনের কাজটি সম্পন্ন করবে। গুরু বিদ্যার সন্ধান দেন, আর শিষ্য সেই বিদ্যার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে বিদ্যা আয়ত্ত করে নিজেকে আলোকিত করে এবং জগৎকে উপহার দেয় আলো। শিক্ষক শিক্ষার্থীর হাতে ধরিয়ে দেন জ্ঞানের দীপশিখা, আর শিক্ষার্থী সেই দীপশিখা হাতে জগতের অনন্ত রহস্যের আঁধার ভেদ করতে করতে অকুতোভয়ে এগিয়ে চলে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থী নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান পায়, আর সেই জ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে আলোকিত করে, সাধন করে মানুষের অশেষ কল্যাণ। উদাহরণস্বরূপ গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটলের কথা বলা যায়। সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন প্লেটো আর প্লেটোর ছাত্র ছিলেন এরিস্টটল। গুরুর কাছ থেকে বিদ্যার নির্দেশনা পেয়ে তাঁরা জ্ঞানের সাধনায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং জ্ঞানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। জ্ঞান-সাধনায় গুরু-শিষ্যের এই অনন্য দৃষ্টান্ত মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁদেরকে অম্লান করেছে। বলা যায়, শিক্ষক জ্ঞানের সাধনায় পথ-প্রদর্শক; কিন্তু জ্ঞানের পথটি মাড়িয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্ব শিক্ষার্থীর এবং এ সাধনা নিঃসন্দেহে কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ।

৪.
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

ভাব-সম্প্রসারণ : পরার্থপরতায় পরম আনন্দ, অনাবিল সুখ এবং গভীর পরিতৃপ্তি। পরের হিতার্থে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত। পরহিতব্রতী মানুষেরাই পায় জগতে অমরত্বের স্বীকৃতি। একক মানুষ খুবই ক্ষুদ্র, অতি নগণ্য। ক্ষুদ্রতার বৃত্ত ভেঙে সমষ্টির অংশ হওয়ার প্রয়োজনেই মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ। সমাজের মধ্যে সে খুঁজে পায় বৃহত্তের পরিধি। এজন্য মানুষকে আত্মপরায়ণতার ক্ষুদ্র পরিচয় বিসর্জন দিতে হয়; সমাজের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখের জীবনের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে হয়। নিজের হিতাহিত ভুলে গিয়ে জগতের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানবজনম সার্থক হয়। জগতের সকল মানুষের কল্যাণচিন্তা ও মঙ্গলকামনার মধ্যেই মানুষের মনে এক নিবিড় শান্তি লুকিয়ে থাকে। জগতের ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া মানেই উদার, উন্মুক্ত আকাশের তলা থেকে সরিয়ে নিয়ে আলো-বাতাসহীন ক্ষুদ্র গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলা। আত্মতাময় জীবনে বৃহৎজীবনের সঙ্গে কোনো যোগ থাকে না, আনন্দ-বেদনার কোনো প্রবাহ থাকে না; তাই সেই বিচ্ছিন্ন জীবনে কোনো শান্তি-স্বস্তিও থাকে না। স্বার্থমগ্ন মানুষেরা অন্যের ভালবাসার উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়ে এক হাহাকারক্লিষ্ট হতভাগ্য জীবন যাপন করে। জীবদ্দশায় সে বৃহৎজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, মৃত্যুর পরে সে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ইতর প্রাণীদের মতো। বনের পশুরা রিপুর তাড়না নিয়ে আত্মতাময় জীবন কাটায়, আবার প্রকৃতির নিয়মে একসময় মৃত্যুকেও বরণ করে নেয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই ইতর প্রাণীর চূড়ান্ত অবসান ঘটে, জগতে তার অস্তিত্বের কোনো চিহ্নরেখা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু একজন সার্থক মানুষের মহাজীবন শুরুই হয় তার মৃত্যুর পরে; সে জীবন অমরত্বের। মানুষের প্রতি তার আত্মনিবেদন ও কর্মের পরিধির নিরিখেই মহাকালের পৃষ্ঠায় তার স্থান নির্দিষ্ট হয়। মানুষ মানুষের চেতনায় বেঁচে থাকে তার মহৎ কর্মের মধ্য দিয়ে, মানবমঙ্গলে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। আত্মসুখে বিভোর মানুষেরা সেই মহাজীবনের খোঁজ পায় না, সেই জীবনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। অবসাদ ও হতাশায় মোড়ানো জীবন কাটিয়ে ইতর প্রাণীর মতোই একসময় সে চিরতরে হারিয়ে যায়। এই পরিচয় মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। যাবতীয় ইতর-প্রবৃত্তি, স্বার্থান্ধতা ও আত্মসুখের ভাবনা পরিত্যাগ করে মানুষ হবে সকলের প্রতি দায়িত্বশীল, পরহিতব্রতী, জগতের মঙ্গলসাধনে আত্মনিবেদিত – সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে এটিই মানুষের আসল পরিচয়।

৫.

দুঃখের মত এত বড় পরশ পাথর আর নেই।
অথবা,
সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা,
আশা তার একমাত্র ভেলা।

ভাব-সম্প্রসারণ : সুখের কামনা মানুষের চিরায়ত, দুঃখের আঁচ জীবনে পড়ুক তা কেউ কখনো কামনা করে না। কিন্তু দুঃখ জীবনে আসে জীবনের নিয়মেই; আসে পালা করে। দিন-রাতের আবর্তনের নিয়মেই যেন সুখ-দুঃখ জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। তাই সুখের দিনের আনন্দের পাশাপাশি জীবনের দুঃখ-রাতির ঘন-তমসার জন্যও মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হয়। আবার সীমাহীন দুঃখের মধ্যেও মানুষ আশান্বিত হতে পারে এই ভেবে যে, দুঃখ কোনো চিরন্তন ব্যাপার নয়; রাতের অবসানে যেমন অরুণোদয় হবেই। জীবন কখনোই পুষ্পশয্যা নয়, সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কারোর জন্যই নির্ধারিত নয়। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের প্রত্যাশা বিপুল। বলাবাহুল্য, প্রত্যাশা কখনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যায় না; প্রত্যাশা পূরণের জন্য মানুষকে পরিশ্রম করতে হয়, কখনো লিপ্ত হতে হয় কঠোর সাধনায়। কখনো বহু কষ্টে পূরণ হয় প্রত্যাশা; আবার অনেকসময় কোনো চেষ্টায়ই ঘটে না প্রত্যাশা-প্রাপ্তির মেলবন্ধন। জীবনে নেমে আসে গভীর হতাশা, দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে জীবন। কিন্তু চিরঞ্জয়ী মানুষেরা কখনোই পরাভূত হয় না, হতাশাকে নিত্য সত্য বলে ভাবে না, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে রচনা করে নতুন স্বপ্নের জাল। অসীম ধৈর্য ও সাহসে যে ব্যক্তি লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকে, দুঃখের দীর্ঘ আঁধার কেটে তার জীবনে সুখের সোনালি সকাল আসবেই। প্রত্যাশা যত বড় হবে, তা অর্জনের পথে বাধাবিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-যন্ত্রণার মাত্রাও হবে তত গভীর ও ব্যাপক। কোনো কিছু অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্টের মূল্য যত বেশি হবে, তার প্রাপ্তির আনন্দও হবে তত বেশি প্রশান্তিদায়ক। জগৎ-সংসারে অভাব আমাদের নিত্য তাড়া করে, অভাব পূরণ হলে আমাদের মন আনন্দে দ্রবীভূত হয়, আবার অপূরণের অনেক কষ্ট মনের কোণে ভিড় জমায়। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষের পক্ষে সাজে না, বরং পরম ধৈর্যে ও নিষ্ঠায় দুঃখকে জয় করার অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, দুঃখই মানুষের জীবনের সাফল্যের বীজমন্ত্র। মানুষের সকল বড় অর্জনের পটভূমিতে আছে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস। মাতৃত্বের আনন্দ কষ্ট ছাড়া অসম্ভব; বিজয়ের মূল্যও দুঃখের মধ্যেই নিহিত। জীবনে কষ্ট যত তীব্র ও ঘনীভূত হয়, সুখের সম্ভাবনা তত নিকটবর্তী হয়। জীবনে কষ্ট এক পরশ পাথর, কষ্টের ভেতর থেকে উদ্ভব ঘটে মানুষের বড় কোন সাফল্যের। পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন এমন সকল কীর্তিমান মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের প্রত্যেককেই ভীষণ কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। চরম বৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে সংগ্রাম করতে হয়েছে – কখনো কখনো মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে তাঁদের জীবনে। কিন্তু চরম বিপর্যয়েও মহামানবদের আশাহত হতে দেখা যায় না। সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় আগামী নির্মাণের স্বপ্নে তাঁরা অবর্ণনীয় কষ্টকেও অম্লান বদনে সহ্য করেছেন। তাই কষ্টকে অস্বীকার করে নয়, কষ্টে মূহ্যমান হয়েও নয়, কষ্টের দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েই বুকভরা আশা নিয়ে মানুষকে সাফল্যের সরণিতে উপনীত হওয়ার সাধনা করতে হবে।

৬.

দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য। সর্পের মস্তকে মণি থাকিলেও তাহা কি ভয়ংকর নহে?

ভাবসম্প্রসারণ: বিদ্বান ব্যক্তি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয়; কারণ একজন বিদ্বান ব্যক্তি বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবে সচ্চরিত্রবান হয়ে ওঠেন। বিদ্যার প্রভায় তিনি নিজে আলোকিত হন, সমাজকে আলোকিত করেন; জ্ঞানে শুচি-স্নাত হয়ে নিজে শুদ্ধ হন, সমাজকে দেখান শুদ্ধতার পথ। তবে বিদ্যা অর্জন করেও যদি কোনো মানুষ চেতনাগতভাবে অসচ্চরিত্রের হন, তাহলে তাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করাই সমুচিত।

বিদ্যা মানুষের পরম ধন। বিদ্যা মানুষের মধ্যে বিবিধ মানবীয় গুণাবলির সমাবেশ ঘটায়, মানুষকে শুভবোধে উদ্দীপ্ত করে, মানুষকে কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত করে। অর্থাৎ, এককথায় বিদ্যা মানুষকে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলে। একজন বিদ্বান ব্যক্তি সত্য ও কল্যাণের প্রতি হবেন গভীর অনুরাগী। লোভ-হিংসার উর্ধ্বে উঠে নিজেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন শুদ্ধচিত্তের মানুষ হিসেবে। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠায় তিনি হবেন সমাজের পথিকৃৎ। একজন বিদ্বান ব্যক্তির কথাবার্তায় ও আচার-

আচরণে বিচ্ছুরিত হবে পবিত্রতার দ্যুতি। তিনি তাঁর লব্ধ জ্ঞানকে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির কাজে প্রয়োগ করেন; তাঁর দ্বারা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। মহানবী (স)-এর প্রতি পবিত্র কোরানের প্রথম বাণীই ছিল 'ইকরা' অর্থাৎ পড়ো। ইসলামে বিদ্যার্জনকে নর-নারীর জন্য ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং মহানবী (স) বিদ্বানের মর্যাদা নির্দেশ করতে গিয়ে বিদ্বানের কলমের কালিকে শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র বলেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাস্তব যে, সমাজে এমন কিছু বিদ্বান লোক দেখা যায়, যারা শিক্ষিত হলেও বিদ্যা তাদের চরিত্র গঠনে কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। বিদ্যার বদৌলতে কিছু কিছু বিষয়ে তাদের কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধি পেলেও তাদের চেতনাগত দিকের কোনো উৎকর্ষ সাধন হয়নি। শিক্ষাহীন, অন্ধচেতন মানুষের মতো লোভ, হিংসা, স্বার্থান্ধতা – এসব পশুপ্রবৃত্তি তাদের মজ্জার গভীরে রয়েই গেল। উপরন্তু শিক্ষার সংশ্লেষে তাদের প্রবৃত্তি দুর্দমনীয় ও অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ বিন্দুমাত্র নেই, মানুষকে পদদলিত করার এক হিংস্র ক্রোধ তাদের সার্বিক আচরণে ফুটে ওঠে। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে দুর্জন বিদ্বানেরা তাদের বিদ্যার অপব্যবহার করে থাকে, যা সমাজের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। শিক্ষাবঞ্চিত মানুষেরা সমাজের জন্য কোনো বৃহত্তর কল্যাণ করতে অক্ষম; কিন্তু দুর্জন বিদ্বান সমাজের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুষ্টক্ষত। সমাজের অনিষ্ট করার ক্ষমতা তাদের অশিক্ষিত মানুষদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। চরিত্রহীন বিদ্বান তার বিদ্যাকে অন্যায় কাজে ব্যবহার করে। তাই বিদ্বান ব্যক্তি শ্রদ্ধাভাজন হলেও চরিত্রহীন, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বান কোনোভাবেই সম্মান লাভের যোগ্য নয়। লোকমুখে প্রচলিত আছে কোন কোন বিষধর সাপের মাথায় অতিমূল্যবান মণি থাকার কথা। জীবনঘাতী বিষের জন্যই সাপের মাথার মণি মহামূল্যবান হলেও কার্যত মূল্যহীন। অনুরূপভাবে বিদ্যা যত মূল্যবানই হোক দুর্জনের বিদ্যা কোনো মূল্য বহন করে না; তার সাহচর্য কোনো অবস্থাতেই শুভ নয়। এধরনের লোকের সাহচর্যে নিষ্কলুষ চরিত্রও কলুষিত হতে পারে। বিদ্যার চেয়ে চরিত্র অধিকতর মূল্যবান; চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার জন্যই দুর্জন বিদ্বানের সাহচর্য সর্বদাই পরিত্যাজ্য।

৭.

দণ্ডিতের সাথে –
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

ভাব-সম্প্রসারণ : সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনে অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রে বিচারিক ব্যবস্থা চালু থাকে। অন্যায়কারীর যথাযথ শাস্তিবিধানের মাধ্যমে বিচারক সমাজের শান্তিরক্ষার মহান ব্রত পালন করে থাকেন। বিচারকের দণ্ডদান অমানবিক বা অনৈতিক কোনো কাজ নয়; বরং তাঁদের কর্মকাণ্ডে সুরক্ষিত হয় সমাজ, সমাজে অপরাধপ্রবণতা থাকে নিয়ন্ত্রণে। বিচারকের দায়িত্ব হলো পক্ষপাতহীনভাবে অন্যায়কারীর শাস্তি নিশ্চিত করা। বিচারকের নিরপেক্ষতা মানে নির্মোহতা নয়; তিনি যান্ত্রিক কৌশলে বিচার কাজ পরিচালনা করবেন না। বিচারক হবেন মানবিক, দণ্ডদানের ক্ষেত্রে দণ্ডিতের প্রতি তিনি হবেন সংবেদনশীল; যাতে অযাচিত কোনো কঠোরতা দণ্ডের মধ্যে না থাকে। কঠোর দণ্ডের মাধ্যমে অপরাধীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মধ্যে বিচারের উদ্দেশ্য নিহিত নয়; সেই বিচারই উত্তম যা অপরাধীর মনে অনুশোচনার জাগরণ ঘটায়, অপরাধীর সংশোধিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, লোভ-লালসা, মোহ – এসব সহজাতভাবেই ক্রিয়াশীল। এসব রিপুর তাড়নায় মানুষ কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায় সমাজবিরুদ্ধ কাজে জড়িয়ে যায়। সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণে অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতেই হয়। কিন্তু দণ্ডদানে বিচারকের মন যদি দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনায় দ্রবীভূত হয়, বিচার হয় দণ্ডিতের বেদনাস্পর্শী, তাহলে অপরাধীর সুপ্ত মানবিক চেতনায় হয়তো তা দাগ কাটতে পারে। তাতে অপরাধীর হারানো মনুষ্যত্ববোধের পুনর্জাগ্রত হওয়ার একটি অবকাশ থেকে যায়। অনুশোচনার দহনে যদি অপরাধী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তাহলে সে বিচারই হবে সর্বাংশে ফলপ্রসূ। বিচারক অপরাধকে ঘৃণা করবেন, অপরাধীকে নয়। কিন্তু বিচারক যদি অপরাধীর প্রতি ঘৃণাবশত বৈরী হন, তাহলে সহমর্মিতা রহিত বিচারে অপরাধীর স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের সুযোগটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিচারের উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনেই বিচারককে হতে হয় দণ্ডিতের প্রতি সমবেদনায় কাতর।

৮.

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?

ভাবসম্প্রসারণ : মা আর মাতৃভাষা মানুষের চেতনায় একই সূত্রে গাঁথা। জন্মের পরে মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে যোগসূত্র তৈরি হয় তা মাতৃভাষার কল্যাণে। একারণেই মাতৃভাষা মানুষের রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জার সঙ্গে বিমিশ্র হয়ে থাকে। মাতৃভাষায় মিশে থাকে অমৃত; তাই মাতৃভাষায় মানুষের আবেগ শত সুরে ঝংকার তোলে। পৃথিবীতে হাজারো ভাষার মেলা; কিন্তু মাতৃভাষার মতো এত মধুময়, এত মায়াময়, এত স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনো ভাষাই নয়। প্রাণ যেন কলকলিয়ে ওঠে মাতৃভাষায়। ভাব আর আবেগ প্রকাশে এমন পরিপূর্ণ আনন্দ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায়ই সম্ভব নয়। বিদেশি ভাষা মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে কষ্টেসৃষ্টে আয়ত্ত করে, বিদেশি ভাষায় দস্তুর মতো কাজও চলে; কিন্তু সুপ্রচুর প্রাণের বন্যা বওয়ানো একমাত্র মাতৃভাষায়ই সম্ভব। মানুষের ভাব প্রকাশের সর্বোত্তম বাহন মাতৃভাষা; আপন মনোভাব প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই তার মাতৃভাষায় সাবলীল; কারণ মাতৃভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর আত্মিক রসকে জারিত করে। বাঙালি হিসেবে বাংলা আমাদের সত্তার ভাষা। বাংলাই আমাদের প্রথম ভালবাসা, আমাদের ভাবাবেগ প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। বাংলাভাষার মাধ্যমেই আমাদের প্রাণ পায় সজীবতা, চেতনা হয়ে ওঠে দীপ্তিময়। আমাদের চিন্তার শুরু, বিকাশ ও পরিণতি সবই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে। মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করলে তা চেতনার গভীরে স্থান পায়; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা পায় পরিপূর্ণতা। সার্বিকভাবে মাতৃভাষার সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটি জাতিরই সমৃদ্ধি সাধিত হয়। মাতৃভাষা-প্রীতি মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমকে গভীর করে, আপন জাতিসত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে। চীন, জাপান, জর্মন প্রভৃতি উন্নত দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাতৃভাষাকে তারা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চার বাহন করে দেশের মানুষের চেতনাজগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। আর জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলায় সমৃদ্ধ মানুষেরাই নির্মাণ করেছে সমৃদ্ধ দেশ। বাঙালি হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি আমাদের গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ থাকা উচিত। মাতৃভাষার অবারিত চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা গৌরবময় অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারব। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা আমাদেরকে পরাশ্রয়ী জাতিতে পরিণত করবে, যা আমাদের কারোরই কাম্য হতে পারে না। আমাদের জন্য এক অনন্ত অনুপ্রেরণা হলো, অতীতে বাংলা ভাষার অবমাননা আমরা মেনে নেইনি, শরীরের রক্ত ঢেলে আমরা এর মর্যাদা রক্ষা করেছি।

৯.

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানব জীবনের সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত বস্তু স্বাধীনতা – সেটা হোক ব্যক্তিগত, হোক রাষ্ট্রীয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কল্পনাও করা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করা খুবই কষ্টসাধ্য; এর জন্য বহু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, ঝরাতে হয় বহু তাজা প্রাণের রক্ত। শক্তিপ্রমত্ত আগ্রাসী শক্তি কখনো পদানত জাতিকে স্বাধীনতা দিতে চায় না, বহু আত্মত্যাগের রক্তাক্ষরে লিখে নিতে হয় স্বাধীনতার সনদ।

পরাধীনতা কোনো জাতির জন্য এক ভয়াবহ অভিশাপ। রুদ্ধ কারাগারে অবরুদ্ধ মানুষের মাথা ঠুকে মরার এক করুণ যন্ত্রণা এই পরাধীনতার মধ্যে নিহিত। পরাধীনতা নিজগৃহে অন্যের দাসত্ব করার আত্মিক রক্তক্ষরণে একটি জাতিসত্তার মৃত্যু ঘটায়। নিজের মতো করে প্রাণের প্রাচুর্যে বাঁচার জন্য স্বাধীনতা এক পরম ধন। বহু মানুষের আত্মত্যাগের সীমাহীন মূল্যে দুর্বৃত্তের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা যায়; কিন্তু স্বাধীনতাটিকে রক্ষা করার জন্য আরো কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয়। কারণ স্বাধীন দেশের ভেতরে বাইরে সক্রিয় থাকে অসংখ্য প্রকাশ্য ও গুপ্ত শত্রু; আগ্রাসী শত্রু ফিরে পেতে চায় হারানো উপনিবেশের ওপর পুরনো কর্তৃত্ব। তারা দেশের স্বাধীনতা হরণে প্রতিনিয়ত বিচিত্র ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে তৎপর থাকে। তাই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন জনগণের সম্মিলিত সচেতনতা ও স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাবোধ। একটি দেশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে হলে ঐ দেশের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো অনিবার্য। দেশকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেশের আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড যদি মজবুত হয় এবং জনগণকে নিরক্ষরতামুক্ত করা সম্ভব হয়, তবেই জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা দৃঢ়বদ্ধ হবে এবং দেশের অর্জিত স্বাধীনতা আর কখনো বিপন্ন হবে না। সকল নাগরিকের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে

দেশাত্মবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে জনগণকে স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত করা সম্ভব হলেই দেশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে।

১০.

স্বদেশের উপকারে নাই যার মন,
কে বলে মানুষ তারে; পশু সেইজন।

ভাবসম্প্রসারণ : মানুষের মহৎ গুণাবলির মধ্যে অন্যতম হলো স্বদেশপ্রেম। জন্মভূমিকে ভালবেসে তার কল্যাণ-চেষ্টায় নিজেকে নিবেদন করার মধ্যেই একজন মানুষের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। দেশপ্রেম যার মধ্যে নেই মানুষ হিসেবে সে ঘৃণিত ও নিন্দিত।

জন্মভূমি মায়ের মতোই একান্ত আপনার ধন। প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের বুনিয়াদ নির্মিত হয় জন্মভূমির কোলে। মায়ের দুগ্ধ পান করে যেমন শিশু পুষ্ট হয়, মায়ের পরম স্নেহ গায়ে মেখে শিশু বেড়ে ওঠে, তেমনি জন্মভূমির রস অনুপান করে, ধুলোবালি, আলো-বাতাস গায়ে মেখে একজন মানুষ পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়। তার অস্তিত্বের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকে জন্মভূমির বিচিত্র উপাদান। জন্মভূমির সঙ্গে তৈরি হয় আত্মার বন্ধন। তাই জন্মভূমির প্রতি মানুষের থাকে এক সহজাত অনুরাগ। স্বদেশকে ভালবাসা মানুষের এক পবিত্র কর্ম হিসেবে পরিগণিত। স্বদেশ যেমন পরম মমতায় কোল জুড়ে তার সন্তানদের আশ্রয় দেয়, সন্তানদেরও স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা পোষণ করা এক বিশেষ কর্তব্য। মা যত দরিদ্রই হোক একজন সন্তানের জন্য মায়ের যেমন কোনো বিকল্প নেই, ঠিক তেমনি নিজের দেশ যত ক্ষুদ্র, দরিদ্রই হোক না কেন, জন্মভূমির চেয়ে সেরা কোন দেশই নয়। একজন দেশপ্রেমিক মানুষের মধ্যে থাকে দেশের জন্য সর্বস্ব উজাড় করা ভালবাসা, দেশের সম্পদে-বিপদে সবসময় স্বদেশ-লগ্ন থাকার এক অকৃত্রিম অনুভূতি। একজন দেশপ্রেমিক লোকের কাছে স্বদেশ হলো– 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।' দেশপ্রেমিক ব্যক্তি স্বদেশের কল্যাণ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে পারে না। দেশ ও জাতির উপকার করতে পারলেই নিজের জীবনকে সার্থক মনে করে। মাতৃভূমি মানুষের কাছে এত প্রিয় যে, দেশের বিপদে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও দেশে এমন কিছু মানুষ থাকে, যারা দেশের সঙ্গে কোনো বন্ধন অনুভব করে না, দেশের প্রতি থাকে না তাদের কোনো দায়িত্ববোধ, দেশের কল্যাণে তাদের কোনো অবদান থাকে না, বরং দেশকে ব্যবহার করে নিজের নোংরা স্বার্থে, এমনকি নিজের স্বার্থের জন্য নিজের দেশকে বিকিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এরা মানুষ হিসেবে অধম, পশুতুল্য। দেশপ্রেমহীন এই নরাধমেরা যতই গুণবান, জ্ঞানী ও সম্পদশালী হোক না কেন তারা বর্জ্যরূপে পরিত্যাজ্য। দেশপ্রেমেই মানুষের মহত্ত্বের পরিচয়, দেশের প্রতিটি মানুষেরই উচিত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

নিজে করুন : (সংকেতসহ ভাব-সম্প্রসারণ)

১. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

সংকেত: পদ্মফুলের অনিন্দ্য সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য যেমন কাঁটার আঘাত সহ্য করতে হয়, তেমনি জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য সাফল্যকামী মানুষকে পাড়ি দিতে হয় দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত দীর্ঘ বন্ধুর পথ।

২. অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

সংকেত: অন্যায়কারী ও অন্যায় সহ্যকারী দুজনেই সমান অপরাধী; আর দুজনেই সমান ঘৃণিত। অন্যায়কারী তার কৃতকর্মের জন্য স্বাভাবিকভাবে ঘৃণাযোগ্য। অন্যায়কারীর অন্যায়ের প্রতিবিধান না করলে অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং সমাজে অন্যায়ের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে যে ব্যক্তি অন্যায়কে সহ্য করে নেয় অন্যায়কারীকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সেই ব্যক্তি অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা হিসেবে অন্যায়কারীর মতোই অপরাধী।

৩. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সংকেত: আপন পরিবেশেই কোন কিছুর প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই বস্তুটি তার সৌন্দর্য হারায়। বনের পশুকে শখ করে খাঁচায় বন্দী করলে অথবা শিশুকে তার মায়ের কোল থেকে ছিন্ন করলে তার প্রাণ-প্রাচুর্য হারায়, তার সৌন্দর্যের হানি ঘটে। কোন কিছুর প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে হলে তাকে তার পরিবেশে রেখেই তার দিকে তাকাতে হবে।

৪. স্পষ্টভাষী শত্রু নির্বাক মিত্র অপেক্ষা শ্রেয়।

সংকেত : শত্রু বিপজ্জনক; কিন্তু নির্বাক মিত্র আরো বেশি বিপজ্জনক। শত্রু শত্রুতাবশত অন্যের কাছে কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি, খুঁত প্রচার করে বেড়ায়। এতে শত্রুর কারণে মানুষকে সমাজে হেয় হতে হয়। এর একটি উপকারী দিকও আছে, নিজের দোষ-ত্রুটির সন্ধান জেনে নিজেকে সংশোধন করার অবকাশ থাকে। আর যে মিত্র ভালবাসার টানে বা সম্পর্ক-রক্ষার তাগিদে কারোর দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তার মাধ্যমে ব্যক্তিটির প্রকৃত উপকার হয় না, বরং তার কারণে ভবিষ্যতে বড় কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃত বন্ধু সে-ই যে কোনো ব্যক্তিকে তার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সংশোধনের পথ বাতলে দেয়।

৫. তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

সংকেত : প্রকৃতির সবকিছুই স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, আবার মৃত্যুতে সমর্পিত হয়। প্রকৃতির সন্তান হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। মানুষের আদল নিয়ে জন্ম নিলেই মানুষ মানুষ হয়ে যায় না। মানুষকে মানুষ হওয়ার জন্য মনুষ্যত্ববোধ অর্জন করতে হয় এবং এটি অবশ্যই সাধনা সাপেক্ষ।

৬. দ্বার বন্ধ করে ভ্রমটাকে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

সংকেত : সত্য ও মিথ্যার মিশেলে এ জগৎ গড়ে উঠেছে। সত্য আমাদের কাঙ্ক্ষিত; কিন্তু মিথ্যাকে বিসর্জনে পাঠিয়ে সত্যকে পাওয়া সম্ভব নয়। মিথ্যা বা ভুলের ভেতর দিয়েই মানুষ সত্যের সন্ধান পায়। মিথ্যাকে রুখতে গিয়ে আসলে সত্যই হারিয়ে যায়। ভুলের ভয়ে কাজ বন্ধ রাখলে কখনো কোনো কাজই করা সম্ভব হয় না, সেটি সঠিক বা ভুল যা-ই হোক।

৭. গ্রন্থগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলেও প্রয়োজন।

সংকেত : বিদ্যা আর ধনের সার্থকতা প্রয়োগ সামর্থ্যে। বিদ্যা ও ধনের মূল্য অনেক; কিন্তু প্রয়োজনের সময় কাজে না লাগলে বিদ্যা ও ধন মূল্যহীন। বইয়ে জ্ঞান অক্ষরবদ্ধ থাকে, বই কিনলেই জ্ঞান অর্জন হয়ে যায় না, বইয়ের জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মগজে প্রবেশ না-করা পর্যন্ত তা মানুষের কোনো কাজে লাগে না। আবার অন্যের হাতে গচ্ছিত টাকার পরিমাণ যতই হোক না কেন তা প্রয়োজনের সময় ইচ্ছামতো ব্যয় করা সম্ভব হয় না। কার্যত সে অর্থ থাকা না-থাকা সমান কথা। অর্থ-বিদ্যা থাকার চেয়ে তার ব্যবহারিক মূল্যটাই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বরে।

সংকেত : স্রষ্টা নিরাকার, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি দৃশ্যমান। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ এবং সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজমান। স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য মানুষের ব্যাকুল আরাধনা এবং স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ না-পাওয়ার বেদনাও মানুষের সীমাহীন। কিন্তু মানুষ ভুলে যায়, গভীর ভালবাসা থেকেই স্রষ্টা সৃষ্টির মেলা সাজিয়েছেন। তাই সৃষ্টির সেবার মধ্যেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি; সৃষ্টিকে ভালবাসলেই স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ হয়ে যায়। জীবের প্রতি প্রেমের মধ্য দিয়েই স্রষ্টাকে পাওয়া সম্ভব।

৯. রাতে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা,
সূর্য নাহি ফিরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

সংকেত : যা কিছু পাওয়া হয়নি তার বেদনায় মূহ্যমান না হয়ে, যা কিছু হাতের কাছে আছে তার মধ্যেই প্রাপ্তির আনন্দ সন্ধান করা সমীচীন। নিত্য পরিবর্তনের স্রোতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকে উপভোগ্য করা সম্ভব হলেই জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

১০. শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

সংকেত : প্রকৃত মহৎ ব্যক্তিরা হিসাবের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নিজেদের আটকায় না, তাদের সাধনাই হয় নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতে। আর যারা ক্ষুদ্র-তুচ্ছ, তারা সব সময়ই নিজের সামান্য দানকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের ভাব-সম্প্রসারণগুলো নিজে করুন:

১. মানুষ বাঁচে তার কর্মের মধ্যে, বয়সের মধ্যে নয়।
২. পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
৩. সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।
৪. তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?
৫. প্রয়োজনে যে মরিতে প্রস্তুত, বাঁচিবার অধিকার তাহারই।
৬. সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া।
৭. ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।
৮. নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়
সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়।
৯. পরের অনিষ্ট চিন্তা করে যেই জন,
নিজের অনিষ্ট বীজ করে সে বপন।
১০. সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।

পাঠ ৮.১৬ : সংলাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সংলাপ কী তা বলতে পারবেন।
- সংলাপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

সংলাপ হলো দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন বা আলাপ। সংলাপে সাধারণত কোনো বিষয়ের উপর দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মত বিনিময় করে থাকে। প্রতিদিন আমরা একে অপরের সঙ্গে অনেক কথা বলে থাকি। এই কথার সবগুলো গোছানো বা সুসংহত নয়। কোনোটি বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ, কোনোটি আবার উপযুক্ত শব্দ দিয়ে গঠিত নয়। ইংরেজি Dialogue –এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে সংলাপ। আমরা একে অন্যের সঙ্গে যে কথা বলি অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথনকে সংলাপ বলা হয়।

সংলাপের বৈশিষ্ট্য

১। সংলাপে একটি বিষয় থাকবে। কোন সংলাপ রচনা করতে গেলে একটি বিষয় ঠিক করে নিয়ে মনের মধ্যে তা গুছিয়ে নিতে হবে ভালোভাবে।
২। সংলাপ সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
৩। সংলাপের ভাষা সহজ সরল প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।
৪। সংলাপ যেন গুরুগম্ভীর ও বক্তৃতাধর্মী না হয়।
৫। ইতিবাচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সংলাপ শেষ হওয়া ভালো।

কিছু সংলাপের নমুনা

ভবিষ্যতে কী হতে চাও তা নিয়ে পিতা-পুত্রের সংলাপ

ভবিষ্যতে কী হতে চাও তা নিয়ে পিতা-পুত্রের সংলাপ নিচে দেয়া হলো :

বাবা : অতনু, কেমন আছ ? তোমার এইচএসসির ভালো ফলাফলে আমি খুবই খুশি। এখন ভবিষ্যতে তুমি কী হতে চাও ?

ছেলে : আপনিই তো সব নির্দেশ দেন আমাকে। আপনি যা চাইবেন সেটাই করার চেষ্টা করবো।

বাবা : আমি প্রথমে তোমার পছন্দকে গুরুত্ব দিতে চাই।

ছেলে : আপনি যদি আপত্তি না করেন তবে আমি ডাক্তার হতে চাই।

বাবা : কেন তুমি ডাক্তারি পেশাকে পছন্দ করলে ?

ছেলে : ডাক্তারি একটি মহান পেশা। সমাজের সবশ্রেণির মানুষকে সেবা দেয়া যায়।

ঊবা : তোমার পছন্দকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু মনে রাখবে এ পেশায় পরিশ্রম, ধৈর্য ও মানবিক গুণের ভীষণ দরকার।

ছেলে : হ্যাঁ বাবা, আমি তা জানি। আমাদের মতো গরিব দেশে অনেক লোক চিকিৎসা পায় না, অবহেলায় অনাদরে মারা যায়। বিশেষ করে গ্রাঞ্চলে। আমার খুব ইচ্ছা ডাক্তার হয়ে পল্লি অঞ্চলে গরিব মানুষদের চিকিৎসা দেব।

বাবা : গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সেবা করতে চাও জেনে খুব খুশি হলাম। তোমার প্রতি অনেক আশির্বাদ রইল।

ছেলে : আশির্বাদ করো বাবা, আমি যেন আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি।

একজন ফুল ক্রেতা ও ফুল বালিকার মধ্যে সংলাপ

ফুল ক্রেতা ও ফুল বালিকার মধ্যে সংলাপ নিচে দেয়া হলো :

বালিকা : স্যার, ফুল লইবেন, ফুল ? লন না স্যার একটা ?

ক্রেতা : কী ফুল দেখি ?

বালিকা : স্যার, গোলাপ আর বকুল আছে। কুনটা লইবেন স্যার ?

ক্রেতা : কত দাম ? টাটকা তো ?

বালিকা : হ স্যার, এক্কেবারে টাটকা। গোলাপ ১৫ ট্যাকা, আর বকুল এক স্টিক ১০ ট্যাকা স্যার। দেই স্যার ?

ক্রেতা : গোলাপ ৫ টা দাও আর বকুল ৪ স্টিক। তোমার নাম কী ?

বালিকা : ময়না স্যার। নীলক্ষেত বস্তিতে থাকি।

ক্রেতা : কয় টাকা পাও ফুল বিক্রি করে ?

বালিকা : হের কুনো ঠিক নাই স্যার । যেমুন বিক্রি তেমুন ট্যাকা।

ক্রেতা : স্কুলে যাও না কেন ?

বালিকা : স্কুল গ্যালে খামু কী স্যার ? বাপ তো কামকাইজ করতে পারে না।

ক্রেতা : কেন কী হয়েছে তোমার বাবার ?

বালিকা : রিক্সা চালাইতে গিয়া এক্সিডেন্ট কইরা পাও ভাইঙা ফালাইছে। হেইর লাইগ্গাইতো ফুল বিক্রি করি আমি।

ক্রেতা : বড় ভাই নাই তোমার ময়না ?

বালিকা : বড় ভাইয়ে বিয়া কইরা আলেদা থাহে। আমগো দ্যাহে না।

ক্রেতা : ও তাহলে তো তোমার অনেক কষ্ট । তোমার মা কী করে ?

বালিকা : মায়ে পরের বাড়ি কাম করে। ছুট ভাই আছে একটা। তিন জনের খাওন হয় না ঐ দিয়া।

ক্রেতা : শোন ময়না, তুমি লেখাপড়া করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আমি খুব খুশি হয়েছি যে, তুমি নিজে কাজ করে খাও। এই নাও বাড়তি ১০০ টাকা দিলাম তোমাকে। কিছু কিনে খেও।

বালিকা : আপনে অনেক ভালা স্যার।

ইংরেজি শেখার গুরুত্ব নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ

নিচে আমি ও আমার বন্ধু বকুলের মধ্যে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব নিয়ে সংলাপ দেওয়া হলো :

আমি : কেমন আছে বকুল ?

বকুল : হ্যাঁ আমি ভালো আছি। তুমি ?

আমি : ভালো। তুমি কি ইংরেজির ব্যবহার সম্পর্কে কোনো কিছু জানো ?

বকুল : হ্যাঁ। ইংরেজির গুরুত্ব সম্পর্কে আমি জানি। এটি আন্তর্জাতিক ভাষা এবং সারা পৃথিবীতে এটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমান যুগকে ইংরেজির যুগ বলা হয়।

আমি : কেন এটি আমাদের শেখা উচিত ?

বকুল : যদি তুমি ভালো চাকরি পেতে চাও অথবা পৃথিবীর অন্য দেশ ভ্রমণ করতে চাও তোমার অবশ্যই ইংরেজি জানা দরকার। এটি একজন পর্যটক, পাইলট, প্রকৌশলী এবং যে কারও জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি : আর কিছু ?

বকুল : ইংরেজি ছাড়া তুমি বর্তমান সময়ের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবে না। তোমার জ্ঞান সীমিত থাকবে এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিদ্যা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে।

আমি : অবশ্যই। তুমি কি ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পার ?

বকুল : অবশ্যই। আমি ইংরেজিতে দ্রুত কথা বলতে ও লিখতে পারি। ইংরেজিতে ভালো দক্ষতার জন্য তোমাকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

আমি : আমিও তাই আশা করি। আমি এখন আধুনিকতার বাইরে। সত্যি বলতে কি আমি এতোদিন ইংরেজির গুরুত্ব বুঝতেই পারিনি।

বকুল : তুমি এক্ষেত্রে আমার কাছে যেকোন সাহায্য পেতে পার।

আমি : তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ

বকুল : তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তরুণ প্রজন্মের কাছে ফেসবুকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ লিখুন।

আমি কাজল ও বন্ধু চপলের মধ্যে ফেসবুক সম্পর্কে সংলাপ নিচে দেওয়া হলো :

কাজল : সবকিছু কেমন ?

চপল : সব ভালো, ধন্যবাদ। তুমি কি ভালো ?

কাজল : আজ অনেক ভালো। এখন তুমি কি ব্যস্ত ?

চপল : না। কোন প্রশ্ন আছে কি ?

কাজল : অবশ্যই। ফেসবুক সম্পর্কে আমার কিছু তথ্য প্রয়োজন।

চপল : ওহ্ ! ফেসবুক ! এখন আমি ফেসবুকের একজন সদস্য। তুমি এটির ব্যাপারে কিছু তথ্য পেতে পার।

কাজল : যে কেউ এটিতে প্রবেশ করতে পারে কি ?

চপল : অবশ্যই। যে কেউ ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে এটি ব্যবহার করতে পারে। প্রথমে তোমার এটির সদস্য হতে হবে। তারপর তোমার সাইন আপ করতে হবে।

কাজল : কথার প্রসঙ্গে, এটি কি আমাদের জন্য প্রজেনীয় ? কীভাবে ?

চপল : প্রয়োজন। এটি কাছে ও দূরে বসবাসকারী লোকের মধ্যে সামাজিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। অনেকে বন্ধু হতে পারে ও অনেক তথ্য ধারণ করতে পারে।

কাজল : আর কিছু আছে ?

চপল : হ্যাঁ, তুমি খোশগল্প করার সুযোগ পাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সদস্য হয়ে যাও। অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি কর। নাহলে তুমি অনেক আনন্দ উপভোগে ব্যর্থ হবে।

কাজল : সম্পূর্ণ ঠিক বলেছ। আমি অবশ্যই তা করবো।

চপল : অনেক ধন্যবাদ। বিদায়।

কাজল : বিদায়। আবার দেখা হবে।

যৌতুক প্রথা নিয়ে দুই বান্ধবীর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন।

যৌতুক প্রথা নিয়ে দুই বান্ধবী কানিজ ও কেয়ার মধ্যে সংলাপ রচনা করা হলো :

কানিজ : আমি কিন্তু হেলেনার বিয়েতে যাচ্ছি না।

কেয়া : আমাদের বান্ধবীর বিয়েতে আমরা সবাই একসাথে আনন্দ করতে যাবো,তুমি শুধু বাধ সাধছো কেন ?

কানিজ : হেলেনার বাবা এই বিয়েতে যৌতুক দিচ্ছেন। আর বরপক্ষও বড় অংকের যৌতুক নিয়েই হেলেনাকে বিয়ে করছে। এই কারণে আমার আপত্তি।

কেয়া : এতে আপত্তির কী আছে ? আমাদের দেশের অধিকাংশ বিয়ে তো এভাবেই হয়ে থাকে। তাছাড়া হেলেনাদের তো টাকা-পয়সার অভাব নেই।

কানিজ : বিয়েতে টাকা-পয়সা লেনদেনের পরিণতি ভালো হয় না। কেননা এতে অর্থের লোভ থাকে। এ অর্থের লোভ থেকেই স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যার মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। এসব তো যৌতুকেরই ফল।

কেয়া : বিয়ের সময় টাকা পয়সার লেনদেন কি আইন করে বন্ধ করা যায় না ?

কানিজ : আইন তো রয়েছে। শুধু আইন দিয়েই কি যৌতুক দেয়া-নেয়া বন্ধ করা যায় ?

কেয়া : তাহলে কীভাবে যৌতুক প্রথা বন্ধ করা যায় ?

কানিজ : এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। সামাজিকভাবে এ কুপ্রথাকে বয়কট করতে হবে। মেয়েদেরকেও যৌতুকের বিনিময়ে বিয়ে নয়, এই শিক্ষা নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। সংলাপ বলতে কী বুঝায় ? আদর্শ সংলাপের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে সংলাপ রচনা কর :

ক) বৈশাখি মেলা নিয়ে একটি সংলাপ লিখ

খ) সম্প্রতি পড়া একটি বই নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে একটি সংলাপ রচনা কর।

গ) ইংরেজিতে উন্নতি করার উপায় সম্পর্কে শিক্ষকের সঙ্গে একটি সংলাপ রচনা কর।

পাঠ ৮.১৭ : খুদেগল্প লিখন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- খুদেগল্প কী তা বলতে পারবেন।
- খুদেগল্প রচনার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

খুদেগল্প মানে ছোট আকৃতির গল্প। সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো ছোটগল্প। কিন্তু ছোটগল্প কখনো খুদেগল্প নয়। কোন গল্প আয়তনে ছোট হলে তাকে খুদেগল্প বলা যায় কিন্তু ছোটগল্প কেবল আয়তনের উপর নির্ভর করে না। খুদেগল্প আকৃতি ও প্রকৃতিতে খুদেই হবে। খুদেগল্প লেখা শেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো।

খুদেগল্প লেখার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে :

১। গল্পের একটা ভাব বা রূপ তৈরি করে মনে মনে তাকে সাজিয়ে নিতে হবে।
২। ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি ঘটনা শুরু করতে হবে।
৩। চরিত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের উপস্থাপন করবে। চরিত্রের ভাষা যেন গল্পরচয়িতার ভাষা হয়ে না যায়।
৪। গল্পের ভাষা হবে সহজ সরল প্রাঞ্জল ও গতিময়।
৫। গল্পের সমাপ্তি হবে সুসংবদ্ধ।

একাত্তর

রিক্সায় বাসায় ফিরছি। ষাটের উপরে বয়স রিক্রাওয়ালা গল্প বলছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। সারা রাস্তায় গল্প বলছিলেন তিনি। একাত্তরে তার বয়স ছিল পনেরর কাছাকাছি। মাঠে ময়দানে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে। বাড়ির সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না সেই সময়। বেশ কটি অপারেশনে যোগ দিয়ে বেশ সুনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি আশেপাশের এলাকায়। কিছুদিন পর গ্রামে এসে দেখেন যুদ্ধে যাবার অপরাধে পাকসেনারা তার মা-বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে, তাদের বাড়িটাও আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধে যাবার কারণে তেমন পড়াশুনো করতে পারেননি। তাই যুদ্ধ শেষে কোন চাকরিও জোটাতে পারেননি। রিক্সা চালিয়েই জীবন কাটাচ্ছেন এখন। একাত্তরে আমার জন্ম, তাই যুদ্ধের কথা ইতিহাসে পড়েছি। কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ঐ রিক্সাওয়ালার কথাগুলো আমার কাছে রূপকথার মতো লাগছিলো। বাসায় পৌঁছে রিক্সা থেকে নামলাম। রিক্সাভাড়া ছাড়াও তাকে বাড়তি কিছু টাকা দিতে চাইলাম, তিনি নিলেন না। বললেন– 'আমি মুক্তিযোদ্ধা, পরিশ্রম করে খেতে পছন্দ করি। কারো দয়া বা সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।' অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

পথশিশু

রফিক আগেই দাওয়াত দিয়েছিলো। তার বড় ভাই এসেছে আমেরিকা থেকে। অতএব বিরাট পার্টি বন্ধুদের জন্য। শীতের রাত। তাড়াতাড়ি হাজির হয়ে গেলাম। অনেক বন্ধুবান্ধব আসতে শুরু করলো। রঙবেরঙের পোশাক তাদের। কেউ কেউ এসেছেন দামি গাড়িতে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা। লাফালাফি করছে কেউ, কেউ উচ্চস্বরে চিৎকার করছে। কেউবা এটা-ওটা নেবার জন্য বায়না করছে। রাত দশটার দিকে মূল আয়োজন শুরু হলো। হাসি-ঠাট্টা-গান, তীব্র স্বরে সাউণ্ড প্লেয়ার বাজছে। থরে থরে খাবার সাজানো। যে যেমন ইচ্ছা খাবার নিচ্ছে, খাচ্ছে। অনেক খাবার নষ্টও হলো। অল্প খানিকটা খেয়ে অনেকে বাকি খাবার প্লেটেই ফেলে রেখেছে। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিলো। কোন মতে খাওয়া শেষ করে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায়

নিয়ে বাইরে এলাম। চমকে উঠলাম., এত রাতে অনেকগুলো ছোট ছোট শিশু তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। একটু খাবার চায় তারা। এত শীতেও গায়ে তেমন কাপড় নেই ওদের। অনেকেই ক্ষুধায় কাতর বোঝা গেল।
মনটা খুব খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। ভাছিলাম এরপরে আর কখনও এধরনের পার্টিতে যাব না। যে দেশে শীতের রাত্রিতেও পথে শিশুরা একটু খাবারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানে এই রকম অনুষ্ঠান আয়োজন করাটাও অমানবিক নিষ্ঠুরতা।

প্রতিজ্ঞা

বন্যায় ঢাকা শহরের চারদিক পানিতে থৈ থৈ। শুকনো খাবার আর স্যালাইন নিয়ে আজাদ ও তার বন্ধুরা দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ১৯৮৮ সালের কথা। আজাদ সেই বন্যার কথা এখনো মনে করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে আজাদ গ্রামের একটি ভালো কলেজে শিক্ষকতা করতে শুরু করলো। আবারও বন্যা। আজাদ ও তার বন্ধুরা খবর পেল রিলিফের সরকারি সাহায্য স্থানীয় হোমরা-চোমড়ারা লুটেপুটে খাচ্ছে। সেদিন রাতে এক বৈঠক করে আজাদ ও তার বন্ধুরা। ঠিক করলো এই অন্যায় ঠেকাতেই হবে এবং সাহায্য দুর্গতদের কাছে পৌঁছাতেই হবে। যেই কথা সেই কাজ। রাতে গোপনে পাহারা বসালো আজাদরা। ট্রাকে করে চাল, আটা পাচার করার মুহূর্তেই পুলিশ এসে হাজির। আজাদরা আগেই ইশারা দিয়ে রেখেছিল পুলিশ সুপারকে। পরের দিন আজাদ ও তার বন্ধুদের নেতৃত্বে সেই খাদ্যসামগ্রী গরিব লোকদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মানুষের সেবা করার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজাদ, এবারের এই বন্যার সময় তার কিছুটা করতে পেরে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করলো সে।

নিঃসঙ্গতা

তাহমিনা আক্তারকে নিয়ে আশেপাশের সবার খুব কৌতূহল। এনজিওতে চাকরি করেন, একা থাকেন তাহমিনা। সবারই জিজ্ঞাসা তার ঘর-সংসার নেই ? কিন্তু কেউ হয়তো জানে না তাহমিনার অতীত ইতিহাস। কলেজে পড়ার সময় বিয়ে হয়েছিলো তাহমিনার। স্বামী হঠাৎ দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর তাহমিনার নতুন জীবন শুরু হয়, শুরু হয় তার অন্য রকমের সংগ্রাম। ছোট ছোট দুই ভাই-বোনকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়। টিউশনি থেকে শুরু করে ছোট চাকরিতে যোগ দেয় সে। ভাই-বোনরাও তাহমিনার এই কষ্টের প্রতিদান দেয়। লেখাপড়ায় মেধাবী ছিল তারা। তাদের একজন আজ ডাক্তার, অন্যজন সরকার কলেজে অধ্যাপনা করে। কিন্তু ভাই-বোনদের মানুষ করতে গিয়ে তাহমিনার আর সংসার করা হয় না। স্বামী মারা যাবার পর অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব এসেছিলো তার বিয়ের। বাবা অকালে মারা যাওয়ায় সেই প্রস্তাবে রাজি হতে পারেনি সে। তাহলে দুই ভাই-বোনের লেখাপড়া হতো না। তাহমিনার পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া এই বয়সে এসে অনেক কথা মনে পড়ে। কেন এমন হলো জীবনটা ? নিজেকেই সে প্রশ্ন করে। সারাদিন এই মফস্বল শহরে এনজিওর কাজ শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। নিজেকে তখন অনেক নিঃসঙ্গ লাগে, একা মনে হয়।

টিউশনি

জীবনকে সেভাবে দেখা হয়নি অমিতের। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা থেকে। টাকা-পয়সার টানাটানি। একই হলে থাকে অমিতের বন্ধু সজিব। সজিব ধনী পিতার সন্তান। সজিবই অমিতকে একটি টিউশনি জোগাড়কওে দিয়েছে। ফোনে কথা বলেছে অমিত ছেলেটির বাবার সঙ্গে। ঐ ছেলেটিকেই পড়াবে অমিত, নাম তন্ময়। তন্ময়ের বাবা অমিত বলেছে পারিশ্রমিক হিসেবে অন্যদেরচেয়ে বেশিই দিবেন তিনি। অমিত প্রথমে বুঝতে পারেনি কেন তিনি বেশি দিবেন ? প্রথম দিন তন্ময়কে পড়াতে গেলে এক অন্য অভিজ্ঞতা হয় অমিতের। পঙ্গু বিকলাঙ্গ মানুষ দেখেছে অমিত কিন্তু বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না তার। তন্ময়ের মা তন্ময়কে সামনে নিয়ে আসার পর অবাক হলো অমিত। চমৎকার সুদর্শন দেখতে তন্ময়। কিন্তু কোথায় যেন একটু সমস্যা আছে বলে মনে হলো অমিতের। কয়েকটি কথা বলার পরই বুঝলো তন্ময়ের বুদ্ধিটা যথেষ্ট পরিণত নয়, একটু কম বিকশিত। প্রথমে একটু বিব্রত বিরক্ত হলেও সামলে নেয় অমিত। টাকার দরকার, তাই টিউশনিটা ছাড়তে পারছে না। এভাবেই প্রথম মাসটা কাটলো। এর মধ্যে তন্ময়ের সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্বও হয়ে গেছে অমিতের। অমিতের সবকিছু বুঝতে পারে তন্ময়, তন্ময়ের কোনকিছুই অমিতের কাছে দুর্বোধ্য নয়। মাঝে মাঝে নিজ গ্রামের গল্প করতো অমিত। তন্ময় অবাক হয়ে শুনতো সেই গল্প। একদিন অমিতের কাছে নিজের আঁকা একটি ছবি নিয়ে আসে তন্ময়। অমিত দেখলো তাদের গ্রামের অবিকল ছবি এঁকেছে তন্ময়। যেভাবে গল্প

করেছে সে, তন্ময় রঙ-তুলিতে তাই–ই তুলে এনেছে। অমিতের বুঝতে বাকি রইলো না যে, তন্ময়ের মেধা শাণিত হলেও তার প্রকাশ কিছু ধীরে। সেদিন থেকে সব দ্বিধা মুছে ফেলে সমস্ত ধৈর্য ও শক্তি দিয়ে তন্ময়কে পড়াতে লাগলো। মাস শেষে তন্ময়ের মা নির্ধারিত বেতনের চাইতেও বেশি টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু তন্ময় জানালো বেশি বেতন লাগবে না, অন্যদের মতো দিলেই সে খুশি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। খুদেগল্প বলতে কী বুঝায় ? সার্থক খুদেগল্প রচনার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

২। নিচের বিষয়গুলো নিয়ে খুদেগল্প রচনা কর :

ক) পানি দূষণ বিষয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

খ) শিশুশ্রম নিয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

গ) গ্রাম থেকে শহরে নতুন আসা একজন লোককে নিয়ে একটি খুদেগল্প রচনা কর।

পাঠ ৮.১৮ : প্রুফ–সংশোধন নির্দেশিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রুফ কী তা বলতে পারবেন।
- প্রুফ-সংশোধন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রুফ-সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা লিখতে পারবেন।

লেখকের লেখার বা রচনার ছাপ দেওয়া কাগজকে সাধারণত প্রুফ বলা হয়। মুদ্রিত কোনো কিছু কারও সামনে উপস্থিত করার আগে তা প্রেসে বা কম্পিউটারে ছাপিয়ে নিতে হয়। প্রেসের কম্পোজিটর বা কম্পিউটার অপারেটর মেশিনের অক্ষরে তা আবার লেখেন। লেখার পর কাগজে ছাপ তোলেন। এ ছাপ তোলার কাগজটিই হচ্ছে প্রুফ। এই মুদ্রিত বা ছাপ দেওয়া কাগজটি হলো লেখকের লেখার একটি প্রমাণ বা প্রুফ। কম্পিউটারে বা মেশিনে লেখার সময় লেখকের লেখা হুবহু লিখেছেন কিনা তা লেখকের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। তখন যদি দেখা যায় যে, অপারেটর লেখকের লেখার থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন কিংবা বানানে ভুল করেছেন অথবা লেখকের হাতের লেখা বুঝতে না পেরে অন্য শব্দ কম্পোজ করেছেন, তখন ঐসব ত্রুটি সংশোধন করাই হলো প্রুফ-সংশোধন।
অনেক সময় লেখক নিজেও পাণ্ডুলিপিতে বানান, তথ্য ইত্যাদি ভুল করতে পারেন। কাজেই প্রুফ যিনি সংশোধন করবেন অর্থাৎ প্রুফ-রিডারকে লেখকের তথ্য, বাক্য, বানান, শব্দবিন্যাস ইত্যাদিতে ভুল থাকলে তাও সংশোধন করতে হয়।

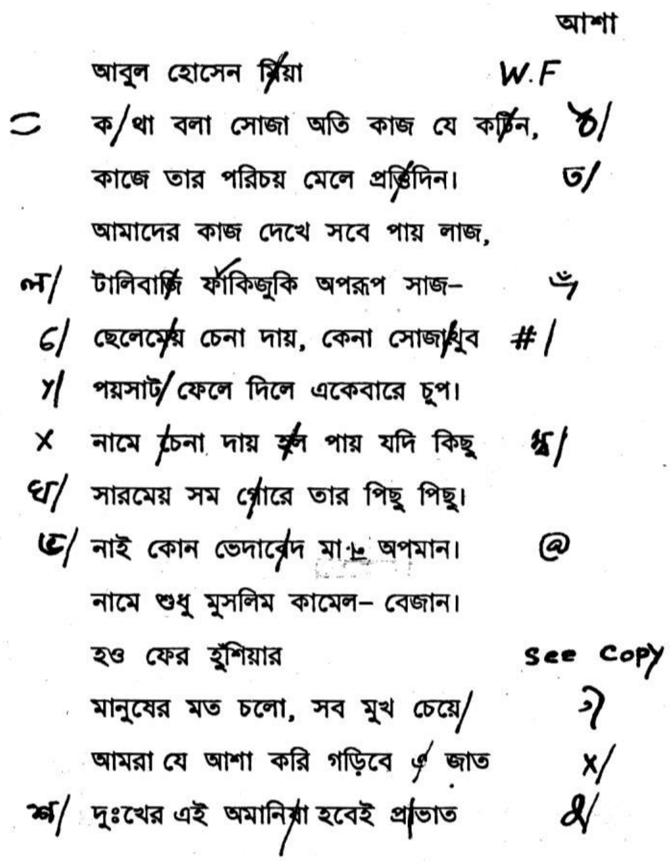
প্রুফ-সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

১। গ্রন্থে যদি তথ্য, তত্ত্ব, বাক্য, শব্দ ও বানান ভুল থাকে তাহলে সাধারণ পাঠক ভুল শিখবে।
২। মুদ্রিত লেখা জনসাধারণে প্রকাশ পেলে এর সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় নানা বিষয় জড়িত হয়ে পড়ে। অতএব সেক্ষেত্রে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে ছাপাখানা আইন প্রযোজ্য হতে পারে। কাজেই খুব ভালোভাবে প্রুফ-সংশোধন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অপর পৃষ্ঠায় প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলো সন্নিবেশিত হলো–

1.	( )	জুড়ে দাও– close up
2.	◡	(কাল দাগ) দাবাও–space appears improper
3.	X	ভাঙ্গা হরফ বদলাও–change the broken type
4.	tr.or trs	স্থানান্তরিত করা বা চাল–Transpose
5.	Cap	বড় অক্ষর–change to capital letters
6.	s. c	ছোট অক্ষর–change to small letters
7.	Ital.	বাঁকা অক্ষর বসাও–Replace with italic letters.
8.	]	ডানদিকে এগিয়ে দাও–Move to the right.
9.	[	বামদিকে এগিয়ে দাও–Move to the left
10.	]	নীচু কর–lower
11.	]	উচুঁ কর–Elevate
12.	[ ]	ছাড় দাও–Indent
13.	st. or stet	কাটা হরফ ঠিক কর–Put the lines though penned through
14.	n. p.	নতুন প্যারা আরম্ভ কর–Begin a new paragraph
15.	W. F	অন্য ধরনের হরফ হয়েছে–wrong font

16.	bold	মোটা অক্ষর দাও–Put antique letter
17.	Rom	Antique or Italic type-এর পরিবর্তে Roman type বসাও–Replace with Roman types
18.	run on	এক লাইনে সাজাও–Put into the same line
19.	=	লাইন ঠিক কর–Aline
20.	d.	তুলে দাও–Delete
21.	d. l.. or d. ld	লেড তুলে দাও–Take out the lead
22.	lead in or ld in	দুই লাইনের মধ্যে লেড দাও–Insert lead between the lines
23.	See copy	কপি ছাড় পড়েছে, দেখে ঠিক কর–Insert the word or words omitted
24.	#	ফাঁক দাও= Insert space
25.	eq #	ফাঁক সমান কর– Reduce space
26.	Less #	ফাঁক কমাও– reduce space
27.	./	ফুলস্টপ দাও–Put a full stop.
28.	;/	সেমিকোলন দাও–Put a semi- colon
29.	:/	কোলন দাও–Insert quolon
30.	?/	প্রশ্নবোধক চিহ্ন দাও–Interogative sign
31.	?	লেখকের প্রতি জিজ্ঞাসা–Query to author
32.	,	কমা বসাও–Insert comma
33.	"/	উদ্ধৃতি চিহ্ন বসাও–Insert quotation
34.	'/	উর্ধ্ব কমা বসাও–Insert apstrophe
35.	-/	হাইফেন বসাও– inset hyphen
36.	Sp.	শব্দটি আস্তে আস্তে কষ্ট সহকারে বানান করে পর–Spell out
37.	@	উল্টিয়ে বসাও–Turn the letter
38.	d⊂	তুলে দাও এবং জুড়ে দাও–Delete and close up
39.	Δ	প্রান্তীয় লেখা বসাও–Insert marginal addition
40.	(—)	ড্যাস চিহ্ন বসাও–Insert dash



আশা

আবুল হোসেন মিয়া

ক/থা বলা সোজা অতি কাজ যে কঠিন,

কাজে তার পরিচয় মেলে প্রতিদিন।

আমাদের কাজ দেখে সবে পায় লাজ,

টালিবাজি ফাঁকিজুকি অপরূপ সাজ–

ছেলেমেয়ে চেনা দায়, কেনা সোজাখুব

পয়সাট/ ফেলে দিলে একেবারে চুপ।

নামে চেনা দায় মূল পায় যদি কিছু

সারমেয় সম ঘোরে তার পিছু পিছু।

নাই কোন ভেদাভেদ মান অপমান।

নামে শুধু মুসলিম কামেল– বেজান।

হও ফের হুঁশিয়ার

মানুষের মত চলো, সব মুখ চেয়ে/

আমরা যে আশা করি গড়িবে এ জাত

দুঃখের এই অমানিশা হবেই প্রভাত

ব্যাখ্যা

W. F — অন্য ধরনের হরফ হয়েছে।

⊂ — ফাঁক পূরণ কর।

ঁ/ — ওপরে চন্দ্রবিন্দু বসাও।

ফাঁক দাও।

X টাইপ বদলাও।

@ উল্টিয়ে বসাও।

See copy ছাড় পড়েছে, কপি দেখ।

d তুলে দাও।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। পাঠটি ভালো করে পড়ে আপনি প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজে লিখুন।

১। প্রুফ বলতে কী বোঝ ? প্রুফ সংশোধন বলতে কী বোঝায় ?

২। প্রুফ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

ইউনিট-৯
প্রবন্ধ রচনা

পাঠ ৯.১ :

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রবন্ধের সংজ্ঞার্থ, আকৃতি, প্রকৃতি ও রূপ সম্পর্কে বলতে পাবেন।
- প্রবন্ধ রচনার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রবন্ধের উদাহরণ লিখতে পারবেন।
- নিজে নিজে প্রবন্ধ রচনার দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রবন্ধ কী ?

প্রবন্ধ সাহিত্যের এক বিশেষ প্রকরণ। সংস্কৃত শব্দ ‘প্রবন্ধ’-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ‘প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন’; বাংলায় শব্দটির একই অর্থ রক্ষিত। গদ্যে রচিত লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল, যুক্তিশাণিত আঁটোসাঁটো বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যরূপই হলো প্রবন্ধ। প্রবন্ধ শব্দটির বিকল্প হিসেবে বাংলায় ‘রচনা’ শব্দের ব্যবহারও লক্ষণীয়, যার অর্থ ‘নির্মাণ করা’। ইংরেজি Essay শব্দের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এর প্রকৃতি প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রবন্ধ সাহিত্য প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত;

(ক) চিন্তাশ্রিত

(খ) ভাবাশ্রিত।

প্রথমোক্ত ধরনে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সর্বাধিক, আর দ্বিতীয়োক্ত ধরনে লেখকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য।

প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ

রচনার প্রধান অংশ তিনটি;

(ক) ভূমিকা

(খ) মূল বিষয় ও

(গ) উপসংহার।

ভূমিকাংশে বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়, কোনো তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ থাকে না। ভূমিকা হতে হয় সব সময় সংক্ষিপ্ত, সংহত ও মনোগ্রাহী। এরপর আসে মূল বিষয়। রচনার এই অংশেই মূলত কাঙ্ক্ষিত বক্তব্যটি যুক্তি, তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্তের আলোকে পরিপূর্ণ অবয়বে রূপান্বিত হয়। বিষয়বস্তু সঠিক ও তাৎপর্যপূর্ণরূপে উপস্থাপনের জন্য মূল বিষয়কে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করে নিতে হয়। তথ্য যৌক্তিক পরম্পরায় উপস্থাপিত ও সন্নিবেশিত হতে হবে। মূল বিষয় বিস্তারিত আলোচনার শেষে আসে উপসংহার। এ অংশে থাকে বিষয় সম্পর্কে লেখকের অভিমত ও সিদ্ধান্ত।

প্রবন্ধের ভাষা

প্রবন্ধের ভাষা হবে সহজ, প্রাঞ্জল, গতিশীল ও আড়ষ্টতামুক্ত। অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে ভাষাকে অনাবশ্যক জটিল করার প্রবণতা পরিহার করা খুবই জরুরি। সাধু ও চলতি রীতির মিশ্রণ থেকে ভাষা মুক্ত হবে। বাক্য অনাবশ্যক জটিল ও অলঙ্কারবহুল হওয়া উচিত নয়।

উদ্ধৃতি ব্যবহার

উদ্ধৃতি ব্যবহারে রচনার মান বাড়ে; বক্তব্য বিষয় অনেক বেশি সুবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। তবে উদ্ধৃতির অনাবশ্যক ও ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার হিতে বিপরীত হয়।

রচনার দৈর্ঘ্য

রচনা হতে হবে সুগঠিত ও পরিপূর্ণ। তবে এর আকার অতি ছোট বা অতি দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পরিসর যা-ই হোক, সামগ্রিকভাবে রচনার মান যেন বজায় থাকে এবং বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্পূর্ণতা অর্জিত হয় সেদিকটা নিশ্চিত করা রচনাকারের মূল দায়িত্ব।

নমুনা হিসেবে কতগুলো প্রবন্ধ/রচনা উপস্থাপন করা হলো।

রূপসি বাংলাদেশ

ভূমিকা

প্রকৃতির এক অপরূপ লীলাভূমি বাংলাদেশ। প্রকৃতি তার অকৃপণ উদারতায় তিল তিল করে সাজিয়েছে এই মনোলোভা দেশটিকে। বিস্তীর্ণ সমভূমি, রূপালি নদীনালা, শ্যামল পাহাড়-টিলা, সবুজ বন-বনানী আর তরঙ্গমুখর সাগর বিচিত্ররূপের অপরূপ সমারোহে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে প্রকৃতির রূপসি কন্যা। বাংলাদেশের অনাবিল সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে কবি আবেগমথিত উচ্চারণে বলেছেন ‘রূপসি বাংলা’।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। উত্তরের পাহাড় বেয়ে নেমে আসা পলি জমে জমে সাগরের বুক থেকে জেগে উঠেছে এ দেশ। এর গায়ে জড়িয়ে আছে হাজারো নদীর জাল। এর সমতল ভূমি দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত। শুকনো মৌসুমে সবুজ ফসলের মাঠে ঢেউ তোলে দখিনা বাতাস, আবার বর্ষাকালে সেই মাঠেই দেখা যায় নদী উপচানো পানির তরঙ্গমালা। ফসলের মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় সবুজ কাপড় গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ নামের প্রকৃতি-কন্যা। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাথায় সবুজ টোপর পড়ে ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়। পাহাড়ের কোল জুড়ে সাজানো রয়েছে চা বাগান। বিচিত্র গাছপালা আর জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ এ পাহাড়ি বনাঞ্চল। পাহাড়ি ঝরনা আর জলপ্রপাত স্বপ্নাবেশ তৈরি করে সৌন্দর্যপ্রেমী মানুষের মনে। উত্তরে রয়েছে গেরুয়া রঙের মাটির ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়, যেখানে সৈনিকের মতো দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গজারি গাছ। পশ্চিমে রয়েছে অবারিত প্রান্তরের ধুলিধূসর রুক্ষতা। তবে সেখানেও আছে মাঠের পর মাঠ আমের বাগান, পানের বরজ আর আখের ক্ষেতের সবুজ গালিচা। দক্ষিণে বাংলাদেশের পা চুমু দিয়ে শুয়ে আছে বঙ্গোপসাগর; আর সাগরের সঙ্গে মিতালি স্থাপন করে উপকূল জুড়ে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন। বন জুড়ে সবুজ পাতার ঘন আস্তরণ এক অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। সেখানে বসতি গড়েছে ডোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর চিত্রল হরিণেরা। সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীগুলোতে বাস করে ভয়ানক কুমির। সবকিছু মিলিয়ে ভয়াল সুন্দর এ বনভূমি সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের চিত্তকে হরণ করে নেয়। নীল সাগরের বুকে জেগে ওঠা দ্বীপসমূহে তাল-নারকেল-সুপারির বাগান, বেত-শোলা-কেওড়ার বন আর প্রান্তর জোড়া ধানক্ষেত– সবুজে-নীলে মাখামাখি এ এক অপরূপ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য।

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। এখানে অবারিত জলরাশির শুভ্র-ফেনিল তরঙ্গমালার গর্জন এক অপূর্ব সুরাবেশ তৈরি করে। বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন’স সমুদ্রমোহনায় অপরূপ শোভা নিয়ে অবস্থান করছে। ফয়’স লেকের নৈসর্গিক শোভা মনোলোভা। কুয়াকাটা সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে দেখা যায় সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নান্দনিক দৃশ্য।

সবুজ শ্যামলিমা ছায়া সুনিবিড় গ্রামগুলোই বাংলাদেশের প্রাণ। কতিপয় শহর বাদ দিলে বাংলাদেশ তো 'গ্রাম বাংলা'। প্রকৃতির নিটোল সৌন্দর্যে গর্বিত এই বাংলা। দিগন্ত প্রসারিত সবুজের অবগুণ্ঠন ভেদ করে উঁকি দেয় সোনালি শস্য। নদী-বিল-ঝিলের স্বচ্ছ পানিতে দোলে সাদা, লাল কিংবা গোলাপি শাপলা। অলস দুপুরে একটানা বিরহের সুর তোলে ঘুঘু। গরু চরানোর ফাঁকে গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে রাখাল বাঁশিতে তোলে করুণ রাগিণী। গোধূলি বেলায় আকাশে ধূলি উড়িয়ে গরুর পাল লয়ে তারা ঘরে ফেরে। আলো-আঁধারির ঐ সময়ে দল বেঁধে বলাকাদের উড়ে যাওয়া এক অপার্থিব দৃশ্যের সৃষ্টি করে। অন্ধকার নেমে না আসতেই বাঁশবাগানের মাথার ওপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা নিয়ে উপস্থিত হয় চাঁদ; বন-বনানীর পাতায় পাতায় লাগে আলোর নাচন। বাংলার এমন সৌন্দর্যে বাঙালির মন হয় মাতোয়ারা; এই সর্ববিস্তারী সৌন্দর্য বাঙালির মনকে করেছে কোমল, শুভবোধে উদ্দীপ্ত।

ঋতুভেদে রূপের বৈচিত্র্য

ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। ঋতুর পালাবদলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকৃতিতে ঘটে বর্ণময় রূপবদল। প্রতিটি ঋতু আসে আপন স্বাতন্ত্র্যে, অপরূপ রূপসজ্জায়। প্রতিটি ঋতুর রয়েছে নিজস্ব রং ও সৌন্দর্য। বঙ্গঋতুর রঙ্গশালায় প্রথম ঋতু গ্রীষ্ম। দুই চোখে ক্রুদ্ধ বহ্নিজ্বালা নিয়ে তার আবির্ভাব। প্রচণ্ড অগ্নিবাণে এ সময় বাংলার বুক বিদীর্ণ হয়; চৌচির হয়ে যায় এর তৃষ্ণার্ত প্রান্তর। নিদারুণ দহন যন্ত্রণায় কাতর হয় পাখ-পাখালি, জন্তু-জানোয়ার। চারিদিকে তখন কেবল ধূলিময় ধূসরতা। এরই মধ্যে কাল-বোশেখী ধেয়ে আসে সবকিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে। এই রাগী ঋতুও মধুময় হয়ে ওঠে আম, জাম,লিচু, কাঁঠাল, আনারসের রসে।

দহন-কাতর প্রকৃতির করুণ প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে 'শ্যাম-গম্ভীর সরসা' রূপে নবযৌবনা বর্ষা দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় মেঘের পিঠে সওয়ার হয়ে বাংলার প্রকৃতির কোলে আসন পাতে। রৌদ্রদগ্ধ তৃষাতুর ধরণী বর্ষার অমৃতরসে অবগাহন করে প্রাণ-প্রাচুর্যে মেতে ওঠে, শ্যাম-স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে রুক্ষ ধরণী। প্রকৃতির বিষণ্ন অঙ্গ থেকে গ্রীষ্মের অবসাদ মুছে দিয়ে সজল বর্ষা প্রকৃতিতে জাগায় নবপ্রাণের শিহরণ। শস্য শিশুরা জেগে ওঠে মাটির বুক ভেদ করে; কদম, জুঁই, হাসনাহেনার সৌরভে মুখরিত হয় বাংলার প্রকৃতি। খেয়ালি বর্ষা বাংলার প্লাবনের ঢল নামায়, অবিশ্রান্ত বর্ষণে মাঠ-ঘাট, নদীনালা কানায় ভরে ওঠে; দূর দিগন্ত থেকে মাথায় মেঘের বোঝা নিয়ে দুরন্ত গতিতে উন্মত্তের মতো ধেয়ে আসে 'বাদল দিনের পাগলা হাওয়া'। প্রবল ক্রোধে যেন দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চায় বাড়িঘর, গাছপালা। কখনো গভীর প্রশান্তিতে আকাশ থেকে ঝরে প্রবল মুষলধারা। নদীতে স্রোতের বান ডাকে; মত্ত স্রোত ঘরবাড়ি, গবাদি পশু, ফসল, রাস্তাঘাট সবকিছু ভাসিয়ে নেওয়ার প্রমত্ত খেলায় মেতে ওঠে। আবার কখনো বর্ষার কৃপণতা গ্রীষ্মের চণ্ডতাকেও হার মানাতে চায়। বাংলার ঋতুবলয়ে বর্ষাই প্রধানতম ঋতু; বাংলার শ্যামল প্রকৃতিতে আর কৃষি-নির্ভর অর্থনীতিতে এই ঋতুর সুগভীর প্রভাব। বাংলার প্রধানতম কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে-গল্পে কেবলি বর্ষা-প্রকৃতির বন্দনা :

"নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভরভর
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনায়েছে দেখ চাহিরে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

প্রকৃতিকে ধুয়ে-মুছে শুচি-স্নিগ্ধ কোমলতা দিয়ে বাংলার শ্যামল অঙ্গনে উপস্থিত হয় শরৎকাল। বর্ষার ঘন মেঘ ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসে, অলস মন্দ্র-মন্থর গতিতে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় 'সাদা মেঘের ভেলা'। কোমল রোদের স্নিগ্ধ আভায় ঝলমল করে ওঠে প্রকৃতি। কাশফুলের শুভ্রতা প্রকৃতিতে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়; শিউলি ফুলের সৌরভে মন যায় উদাস হয়ে। শরতের সকালে কচি ঘাসের ডগায় মুক্তো দানার মতো শিশির ঝলমল করে ওঠে। শারদ শোভায় মোহিত কবি তাই আপন মনে গেয়ে উঠেন–

"আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাতঃ বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।"

অমল ধবল শরতের পেছনে পেছনে প্রকৃতিকে সোনার রঙে রাঙিয়ে বাংলার রূপময় মঞ্চে আবির্ভূত হয় হিমের চাদর গায়ে-মোড়ানো হেমন্ত। ধান কাটার ধুম পড়ে যায় মাঠে মাঠে। ধান কাটা শেষ হলে প্রকৃতিতে যেন ছড়িয়ে থাকে বৈরাগ্যের বিষণ্ণতা। ইতোমধ্যে অবশ্য মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করে দেয় শীতের সবজির কচি পাতা। ঘরে ঘরে তখন নবান্নের উৎসব। আবহমান বাংলার মানুষের কাছে এটিই সবচেয়ে সুখের সময়।

পিঠার গন্ধ পেয়েই যেন বাংলার প্রকৃতিতে হাজির হয় শীতের হিমবুড়ি। খেজুরের রসে বাঙালির পিঠা-উৎসব পূর্ণতা পায় এ সময়। শীতের কুয়াশায় ঢেকে যায় সকালের সূর্য। শীতের তীব্রতায় মানুষ জবুথবু হয়ে যায়, কাপড়ের ওপর কাপড় জড়িয়ে মানুষ শীত নিবারণের চেষ্টা চালায়। দরিদ্র মানুষেরা কাপড়ের অভাবে কষ্ট পায়। শীতের প্রকোপে গাছে গাছে চলে পাতা ঝরার পালা। গাছগুলো যেন নিজেদের মৃত ঘোষণা করে দেয়। তবে শীতকালে সবজির বিপুল সমারোহ ঘটে। গাঁদা, গোলাপ– এমনি সব বাহারি ফুলে নিষ্প্রাণ প্রকৃতিও রঙিন হয়ে ওঠে।

শীতের তীব্রতা কমতেই আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠে প্রকৃতি, মৃতবৎ গাছগুলোর নিষ্পত্র শাখাগুলো রাতারাতি পত্রপুষ্পে মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে। ঋতুমঞ্চে আগমন ঘটে মহারাজ বসন্তের। দখিনা মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে ফুষ্পের সৌরভ, অলিকুলের গুঞ্জরণে আর উদাস দুপুরে কোকিলের কুহুতানে মন মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। বসন্ত-প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ কবি তাই গেয়ে ওঠেন–

“ওগো দখিনা মলয়, আজি তব পরশনে,
কার কথা পড়ে মনে।
মধূপ হয়েছে আজি পাগল পারা
কুসুমে কুসুমে তাই জেগেছে সাড়া।”

উপসংহার

রূপের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ যেন কোনো এক রূপদক্ষ শিল্পীর আঁকা এক অসাধারণ শিল্প-প্রতিমা; শিল্পীর তুলির আঁচড়ে শিল্পীর মনোভূমির নির্যাস থেকে যেন গড়ে উঠেছে এই রূপময় বাংলাদেশ। তাই মুগ্ধ কবি বাংলার গর্বিত পরিচয় তুলে ধরেন এভাবে–

“এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।”

স্বদেশপ্রেম

ভূমিকা

মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ মানুষের সহজাত প্রবণতা। স্বদেশের ধূলিকণা গায়ে মেখে, স্বদেশের শস্য-দানায় শরীরের পুষ্টিসাধন করে, স্বদেশের প্রকৃতির শ্যামল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েই মানুষের জীবন। মায়ের কোলে মতোই দেশ মানুষের কাছে এক পরম নির্ভরতার স্থল, এক বরাভয় আশ্রয়। দেশ তাই মানুষেরর চেতনার অংশ; দেশের সঙ্গে মানুষের সমগ্র সত্তার সংযোগ। মানুষের চেতনায় নিরন্তর বয়ে যায় দেশপ্রেমের অনিঃশেষ ফল্গুধারা; দেশকে ভালবেসে মানুষ নিজেকে ধন্য করে, নিজেকে পূর্ণ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় দেশের প্রতি বাঙালির অনুরাগঃ

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালবেসে।”

স্বদেশপ্রেম কী

নিজের দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি, দেশের প্রকৃতির প্রতি বিমুগ্ধ ভালবাসা আর গভীর শ্রদ্ধাবোধই হলো স্বদেশপ্রেম। স্বদেশপ্রেম উৎসারিত হয় মানুষের আত্মার নিবিড় চৈতন্যবোধ থেকে। দেশের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা আর গৌরবের অনুভূতি তার অভিভূত মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। দেশপ্রেমীর মনে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি এত প্রগাঢ় হয় যে, স্বদেশের কোনো অবমাননা অথবা স্বদেশবাসীর দুঃখ-দৈন্য নিরসনে নিতান্ত হেলায় নিজের জীবন, ধন, মান সর্বস্ব উৎসর্গ

করে দিতে পারে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মানুষদের নিবেদিতপ্রাণ কর্মযজ্ঞেই গড়ে ওঠে একটি দেশের সমৃদ্ধির সৌধ; বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে দেশটির গৌরবময় অবস্থান।

দেশপ্রেমের উৎসবীজ

বিশ্বময় বিরাজমান প্রতিটি প্রাণিরই নিজের জন্মস্থান ও পরিবেশের প্রতি রয়েছে অন্তর্নিহিত টান। বনের পশুকে লোকালয়ে আনলে সে তার স্বাভাবিক জীবন হারায়, মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। নীড়ের প্রতি আসক্তি পাখির চিরায়ত। প্রাচুর্যময় ইমারতের চেয়ে খড়কুটোর দরিদ্র আবাসই তার কাছে শ্রেয়। পাখিকে নীড়চ্যুত করলে সে আর্তনাদ করে ওঠে। কোনো সুরক্ষিত আশ্রয়ের মোহে কখনোই বিবর ত্যাগ করে না মুষিক। তার মানে জন্মস্থানই সবার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, জন্মস্থানেই সবাই নিজেকে নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। অনুরূপভাবে, দেশ মানুষের কাছে এক সুবিশাল বাসগৃহস্বরূপ। নিজ আবাসের প্রতি নাড়ীর টানেই মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে দেশের প্রতি ভালবাসা।

দেশপ্রেমের স্বরূপ

স্বদেশের উপাদান দিয়েই তৈরি হয় মানবদেহের অণু-পরমাণু– অস্থি-মজ্জা, রক্ত-মাংস। দেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জৈব-মানসিক। এ কারণেই দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতায় সে অনুভব করে অঙ্গহানির যন্ত্রণা। স্বীয় দেশ দরিদ্র হলেও দেশপ্রেমী মানুষের কাছে দেশের মর্যাদা রাজরাণীর। দেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ ও আনুগত্যের কারণেই স্বদেশের সুখের দিনে মানুষ আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়, দেশের যে কোনো গৌরবে নিজে হয় গৌরবান্বিত; আবার দেশের কোনো দুর্যোগে সে গভীর বেদনা অনুভব করে, স্বদেশের স্বাধীনতা ও মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য আত্মত্যাগেও দ্বিধা করে না। স্বদেশপ্রেম দেশের মানুষকে নিজের সবকিছু উজাড় করে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

দেশপ্রেমিকের গুণাবলি

একজন দেশপ্রেমিক সবসময় স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তায় থাকে বিভোর, স্বদেশের মঙ্গল-সাধনে নিবেদিত। তার কাছে স্বার্থপরতা ও আত্মসুখ নিতান্তই তুচ্ছ। একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক দেশের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে, হাসিমুখে পান করে মৃত্যুর হলাহল। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশপ্রেমী জনতা, শত্রু নিধনের যজ্ঞে হাসতে হাসতে প্রাণ দেয় অকুতোভয় দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য যারা জীবন-পণ লড়াই করে তারা যেমন দেশপ্রেমিক; তারাও দেশপ্রেমিক, যারা স্বদেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনে নীরবে নিভৃতে কাজ করে যায়। কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, শ্রমজীবী মানুষ তাদের মেধা ও মননের চর্চায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে তোলে দেশের সমৃদ্ধির সোপান, বিশ্ব-সভায় নিশ্চিত করে দেশের জন্য গৌরবের আসন। এভাবেই দেশের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসার অভিপ্রকাশ ঘটে।

স্বদেশপ্রেমের উদাহরণ

স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ দেশপ্রেমের প্রেরণায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের আত্মদান মানবেতিহাসে দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির। দেশপ্রেমের কঠিন ব্রতে উত্তীর্ণ হয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি হয়ে উঠেছেন স্বদেশ ও মাতৃভাষাকে ভালবেসেই। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জগদীশ চন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, তীতুমীর, মাস্টার্দা সূর্যসেন– এমনি আরো বহু দেশপ্রেমিকের কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়েছে বাংলা মায়ের শ্যামল মুখ। উপমহাদেশে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, এ.পি.জে. আব্দুল কালাম প্রমুখ মনীষীগণ। ইতালির গ্যারিবল্ডি, চীনের সান ইয়াতসেন, মাওসেতুং, আয়ারল্যান্ডের ভেলোরা, তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার কিং, রাশিয়ার লেনিন, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত, দক্ষিণ আমেরিকার নেলসন ম্যান্ডেলা প্রমুখ ব্যক্তির অতুলনীয় দেশপ্রেম পৃথিবীর ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে।

জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

জন্মভূমি জননীর মতো। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে মায়ের শরীর থেকে রস নিয়ে যেমন একজন শিশু বেড়ে ওঠে, মায়ের অস্তিত্ব ছাড়া যেমন সন্তানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি দেশহীন মানুষের অস্তিত্বও কল্পনা করা অসম্ভব। জন্মভূমির আলো, বাতাস, খাদ্য, পানীয় সেবন করেই মানুষ বেঁচে থাকে, বড় হয়ে ওঠে। তাই দেশের সঙ্গে মানুষ আত্মিক বন্ধনে বাঁধা। সন্তানের ভালবাসায় মায়ের মুখের হাসি যেমন মুক্তো দানার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি দেশপ্রেমী মানুষের অপার ভালবাসায়, ত্যাগে, কর্মে দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়। দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাঁচে না, দেশ বাঁচে মানুষের ভালবাসায়। জন্মভূমির প্রতি মানুষের ঋণ অনুভব করতে হয়, ঋণের দায় থেকেই মানুষ দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, এ ঋণই দেশের উন্নয়নে ও সেবায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। দেশের মানুষ তাদের কর্মতৎপরতায় দেশকে যতটুকু সমৃদ্ধ করে, দেশ ততটুকুই এগোয়। মনে রাখতে হবে, দেশ সম্মানিত হলে এর মানুষও সমানভাবে সম্মানিত হয়। বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উচিত দেশপ্রেমের যে চেতনায় **১৯৭১**-এ আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছি, সেই একই চেতনায় শাণিত হয়ে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন, নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পরিহার করা। দেশের প্রতি গভীর আবেগ নিয়ে আমরা যদি দেশের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাজনীতির চর্চা করি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় নিবেদিত হই, দুর্নীতি পরিত্যাগ করে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করি, সন্ত্রাস-হত্যা-রাহাজানি বন্ধ করে দেশের উৎপাদন বাড়াতে আত্মনিয়োগ করি, বিদেশি পণ্যের প্রতি মোহ ত্যাগ করে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াই, দেশের প্রতি আনুগত্য বাড়িয়ে নাগরিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন পারি, তবেই দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা পূর্ণতা পাবে। অন্যথায় দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হবে মাত্র।

প্রবাসে দেশপ্রেমের উপলব্ধি

প্রবাসে মানুষ দেশের সঙ্গসুধা থেকে বঞ্চিত হয়। স্বজনবিহীন বিচ্ছিন্ন পরিবেশে স্বদেশের প্রতি মানুষের আবেগ যথার্থ পরিসর লাভ করে। প্রবাসে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে জন্মভূমির যথার্থ মূল্য। যেমনটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন প্রথম জীবনে জন্মভূমি-বৈরী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে অনুতপ্ত কবি এক অপার আবেগে জন্মভূমির বন্দনায় মেতে উঠেন :

"বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।"

প্রবাসে স্বদেশ হাতছানি দিয়ে ডাকে। দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে দেশের স্নেহময় সংস্পর্শে এলে মানুষের তৃষ্ণা-কাতর প্রাণের ওপর দিয়ে যেন গভীর শান্তিদায়ী অমৃতরসের ফোয়ারা বয়ে যায়।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের পারস্পরিক সম্পর্ক

সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তার উর্ধ্বে মানবতাবাদে নিহিত রয়েছে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের মূল। স্বদেশপ্রেমের ভ্রূণেই জন্ম নেয় বিশ্বপ্রেম। দেশ ও দেশের মানুষকে ভালো বাসতে বাসতেই একজন স্বদেশপ্রেমী মানুষ বিশ্বকে ভালবাসতে শেখে। দেশের প্রতি উৎসারিত ভালবাসা একসময় বিশ্বপ্রবাহে ধাবিত হয়; তখন একজন দেশপ্রেমী তার দেশের মধ্যেই পেয়ে যায় বিশ্বের মহাবার্তা। বাংলার কবি দেশকে ভালবেসেই হয়ে যান বিশ্বকবি, বাংলার কায়ায় দেখেন বিশ্বে ছায়া :

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

উগ্র দেশপ্রেম

দেশপ্রেম কখনো কখনো উদার প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে সঙ্কীর্ণতার পথে হাঁটে; তখনি জন্ম নেয় অতি-দেশপ্রেম, যার রূপ প্রমত্ত, পরিণতি ভয়ঙ্কর। উগ্র দেশপ্রেমের বিনাশী পরিচয় বিশ্ব পেয়েছে দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। জার্মানির হিটলার আর ইতালির মুসোলিনীর উগ্র দেশপ্রেমের বলি হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেশপ্রেম সবসময়ই শুভ, কল্যাণকর; কিন্তু উগ্র দেশপ্রেম কট্টর জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়, যা চিরকালই অকল্যাণের ও অশান্তির।

মানুষের ওপর স্বদেশপ্রেমের প্রভাব

স্বদেশপ্রেমের শেকড় মানুষের মনুষ্যত্বে। দেশপ্রেম মানুষের মন থেকে মুছে দেয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি, মানুষের মনে বয়ে আনে মহত্ত্ব। স্বদেশপ্রেমীর তপস্যা ত্যাগের; দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মন্ত্রে তার মন উজ্জীবিত। স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকদের ত্যাগের প্রভায় গৌরবোজ্জ্বল হয়েছে মানবেতিহাস। অনাদিকালের মানুষ ঐ মহাপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে আত্মত্যাগের দীক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অবিনাশী প্রেরণা।

উপসংহার

দেশপ্রেম পবিত্র ও কল্যাণকর। দেশপ্রেমীদের ত্যাগে আর দায়িত্ববোধেই একটি দেশ উন্নতির শিখরে আরোহণে সক্ষম হয়। দেশপ্রেমিকের ভাবনা জুড়ে থাকে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ। প্রতিটি মানুষেরই উচিত দেশকে ভালবাসা ও তার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, দেশের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে অন্য কোনো দেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, মানবতা যেন কোনোভাবেই লজ্জিত না হয়। এটি নিশ্চিত হলেই দেশপ্রেম সর্বাংশে কল্যাণদায়ী হবে।

বাংলা নববর্ষ

সূচনা

সময়ের নিয়মে ‘পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি’র অন্তিম প্রহরে দীপ্ত সূর্যোদয় ঘোষণা করে আরেকটি নতুন বছরের আগমনী বার্তা, যে বার্তা বহন করে অপার সম্ভাবনা, অনেক স্বপ্ন, অফুরন্ত আনন্দ। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে মানুষ পেরিয়ে যেতে চায় তার পুরনো হতাশা, ব্যর্থতা আর অপ্রাপ্তির বেদনাকে; প্রাপ্তির আনন্দে জীবনকে পূর্ণ করার স্বপ্ন বুনে নতুন করে। সাফল্যের দোরগোড়ায় নিজেকে পৌছানোর উদ্যম নিয়ে শুরু করে নতুন পথচলা। উৎসবে উৎসবে মানুষ বরণ করে নেয় এই মাহেন্দ্রক্ষণটিকে। দেশে দেশে নতুন বছরের এই আড়ম্বরময় বরণ হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য।

দেশে দেশে নববর্ষ

সময়ের ফ্রেমে বন্দি মানুষেরা সময়ের হিসাব মেনেই তার স্বপ্ন বুনে, জীবন সাজায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবম্বিধ বহু প্রয়োজনে মানুষ সময়কে দিন, সপ্তাহ, মাস, বছরে বিভাজন করে। আর এর জন্য মানুষ নির্ভর করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির ওপর। এই নির্ভরতা কখনো সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ, আবার কখনো পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের প্রদক্ষিণের সময়সীমার ওপর। সৌর বা চান্দ্র যা-ই হোক মানুষ এই সময়ের বৃত্তে নিজের কর্মপরিকল্পনা সাজায় এবং তা বাস্তবায়নে প্রবৃত্ত হয়। কখনো স্বপ্ন পূরণের আনন্দে হয় আত্মহারা; আবার কখনো মূহ্যমান হয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়। তবে মানুষ কখনো চূড়ান্তভাবে পরাভূত হয় না; নতুন বছরের আগমনে অতীতের সকল গ্লানি মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে শিরদারা সোজা করে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। নতুন বছর মানুষের মনে সৃষ্টি করে নতুন উদ্দীপনা। তাই দেশে দেশে নববর্ষ হয়ে ওঠেছে উৎসবের উপলক্ষ। তবে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। বছরের প্রারম্ভিক সময়টি কোথাও নির্ধারিত হয়েছে ধর্মীয় কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে, আবার কোথাও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক বিবেচনায়। মুসলমান ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় নববর্ষ উদ্‌যাপন করে নিজ নিজ ধর্মের ধর্মপ্রবর্তকের ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যের আলোকে। আবার জাতি হিসেবে বাঙালি, চিনা, জাপানি, ইরানি– এ সকল জাতি পালন করে নিজ নিজ নববর্ষ উৎসব। যে কোন নামে, যে কোন সময়েই উদ্‌যাপন করা হোক না কেন, নববর্ষ অনুষ্ঠানের অভিন্ন চারিত্র্য হলো এর শুভবোধ, সর্বজনীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা।

বাঙালির জীবনে নববর্ষ

এক সর্বজনীন কল্যাণ চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে বাঙালি মেতে ওঠে নববর্ষের বর্ণাঢ্য আয়োজনে। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের সকল সীমারেখা মুছে দিয়ে বাঙালি এক অভিন্ন আত্মায় মিলিত হয়, নির্মল আনন্দে চিত্তকে করে পরিপ্লাবিত। এ দিনে চিত্তের দীনতা, বিত্তের উনতা, জীবনের হতাশা আর রিক্ততাকে পেছনে ফেলে প্রতিটি বাঙালি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়। প্রাণের উচ্ছ্বাসে সাজায় ঘরদোর, বর্ণিল পোশাকে সাজায় নিজেকে; অকৃত্রিম সহৃদয়তায় পরস্পরকে বাঁধে আলিঙ্গনে, শুভেচ্ছায় সিক্ত করে পরস্পরকে।

নববর্ষের উৎসবাদি

বাঙালি জীবনে উৎসবের বান ডেকে আসে নববর্ষ; বিচিত্র উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে এদেশের প্রতিটি শহর- বন্দর- গ্রামের আনাচ-কানাচ। নির্মল আনন্দ দানের পাশাপাশি উৎসবগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বও অপরিসীম। বছরের হিসাব-নিকাশ, চাষাবাদ, খাজনা আদায়, বিয়ের তারিখ ঠিক করা – এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাঙালি গ্রহণ করে বাংলা বর্ষপঞ্জি মেনে; আর তা করে উৎসবের আমেজে। নববর্ষের উৎসবগুলোর মধ্যে পুণ্যাহ, হালখাতা, বৈশাখি মেলা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) পুণ্যাহ : পুণ্যাহ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো পুণ্য কাজের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন। কিন্তু বাংলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে নতুন বছরে প্রজাদের কাছ থেকে জমিদারদের খাজনা আদায়ের শুরুর দিন। এ দিনে প্রজারা ভাল পোশাক পরে জমিদারদের কাছারি বাড়িতে খাজনা দিতে যেতেন; আর জমিদারগণ মিষ্টান্ন ও পানসুপারি দিয়ে প্রজাদের আপ্যায়ন করতেন ও তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। এভাবে জমিদার-প্রজার মধ্যে পারস্পরিক সহজ ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হতো। জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেরও বিলোপ ঘটেছে।

(খ) হালখাতা : হালখাতা নববর্ষের এক বিশেষ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। বছরের প্রথম দিনটিতে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানে ক্রেতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের আমন্ত্রণ জানায় এবং মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করে। ক্রেতারা তাদের বকেয়া পরিশোধ করে পুরনো বছরের লেনদেন সম্পন্ন করে এবং নতুনভাবে লেনদেন শুরু করে। এভাবে ব্যবসায়ী ও খদ্দেরের মধ্যে গড়ে ওঠে এক মধুর সম্পর্ক।

(গ) বৈশাখি মেলা : বৈশাখি মেলা এ দেশের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এ মেলায় দেশীয় কুটির শিল্পজাত পণ্যের সমারোহ ঘটে। এখানে দেশীয় খাদ্য আর শিশুদের মন-ভোলানো পণ্য ক্রয়ের ধুম পড়ে যায়। গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও গ্রামের মানুষেরা মেলা থেকে সংগ্রহ করে। ছেলে, যুবা, বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে মেলার প্রাঙ্গন। শহরেও মেলা এসেছে বর্ণাঢ্য রূপ নিয়ে। মেলাগুলোতে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী ও বিক্রয় হয়। এ মেলার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বই মেলা শহরে নববর্ষ উদ্‌যাপনের নতুন অনুষঙ্গ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেচে গেয়ে শহরের মানুষেরা নববর্ষকে বরণ করে নেয়। উৎসবকে প্রাণবন্ত করতে অতিথিপরায়ণ বাঙালি এ দিনে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানায়। মুখরোচক খাবার আর গল্পে-আড্ডায় উৎসবমুখর পরিবেশে তারা কাটিয়ে দেয় দিনটি।

নববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচি

বাংলাদেশ সরকার নববর্ষকে সর্বজনীন উৎসব হিসেবে বিবেচনা করে এবং দিবসটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করে। দিবসটিকে উৎসবের রঙে রাঙানোর জন্য সরকারি কর্মচারীদেরকে নববর্ষ ভাতা প্রদান করছে। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, নজরুল ইনস্টিটিউট, ছায়ানট, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি– এসব প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এক বিশেষ ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বকুলতলার প্রভাতি অনুষ্ঠান ও মঙ্গল শোভাযাত্রা বাংলা নববর্ষ বরণে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর নববর্ষ বরণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী বর্ণাঢ্য আয়োজনে চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। এটি পাহাড়িদের সবচেয়ে বড় উৎসব। এ উৎসবকে চাকমারা 'বিজু', মারমারা 'সাংগ্রাই', ত্রিপুরারা 'বৈসুক' ইত্যাদি নামে আখ্যা দিলেও গোটা পাহাড়ি অঞ্চলে এটি ' বৈসাবি' নামে অভিহিত।

বাঙালি জীবনে নববর্ষের তাৎপর্য

বাংলাদেশে বহু জাতি-গোষ্ঠীর লোকের বসবাস। প্রতিটি সম্প্রদায়ের রয়েছে নিজ নিজ ধর্ম ও তার উৎসব। তবে নিজ নিজ ধর্মীয় পরিচয় ছাপিয়ে এ দেশের মানুষের সর্বজনীন পরিচয় বাঙালি হিসেবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষই পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। পহেলা বৈশাখ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির সর্বজনীন উৎসব। এ উৎসবের মাধ্যমেই এ

দেশের সকল মানুষ সকল ভেদাভেদ ভুলে এক অখণ্ড বাঙালি চেতনায় উজ্জীবিত হয়। ফলে জাতিগত ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় হয়; আমাদের জাতীয় চেতনা হয় মজবুত।

উপসংহার

নববর্ষ বাঙালির জীবনে পরম আনন্দের উৎসব। এই উৎসব কেবল আমাদের আনন্দ জোগায় না; আমাদের মধ্যে সমৃদ্ধ আগামির স্বপ্ন ও প্রেরণা জাগায়। নববর্ষ সকল বাঙালির মনে জাতীয় চেতনার বীজ বোনে। নববর্ষের শুভক্ষণে বাঙালি জাতি এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার শপথে বলীয়ান হয়। চির অম্ম্লান হোক বাংলা নববর্ষ, নতুনের চেতনা নিয়ে বরাভয় হাতে বাঙালির জীবনে বার বার ফিরে আসুক বাংলা নববর্ষ - এই হোক আমাদের প্রার্থনা।

মানব কল্যাণে বিজ্ঞান /আধুনিক জীবন ও বিজ্ঞান

ভূমিকা

বিজ্ঞানের বেদীমূলে প্রোথিত মানবসভ্যতার শেকড়। যেদিন মানুষ আগুন আবিষ্কার ও তার ব্যবহারে দেখিয়েছে পারঙ্গমতা সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানুষ তার জীবনকে সহজ করার জন্য হাতের বদলে হাতিয়ার ব্যবহারে সফল হয়েছে বিজ্ঞানের দৌলতে। এরপর বহু যুগ-যুগান্তরের অজস্র মানুষের স্বপ্ন ও সাধনার সরণি বেয়ে বিজ্ঞান আজ সর্বজয়ী রূপে আবির্ভূত। মানবসভ্যতা আজ বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ছাড়া বর্তমান দুনিয়ার একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। বিজ্ঞানের কল্যাণস্পর্শে জীবনের সর্বক্ষেত্র হয়েছে সহজ ও আনন্দমুখর; মানবসভ্যতা হয়েছে সমৃদ্ধ।

বিজ্ঞানহীন যুগ

বিজ্ঞানহীন যুগে ছিল গুহাবাসী; পশুর সঙ্গে ছিল না কোনো প্রভেদ। প্রকৃতি ও পরিবেশ ছিল মানুষের জন্য চরম বৈরী। ভয়ানক অসহায় মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়েছে চরম বৈরী শক্তির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে। জান্তব শক্তির সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ে কখনো বিজয়ী হয়েছে মানুষ, শত্রুর কাচা-মাংসে করেছে উদরপূর্তি, আবার কখনো নিজেই হয়েছে হিংস্র প্রাণীর খাবার। বৈরীশক্তির প্রতিনিয়ত লড়াই থেকে মানুষ অর্জন করেছে অভিজ্ঞতা, কালক্রমে সেই অভিজ্ঞতা পরিণত হয়েছে জ্ঞানে; আর জ্ঞান বিশেষায়িত হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে বিজ্ঞানে। কোনোমতে বেঁচে থাকার আদিম লড়াইয়ে মানুষের কাছে সুখের পরশ ছিল সুদূর পরাহত। বিজ্ঞান মানুষের অসহায়ত্বে জুগিয়েছে দুর্বার শক্তি, সুখহীন জীবনে বইয়ে দিয়েছে সুখের ফোয়ারা।

সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের দান

মানবজীবনে বিজ্ঞানের দান অপার ও বিস্ময়কর। আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিজ্ঞানের নানা উপকরণের সঙ্গে লগ্ন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের অনিবার্য প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনে ও সমাজে; ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনায়ন। গৃহে বা বাইরে, কর্মস্থলে বা বিনোদন কেন্দ্রে, পথে বা মাঠে সর্বত্র বিজ্ঞান আমাদের ছায়াসঙ্গী। বিজ্ঞানের পরিচর্যায় আমাদের জীবন হয়েছে সহজ, অনায়াস ও সুন্দর। বৈদ্যুতিক বাতিতে আমাদের ঘর যে আলোময় আর বৈদ্যুতিক পাখার ঘূর্ণনে ঘর যে শীতল হয়ে ওঠে তাতে বিজ্ঞানের দান শতভাগ। এভাবে বিজ্ঞানের কল্যাণে বেতার ও টিভি যোগে জেনে নিতে পারি দেশ-বিদেশের হালচালের খবর; টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে সেরে নিতে পারি দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা কর্ম-সম্পর্কিত মানুষের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষার কাজটি। কম্পিউটারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কম্পোজ হচ্ছে অনায়াসে; আর তা সংরক্ষিত হচ্ছে অত্যন্ত নির্ভরতার সঙ্গে। প্রয়োজনমতো এ সকল তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে আদান-প্রদান করাও সম্ভব হচ্ছে অতি সহজে। জল, স্থল ও আকাশপথে অনায়াসে ও দ্রুততার সঙ্গে চলাচল ও মালামাল পরিবহন সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের কারণে। বিজ্ঞান আমাদের নিস্তরঙ্গ ও স্থবির জীবনে এনেছে গতি; বিজ্ঞানের সহযোগে আমাদের জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য।

প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান

প্রভাতের শয্যা ত্যাগ হতে নিশীথের শয্যা গ্রহণ পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বিজ্ঞানের সুরে বাঁধা। বেঁধে দেওয়া সময়ে এলার্ম ঘড়ির ছন্দময় ঝংকারে যথারীতি আমাদের ঘুম ভাঙে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা যে টয়লেটটিতে

প্রবেশ করি তা বিজ্ঞানের পরিচর্যায় সাজানো-গোছানো পরিপাটি। বিজ্ঞানের বদৌলতে প্রয়োজন অনুসারে ঠাণ্ডা বা গরম পানির প্রবাহ আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। দাঁত মাজার ব্রাশ আর পেস্ট বিজ্ঞানেরই দান। গ্যাসের চুলায় বা ইলেকট্রিক হিটারে তৈরি হয় গরম চা; ফ্রিজে সংরক্ষিত নাস্তা ওভেনের কল্যাণে অতি সহজেই খাবার উপযোগী হয়ে ওঠে। বাজারে প্রতিদিন দৌড়াতে হয় না; ফ্রিজেই সংরক্ষণ করা যায় গৃহের প্রয়োজনীয় খাদ্য সম্ভার। বিজ্ঞানের দৌলতে ছাপাখানা থেকে হাজারো সংবাদ গায়ে মেখে প্রতিদিন দরজার নিচ দিয়ে ঢুকে সংবাদপত্র। ইস্ত্রি করা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি জামায় সেজে কর্মস্থলের দিকে যাত্রা করতেই দরজার সামনে লিফট উপস্থিত। লিফট থেকে নামতেই ব্যক্তিগত মোটর গাড়ি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। যাদের ব্যক্তিগত গাড়ি নেই, তাদের জন্য আছে বাস, ট্যাক্সি, ট্রেন, রিকসা ইত্যাদি বাহন। পথ শেষে ঝলমলে আলোয় স্বাগত জানায় কর্মক্ষেত্র; সেটিও আবার বিজ্ঞানের বিচিত্র উপচারে সাজানো। টাইপরাইটার ও কম্পিউটারে টাইপ হয় প্রয়োজনীয় ফাইল ও চিঠিপত্র এবং কম্পিউটারের সাহায্যে রক্ষিত হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। কর্মব্যস্ত অফিস শেষে ছুটির পর বিনোদনের জন্য রয়েছে সিনেমা, ভিসিআর, স্যাটেলাইট টিভি ইত্যাদি। ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে আরামের বিছানা। ঘুমকে নির্বিঘ্ন করার জন্য আছে শীততাপ যন্ত্র, নিদেনপক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা। এভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের গাঁটছড়া বাঁধা।

শুধু শহুরে জীবন নয়, গ্রামীণ জীবনও বিজ্ঞানের ছন্দে বাঁধা। নাগরিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রামের দিকেও প্রসারিত। বৈদ্যুতিক বাতিতে গ্রামের ঘরগুলো উজ্জ্বল, মোবাইল ফোন সকলের হাতে হাতে, স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলো আজ গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে গ্রামীণ মানুষের হাতের মুঠোয় আজ পৃথিবীর তথ্যবিশ্ব। মান্ধাতার আমলের কৃষিব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কৃষক জমিচাষে গরুর হালের বদলে ব্যবহার করছে ট্রাক্টর, আবহাওয়া নির্ভরতা কমিয়ে উন্নত সেচব্যবস্থার আশ্রয় নিচ্ছে, উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করছে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে অধিক ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করছে। এসবই সম্ভব হচ্ছে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে। বিজ্ঞানের বদৌলতে শহর-গ্রামের ব্যবধান ও দূরত্ব তুলনামূলকভাবে কমে গেছে।

বিচিত্র ক্ষেত্রে বিজ্ঞান

জগৎ ও জীবনের এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটেনি। খনির অন্ধকারে বিজ্ঞান আলো ফেলেছে, আকাশে উড়িয়েছে তার বিজয় নিশান, মহাশূন্যে পাঠিয়েছে পৃথিবীর দূত। বিজ্ঞানের কল্যাণে দূরের নক্ষত্রলোকের খবর পেয়েছে গ্রহলোকের মানুষ। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ উদ্দাম নদী স্রোতকে বশীভূত করে নিয়ে গেছে উষর মরু-প্রান্তরে, মরুর পাথুরে বুকে জাগিয়েছে প্রাণের স্পন্দন। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে বাষ্পীয় শক্তি মানুষের বশীভূত, পারমাণবিক শক্তি মুঠোয় বন্দী, আকাশের বিদ্যুৎ বাতির ভেতরে প্রশান্ত। বিজ্ঞানের বদৌলতে স্থল পথে ছুটছে ট্রেন, মোটর; গভীর সমুদ্রে ঢেউয়ের বুক ভাঙে জাহাজ; আকাশ তোলপাড় করে উড়ে চলে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান; অসীম মহাশূন্যে পাড়ি দেয় ছোট কোনো নভোযান। কারখানায় তৈরি হচ্ছে জীবনের জন্য প্রয়োজনের আর উপভোগের বিচিত্র সামগ্রী, বসবাসের জন্য তৈরি হচ্ছে হরেক রকমের দালান। ঘরের ভেতরে রান্না করার চুলা, মশলা গুঁড়ো করার গ্রাইন্ডার, মাছ-মাংস-সবজি কাটা ও প্রক্রিয়াকরণের বিচিত্র উপকরণ, রাইস কুকার, খাবার সংরক্ষণের ফ্রিজ, খাবার গরম করার ওভেন, কাপড় ধোয়ার মেশিন, ঘর শীতলীকরণের এসি– জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যদানকারী সকল সামগ্রীই আমাদের জন্য বিজ্ঞানের উপহার। বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এসেছে বিপ্লব। কলেরা, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, বসন্তের মতো যেসব রোগ মহামারীরূপে জনপদের পর জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিত সেসব এখন মামুলি রোগে পরিণত হচ্ছে। টীকা আবিষ্কারের মাধ্যমে মারাত্মক সব রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে; অনেক রোগের মৃত্যুঘণ্টা ঘোষণা করেছে বিজ্ঞান। নানা ধরনের সূক্ষ্ম ও জটিল অপারেশন হচ্ছে অহরহ। বাইপাস সার্জারি আর হৃৎপিণ্ড পরিবর্তন এখন আর যাদু নয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয় আর অস্ত্রোপচারের কাজ অনায়াসে সাধিত হচ্ছে। মরণঘাতী ক্যান্সারের উন্নত চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়েছে, এইডস নিরাময়ের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা। কৃষি ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কোনো প্রকার হাতের স্পর্শ ছাড়াই যান্ত্রিক কলাকৌশল ব্যবহার করে জমি তৈরি থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কাজ অনায়াসে সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞান যোগাযোগ ব্যবস্থায় এনেছে বিপ্লব। জল-স্থল-আকাশ পথের দ্রুতগতির বাহনের পাশাপাশি টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার ইত্যাদি তৈরি করে বিশ্বকে পুরেছে হাতের মুঠোয়। কম্পিউটার আর ইন্টারনেটের বদৌলতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত আজ কম্পিউটারের সঙ্গে হাতের আঙুলের

স্পর্শের দূরত্বে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে শিক্ষার্থীর শিক্ষাঙ্গন আজ বিশ্বময় বিস্তৃত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই শিক্ষক লেকচার দিতে পারেন, শিক্ষার্থী যে কোনো বই অতি সহজেই সংগ্রহ করে নিতে পারে ইন্টারনেটের সহযোগিতায়, গোগল সার্চ দিলেই শিক্ষার্থীর সামনে উন্মোচিত হয় জ্ঞানের অপার দিগন্ত। পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীকে হাজির হতে হয় না, ঘরে বসেই অংশগ্রহণ করতে পারে পৃথিবীর যে কোনো দেশের পরীক্ষায়। প্রযুক্তির ব্যবহারে অফিসের কর্ম-পরিবেশ হয়েছে উন্নত, কাজে এসেছে গতি এবং নিপুণতা। ব্যবসা-বাণিজ্যও আজ প্রযুক্তি-নির্ভর, সকল প্রকার হিসাব-নিকাশ ও লেন-দেনের কাজ কম্পিউটার আর অনলাইনেই সম্পন্ন হচ্ছে। সারাদিনের কর্ম-ক্লান্ত দেহ ও মনের জন্য বিনোদন প্রয়োজন– তারও ব্যবস্থা করে রেখেছে বিজ্ঞান। সিনেমা, টেলিভিশন হাতের নাগালেই। ডিশ-এন্টেনার সহযোগে হাতের রিমোটেই ঘুরে তামাম দুনিয়ার বিনোদন জগৎ। এসবই হলো বিজ্ঞানের ম্যাজিক।

বিজ্ঞানের অভিশপ্ত দিক

বিজ্ঞানের অপরিসীম কল্যাণকর দিকের বিপরীতেই লুকিয়ে আছে এর ভয়ংকর অন্ধকার দিক। বিজ্ঞানের বদৌলতে পৃথিবীর ভাণ্ডারে জমা হয়েছে মারাত্মকসব মারণাস্ত্র। শুধু একটি পারমাণবিক বোমার আঘাতে মুহূর্তেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে হাজার বছরে গড়ে ওঠা একটি সমৃদ্ধ জনপদ, নির্বিচারে নিহত হতে পারে হাজার হাজার মানুষ। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা, নাগাসাকিতে বিজ্ঞানের মানববিধ্বংসী তাণ্ডব বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্য বিশেষত ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়ায় যে মানবতা-বিরোধী তাণ্ডব চলছে তা বিজ্ঞানের কদর্যতম দিকটিকেই আমাদের সামনে উন্মোচন করে। তবে মনে রাখতে হবে, এর দায় বিজ্ঞানের নয়, কিছু সংখ্যক মানুষের সীমাহীন লোভই এর জন্য দায়ী। মানুষের মধ্যে শুভবোধের উদয় হলেই বিজ্ঞান হবে মানুষের জন্য অপরিসীম কল্যাণের দূত।

উপসংহার

বিজ্ঞানের অভিযান আজ সর্বত্র; জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জয়ে এর সীমাহীন উদ্দীপনা। পৃথিবীর বুকে মানুষের রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিজ্ঞানের বদৌলতে, বিজ্ঞানের হাত ধরেই মানুষ জয় করতে চায় দুর্জয়কে। মনে রাখতে বিজ্ঞান স্বয়ংক্রিয় কিছু নয়, পুরোটাই মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপার; বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা গূঢ়-রহস্য উদ্ঘাটনের মানবিক প্রয়াস। বিজ্ঞানের বিশ্বে নিজেকে বিজ্ঞান-মনস্ক হতে হবে, বিজ্ঞানের প্রতি ও বিজ্ঞানের ব্যবহারে সদর্থক হতে হবে। তবেই বিজ্ঞান হবে পরিপূর্ণরূপে মানুষের।

অনুসারী রচনা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান/ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব/ডিজিটাল বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দবন্ধ সম্ভবত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপরেখা ও সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন রয়েছে এ শব্দবন্ধে। আধুনিক যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ; সমৃদ্ধির শিখরে অধিষ্ঠিত দেশগুলোর সাফল্যের মৌলভিত্তি হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক সাফল্য। একুশ শতকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবাত্মক বিকাশ ঘটানোর বিকল্প নেই। জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ডিজিটালাইজ্‌ড, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য এদেশের মানুষকে হতে হবে অনেক বেশি প্রত্যয়ী, পাড়ি দিতে হবে শ্রমসাধ্য দীর্ঘ পথ। গন্তব্য কষ্টসাধ্য হলেও দুর্গম নয়।

তথ্যপ্রযুক্তি কী

তথ্য শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো যথার্থ বা সঠিক সংবাদ। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমগ্র মানুষের বিচিত্র চিন্তা, পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতা বর্তমান উৎকর্ষতা পেয়েছে। যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের পটভূমিতে বর্তমান মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞানভান্ডারের প্রতিটি উপাদানই হলো এক একটি তথ্য। 'জ্ঞানই শক্তি' ভিক্টোরিয় যুগের এই শ্লোগান বদলে গিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় শ্লোগান দাঁড়িয়েছে 'তথ্যই শক্তি'। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা যে

জাতি তথ্যশক্তিতে যত বেশি সমৃদ্ধ, সে ব্যক্তি বা সে জাতি তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। আর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বিত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনাই হলো তথ্যপ্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলি কমিউনিকেশন, ডাটাবেস উন্নয়ন, বিনোদন, তথ্যভাণ্ডার, নেটওয়ার্ক, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, মুদ্রণ ও রিপ্রোগ্রাফিক, ডিশ এন্টেনা ইত্যাদি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দুই ভাগে বিভক্ত– এক. তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি, দুই. যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ করে ব্যবহার উপযোগী করা হয় আর যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সে তথ্য বিনিময় করা হয়।

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমেই বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব। বিশ্বের যে কোন নতুন একটি আবিষ্কার, নতুন একটি চিন্তা, নতুন কোন তথ্য তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। তথ্যপ্রযুক্তি মুছে দিয়েছে দেশকালের সীমারেখা। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন উদ্ভাবনের আমরা সমান অংশীদার। আন্তর্জালের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই সম্পন্ন করতে পারি গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম; মুহূর্তেই লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে যে কোন ধরনের তথ্য। অফিসের কাজকর্ম করার জন্য আজ অফিসে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় সমুদ্রতীরে অবকাশ যাপনকালেও অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে নেওয়া যায় অনায়াসে।

আমাদের জীবনে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উৎস তথ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আনি, সঠিকভাবে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করি, নিত্য-নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করি, জীবন ও সভ্যতাকে উৎকর্ষমণ্ডিত করি। তথ্যের অবাধপ্রবাহ মানুষের কর্মযজ্ঞকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত বাংলাদেশ সমৃদ্ধি অর্জনে তৎপর। এদেশের দারিদ্র্যের বৃত্ত ভেঙে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জনের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারকে এড়িয়ে বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। বাংলাদেশের সকল কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও দ্রুত উন্নতির জন্য সর্বক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই ২০২০ সালের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসার এক মহাপরিকল্পনা হাতে নেয় বর্তমান সরকার। পরিকল্পনা অনুসারে দেশটির সার্বিক কর্মকাণ্ড যেমন- সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, ব্যাংক-বীমা, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, যোগাযোগসহ প্রতিটি সেক্টর পরিচালিত হবে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার দিয়ে। সরকার সর্বাংশে প্রযুক্তি-নির্ভর ভবিষতের সৃমদ্ধ বাংলাদেশের নাম দিয়েছেন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল কর্মকাণ্ড প্রযুক্তির ব্যবহারে পরিচালিত হলেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন পূর্ণতা পাবে।

ডিজিটালাইজেশনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশকে ডিজিটালাইজ্‌ড রাষ্ট্রে পরিণত করতে তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পদক্ষেপসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. সরকার প্রায় পুরো বাংলাদেশকে ডিজিটাল টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতায় এনেছে।

২. তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য ঢাকার কাওরান বাজারে অত্যাধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি 'আইসিটি ইনকিউবেটর' স্থাপন করেছে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নে গাজীপুরের কালিয়াকৈরেও 'হাইটেক পার্ক' প্রতিষ্ঠা করেছে।

৩. ডিজিটাল অর্থনীতিতে পুঁজির চেয়েও বেশি প্রয়োজন সৃজনশীলতা। সৃজনশীল মেধা না থাকলে উদ্যোক্তা হওয়া কঠিন। প্রযুক্তি-দক্ষ সৃজনশীল জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার 'কম্পিউটার ল্যাবরেটরি' গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীদের জন্য 'আইসিটি ইন্টার্নশীপ' কোর্স চালু করেছে।

৪. বাংলাদেশে উৎপাদিত তথ্য-প্রযুক্তি ও সফ্টওয়্যার পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের জন্য 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার' স্থাপন করেছে।

৫. কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি পণ্যকে করমুক্ত করা হয়েছে। এসব পণ্য ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে।

৬. দেশের ৪ হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। স্কাইপি, পল্লি বিদ্যুতের বিল, জমির পর্চা– এসব সেবা এ সেন্টার থেকে পাওয়া যায়।

দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে তরুণ প্রজন্মকে নবীন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে সরকার। আর উদ্যোক্তা তৈরির জন্য তথ্যপ্রযুক্তি হলো সম্ভাবনাময় খাতগুলোর একটি। সরকারের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানির পরিমাণ ৫০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া; এবং এ খাতে বিপুল উদ্যোক্তা তৈরি করার লক্ষ্যে সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের জন্য তিন ধরনের প্রণোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য '১০-১০-১০' পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বছরে ১০ মিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি করতে পারে এমন ১০টি প্রতিষ্ঠান; অন্তত ১ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি করতে পারে এমন আরও ১০টি প্রতিষ্ঠান এবং স্টার্টআপ বা নবীন সৃজনশীল ১০টি প্রতিষ্ঠানকে কাঙ্ক্ষিত সক্ষমতা অর্জনের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। সরকারের এ সকল মেগা প্রজেক্ট ইতোমধ্যে ফলও দিতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি-নির্ভর যে কয়টি নতুন উদ্যোগকে সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা হচ্ছে সেগুলোর একটি বাংলাদেশিদের উদ্যোগ ব্যাকপ্যাক। এ প্রতিষ্ঠানটি বাহকের মাধ্যমে এক দেশ থেকে মালামাল হস্তান্তরের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে।

দেশের কর্মকাণ্ডে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে লেগেছে তথ্য-প্রযুক্তির ছোঁয়া, দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলেছে ডিজিটালাইজেশন। দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান– ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, ট্রেজারি অফিস পরিপূর্ণরূপে প্রযুক্তিতায়িত। মন্ত্রণালয়সহ সকল অফিসের কার্যক্রম এখন তথ্য-প্রযুক্তির আওতাধীন। প্রযুক্তির কল্যাণে দাপ্তরিক কাজের গতি ও মান অনেক বেড়েছে। কোনো কাজের জন্য এখন আর সশরীরে অফিসে হাজির হতে হয় না। ইন্টারনেটের সহযোগিতায় অফিসের কোনো তথ্য মুহূর্তেই বিনিময় করা যাচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে অফিসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় অফিসের কাজ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতো, ঘুষ-দুর্নীতির অবৈধ লেন-দেন বন্ধ হতো, সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতো। বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনার পথেই আছে।

তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষকের লেকচার ভিডিও করে প্রজেক্টরের মাধ্যমে সাদা পর্দায় প্রদর্শন করে সম্পন্ন করা যাচ্ছে জরুরি ক্লাস। কম্পিউটারের সঙ্গে ইন্টারনেটের সংযোগে ঘরে বসে শিক্ষাগ্রহণ এখন খুবই সুলভ। বাংলাদেশে এখন দূর-শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ বই ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া যাচ্ছে অনায়াসে। তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারে বাংলাদেশের চিকিৎসা-ব্যবস্থা আমূল বদলে গেছে। জটিল রোগ নির্ণয় ও অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হচ্ছে বাংলাদেশে। যে কোনো রোগের উন্নত চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সুলভ। ডাক্তারের সামনে সশরীরে হাজির না হয়েও প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো রোগী কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে শহরের নামীদামী ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারছে।

তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে আমাদের দেশের মান্ধাতার আমলের কৃষিতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ ও উন্নত পরিবেশ-বান্ধব সার উৎপাদনে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের কৃষি-বিজ্ঞানীরা সহজেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষি-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছেন, কৃষির সর্ব-সাম্প্রতিক বিভিন্ন আবিষ্কার সম্পর্কে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে পারছেন। কৃষকরাও অতি সহজে উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে ধারণা পাচ্ছেন; এমনকি উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও পয়েন্টে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে জননিরাপত্তার বিষয়ে তদারকি চালু হয়েছে। এতে অপরাধপ্রবণতা কমবে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশের কারণে বাংলাদেশে এখন অন-লাইনে কেনাবেচা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে মানুষ ঘরে বসেই দ্রব্য পছন্দ করছে এবং দ্রব্যের মূল্যও পরিশোধ করতে পারছে। তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থায় বিপ্লব আসবে সন্দেহ নেই।

দেশে দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট। উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এখন কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার শতভাগ সম্ভব হলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশৃঙ্খল এই বিভাগে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা যাবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ সম্পদের অপ্রতুলতা নয়; দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং জনগণের অশিক্ষা ও অসচেতনতা। তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা গেলে এবং তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা গেলে বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে এক সোনালি ভবিষ্যৎ। তাই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' অতিপ্রাকৃত কল্পনা নয়, ভবিষ্যতের সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

সবার জন্য বিদ্যুৎ

ভূমিকা

বিজ্ঞানের যে আবিষ্কারটি গোটা মানব সভ্যতাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে, সেটি নিঃসন্দেহে বিদ্যুৎ। যন্ত্রশিল্পের প্রাণশক্তির অবিকল্প উৎস হলো বিদ্যুৎ। আর কে না জানে যে, যন্ত্রশিল্পে যে দেশ যত বেশি সমৃদ্ধ, উন্নতির মানদণ্ডে সে দেশ তত বেশি অগ্রসর। অনিবার্য সত্য এই, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির প্রধান শর্তই হলো বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় স্বনির্ভরতা অর্জন। রূপকল্প অনুসারে, ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুৎ

কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রাণশক্তি ও মুখ্য উপকরণ হলো জ্বালানি। যন্ত্রশিল্পে জ্বালানি হিসেবে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি ব্যবহৃত হলেও উন্নততর ও সহজে ব্যবহার্য জ্বালানি হিসেবে বিদ্যুতের কোন তুলনা নেই। অবশ্য বিদ্যুৎ পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদির মতো প্রাথমিক জ্বালানি নয়; উপর্যুক্ত জ্বালানিসমূহকে যন্ত্রশিল্পে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্বিতীয় স্তরের জ্বালানি হলো বিদ্যুৎ । তবে এর ব্যবহার সহজ ও বহুমাত্রিক – বিদ্যুৎ শক্তিকে খুব সহজেই আলোকশক্তি, তাপশক্তি, শব্দশক্তি, চৌম্বকশক্তি প্রভৃতিতে রূপান্তর করা সম্ভব। যন্ত্রশিল্পের সক্রিয়তা তো শক্তির এই রূপান্তরেই। বিদ্যুতের ব্যবহারে তাই সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে; ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক চুলা ইত্যাদি যন্ত্রে তাপ উৎপাদন হয়; ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটরে তাপ শোষণে দ্রব্য ও স্থান শীতল হয়; টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রে চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরণের মাধ্যমে শব্দময় ও দৃশ্যময় হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার – অতীত পরিপ্রেক্ষিত

নিকট অতীত পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল নিতান্তই কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশের পেশা ছিল কৃষি। কৃষিকাজ ছিল মান্ধাতার আমলের– লাঙল আর প্রকৃতির খেয়াল নির্ভর। উন্নত প্রযুক্তির কোন ছোঁয়া ছিল না, সেচ ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোন উন্নত বীজের ধারণা। দেশে যতটুকু শিল্প ছিল, সেটি আবার কুটিরশিল্প। কার্যত যন্ত্রশিল্প ছিল অনুপস্থিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পড়ে আমাদের কৃষিব্যবস্থায় এক চরম স্থবিরতা নেমে আসে, শিল্পের বিকাশ-সম্ভাবনা হয় তিরোহিত। এমন প্রেক্ষাপটে বিদ্যুতের ব্যবহার ও চাহিদা ছিল মূলত শহরের মানুষের বাতি জ্বালানো ও পাখা চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার– স্বাধীনতা-উত্তর পরিপ্রেক্ষিত

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। তাই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ব্যাপক ঘাটতির সমস্যায় পড়ে। চাহিদা অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহে অপারগতার কারণে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়, স্বাধীনতার সুফল হতে জনগণ বঞ্চিত হয়। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরবর্তী গণবিমুখ সরকারসমূহ উন্নয়নের প্রাণশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি উদাসীন থাকায় সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। এছাড়া গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের স্বল্পমূল্য ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ না হওয়ায় বিদ্যুৎ সমস্যা তীব্রতর হয়।

যে বিপুল স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে সংগ্রামী মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ব্যর্থ হতে পারে না। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে এদেশের মানুষ নিজেদের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ রচনায় আত্মনিয়োগ করে। মুক্তিযুদ্ধে

নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর জনগণের জীবনমান উন্নত আর সমৃদ্ধ দেশ গঠনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে । বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের আর ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি উন্নত কৃষিব্যবস্থা ও ভারি যন্ত্রশিল্পের বিকাশের প্রতি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে গত দুই দশকে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ণু জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং নিকট ভবিষ্যতে এই প্রবণতা আরো তীব্রতর হবে। দ্রুত বিকশিত অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে এক বিশেষ চমক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই গতিকে ধরে রাখতে জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে জ্বালানি হিসেবে মুখ্যত বিদ্যুৎ শক্তিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই সরকার বিদ্যুৎকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করে এর ব্যাপকভিত্তিক সংস্কারের প্রয়োজনে 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০' প্রণয়ন করে। ২০০৯ সালে যখন এ মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে কাজ চলছিল তখন দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ও ভঙ্গুর পর্যায়ে ছিল। এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, যথাযথ ব্যবহার ও অপচয় রোধের কার্যক্রমসহ এক ব্যাপকভিত্তিক জ্বালানি উন্নয়ন কৌশলপত্র গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৮ শতাংশ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় আছে, যা ২০০০ সালে ছিল ৩২ শতাংশ।

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০-এ গৃহীত পদক্ষেপ

বিদ্যুৎব্যবস্থার বিপর্যয়কর অবস্থায় সরকার 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১০' প্রণয়ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের একটি রোডম্যাপ গ্রহণ করে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার একটি সমীক্ষা করে পি.এস.এম.পি। সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০০৬-০৭ সালে যেখানে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৩,৯৭০ মেগাওয়াট, ২০১১ সালে চাহিদা দাঁড়ায় ৪,৮৩৩ মেগাওয়াট। সমীক্ষায় ২০১৫, ২০২০ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপিত হয় যথাক্রমে ১০,২৮৩ মে.ও, ১৭,৩০৪ মে.ও. এবং ৩৩,৭০৮ মে.ওয়াটে। বিদ্যমান সংকট ও ভবিষ্যতের বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য সরকার চার স্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করে :

১ম ধাপ : তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা (৬-১২মাস)
তরল জ্বালানিভিত্তিক রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।

২য় ধাপ : স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা (১৮-২৪মাস)
তরল জ্বালানিভিত্তিক পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।

৩য় ধাপ : মধ্য মেয়াদী ব্যবস্থা (৩-৫ বছর)
ক) গ্যাস ও জ্বালানিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট নির্মাণ।
খ) গ্যাস ও জ্বালানিভিত্তিক পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।
গ) কয়লাভিত্তিক স্টেম প্ল্যান্ট নির্মাণ।

৪র্থ ধাপ : দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা (৫ বছরোর্ধ্ব)
ক) এল.এন.জিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল প্ল্যান্ট নির্মাণ।
খ) দেশিয়/ আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
গ) গ্যাস/ তেলভিত্তিক পিকিং প্ল্যান্ট নির্মাণ।
ঘ) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
ঙ) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ।
চ) আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের আওতায় বিদ্যুৎ আমদানি।

এ ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সফল করার জন্য সরকার নিজস্ব বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগের পথ উন্মুক্ত করেছে।

বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি

সরকারের তাৎক্ষণিক ও স্বল্প মেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। প্রধানত তেলভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে। ইতোমধ্যে স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তবে ৯০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন করা যাচ্ছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে উৎপাদনক্ষমতার সঙ্গে প্রকৃত উৎপাদনের বিরাট ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। নাজুক বিতরণ ব্যবস্থার কারণে গ্রাহকের জন্য কার্যত ৬ হাজার ৬৫০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সরবরাহকৃত বিদ্যুতের সঙ্গে আরো ২ হাজার মেগাওয়াট বেশি বিদ্যুৎ সংযুক্ত করা সম্ভব হলে আপাতত সন্তোষজনক একটা বিদ্যুৎব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

সরকারের রূপকল্প অনুসারে ২০২১ সালে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর মহৎ উদ্যোগের জন্য দেশবাসী চেয়ে আছে। এর জন্য ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে উৎপাদনক্ষম করার পাশাপাশি আরও ৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবকাঠামো নির্মাণ ও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য ও করণীয় নির্ধারণে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যান-২০১৬ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। এ মাস্টারপ্ল্যানে অনুমান করা হয়েছে ২০৪১ সালে বিদ্যুতের চাহিদা হবে ৫২ হাজার মেগাওয়াট; এর বিপরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৭ হাজার মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুসারে ২৩ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়স ২০ বছরের বেশি। এ সব উৎপাদন কেন্দ্রে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায়শই ব্যাহত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো জ্বালানি সংকট। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। দেশীয় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পেট্রোবাংলা গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়া ছাড়া বাড়ানোর কোন তথ্য দিচ্ছে না; বরং বিদ্যমান গ্যাস দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার সংকেত দিচ্ছে। এছাড়া অনুন্নত বিতরণ ব্যবস্থার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় রয়েছে অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও সীমাহীন দুর্নীতি। সিস্টেম লসের নামে ১৫ শতাংশের বেশি বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিড থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উন্নয়নে সরকারের চলমান পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিতকরণের যে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চালক হিসেবে বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে যে দশটি প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার তিনটিই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এবং একটি এল.এন.জি টার্মিনাল যা প্রতিষ্ঠিত হবে বিদ্যুতের জন্য জ্বালানি সরবরাহকে নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য। বিদ্যুৎ কেন্দ্র তিনটি হল মৈত্রী সুপার বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি, মজুদ ও সরবরাহের জন্য গভীর সমুদ্রে এল.এন.জি টার্মিনাল নির্মাণের এই উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মাতারবাড়ি-মহেশখালীতে 'এনার্জি হাব' করার কাজ শুরু হয়েছে যেখানে ১০,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষম বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কয়লাবন্দর গড়ে উঠবে।

এছাড়া সরকার ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে ৩হাজার ১৭৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে কাজ করছে সরকারের 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ' (স্রেডা)। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সৌরবিদ্যুৎই হবে প্রধান। সরকার দুই প্রক্রিয়ায় সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যবস্থা করেছে–এক. বাড়িভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প, দুই. মিনি গ্রিড প্রকল্প। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ১১টি মিনি গ্রিড প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে যাদের সর্বমোট উৎপাদন প্রায় দেড় মেগাওয়াট। সৌরবিদ্যুতের মেগা গ্রিড প্রকল্প চালুও প্রক্রিয়াধীন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০৩০ সালের মধ্যে শুধু তুষ জ্বালিয়ে ১ হাজার ১৪৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। এছাড়া গৃহস্থালি বর্জ্য, হাঁস,মুরগি,গবাদি পশুর মল, মানুষের পয়োবর্জ্য প্রভৃতিও বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের নির্ভরযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে পারে। সরকার সকল সম্ভাব্যতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে সরকার ৬টি

উপজেলায় সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করেছে এবং অচিরেই বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে উন্নতি করেছে তা টেকসই ও স্থিতিশীল করার জন্য সরকার আধুনিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা (স্মার্ট পাওয়ার সিস্টেম) প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিয়েছে। উন্নত সঞ্চালন ও বিতরণব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক প্রি-পেইড মিটার ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির (লাইট, ফ্যান, এসি, ফ্রিজ ইত্যাদি) বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ব্যবস্থা গড়ে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

রূপকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

১। বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন যোগানের জন্য গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানো, অভ্যন্তরীণ কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি, কয়লা আমদানির জন্য দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি ও গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, এল.এন.জি আমদানি এবং নিরাপদ পরমাণু প্রযুক্তি নিশ্চিতকরণ।
২। বিপুল পরিমাণ অর্থায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।
৩। জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার জন্য রেলওয়ে ও সড়ক যোগাযোগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নৌপথের নাব্যতা রক্ষণাবেক্ষণ। জ্বালানি মজুদের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ।
৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের জন্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

উপসংহার

উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে সামিল হতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশের এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আর এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের সরকারের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক।

ভূমিকম্পের রেশ

সূচনা

পৃথিবীতে খরা, বন্যা,ঘূর্ণিঝড় সহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে চলেছে। এর মধ্যে ভূমিকম্পই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। কারণ এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে অনেক বেশি। মাটির নিচ থেকে হঠাৎ করেই যেন কেঁপে ওঠে পৃথিবী। কোন পূর্ব সংকেতের সুযোগ না দিয়েই ভূমিকম্প মুহূর্তেই লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে একটি পুরো জনপদ।

ভূমিকম্প কী

ভূ-অভ্যন্তরের শিলায় পীড়নের জন্য যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সেই শক্তির হঠাৎ মুক্তি ঘটলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়। এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। কম্পন-তরঙ্গ থেকে থেকে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে এক/দুই মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে, তা অনুভব করা যায় না । কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে সম্পদ ও প্রাণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্প কেন হয়

বিশেষজ্ঞরা তাঁদের গবেষণায় ভূমিকম্পের কয়েকটি কারণ সনাক্ত করেছেন।

১। ভূপৃষ্ঠে উপরের স্তরে অনেকগুলো প্লেট আছে। এগুলো আবার অনেকগুলো সাবপ্লেটে বিভক্ত। এগুলো সবসময় নড়াচড়া করছে এবং একটার সঙ্গে আরেকটার ঘর্ষণ হচ্ছে। এই ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের।
২। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।
৩। পাহাড় বা উঁচু স্থান থেকে বৃহৎ পরিসেরে শিলাচ্যুতির কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

৪। কোনো কোনো এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের গভীর থেকে অতিরিক্ত পানি বা তেল ওঠানোর ফলে ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থানের তারতম্য ঘটে। ফলে ভূমিকম্প হয়।

৫। ভূ-ত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হয়ে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়।

৬। নানা কারণে ভূ-গর্ভে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এ বাষ্প ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তা ভূ-ত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয়, ফলে প্রচণ্ড ভূ-কম্পন অনুভূত হয় এবং ভূমিকম্প হয়।

৭। প্রকাণ্ড হিমবাহ পর্বতগাত্র থেকে পড়ে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে ও ভূমিকম্প হয়।

বাংলাদেশে ভূমিকম্প

বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলতে বাংলাদেশ ও তার নিকটবর্তী এলাকার ভূমিকম্পকে বুঝায়। কারণ বাংলাদেশ আসলে ভারত ও মায়ানমারের ভূ-অভ্যন্তরের দুটি চ্যুতির প্রভাবে আন্দোলিত হয়। উল্লেখ্য বাংলাদেশ ভারতীয়, ইউরোপিয় এবং মায়ানমারের টেকটনিক প্লেটের মাঝে অবস্থিত। এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে আমাদের দেশে প্রায়ই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাছাড়া ভারতিয় ও ইউরেশিয় প্লেট দুটো হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে রয়েছে এবং ১৯৩৪ সালের পর তেমন কোন বড় ধরনের নড়াচড়া প্রদর্শন করে নি। এ কারণে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন এ প্লেট দুটো হয়তো নিকট ভবিষ্যতে নড়ে ওঠবে যা বড় ধরনের ভূমিকম্পের কারণ হবে। বাংলাদেশে ৮টি ভূ-তাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা রয়েছে, যথা বগুড়া চ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোর চ্যুতি এলাকা, ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা, সিতাকুণ্ড টেকনাফ চ্যুতি এলাকা, হালুয়াঘাটের ডাওকি চ্যুতি এলাকা, ডুবরি চ্যুতি এলাকা, চট্টগ্রাম চ্যুতি এলাকা, সিলেটের শাহজীবাজার চ্যুতি এলাকা, রাঙামাটি চ্যুতি এলাকা। এসব 'ভূ-চ্যুতি'ই বাংলাদেশের ভূমিকম্পের প্রধান কারণ।

প্রাকৃতিকভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। এদেশের ভিতরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯০০ খ্রি. থেকে ২০০৪ খ্রি. পর্যন্ত শতাধিক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পরেই হয়েছে ৬৫ টিরও বেশি। অর্থাৎ গত ৩০ বছরে ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মানমন্দিরে মে ২০০৭ থেকে জুলাই,২০০৮ পর্যন্ত কমপক্ষে ৯০টি ভূকম্পন নথিভূক্ত হয় যার ৯টিরই রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল ৫ এর ওপরে। গত ১৬ মাসের ব্যবধানে পাঁচটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়েছে দেশ। গত বছর ২৫ এপ্রিল তারিখে সংঘটিত নেপালের ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আঘাত বাংলাদেশকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। মাত্র ১৫ কিলোমিটার গভীর থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই ভূমিকম্প নেপালে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এর রেশ না কাটতেই ১২ মে তারিখে নেপালে আবারও ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। ঢাকা থেকে দুটি ভূমিকম্পের দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ৭শত ও ৬শত কিলোমিটার। ২০১৬ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখের ভোরে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে সারা দেশ, যার উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৩৪৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভারতের মনিপুর রাজ্যে। এর রেশ না কাটতেই গত পয়লা বৈশাখের আগের দিন ১৩ এপ্রিল,২০১৬-এর সন্ধ্যায় ৬.৯ মাত্রার আরেকটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কম্পিত হয় এ দেশ। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকা থেকে ৪৬৫ কিলোমিটার পূর্বে মিয়ানমারের দক্ষিণ-পূর্বেও মাইলাক শহরের কাছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এর কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ১৩৫ কিলোমিটার। এরপর এ বছরের ২৩ ও ২৪ আগস্টে মৃদু ভূমিকম্পের পর ২৪ আগস্টে বাংলাদেশে ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়, যার উৎপত্তিস্থল ছিল মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলে এবং কেন্দ্র ছিল ভূ-পৃষ্ঠের ৮৪.১ কিলোমিটার গভীরে। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব ছিল ৫২৬ কিলোমিটার। এভাবে মৃদু ও মাঝারি ভূমিকম্পে দফায় দফায় কেঁপে ওঠছে বাংলাদেশ। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনমনে আতংক তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ শক্তিশালী ভূমিকম্পগুলো দেশ থেকে অনেক দূরে ও মাটির অনেক গভীরে কেন্দ্র হওয়ায় বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনে। তবে দেশের ভেতর থেকে কম গভীরতায় উৎপন্ন শক্তিশালী ভূমিকম্পের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর এ ধরনের ভূমিকম্প দেশে মানবিক বিপর্যয় সৃস্টি করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে শুধু ভূমিকম্প নয়, ভূমিকম্পের পর দেশের উপকূলীয় এলাকা ঘিরে ভয়াবহ সুনামি সৃষ্টির জন্য সাইসমিক গ্যাপ বিরাজমান রয়েছে, যা আমাদের জন্য অশনিসংকেত।

অনেক ভূ-তাত্ত্বিক ঘন ঘন ছোট ছোট ভূমিকম্পন সংঘটনকে বড় ধরনের ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেমন্ট-ডোহের্টি আর্থ অবজারভেটরির ভূ-তাত্ত্বিকেরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নিচে জমে ওঠা টেকটনিক চাপ জমে উঠছে কমপক্ষে ৪০০ বছর ধরে। এই চাপ যখন মুক্ত হবে তখন সৃষ্ট ভূমিকম্পের

মাত্রা হবে প্রায় ৮.২ রিখটার, এমন কী তার মাত্রা বেড়ে ৯ রিখটারেও পৌঁছতে পারে। (জুলাই, ২০১৬)। প্রায় ১৪ কোটি মানুষ এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন।

বাংলাদেশকে ভূমিকম্পের তীব্রতার ভিত্তিতে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। মাত্রাভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার অবস্থান নিম্নরূপ :

জোন-১ : পঞ্চগড়, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সম্পূর্ণ অংশ এবং ঠাকুরগাঁও, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারের অংশবিশেষ।

জোন-২ : রাজশাহী, নাটোর, মাগুরা, মেহেরপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফেনি এবং ঢাকা।

জোন-৩ : বরিশাল , পটুয়াখালী এবং সব দ্বীপ ও চর।

জোন ১-এর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের ৪৩% এলাকা উচ্চ মাত্রার ঝুঁকিতে, জোন ২-এর অন্তর্ভুক্ত ৪১% এলাকা মধ্যম মাত্রার ঝুঁকিতে এবং ১৬% এলাকা নিম্ন ঝুঁকিতে রয়েছে। জোন ১-এ অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা সিলেট এবং তৎসংলগ্ন এলাকা ভূমিকম্প প্রবণ। এর পরের অংশগুলোও যেমন ঢাকা ও রাজশাহী সক্রিয় ভূমিকম্প এলাকায় থাকার কারণে মারাত্মক ভূমিকম্পের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে পারে।

জাতিসংঘ পরিচালিত 'রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট টুলস ফর ডায়াগনসিস অফ আরবান এরিয়াস এগেইন্সট সাইসমিক ডিজাস্টার' জরিপে ভূ-তাত্ত্বিক ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্বের ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এক গবেষণায় দেখা গেছে ঢাকার ভূমিতে বিভিন্ন প্রকার মাটি (লাল মাটি, নরম মাটি ইত্যাদি) রয়েছে। ঢাকার সম্প্রসারিত অংশে জলাশয় ভরাট করে গড়ে তোলা হয়েছে আবাসন এলাকা। ভূমিকম্পের সময় নরম ও ভরাট করা এলাকার মাটি ভূমিকম্পের তরঙ্গকে বাড়িয়ে দেয়। তাই আলগা মাটি সমৃদ্ধ ঢাকার বর্ধিতাংশকে গবেষকরা যথেষ্ঠ ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। সরকারি তথ্যসূত্র মতে, ঢাকায় রাতের বেলায় ৭ থেকে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ৯০,০০০ লোক এবং দিনের বেলায় হলে ৭০,০০০ লোক হতাহত হবে। প্রায় ৭২,০০০ দালান সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং ৮৫,০০০ ভবন মাঝারি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার আর্থিক মূল্য দাঁড়াবে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ভূমিকম্প মোকবেলায় পদক্ষেপ

ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দুটি। এক. ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে নিম্নতম পর্যায়ে রাখা। দুই. ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। এ লক্ষ্যে ভূমিকম্প পূর্ব, ভূমিকম্প কালীন ও ভূমিকম্পের পরে করণীয় নির্ধারণ করে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পদক্ষেপসমূহ হলো–

১। পরিবারের সবাইকে ভূমিকম্পের জরুরি অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
২। ভূমিকম্প মোকাবেলায় সক্ষম বাড়িঘর, দালান ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা।
৩। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে ঘরের বড় বড় ও লম্বা আসবাবপত্রগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।
৪। বিছানার পাশে সব সময় টর্চলাইট, ব্যাটারি এবং জুতা রাখা।
৫। ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য আগেই রুমাল বা চাদরের ব্যবস্থা রাখা।

সরকারি পদক্ষেপ

১। পুরনো নড়বড়ে দালানগুলো অপসারণ অথবা প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২। ভূমিকম্পের সময় করণীয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৩। ভূমিকম্প সহনীয় করে বিল্ডিং নির্মাণ নিশ্চিতকরণের জন্য তদারকি নিশ্চিত করা ।
৪। রাস্তা প্রশস্ত ও উন্মুক্ত মাঠ বাড়ানো নিশ্চিত করা।
৫। দ্রুত উদ্ধার কাজের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির যোগান নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ উদ্ধারকর্মী সৃষ্টি করা।
৬। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

মনে রাখতে হবে, " প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।"

ভূমিকম্প হলে করণীয়

১। ভূমিকম্প হলে টেবিল, চেয়ার, বিছানার নিচে আশ্রয় না নিয়ে ঠিক পাশে আশ্রয় নিতে হবে।
২। দৌড়াদৌড়ি বা হুড়াহুড়ি বা ধাক্কাধাক্কি করে সিঁড়ি দিয়ে না নামা।
৩। কখনো সিঁড়িতে আশ্রয় না দেওয়া।
৪। বাসার একেবারে ভিতরের দিকে রুমে না থেকে বাইরের দেয়ালের বিমের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করা।
৫। উঁচু দালান, বড় গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি ও গ্যাস লাইনের কাছাকাছি আশ্রয় না নেওয়া।
৬। ভূমিকম্পের সময় গাড়িতে থাকলে দ্রুত নেমে পড়া এবং বাসার বাইরে থাকলে বাসায় না ঢোকা।
৭। কাচের জানালা, আলমারি, ফ্রিজের কাছাকাছি আশ্রয় না নেওয়া।
৮। ভূমিকম্পের সময় লিফট ব্যবহার না করা।
৯। প্রথম ভূমিকম্পের পর পরাঘাতের আগেই গ্যাস, বিদ্যুৎ– এসবের মেইন সুইচ বন্ধ করে দেওয়া।
১০। দেয়াশলাই জ্বালানো যাবে না।

উপসংহার

ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর একটি। ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার কারণেই এটি ঘটে থাকে। ভূমিকম্প থামানোর ক্ষমতা কারোর নেই; কিন্তু ভূমিকম্প মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এর ধ্বংসের ভয়াবহতা কমানো সম্ভব। তাই এ বিষয়ে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

সম্প্রীতি

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছে সমাজ। আর সমাজ গড়ে তোলার নিয়ামক হিসেবে মানুষকে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা বিসর্জন দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পরার্থপরতার নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে। উন্নতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ সামবায়িক কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গোত্রে বিভক্ত হয়েও মানুষ বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার পথে হাঁটেনি; বরং পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সভ্যতার চাকাকে গতিময় করেছে। আজকের সভ্যতা সকল মানুষের নিরলস প্রচেষ্টার অনন্য ফসল; এ সভ্যতায় সকলের সমান উত্তরাধিকার। আর মানবসভ্যতার বুনিয়াদ নির্মিত হয়েছে প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতির ভিত্তিমূলে দাঁড়িয়ে। উল্লেখ্য, কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষে মানুষে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালিয়ে মানবসভ্যতার স্থিতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

সম্প্রীতি কী

সম্প্রীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ সদ্ভাব, সৌহার্দ্য, প্রেম, প্রণয়, সন্তোষজনক আচরণ, সুভাব, সন্তোষ ইত্যাদি। প্রেম, সৌহার্দ্য, সদ্ভাব এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পারস্পরিক শান্তিময় সহাবস্থানই হচ্ছে সম্প্রীতি । অন্যভাবে বলা যায়, মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনই হচ্ছে সম্প্রীতি। ধর্মে-বর্ণে-জাতি-গোত্রে বিভিন্ন পরিচয় থাকলেও মানুষের চূড়ান্ত পরিচয় 'মানুষ' হিসেবে। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকেও প্রতিটি শুভবোধসম্পন্ন মানুষের গভীরতর প্রত্যয় এই : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই সভ্যতা নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। মানবসভ্যতার যতগুলো অর্জন, তার সবই সমগ্র মানবকূলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফসল। মানুষের মহৎ কোন আবিষ্কার বা সৃষ্টি কোন জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; দেশ-কাল-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ বেড়া ডিঙিয়ে তা হয়ে ওঠে বিশ্বের সকলের। মানব প্রগতির স্রোতোধারায় রয়েছে সকল জাতির সকল ধর্মের, বর্ণের সম্মিলিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অবদান। সকল শুভবোধসম্পন্ন মানুষের ঐকান্তিক চাওয়া হলো শান্তিময়, সমৃদ্ধ বিশ্ব। আর এর জন্য দরকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, পরমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া, নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

ভাবার অহম্ ত্যাগ করা, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করা। অন্যের মনোভাব, অভিমত, ধারণা বা বিশ্বাসের সঙ্গে একমত না হতে পারলেও তার প্রতি সহানুভূতি, সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অপরিহার্য। আধুনিক বিশ্ব অগ্রসর হচ্ছে বহুমত ও বহুপথকে যুগপৎ ধারণ করে। শান্তিময়, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ পৃথিবী নির্মাণের জন্য সম্প্রীতির বন্ধনের বিকল্প নেই। কোন কারণে সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজে বিভেদ বাড়ে, বাড়ে অন্যের ক্ষতি করার পাশবিক উল্লাস। পরিণামে দেখা দেয় সংঘর্ষ ও হানাহনি। অশান্তির বিষ প্রবেশ করে সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে; সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ হয়ে যায় রুদ্ধ। মানবকল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থে যে কোন মূল্যে সমাজে সম্প্রীতি রক্ষা করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে ভলতেয়ারের বক্তব্য স্মরণীয় : "তোমার কথার সঙ্গে আমি একমত হতে না পারি, কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আমি আমার জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব।" বস্তুত পরমত সহিষ্ণুতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সম্প্রীতির বীজ।

রক্তক্ষয়ী বিশ্ব-পরিস্থিতি

শুভবোধসম্পন্ন মানুষেরা যেমন মানুষে মানুষে সম্প্রীতি রক্ষায় নিবেদিত; এর বিপরীত পিঠে তৎপর রয়েছে সম্প্রীতি বিনষ্টকারী স্বার্থান্ধ অশুভ শক্তি। ব্যক্তি বা মহলবিশেষ ক্ষমতার লোভে, অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে অথবা গোষ্ঠী-স্বার্থে ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে গড়ে তুলেছে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর; বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে বিপরীত পক্ষকে ঘায়েল করার প্রাণঘাতী ফিকিরে লিপ্ত হয়েছে; রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বা যুদ্ধ বাঁধিয়ে রক্তাক্ত করছে জনপদ। এভাবে যুগে যুগে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় কত জনপদ ধ্বংস হয়েছে, কত মানুষ নিহত হয়েছে তার কোন পরিসংখ্যান নেই। এই দ্বন্দ্বে সুবিধাবাদী গোষ্ঠী সহজ ও কার্যকর ইন্ধন হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে ধর্মকে। হীন সাম্প্রদায়িকতার মূল নিহিত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের গোড়ামি ও অন্ধবিশ্বাসে। ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কারণেই মানুষে মানুষে সীমাহীন বিভেদ ও বিদ্বেষের অগ্নিদহন। অথচ প্রতিটি ধর্মের গোড়ার কথা মানবকল্যাণ ও শান্তি। প্রত্যেকের ধর্ম প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে পালন করবে এবং অন্যকেও নির্বিঘ্নে ধর্মপালনের সুযোগ করে দেবে – এটাই প্রতিটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা। সকল ধর্মই পারস্পরিক সহাবস্থান ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আছে। ধর্মের নামে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো, হানাহানি ও রক্তক্ষয়ে লিপ্ত হওয়া ধর্মের মূল চেতনাকেই ধ্বংস করে। পরিতাপের বিষয় হলো- বিশ্ব আজ অশান্ত, বিধ্বস্ত, রক্তরঞ্জিত ধর্মীয় উগ্রপন্থার কারণে। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের নোংরা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে ধর্ম। রাজনীতিবিদেরা ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে ইস্যু বানিয়ে সহজেই হাসিল করে নিচ্ছে নিজের স্বার্থ ও প্রভাব। এছাড়া জাতি-বৈরিতা ও বর্ণ-বিদ্বেষ থেকেও বহু জাতি ও রাষ্ট্র যুদ্ধে, সংঘর্ষে, দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ছে। ফলত লজ্জিত হচ্ছে মানবতা।

ক্ষমতালোভী, জাত্যাভিমানী ও আধিপত্যবাদী নরপশুদের সহিংসতায় কালে কালে, দেশে দেশে রক্তরঞ্জিত ও কলঙ্কিত হয়েছে মানবেতিহাস। কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের সহিংসতা মানবতার জন্য এক গভীর ক্ষত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রমত্ত আগ্রাসনে নির্মূল হতে হয়েছে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ও অস্ট্রেলিয় আদিবাসীদের। প্রবল জাত্যাভিমানী ও ক্ষমতালোভী হিটলারের গ্যাসচেম্বারে নিহত হতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে। আবার ইহুদিরাই সকল প্রকার ন্যায়নীতি আর মানবতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্যালেস্টাইনে নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কতিপয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্ব-আধিপত্য বজায় রাখার কৌশল হিসেবে এই নৃশংসতাকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে ক্ষমতার দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ইংরেজরা বিবেকবর্জিত দমনপীড়নের আশ্রয় নিয়েছে; ভ্রাতৃপ্রতিম দুই সম্প্রদায়– হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কৌশলে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পরস্পরকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে সংঘটিত হয়েছে অসংখ্য ভয়াবহ দাঙ্গা। ভারতকে বিভক্ত করার মাধ্যমে বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এ জনপদে অশান্তির স্থায়ী বীজ রোপণ করে দিয়ে গেছে। জাতিগত সহিংসতার কারণে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়ায়, সোমালিয়ায়, মায়ানমারে এবং আরো বহু দেশে। ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সহিংসতায় মধ্যপ্রাচ্য আজ বিপন্ন। সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে সহিংসতায় প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছে মানুষ; মানুষের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে ধরণীর বুক। ধর্মীয় উগ্রপন্থা ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বময়; উগ্রপন্থীদের হাত থেকে আজ কেউ নিরাপদ নয়। ধর্মীয় উগ্রপন্থা আজকের পৃথিবীকে এক গভীর সংকটে নিপতিত করেছে।

বাংলাদেশে সম্প্রীতির ঐতিহ্য ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের মানুষের মনের জমিন এদেশের পলিমাটির মতোই নরম; হিংসা, হানাহানি, হিংস্রতা, ক্রূরতার সঙ্গে এদেশের মানুষের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ। সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায়, সম্পদে-বিপদে যূথবদ্ধ থাকার এক অবিনশ্বর চেতনা বাঙালি

জাতি তার সত্তার গভীরে লালন করে। ধর্ম-বর্ণ-জাতির চেয়ে এখানে মানুষের পরিচয়ই সবচেয়ে বড়। মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে বাঙালির শাশ্বত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে –– 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই এদেশের মানুষ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনের হাজার বছরের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন সময়ে স্বার্থান্ধদের প্ররোচনায় এই সম্প্রীতির বন্ধনে কখনো কখনো মোচড় লেগেছে, কিন্তু ছিন্ন কখনোই হয়নি। ব্রিটিশদের ভারতশাসনে বিভাজনের ঔপনিবেশিক নীতি আমাদের হাজার বছরের সম্প্রীতির বন্ধনকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মুসলমানদের আনুকূল্য দেওয়ার অজুহাতে **১৯০৫** সালে বঙ্গ-বিভক্তির মধ্য দিয়ে হিন্দু-মসলমান দুই সম্প্রদায়কে কার্যত বিভক্ত করা গেছে। **১৯১২** সালে বঙ্গ আবার একীভূত হলেও ভাঙার রেখাটি রয়েই গেছে। এরপর **১৯৪৭** সাল পর্যন্ত এই বিভাজন দাঙ্গায় রূপ নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনিবার্য পরিণাম হিসেবে **১৯০৫** সালের রেখা ধরেই বাংলা আবার বিভক্ত হয়। এরমধ্যে সম্প্রীতির বাংলায় ঘটে গেছে ভয়াবহ দাঙ্গা; লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এই অহিংসার ভূমি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই বাঙালি তার সত্তানিহিত সম্প্রীতির চেতনায় ফিরে আসে। এ যেন এক মহাঘোর কাটিয়ে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসা। বাংলা ভাষার ওপর আঘাতেই বাঙালি জাতিসত্তার পরিপূর্ণ পুনর্জাগরণ ঘটে। পাকিস্তানিদের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রতিবাদী হওয়ার শক্তি জুগিয়েছে এর অন্তর্নিহিত সম্প্রীতি চেতনা। পাকিস্তানি শাসকেরা বহু ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে এ সম্প্রীতি চেতনাকে বিনষ্ট করার প্রয়াস হিসেবে। **১৯৬৪** সালের পাক-ভারত যুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির একটি চেষ্টা চালানো হয় পাকিস্তানি শাসকদের প্ররোচনায়; কিন্তু বাঙালি জাতি সেই অপচেষ্টা প্রবলভাবে প্রতিহত করেছে। বাঙালি জাতির সম্প্রীতি চেতনার ভিত্তিতেই **১৯৭১** সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সকলের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশের বুনিয়াদ। স্বাধীন বাংলাদেশেও পাকিস্তান-পন্থী কিছু দোসরের প্ররোচনায় সময়ে সময়ে সম্প্রীতির চেতনায় চিড় ধরেছে। কিন্তু সকল অপচেষ্টাকে পরাভূত করে বাঙালির সম্প্রীতিবোধ অটল আছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী জঙ্গীবাদের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও এর প্রসার ঘটানোর একটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলমান আছে। কিছু জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলামের ভুল ব্যাখ্যায় প্ররোচিত করে যুব সমাজকে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে কথিত জিহাদে উদ্বুদ্ধ করছে। মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত মতাদর্শীদের সহিংসতায় রক্তাক্ত হচ্ছে এ জনপদ; গুলশানের হলি আর্টিজানের ঘটনা এর সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। কিন্তু এদের নৃশংসতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এদেশের মানুষ, তাদের করুণ পরিণতিতে কেউ কোনো অনুকম্পা দেখায়নি, এমনকি তাদের মা-বাবারাও নয়। এটিই সম্প্রীতির বাংলাদেশের আসল পরিচয়।

বাংলাদেশে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য করণীয়

বাংলাদেশের সহিংসতারইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সমাজের ক্ষুদ্র একটি স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে এদেশের ধর্মানুরাগী মানুষদের কাছে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করেছে। এই প্রবণতা রোধ করার জন্য ধর্মের সঠিক শিক্ষা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কুসংস্কারমুক্ত, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। দেশের সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ তৈরি করতে হবে। সামাজিক ন্যায় ও রাষ্ট্রীয় সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। নীতি-নির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, পরিপার্শ্বে যখন অন্যায়, অত্যাচার জুলুম চলতে থাকে, তখন যুবকদের মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয় এবং এ থেকে পরিত্রাণের জন্য এরা পথ খুঁজতে থাকে। এ সুযোগটিই নিয়ে থাকে সুবিধাবাদীরা। পারিবারিক পর্যায়েও সুস্থতার সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের রয়েছে সম্প্রীতির এক গর্বিত ইতিহাস। সম্প্রীতির ভিতে গড়ে উঠা বাংলাদেশ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, সংঘাতপূর্ণ ও হিংসাত্মক পৃথিবীতে সম্প্রীতির পতাকা হাতে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেবে ––এটাই এদেশের সকল মানুষের স্বপ্ন। এর জন্য সুরক্ষিত করতে হবে আমাদের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে। স্বার্থান্ধ ষড়যন্ত্রকারীরাও থেমে থাকবে না, তাদের অপচেষ্টা চলতেই থাকবে; তবে বাঙালির শাণিত চেতনা তাদের অপচেষ্টাকে শক্তহাতে প্রতিহতও করবে––ইতিহাস আমাদেরকে এভাবেই আশ্বস্ত করে।

নারীর ক্ষমতায়ন/ অধিকার

ভূমিকা

"কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয় লক্ষ্মী নারী ।"

নারীর প্রতি এই বন্দনায় প্রতিফলিত হয়েছে গৃহকোণে বন্দী নারীর নিভৃত ভূমিকার কথা। যদিও এখানে নারীর প্রেরণা ও শক্তিদানের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, এই পরিচয়েও নারী শেষ পর্যন্ত অন্তরালের নারীই; সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির সমন্বয়ে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে নারীর প্রত্যক্ষ ও স্বাধীন-সার্বভৌম ভূমিকা অনুপস্থিতই থেকে যায়। গৃহকোণ সামলানো, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন এবং আরাম-আয়েশ ও বিনোদনের বিচিত্র উপচার যোগানো – নারীর অন্তরালের এই নিরন্তর কর্মযজ্ঞ পুরুষের শীর্ষস্পর্শী সাফল্যের গোড়ার কথা। কিন্তু নারী পুরুষের সাফল্যের সিঁড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে নিজেই যে সিঁড়ি হারিয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো কেউ কেউ উদারতাবশত নারীর অন্তরালের অবদানের স্বীকৃতিটুকু দেয়; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো ঘটে উল্টোটা – সামান্যতম ত্রুটির জন্যও নারীর প্রাপ্তি হয় অপমান, লাঞ্ছনা আর নির্যাতন। প্রেরণা আর শক্তিদান – ক্ষমতার মধ্যে পড়লেও এটুকুই নারীর শেষ ক্ষমতা নয়; নারী যে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান সক্ষমতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র অঙ্গনে অবদান রাখতে পারে তার উদাহরণ অল্প হলেও বিরল নয়। মাদাম কুরি, মাদার তেরেসা, ইন্দিরা গান্ধী, কল্পনা চাওলা প্রমুখ নারী আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ পেলে নারী মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁরা নারীর সক্ষমতার এককেটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা।

নারীর ক্ষমতায়ন কী

নারীর ক্ষমতায়ন মানে একজন শিক্ষিত নারীর নিজের মেধা-মনন-প্রজ্ঞা ও সৃজনক্ষমতাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা গেলেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা

একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে প্রতিটি দেশই তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্বে মানুষের চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। একথা সবারই জানা, উন্নত দেশগুলোর উন্নতির মূলে রয়েছে সে দেশগুলোর মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরন্তর চর্চা। ঐ দেশগুলোতে শুধু পুরুষকেই মানবসম্পদে রূপান্তর করা হয় নি, মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ নারীকেও সম্পদ বিবেচনায় সমাজের মূলস্রোতে টেনে এনেছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী দেশগুলোকে নারীর মেধা, মনন ও সৃজনীশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাদেরকে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভূমিকা পালনের পূর্ণ সুযোগ করে দিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোতে পরিদৃষ্ট হলেও তার পরিপূর্ণ সুফল মিলবে সমগ্র নারীসমাজকে ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশে নারীর ঐতিহ্যগত অবস্থান

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণেই সুদূর প্রাচীন কাল থেকে নারীরা মর্যাদা বঞ্চিত। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন বৈদিক যুগে ভারতবর্ষে নারী-পুরুষে প্রান্তরের সমতা ছিল। কিন্তু কালের পরিক্রমায় উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিকানা, উত্তরাধিকার ও সামাজিক আধিপত্যের প্রশ্নে নারী-পুরুষে বৈষম্য সৃষ্টি হতে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়ামক হয়েছে নারী-পুরুষের শারীরিক গঠন ও শক্তির পার্থক্য। এরই এক পর্যায়ে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং এই অর্থনৈতিক মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে নারীর চূড়ান্ত পতন ঘটে। এই পর্যায়ে সে নিজেও নিজের রইলো না, গৃহের অন্যান্য সম্পদের মতো পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। শিক্ষা তার জন্য নিষিদ্ধ হলো, ঘরের বাইরের জগৎ তার জন্য নিষিদ্ধ জগতে পরিণত হলো। ঘরে অবরুদ্ধ থেকে রান্না-বান্না, গৃহস্থালির কাজ করবে, পুরুষের যৌন চাহিদা পূরণ করবে আর পুরুষের সম্পদের উত্তরাধিকার হিসেবে সন্তান, বলা বাহুল্য পুত্রসন্তান জন্মদান করবে। এক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্যহীন, পুরুষের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। সেবাব্রতী ও সন্তানোৎপাদক– এই ভূমিকায় সাফল্যের নিরীখে নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হতো। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন সময়ে বহু জাতিগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে,বহুবার ক্ষমতার পালাবদল ও ধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটেছে কিন্তু নারীর প্রতি

দৃষ্টিভঙ্গীর তেমন কোন হেরফের হয়নি। বিগত দুয়েক শতকে ইংরেজ শাসন ও ইউরোপিয় শিক্ষার প্রভাবে নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদানের আওয়াজ ওঠে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও অনুকূল পরিবেশের সুযোগে কোন কোন নারী নিজের ক্ষমতা ও ভূমিকার প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হলেও তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। এখনো অনেক শিক্ষিত পুরুষ প্রাচীন মনেবৃত্তিই লালন করে নারীর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে। এছাড়া সাংসারিক কাজকর্ম – যেমন সন্তান পালন, গৃহস্থালির কাজ যেগুলো বিরক্তিকর ও কষ্টের, সেগুলো এড়িয়ে চলার মানসিকতা এক্ষেত্রে সক্রিয়। পুরুষের স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থান্বেষী মানসিকতার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে। জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারীর বিপুল কর্মশক্তি ও মেধাশক্তির অপচয়ের কারণে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নের বৈশ্বিক উদ্যোগ

বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে। ৭০-এর দশক থেকে জাতিসংঘ নারীর মর্যাদার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। **১৯৭৫** সারকে নারী বর্ষ এবং **১৯৭৫-১৯৮৫** কে নারী দশক হিসেবে পালন করে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে জোরদার করে। জাতিসংঘের আয়োজনে **১৯৭৫** থেকে **১৯৯৫** সালের মধ্যে চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের উদ্যোগ :

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। নারী উন্নয়নের প্রয়োজনে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সংবিধানে। নারীর উন্নয়নে বাংলাদেশে মহিলা বিষয়ক আলাদা মন্ত্রণালয় রয়েছে। প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **১৯৭২** সালে সরকারি চাকরিতে নারীর জন্য **১০%** কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নারীর জন্য ৬০% কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশ, বিচার বিভাগ সহবিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সচিব পর্যন্ত মহিলা রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা সহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্বে নারী দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের বিধান করা হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। নারী শিক্ষাকে স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক করা হয়েছে এবং তাদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এ সব উদ্যোগের কারণে নারীরা আজ সমাজে বেশ প্রভাবশালী অবস্থানে রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এখনো সবচেয়ে বাঁধা। নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে এখনো পুরুষেরা খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে না। নারীর ক্ষেত্রে এখনো শ্রম বৈষম্য বিদ্যমান। নারীর গৃহস্থালির কাজের মর্যাদা এখনো অস্বীকৃত। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় নারীরা নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়নের উপায়

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আশার কথা হলো, সাম্প্রতিক সময়ে প্রথম আলো পত্রিকার এক জরিপে দেখা গেছে, " অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক অথবা পড়াশোনায় যেমনই হোক, মেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠিত হতে চান।" (প্রথম আলো, ৬ সেপ্টেম্বর,২০১৬)। জরিপে অংশ নেওয়া **১৮৮** জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র দুজন পড়াশোনা শেষ করে কিছু করতে চায় না, সংসারে মনোযোগ দিতে চায়। আগে মেয়েদের মধ্যে এ মানসিকতাই প্রবল ছিল, যা নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম বাঁধা। বর্তমানে যে সকল মেয়েরা কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে, তারা প্রায় সবাই প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, হতে চায় পরিবারের কাণ্ডারি, নিতে চায় নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত, সমাজের জন্যও কাজ করতে চায় তারা। নিজের, পরিবারের ও সমাজের দায়িত্ব নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারীর ক্ষমতায়নের মূলমন্ত্র। নারীরা স্বাবলম্বী হলে শুধু পরিবারে নয়, সমাজেও তার একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরি হয়। পারিবারিক-অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নারীর নিজেরও সক্ষমতা বাড়ে। মা-বাবা,পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো মেয়েদের এই চাওয়াগুলোকে পূরণের জন্য তাদের পাশে থাকা, তাদেরকে সমর্থন দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা, তাদের মেধাবিকাশে আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা ।

নারীর ক্ষমতায়নের সুফল

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নারীর অবদান অপরিসীম। নারীর ক্ষমতায়নের সুফল বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩র তথ্যমতে, দেশের অর্থনীতির মূলধারা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে ১ কোটি ৬৮ লাখ নারী কাজ করছেন এবং প্রতি বছর গড়ে যোগ হচ্ছেন আরো দুই লাখ নারী। এ ছাড়া উৎপাদন খাতে কাজ করছেন ২২ লাখ ১৭ হাজার নারী। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-ও এক গবেষণাপত্রে দেখা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সালে মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ; ২০১১-১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ। তাদের উপার্জন সংসারের মোট উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সচ্ছলতা বৃদ্ধি করছে; এতে জীবনমানের উন্নতি হচ্ছে। পরিবারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার সুযোগ বাড়ছে; একই সঙ্গে উন্নত হচ্ছে দেশ।

উপসংহার

দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হলে পরিবার ও সমাজের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নেও এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে। এ জন্য নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

গুণগত শিক্ষা

সূচনা

শিক্ষা প্রসঙ্গে সুপ্রচলিত প্রবাদ, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। অর্থাৎ, মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন দেহ চলে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া দেশ চলে না। জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষার সম্প্রসারণে ব্যাপক উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। শিক্ষার হার বাড়ছে ব্যাপকভাবে। সরকার জাতীয় বাজেটে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এত কিছুর পরেও শিক্ষার সুফল নিয়ে সর্বত্র একটা আশঙ্কা বিরাজ করছে। অনেক বিজ্ঞজনই মনে করেন, সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ব্যর্থ হচ্ছে শিক্ষা গুণগত মানে উৎকর্ষ হারানোর কারণে।

গুণগত শিক্ষা কী

যে শিক্ষা মানুষের সুপ্তশক্তির উদ্বোধন ঘটায়, মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে সৃজনশীলতা, মানুষকে করে তোলে কর্মদক্ষ, সর্বোপরি মানুষকে মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করে সেই শিক্ষাই গুণগত শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত। শিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটলেই সেই শিক্ষাকে গুণগত শিক্ষার অভিধা দেওয়া সম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে সদর্থে বদলে দেওয়া, গুণগতভাবে মানুষকে উন্নত ও বিকশিত করা। যে শিক্ষা তার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়, তাকে কোনোভাবেই গুণগত শিক্ষা বলা যায় না। পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হচ্ছে। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা সার্টিফিকেট প্রদান ও গ্রহণের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে গেছে, শিক্ষা হয়ে গেছে বাণিজ্য-পণ্য।

শিক্ষার বর্তমান হাল

ডিগ্রি অর্জনের অন্ধ মোহে আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষ্য নেই– না মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের, না পেশা বাছাইয়ের। অবস্থা অনেকটা এমন যে, ভাসতে ভাসতে কোনোখানে গিয়ে ঠেকলেই হলো। ফলত শিক্ষা হয়ে গেছে সমাজে মূল্যবোধহীন বেকার জনগোষ্ঠী তৈরির একটি মেগা প্রকল্প। কর্মসংস্থানের সুবিধা এদেশে অনেক সংকুচিত; শিক্ষাজীবন শেষে বেকার হওয়ার উদ্বেগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন কাটে। পড়াশোনার কঠিন সাধনার বদলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধাবিত হয় সহজ কোনো প্রতিষ্ঠার দিকে। অনেক শিক্ষার্থী জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সহজ পথ হিসেবে বেছে নেয় রাজনীতিকে। এ রাজনীতি নীতি-বিবর্জিত, একান্তই স্বার্থ-তাড়িত। এই রাজনীতিতে সন্ত্রাস আসে অনিবার্য নিয়মে। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার যোগ থাকে না। পরীক্ষায় পাশ করার সহজ উপায় হিসেবে নকল বাড়ে; আর নকল হলো সংক্রামক ব্যাধির মতো। একজন নকল করলে পাশেরজন উৎসাহিত হয়। নকলের মতো ঘৃণ্য অপরাধ বহুল চর্চায় বৈধতা পায়। নকল বাড়লে মেধা কমে। এভাবে কলুষিত হয় শিক্ষা, কলুষিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে ব্যক্তিত্ব হারায় শিক্ষার্থীরা। সস্তা পথে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা

পেলেও অধিকাংশই হারিয়ে যায়। এভাবেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকে আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে এক গভীর সংকট, সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অস্থিরতা।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের কাছে শিক্ষা হলো চাকুরি নামক সোনার হরিণ শিকারের কলাকৌশল। যার ভাণ্ডারে যতবেশি তূণ থাকবে, শিকার করার প্রতিযোগিতায় সে ততবেশি এগিয়ে থাকবে। তাই আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের একটা অসম্ভব চাপ ও তাড়ার মধ্যে থাকতে হয়। স্কুলে সিলেবাস ভারি করা হয়েছে, বইয়ের সংখ্যা বেড়েছে, নতুন নতুন বিষয় যোগ হয়েছে, পরীক্ষার চাপ বেড়েছে। শিক্ষার ভয়াবহ মাত্রায় বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের খুবই অভাব, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকও নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা নেই। এই চাপের সমাধান হিসেবে এসেছে কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউশনি আর গাইড বই। অভিভাবকের বেড়েছে ব্যয়ের বোঝা। আর ঘন ঘন পরীক্ষার চাপ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছোটাছুটি করতে হয় গাইড বই, স্কুল, কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর, নোট ইত্যাদির মধ্যেই। সন্তানদের কাছে অভিভাবকদের দাবি বাইরের বই পড়বে না, ফার্স্ট হতে হবে, লেখাপড়া করে বড় লোক অর্থাৎ অনেক অর্থের মালিক হতে হবে, অনেক ক্ষমতাশালী হতে হবে। ফলত আমাদের শিক্ষার্থীরা চিন্তাশূন্য, বিশ্লেষণশূন্য, প্রশ্নশূন্য ও আত্মকেন্দ্রিক একেকটি রোবট-মানবে পরিণত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা নিষিদ্ধ অথবা উপেক্ষিত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা প্রকট। পার্শ্ব প্রতিষ্ঠান বিবেচনায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা পারতপক্ষে সেদিকে ভিড়ে না। বাংলাদেশে কিছু ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেখানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় খুবই নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও তদারকির মধ্যে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামোবদ্ধ পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত তারুণ্যের বিকাশ অসম্ভব।

শিক্ষার মানের অবনতির কারণ

শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও দেশে সমন্বিত পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। ব্যক্তি-স্বার্থে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় অপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনহীন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলো সুষ্ঠু শিক্ষা বিস্তারে শুধু অন্তরায়ই নয়, শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ধ্বংসেরও কারণ। শিক্ষার উন্নয়নে মেধাবী শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষকতাকে মেধাবীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্র। শিক্ষকদেরকে এখানে করুণার দৃষ্টিতে দেখার মানসিকতা কাজ করে। মেধাবীরা তাই শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহ থাকলেও অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার প্রত্যাশায় অন্য কোনো চাকরি খুঁজে নেয়। যারা আবেগের বশে শিক্ষকতায় আসে নানা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হয়ে ক্রমান্বয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলত তাদের মেধার অনেক সময় অপচয়ই হয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষকতাকেই সবচেয়ে মর্যাদার কাজ বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মেধাবীরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই জীবন-জীবিকার তাগিদে শিক্ষকতায় আসে, শিক্ষার প্রতি হয়তো তারা অন্তরের টান অনুভব করে না। শিক্ষাকে তারা পণ্য বানিয়ে নিজের ভাগ্যোন্নয়নে কাজে লাগায়; তাদের আকর্ষণ শ্রেণিকক্ষের চেয়ে নিজের প্রতিষ্ঠিত কোচিং সেন্টারেই বেশি কেন্দ্রীভূত থাকে। তদুপরি শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে শ্রেণিকক্ষের সংকট চরমে। নেই কোনো উন্নত লাইব্রেরি, মান-সম্মত গবেষণাগার। আমাদের দেশে যুগোপযোগী উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মারাত্মক অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে গাইড বই আর শ্রেণিকক্ষের চেয়ে কোচিং সেন্টার বেশি আকর্ষণীয়। কারণ তারা চায় কম পড়ে ভাল ফলাফল করার সহজ দাওয়াই। নকলের প্রবণতাও একই কারণে মারাত্মক পর্যায়ে আছে। শিক্ষার্থীদের সামনে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস নেই। হতাশার মধ্যে উদ্যমী হওয়ার মানসিক শক্তি অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই থাকে না। এসব কারণে আমাদের দেশের শিক্ষার মান কার্যত নিম্নমুখী।

গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপায়

শিক্ষা এমন একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যার সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই, শিক্ষার ব্যবস্থাপনা সরাসরি জড়িত। এর কোন একটিতে দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে শিক্ষার মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের উন্নয়ন আর সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করতে চাইলে প্রথমেই এদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য দরকার–

১. শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগী করার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. পাঠ্যবইকে আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত শিক্ষা-উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

৪. আধুনিক পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. গুণগত শিক্ষার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষকতায় টেনে আনা সবচেয়ে বেশি জরুরি। এজন্য শিক্ষকতাকে সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় করতে হবে। প্রাণ ছাড়া যেমন সুন্দর দেহ মূল্যহীন, তেমনি ভাল শিক্ষক ছাড়া গুণগত শিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব কল্পনা।

৬. শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। কোচিং সেন্টার, গাইড বইয়ের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত ও জীবনঘনিষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

৮. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য দেশে বিদেশে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে শিক্ষকের দক্ষতার মূল্য প্রশ্নাতীত। সকল ক্ষেত্রে দক্ষ শিক্ষক দ্বারা মানসম্পন্ন প্রশ্ন-প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষা থেকে নকল উচ্ছেদ করতে হবে।

১০. শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। কারণ উদ্দেশ্য পরিষ্কার না থাকলে অর্জনের পথটি ঝাপসা হতে বাধ্য।

উপসংহার

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে শামিল হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এই মহৎ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত, উন্নত মূল্যবোধলালিত সৃজনশীল জনশক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে। গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলেই স্বপ্ন পূরণের পথে বহুদূর এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ, বাস্তবে রূপ পাবে স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'।

পরিবারে নৈতিক শিক্ষা

মানুষ সামাজিক জীব, কিন্তু তার জীবনের শুরু হয় পরিবার থেকে। সামাজিক হওয়ার জন্য মানুষকে রপ্ত করতে হয় কিছু আচার-আচরণ, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ; আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্ত ভেঙে নিজেকে গড়তে হয় সমাজের উপযোগী করে; নিজেকে শাণিত করতে হয় সমষ্টিচেতনায়; নিজেকে নিবেদন করতে হয় পরার্থপরতায়। যে প্রক্রিয়ায় মানুষ আদিম প্রবৃত্তি ত্যাগ করে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে উন্নত মূল্যবোধসম্পন্ন সত্তায় পরিণত হয় তা-ই শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে করে কর্মদক্ষ, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে করে তীক্ষ্ণ, মানুষের বিবেককে করে পরিচ্ছন্ন, রুচি ও মূল্যবোধকে করে উন্নত। এক কথায়, শিক্ষাই মানুষের সার্বিক বিকাশের একমাত্র উপায়। আর নৈতিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা মানুষের মধ্যে শুভ ও কল্যাণচিন্তার উন্মেষ ঘটায়, যার প্রভাবে ভাল-মন্দের তফাৎ নির্ণয় করে মানুষ ভালর পক্ষে অবস্থান নিতে পারে, মানুষ পরার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। সমাজে একজন মানুষকে আমরা যে ভূমিকায় পাই তার বুনিয়াদ নির্মিত হয় পরিবারে। অর্থাৎ পরিবার ও শিক্ষা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং নীতি-আদর্শ শিক্ষায় পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম।

মানুষের একসঙ্গে থাকা ও সামবায়িকভাবে প্রতিকূলতা মোকাবেলার প্রয়োজন থেকে সমাজ গড়ে উঠেছে। আর সমাজ গড়ে তোলার পেছনে সক্রিয় রয়েছে মানুষের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা– সহমর্মিতা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগের মানসিকতা। সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন পরিবারের সমন্বয়ে। আর পরিবার হলো পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি ও অন্যান্য রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন, যারা এক সঙ্গে একই বাড়িতে থাকে, তাদের নিয়ে গঠিত সংসার। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শিক্ষার শুরু হয়। জন্মগ্রহণের পর শিশুর সকল নির্ভরতা তার পরিবার, বিশেষত মা-বাবার ওপর। তার শেখার শুরুও মা-বাবার কাছ থেকেই। বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের নীতি-আদর্শেই বেড়ে ওঠে শিশু। ঘরেই শুরু হয় শিশুর প্রথম পাঠ আর মা-বাবাই শিশুর প্রথম শিক্ষক। একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশই শিশুর পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ এবং সফলতার জন্য উপযুক্ত স্থান। পরিবারে নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার ভিত দৃঢ় হয়; এ সময়ে শিশুকে যা দেখানো ও শেখানো হয় তা-ই তার চেতনাজগতের মৌল ভিত্তি নির্মাণ করে দেয়। পারিবারিক শিক্ষার আলোকে শিশু পরবর্তীতে সমাজ ও প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেয়। পরিবারের সদস্যদের যাপিত জীবন গভীর ছাপ ফেলে শিশুর চেতনায়। পরিবারের সদস্যরা সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত হলে শিশুও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরা উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন যাপন করলে শিশু বিপথে পরিচালিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। পারিবারিক প্রভাবে সে হবে একজন অনৈতিক, অসৎ ও নীতিবিবর্জিত মানুষ; যে দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য বিপজ্জনক।

কোন কিছু সৃষ্টির জন্য দৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন হয়; ভিত্তি যত মজবুত ও শক্ত হয় নির্মিত জিনিসের প্রতিকূলতা জয় ও টিকে থাকার ক্ষমতাও তত বেশি হয়। পরিবার একজন শিশুর গড়ে ওঠার প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করে দেয়। জীবনের শুরুতেই

যদি একটি শিশু সদ্গুণাবলি অর্জন করতে পারে, তাহলে পরবর্তী জীবনে বাইরের কোন প্রভাব তার নীতি আদর্শকে টলাতে পারবে না। তাই শিশুর আদর্শ চরিত্র গঠনে পরিবারই যথার্থ ও আসল ভূমিকা পালন করতে পারে।

জন্মের পর একটি শিশু সাদা কাগজের অলিখিত পৃষ্ঠার মতো; অথবা এ সময়টিকে তুলনা করা যায় কাদা মাটির সঙ্গে। সাদা কাগজটিতে যা ইচ্ছা তা-ই লেখা সম্ভব, আর নরম মাটিকে ইচ্ছেমত আকৃতি দেওয়া খুবই সহজ। সাদা কাগজের পৃষ্ঠা কোন লেখায় পূর্ণ হবে তা যেমন নির্ভর করে লেখকের মেজাজ, রুচি আর দক্ষতার ওপর এবং নরম মাটি দিয়ে কী তৈরি হবে ও তা কতটা শৈল্পিক হবে তা যেমন নির্ভর করে কারিগরের শিল্প প্রতিভার ওপর, তেমনি একজন শিশু কোন রুচি, আদর্শ ও নীতির মানুষ হবে তা প্রকৃতই নির্ভর করে তার মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের আচার-আচরণ, শিক্ষা, রুচি ও নৈতিক আদর্শের ওপর। পরিবারের মানুষদের প্রতিদিনের আচরণ, কথাবার্তা, চলাফেরা, কাজকর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি শিশু অবচেতনে নিজের চেতনায় শুষে নিয়ে নিজের চেতনাজগৎ নির্মাণ করতে থাকে। পারিবারিক পরিবেশ যদি হয় শান্তিময়, ভালবাসাপূর্ণ, রুচিস্নিগ্ধ ও নৈতিক মূল্যবোধে শাণিত, তাহলে শিশুটি অবধারিতভাবেই হবে শান্তিপ্রিয়, ভালবাসায় পরিপূর্ণ হবে তার অন্তর, রুচির ছাপ থাকবে তার কথায় ও কর্মে, নৈতিক মূল্যবোধে তার জীবন হবে সমুন্নত। যে শিশু ভালবাসার মধ্যে বড় হয় সে কখনো সহিংস ও নিষ্ঠুর হতে পারে না; যে শিশু নৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বেড়ে ওঠে, তার মধ্যে হীনতা, নীচতা ও অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় দেবে না; যে শিশু সদাচারের মধ্যে বড় হয় সে কখনো অন্যের সঙ্গে আচরণে রূঢ় হতে পারে না। অর্থাৎ শিশু পরিবার থেকে যা শেখে তা-ই তার চেতনার গভীরে স্থায়ী হয় এবং তার সারা জীবনের আচরণ ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু একটি শিশু তার পরিবারের সদস্যদের অনুসরণ করে তাই শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য পরিবারের সদস্যদের দায়-দায়িত্বও অনেক। যেমন সন্তানের সামনে ঝগড়াঝাটি না করা, খারাপ ভাষায় কথা না বলা, নেশা না করা, অনৈতিক কোন কাজ না করা, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসন মেনে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা, আদর্শ ব্যক্তিদের জীবনী সম্পর্কে শিশুদের আগ্রহী করা– এসবের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক জীবনবোধের বার্তা ও আদর্শ পৌঁছে দিতে পারলে শিশু তার জীবনের পথটি সহজেই চিনে নিতে পারবে। একটি সুশিক্ষিত, ভাল, সৎ, রুচিশীল পরিবারের আগামি প্রজন্ম নীতি-আদর্শ শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হবে– এটাই স্বাভাবিক। আর একটি অসৎ পরিবারের সন্তান আদর্শবান ব্যক্তি হবে তা কল্পনা করাও অযৌক্তিক।

শিশু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের প্রাথমিক পর্ব শেষ করেই সে সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করে। পরিবারের হাত ধরেই শিশু বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করে, পরিবারের দায়িত্বও তাই কেবল পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিশুর সামাজিক জীবনেও পরিবারকে নজরদারি করতে হয়। গৃহে শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে হয়। সেখানে শিশুটি কী করছে, কী শিখছে, কার সঙ্গে মিশছে এসব বিষয়েও পরিবারের সদস্যদের খেয়াল রাখতে হবে। শিশু যাতে অসৎ সঙ্গে না মিশতে পারে, কোন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়াতে না পারে সে বিষয়ে গভীর নজরদারি রাখা পরিবারের অন্যতম দায়িত্ব। সন্তানকে ভালবাসার পাশাপাশি প্রয়োজনমত শাসন করতে হবে। এই শাসন হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও সীমাবদ্ধ; এই শাসনের মধ্যে যাতে হিংস্রতা না থাকে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। বর্তমান সময়ে মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের ব্যস্ততা অনেক বেড়ে গেছে। অর্থ ও প্রতিপত্তির পিছনে ছুটতে গিয়ে তাঁরা পরিবার ও সন্তান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে অথবা যাচ্ছে। সন্তানকে সময় দেওয়ার সময় তাঁদের হাতে নেই। অর্থের বিনিময়ে তাঁরা সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছে; নিঃসঙ্গ সন্তানের বিনোদনের জন্য হাতে তুলে দিয়েছে গেমস খেলার যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদি। শিক্ষা যখন পণ্য হয় তখন তাতে ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বাড়তে পারে, কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে নৈতিকতার দায় থাকে না। মা-বাবার বদলে সঙ্গ দেওয়ার কাজটি যখন করে যন্ত্র, তখন রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে স্নেহ-শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মাখামাখি মানবিক কোন বন্ধন তৈরি হয় না; না পিতা-মাতার সঙ্গে, না আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, না কোন মানুষের সঙ্গে। ক্রোধমিশ্রিত বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বিচ্ছিন্নতা আক্রান্ত যন্ত্র হিসেবে সে গড়ে ওঠে। তখন সে অনায়াসে হত্যা করতে পারে জনক-জননীকে, হত্যা করতে পারে স্বজনকে, হত্যা করতে পারে যে কোন মানুষকে। তার সঙ্গলিপ্সু, ভালবাসা-বুভুক্ষু মন সঙ্গী খুঁজে বেড়ায় ইন্টারনেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথবা অন্যত্র। কার সঙ্গে মিশছে, পরিণতি কী হতে পারে - এসব হিতাহিত ভাবার অবকাশ তার থাকে না। এভাবে কখনো তারা অমিতাচারে লিপ্ত হচ্ছে, কখনো নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, কখনো বা বিভ্রান্ত আদর্শে সমর্পিত হচ্ছে। জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদে। সাফল্য-সন্ধানী মানুষদের সকল অর্জন ব্যর্থ হয়ে যায় সন্তানের এই করুণ পরিণতিতে। চরম মূল্যে পরিশোধ করতে হয় সন্তানের প্রতি উদাসীনতার দায়। মনে রাখতে হবে, মা-বাবার সঙ্গ, ভালবাসা, স্নেহ সন্তানের কাছে পরম কামনার ধন; মা-বাবার ইতিবাচক

জীবনবোধ শিশুকে প্রত্যয়ী করে, মা-বাবার নীতি-আদর্শে সে গর্বিত হয়, উন্নত ও সম্মানিত জীবন গড়তে সে গভীর অনুপ্রেরণা অনুভব করে।

পরিবার সমাজেরই ক্ষুদ্র ইউনিট। তাই পারিবারিক দায়িত্ব পালন করলেই সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না। প্রবাদ আছে, নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিলে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বিষ ঢুকলে তা এড়িয়ে যাওয়া বা তার সঙ্গে শরিক হওয়ার সুযোগ নেই। একদিকে সামাজিক অনাচার ও অমানবিকতাকে চুপচাপ দেখবো অথবা এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব, অন্যদিকে সন্তানকে নীতি-আদর্শে বলীয়ান হতে বলবো -- তাতে কাজ হবে না। নিজে অন্যায় না করলে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে তা সন্তানের চেতনাজগৎকে প্রভাবিত করবে; পাশাপাশি নীতি-আদর্শের সঠিক পাঠ নিতে সে উদ্বুদ্ধ হবে। রাস্তার মোড়ে বা চায়ের স্টলে অথবা নির্জন স্থানে আগামি প্রজন্মের নষ্ট হয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। নিশ্চয়ই তারা পরিবার থেকে ভাল শিক্ষা পায় নি। নষ্টরা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও নষ্ট করবে। তাই দেশ ও জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে পরিবারে নৈতিকতার চর্চা করা এবং সন্তানদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা আজ সময়ের দাবি।

পরিশেষে বলা যায়, পরিবারের দায়িত্বশীল ভূমিকাই পারে একজন সুশিক্ষিত, আদর্শবান, সৎ ও নীতিনিষ্ঠ মানুষ তৈরি করতে, যে কিনা পরিবার ও সমাজে আলো ছড়াবে এবং তার আলোয় জাগবে বিবেক, সাজবে স্বদেশ, উজ্জ্বল হবে জাতির মুখ।

সাহিত্যপাঠের আনন্দ

ভূমিকা

সাহিত্য জগৎ ও জীবনের দর্পণ। বৈচিত্র্যময় জগৎ-জীবনের নিগূঢ় বার্তা রসের আধারে ধারণ করে সাহিত্য। মানবমনের অতলান্ত ভাবনাকে, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যকে সাহিত্যিক তাঁর সূক্ষ্মানুভূতিময় অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অমৃতের রসধারায় সিক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আমরা তাতে জগৎ-জীবনের খবর যেমন পাই, তেমনি আমাদের মনোবীণায় সঞ্চারিত হয় আনন্দের অপূর্ব সুরধারা। এককথায় জীবনকে পূর্ণতাদানের জন্য মানুষের কাছে সাহিত্যের আবেদন অনিঃশেষ।

সাহিত্যের স্বরূপ

'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'সহিত' শব্দ থেকে। এ শব্দটি পারস্পরিক সম্পর্কের একটি বাতাবরণ তৈরি করে। সাহিত্য এমন এক সেতুবন্ধ যা লেখকের সঙ্গে পাঠককে নিবিড় সম্পর্কে বাঁধে। কোন লেখনীর মাধ্যমে লেখকের ভাবনা, কল্পনা,অনুভূতি অকৃত্রিম সংবেদ্যতায় পাঠকের মনকে রসসিক্ত করে, তখনই সে লেখনীটি সাহিত্য পদবাচ্যের মর্যাদা লাভ করে। মানুষ সমাজ গড়েছে শুধু বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে নয়; বরং সমাজগঠনে মানুষের সবচেয়ে বড় তাগিদটি ছিল নিজেকে অন্যের সঙ্গে মেলানো; নিজের চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র অন্তর্ময় অনুভূতিগুলোকে অন্যের কাছে গভীরতর তাড়না। ব্যক্তি নিজেকে সমর্পণ করতে চায় সমষ্টির মধ্যে; নিজের ভাবকে সঞ্চারিত করতে চায় অন্যের ভাবের মধ্যে; নিজের প্রাণের মধ্যে অনুভব করতে চায় অন্যের প্রাণের সাড়া। পারস্পরিক সাহচর্য মানবসভ্যতাকে দান করেছে বিশিষ্টরূপ। আর মানুষে মানুষে সাহচর্যলাভের সবচেয়ে প্রভাবসঞ্চারী ও নান্দনিক মাধ্যম হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্যে মানুষের বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে শুধু তা-ই নয়; রসমণ্ডিত হয়ে বাস্তবনিষ্ঠ ও জীবনঘনিষ্ট রূপ লাভ করে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য এবং তা মানুষের বিচিত্র রস পিপাসা মিটানোর জন্য বিচিত্র আঙ্গিকে রূপলাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"

সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য

সাহিত্যপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দলাভ। লেখক নিজের চিত্তকে পরিতৃপ্ত করতে তাঁর রসভূবন তৈরি করেন; আর পাঠক সেই ভুবনে অবগাহন করেন আনন্দরসে সিক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে। মানবহৃদয়ের বিচিত্র অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যায় সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে। সাহিত্যপাঠে পাঠকের মনে যেমন নির্মল আনন্দানুভূতির সৃষ্টি হয়; তেমনি বিচিত্র জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে পাঠকের মননকে। সাহিত্য মানুষের জীবনচর্যার সমগ্রতাস্পর্শী মাধ্যম। ত্যাগে, ভোগে, আত্মদানে, মহত্ত্বে, বীরত্বে অথবা এসবের বৈপরীত্যে মানুষ যে জীবন যাপন করে; যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে জীবন যাপন করে তার চড়াই-উৎরাই ও বিবর্তনের ইতিবৃত্ত; ভ্রমণবৃত্তান্ত, দুঃসাহসিক অভিযান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, দেশ-দেশান্তরের

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়, সামাজিক আচার-আচরণ অর্থাৎ মানবজীবন ও বৈচিত্র্যময় জগতের সকল প্রান্তের সংবাদ নিয়েই শিল্প-সাহিত্যের বহুমুখী স্রোতোধারা। সাহিত্যপাঠে মানুষের মনের দিগন্ত উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়; উঁকি দেয় মুক্তচিন্তা; মন হয় পরিশুদ্ধ ও নির্মল।

সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা

সাহিত্যের সাধনা সত্য ও সুন্দরের সাধনা। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা জগৎ ও জীবনের চিরায়ত সত্য ও সুন্দরকে অনুধাবন করি। ঋদ্ধ মননশীলতা, অপার সৃজনশীলতা আর সূক্ষ্ম অনুভবময়তার কারণেই শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানবসমাজের সবচেয়ে অগ্রসর অংশ। অনুভূতির সূক্ষ্ম শিকড় চাড়িয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা জগতের অপার রহস্যজাল থেকে সত্য ও সুন্দরকে ছেনে বের করে তার অমৃতরস আমাদের সামনে তুলে ধরেন। পাঠক সেই রসসুধা পান করে এক অনাবিল আনন্দে পরিপ্লাবিত হয়; পাশাপাশি যে সত্য-সুন্দরের বার্তা পায় সাহিত্যে, তারই আলোকে সাজায় আপন জীবন-ভুবন।
সাহিত্যপাঠে মানুষ অর্জন করে পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি, যা সকল ক্ষুদ্রতার বন্ধন মুক্ত করে তাঁকে উপনীত করে মহত্ত্বের উপলব্ধিতে। সাহিত্য মানুষের মনে নান্দনিকতার বোধ জাগায়, জগৎ ও জীবনকে দেখার শৈল্পিক দৃষ্টি দান করে। সাহিত্য মানুষকে উন্নত রুচিবোধ ও চিন্তা-চেতনার সন্ধান দেয়। সাহিত্য শুভবোধে উদ্দীপ্ত কল্যাণময় ও সৌন্দর্যময় জীবন বিনির্মাণের রসদ জোগায়। ফলত সাহিত্যপ্রেমী মানুষের প্রতিটি কর্মে ও আচরণে শিল্পের ছোঁয়া থাকে।
মানবতার বাণী সাহিত্যে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়; শোষণ, বঞ্চনা, উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা আর সহিংসতার বিরুদ্ধে সাহিত্যের উচ্চারণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে সাহিত্য বিশ্বময় মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে বাঁধে। সাহিত্য জাতীয় জাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধিকারের দাবি উচ্চারণের মাধ্যমে পরাধীন, অধিকার-বঞ্চিত মানুষের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটায়।

সাহিত্যে সমাজ, সংস্কৃতি তার ইতিহাস-ঐতিহ্যসমেত সমগ্র চেহারা নিয়ে প্রতিফলিত হয়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকট-সম্ভাবনার চিত্র বাঙ্ময় হয়ে ওঠে সাহিত্যে। তাই সাহিত্যপাঠে সমাজকে জানা যায় অনুপুঙ্খরূপে।

সত্য-সুন্দরের সাধনায় জীবনকে মহিমান্বিত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা অনন্য। এটি সাহিত্যের উপযোগের দিক; কিন্তু গৌণ দিক মাত্র। দৈনন্দিন জীবনে কর্মে ক্লান্ত, হতাশায় নিমজ্জিত, সমস্যায় ক্লিষ্ট মানবমন চায় একটু স্বস্তির অবসর; প্রত্যাশা করে ক্লান্তিদায়ী ভুবনের প্রতিস্পর্ধী অন্য ভুবন, যে ভুবন স্বপ্নের, আনন্দের, রোমাঞ্চের। আমরা যখন শোকে বিহ্বল, আনন্দে আত্মহারা আর হতাশায় বিধ্বস্ত হই তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন আমাদের এ অনুভূতি জগৎকে সাহায্য করতে পারে না। ক্লান্ত-বিধ্বস্ত-অবসাদগ্রস্ত মনে আনে অনাবিল শান্তি। সাহিত্য প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা বলে। তাই সাহিত্য প্রাণে প্রাণে প্রেরণা ছোটায়, স্পন্দন জাগায়। কবি ওমর খৈয়াম তাই বেহেশতের আসবাবপত্রের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কাব্যগ্রন্থের কথা ভুলেননি : রুটি,মদ হয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবে, সাকি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু অমর কাব্য তার সাথে থাকবে অনন্ত যৌবনা সঙ্গিনীর মতো।

উপসংহার

মানুষের হৃদয়ানন্দে সৃষ্টি হয়েছে সাহিত্য; সাহিত্যে বিম্বিত হয়েছে মানুষের আপন অন্তরতম সত্তার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "গোলাপের সৌন্দর্য আমি যে উপভোগ করছি তা এমন করে প্রকাশ করতে হয়, যাতে তোমার মনেও সৌন্দর্যভাবের উদ্রেক হয়।" সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মে যে আনন্দরসের সঞ্চার করেন, তা উপলব্ধির জন্য পাঠককেও প্রস্তুত হতে হয়। সাহিত্যের জগৎ থেকে আনন্দ লাভের জন্য মানুষকে অধ্যবসায়ী হতে হয়। তবেই সাহিত্যপাঠের আনন্দ দীর্ঘদিন মানুষের মনকে সুরভিত রাখে।

রচনার নমুনা

সংকেতের সাহায্য নিয়ে নিচের রচনাগুলো লিখুন। প্রয়োজনে অন্যান্য বইপত্রের সাহায্য নিন। শিক্ষক ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রচনা লেখার ব্যাপারে আলোচনা করুন।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

১. সূচনা
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকারভেদ
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের কারণ
৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ
৭. বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও দুর্যোগ
৮. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ
৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিণাম
১০. দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ও প্রতিকার
১১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন সংস্থা
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা
১৩. উপসংহার

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশ

১. সূচনা
২. গ্রিন হাউস কী
৩. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া কী
৪. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণ
৫. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলাফল
৬. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার বাংলাদেশে প্রভাব
৭. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার বৈশ্বিক প্রভাব
৮. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের উপায়
৯. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে বৈশ্বিক পদক্ষেপ
১০. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ
১১. উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাংলাদেশ

১. সূচনা
২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি
৩. মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য
৪. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বরূপ
৫. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেম
৬. জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন
৭. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুপস্থিতি ও এর প্রভাব
৮. বাংলাদেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অপপ্রয়োগ

৯. বর্তমান বাস্তবতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা
১০. উপসংহার

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প
১. সূচনা
২. পর্যটনের পরিচয়
৩. পর্যটনের আদিকথা
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব
৫. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা
৬. বাংলাদেশের পর্যটনকেন্দ্রের বিন্যাস
৭. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপ
৮. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও অন্যান্য সংস্থা
৯. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের বিকাশে করণীয়
১০. উপসংহার

টেলিভিশন
১. ভূমিকা
২. টেলিভিশন কী
৩. আবিষ্কার
৪. টেলিভিশনের উপযোগিতা বা গুরুত্ব
৫. বাংলাদেশ ও টেলিভিশন
৬. দৈনন্দিন জীবনে টেলিভিশন
৭. টেলিভিশনে জাতীয় জীবনের প্রতিফলন
৮. প্রচার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন
৯. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন
১০. সংস্কৃতির বিকাশে টেলিভিশন
১১. জনমত গঠন ও গণতন্ত্রের বিকাশে টেলিভিশন
১২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিভিশন
১৩. বিনোদনে টেলিভিশন
১৪. অপকারিতা
১৫. উপসংহার

শিষ্টাচার
১. সূচনা
২. শিষ্টাচার কী
৩. জীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব
৪. জীবনে শিষ্টাচারের পরিচয়
৫. শিষ্টাচার অর্জনের উপায়
৬. শিষ্টাচারের সুফল
৭. উপসংহার

বাংলাদেশের যানজট সমস্যা

১. ভূমিকা
২. যানজট কী
৩. বাংলাদেশে যানজটের স্বরূপ
৪. যানজট সৃষ্টির কারণ
৫. যানজটের ভয়াবহ কুফল
৬. যানজট নিরসনের উপায়
৭. যানজট নিরসনে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ
৮. যানজট নিরসনে নাগরিকের করণীয়
৯. উপসংহার

একটি চন্দ্রালোকিত রাত্রি

১. ভূমিকা
২. চন্দ্রালোকিত রাতের তিথি বা তারিখ
৩. চন্দ্রালোকিত রাতের আবির্ভাব
৪. চন্দ্রালোকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ
৫. চন্দ্রালোকিত রাতের সৌন্দর্য ও মুগ্ধতার আবেশ
৬. মানব-মনে জ্যোৎস্নার প্রভাব
৭. রাতের বিভিন্ন পর্বের জ্যোৎস্নার রূপ ও মনোরম দৃশ্য
৮. রাত শেষ হওয়ার আগের দৃশ্য
৯. মনের ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির যোগসাধন
১০. উপসংহার

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

১. ভূমিকা
২. প্রাকৃতিক সম্পদ কী
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ
৪. ভূমি-সম্পদ
৫. বনজ সম্পদ
৬. মৎস্য সম্পদ
৭. নদ-নদী
৮. খনিজ সম্পদ – গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, খনিজ তেল, সিলিকা
৯. সৌরশক্তি
১০. প্রাকৃতিক সম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব
১১. প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার
১২. উপসংহার

বাংলাদেশের উৎসব

১. ভূমিকা
২. উৎসব কী
৩. উসবের ধরণ ও প্রকৃতি
৪. বাংলাদেশে উৎসবের সমারোহ
৫. ঋতু উৎসব
৬. ধর্মীয় উৎসব

৭. সামাজিক উৎসব
৮. সাংস্কৃতিক উৎসব
৯. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উৎসব
১০. জাতীয় উৎসব
১১. অর্থনীতি-সংশ্লিষ্ট উৎসব
১২. স্মরণোৎসব
১৩. উৎসবের সর্বজনীন রূপ
১৪. ব্যক্তিগত জীবনে উৎসবের প্রভাব
১৫. জাতীয় জীবনে উৎসবের প্রভাব
১৬. উপসংহার

ইন্টারনেট

১. সূচনা
২. ইন্টারনেট কী
৩. ইন্টারনেটের স্বরূপ
৪. ইন্টারনেটের উদ্ভব ও বিকাশ
৫. ইন্টারনেট সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া
৬. ইন্টারনেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান
৭. বাংলাদেশে ইন্টারনেটের ব্যবহার
৮. ইন্টারনেট ব্যবহারের উপকারিতা
৯. ইন্টারনেট ব্যবহারের অপকারিতা
১০. উপসংহার

কম্পিউটার ও আধুনিক সভ্যতা

১. ভূমিকা
২. কম্পিউটার কী
৩. কম্পিউটার আবিষ্কারের কথা
৪. কম্পিউটারের কাঠামো
৫. কম্পিউটারের বহুমাত্রিক ব্যবহার
৬. বাংলাদেশে কম্পিউটারের ব্যবহার
৭. বাংলাদেশের উন্নয়নে কম্পিউটারের অবদান
৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের অপরিহার্যতা
৯. উপসংহার

খেলাধুলায় বাংলাদেশ

১. সূচনা
২. খেলাধুলা কী
৩. খেলাধুলার গুরুত্ব
৪. বাংলাদেশের নিজস্ব খেলা
৫. বাংলাদেশের বিদেশি খেলা
৬. খেলাধুলায় বাংলাদেশের অবদান
৭. উপসংহার

নমুনা প্রশ্ন

বাংলা ২য় পত্র (বিষয় কোড: ২৮৫১)

এইচএসসি প্রোগ্রাম

সময়: ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান: ১০০

[দ্রষ্টব্য: ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দূষণীয়।]

১। (ক) ম-ফলা (ম) উচ্চারণের ৫টি নিয়ম লিখুন। ৫

অথবা

(খ) যে কোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লিখুন:
উচ্চারণ, ইতিহাস, অভিজ্ঞ, গদ্য, দায়িত্ব শূন্য, পদ্ম, সহস্র।

২। (ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের যে কোনো ৫টি নিয়ম লিখুন। ৫

অথবা

(খ) যে কেনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লিখুন:
সামিয়ানা, টেলিভীষন, অ্যাসিড, ব্যাঙ্ক, রঙিন, কীংবদন্তি, কার্ত্তিক, লালগোলাপ।

৩। (ক) উদাহরণসহ সর্বনাম পদের শ্রেণী বিন্যাস আলোচনা করুন। ৫

অথবা

(খ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে ৫টি বিশেষণ নির্বাচন করুন:
প্রতিযোগিতার প্রথম পুরষ্কার একটি মোবাইল সেট। সুস্থ-সবল দেহ না হলে খেলায় জয় লাভ অসম্ভব। ইট বসানো রাস্তায় হবে সাইকেল চালনা। কাঁদো কাঁদো চেহারায় ফিরে এলো ছেলেটি।

৪। (ক) উপসর্গ বলতে কি বোঝেন? উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন। ৫

অথবা

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখুন (যে কোনো পাঁচটি):
লাঠালাঠি, মহানবী, দম্পতি, পরানপ্রিয়, অনভ্যাস, সোনামুখী, নীলপদ্ম, কীটনাশক।

৫। (ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ৫

অথবা

(খ) বাক্যান্তর করুন (যে কোনো পাঁচটি):
(i) মূর্খ লোক অবজ্ঞার পাত্র। (জটিল বাক্য)
(ii) যে বইটি আমি কিনেছি, সেটি খুব দামী। (সরল বাক্য)
(iii) তিনি ধনী হয়েও সুখী ছিলেন না। (যৌগিক বাক্য)
(iv) পড়াশোনা কর, নচেৎ ভবিষ্যৎ অন্ধকার। (জটিল বাক্য)
(v) তার অভ্যাস পেতাম, কিন্তু নাগাল পেতাম না। (জটিল বাক্য)
(vi) তুমি আবার এসো। (নেতিবাচক বাক্য)
(vii) বেশির ভাগ লোকেই বেদের অর্থ বুঝতনা। (অস্তিবাচক বাক্য)
(viii) যে কথা আজও ভুলতে পারিনি। (প্রশ্নবাচক বাক্য)

৬। (ক) যে কোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লিখুন। ৫
(i) ক্লাসে অনেক ছাত্ররা উপস্থিত ছিল।
(ii) বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
(iii) যুক্তি খণ্ডিত হয়েছে, তবে মুক্তি মেলেনি।
(iv) শুধুমাত্র এই কটা টাকা দিলে?
(v) তিনি সস্ত্রীক ঢাকা থাকেন।
(vi) মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সচিব দায়িত্ব পালন করবেন।
(vii) গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।
(viii) অন্যায়ের প্রতিফল দুর্ণিবার্য।

অথবা

(খ) অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লিখুন:
আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে। আজকাল অবশ্য ছাত্রদের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম। সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বশিক্ষিত। কলেজ অধ্যক্ষ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করবেন।

৭। (ক) পারিভাষিক শব্দ লিখুন (যে কোনো দশটি): ১০
fossil, editor, circular, abstract, campus, galaxy, home-ministry, para, phobia, symphony, tribe, consultant, warrant, file, nursery.

অথবা

(খ) বাংলা অনুবাদ করুন:
A newspaper is a store of knowledge We can know the condition, manners and customs of other countries of the world from newspaper. It is in fact the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The Businessman finds the condition of the market about his goods through newspaper.

৮। (ক) চিড়িয়াখানা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। ১০

অথবা

(খ) ইভ-টিজিং এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি ভাষণ লিখুন।

৯। (ক) বই পড়া কর্মসূচিতে পুরস্কার প্রাপ্তি সম্পর্কে জানিয়ে আপনার বাবার উদ্দেশ্যে একটি ই-মেইল রচনা করুন। ১০

অথবা

(খ) একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পত্র রচনা করুন।

১০। (ক) সারমর্ম লিখুন: ১০

কহিল মনের খেদে মাঠ সমতল
মাঠ ভরে দেই আমি কত শস্য ফল।
পর্বত দাঁড়ায়ে রহে কি জানি কি কাজ
পাষাণের সিংহাসনে তিনি মহারাজ।
বিধাতার অবিচার কেন উঁচু নিচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।
গিরি কহে সব হলে সমতল পারা
নামিত কি ঝর্ণার সুশীতল ধারা?

অথবা

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ করুন:
সাহিত্য জাতির দর্পণস্বরূপ।

১১।(ক) সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করুন। ১০

অথবা,

(খ) প্রদত্ত উদ্দীপকের আলোকে ‘বন্ধুত্ব’ মূলভাবে একটি গল্প রচনা করুন, হোস্টেলের বিছানায় একা কাতরাতে থাকে সজীব।.....

১২। যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন: ২০

(ক) সৎসঙ্গ
(খ) তথ্য-প্রযুক্তির অগ্রগতি ও বাংলাদেশ
(গ) বই পড়ার আনন্দ
(ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
(ঙ) স্বনির্ভর বাংলাদেশ।